ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*** (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.**

Note: The Article 51 A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).
**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010). Constitution of India.*

জীববিদ্যা

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

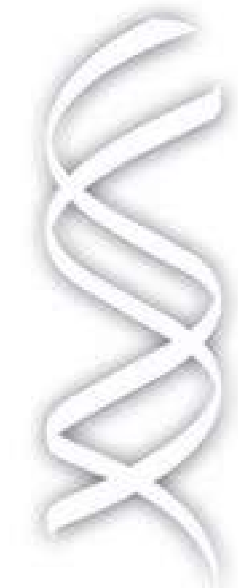

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
এন সি ই আর টি-র
Biology পাঠ্যপুস্তকের
২০১৮ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : সন্তোষ দেবনাথ

মূল্য: ১৯৫ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

পুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন

১। অভিজিৎ চক্রবর্তী, শিক্ষক
২। পূর্বিতা সরকার, শিক্ষিকা
৩। তটিনী ঘোষ, শিক্ষিকা
৪। পৌলমী ভট্টাচার্য, শিক্ষিকা
৫। কাকলি মজুমদার, শিক্ষিকা
৬। সুস্মিতা দেবনাথ, শিক্ষিকা
৭। পান্না ভৌমিক, শিক্ষক
৮। সত্যপ্রিয় রায়, শিক্ষক
৯। ড: সুরজিৎ ভট্টাচার্য, শিক্ষক

ভাষা পরিমার্জনায়

১। সুপ্রিয় চক্রবর্তী, শিক্ষক
২। এমেলী নাগ, শিক্ষিকা
৩। গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

FOREWORD

The National Curriculum Framework (NCF) 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in science and mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisor for this book, Professor K. Muralidhar, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook. We are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations

which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairmanship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution.

As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

PREFACE

Biology is the study of life in its entirety. The growth of biology as a natural science during the last 1000 years is interesting from many points of view. One feature of this growth is changing emphasis. Initially it was description of life forms. Identification, nomenclature, classification of all recorded living forms enjoyed the attention of scientists for a long time. Description of their habitats and (in the case of animals) their behaviour was included in this study. In later years, the focus was physiology and internal morphology or anatomy. Darwinian ideas of evolution by natural selection changed the perception completely. Classical descriptive and clueless biology found a theoretical framework in the evolutionary theory of Darwin.

In the nineteenth and twentieth centuries, Physics and Chemistry were applied to Biology and the new science of Biochemistry soon became the dominant face of biology. On one hand Biochemistry was integrating with Physiology, becoming almost synonymous with it. On the other hand it gave rise to Structural Biology (structure of biomacromolecules), originally called Molecular Biology. The work of Bernal, Pauling, Watson and Crick, Hodgkins, Perutz and Kendrew, Delbruck, Luria, Monod, Beadle and Tatum, Lederberg, Brenner, Benzer, Nirenberg, Khorana, Mclintock, Sanger, Cohen, Boyer, Kornbergs (father and son), Leder, Chambon and scores of others brought in and established a modern version of Molecular Biology dealing with life processes at molecular level.

Physics and Chemistry dominated public perception of science for a long time. Daytoday life of man was influenced by developments in Physics, Chemistry and their respective manufacturing industries. Slowly and steadily, Biology, not to be left behind, demonstrated its utility for human welfare. Medical practice, especially diagnostics, green revolution and the newly emerging biotechnology and its success stories made the presence of biology felt by the common man. Patent laws brought biology into political domain and commercial value of biology became obvious.

For more than a century, classical and so-called reductionist biology fought artifical battles. The fact is both are important. Ecology brought in synthesis of both approaches and emphasised integrated understanding of biology. Form and process are both equally important. Systems biology, using mathematical tools, is bringing about a modern synthesis of both the aspects of Biology.

The Class XI and XII textbooks in biology essentially were to reflect these threads of biological thought. While the Class XI book dealt with morphology, taxonomy, molecular and cellular aspects of physiology, the Class XII book deals with the physiological process of reproduction in flowering plants and humans, the principles of inheritance, the nature of genetic material and its function, the contributions of biology to human welfare, basic principles of biotechnological processes and their applications and achievements. The Class XII book also relates genes to evolution on one hand and presents ecological interactions, behaviour of populations and ecosystems on the other. Most important,

the guidelines under NCF-2005 have been followed in letter and spirit. The total learning load has been reduced considerably and themes like environmental issues, adolescent problems and reproductive health have been dealt with in some detail. Studied together, the class XI and class XII textbooks in Biology would enable the student to —

(i) become familiar with the diversity of biological material.

(ii) appreciate and believe in the Darwinian evolutionary process exhibited by the living world.

(iii) understand the dynamic state of constituents of living bodies, i.e., metabolic basis of all physiological processes in plants, animals and microbes.

(iv) realise the structure and function of genetic material in directing the inherited phenotype pattern as well as a mediator of evolutionary process.

(v) appreciate the profound contributions of biology to human welfare.

(vi) reflect on the physico-chemical basis of living processes and at the same time realise the limitation of reductionism in understanding behaviour of organisms.

(vii) experience the humbling effect of this realisation that all living organisms are related to each other by virtue of shared genetic material.

(viii) realise that biology is the story of the struggle of living organisms for existence and survival.

One may notice a perceptible change in the writing style. Most of the chapters are written in an easy dialogue style engaging the student constantly while some chapters are in the form of critical comments on the subject matter. A number of questions have been provided at the end of each chapter though answers to some may not be found in the text. Students have to read supplementary material, upon advise from the teacher, to answer such questions.

I am thankful to Professor Krishna Kumar, Director NCERT; Professor G. Ravindra, Joint Director, NCERT and Professor Hukum Singh, Head, DESM, NCERT for constant support. I must place on record my deep appreciation for Dr B.K. Tripathi, *Reader,* DESM, NCERT for his relentless efforts as coordinator in bringing out the Biology textbook for both the Class XI and XII. All the members of the development team, the experts and reviewers, and the school teachers have contributed enormously in the preparation of this book. I thank them all. I am indeed highly thankful to the members of monitoring committee constituted by Ministry of Human Resource Development for their valuable observation that helped in the improvement of the book at the final stage. The book is prepared keeping in mind the guidelines of the NCF-2005 especially the emphasis on reducing the learning load. We hope that the book would meet the expectations of all the stakeholders. All suggestions for further improvement are always welcome.

K. Muralidhar
Chief Advisor
Biology Textbook for Class XII

Department of Zoology
University of Delhi

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Group for Textbooks in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Emeritus Professor*, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Pune University, Pune

Chief Advisor

K. Muralidhar, *Professor*, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi

Members

Ajit Kumar Kavathekar, *Reader* (Botany), Sri Venkateswara College, University of Delhi, Delhi

B.B.P. Gupta, *Professor*, Department of Zoology, North-Eastern Hill University, Shillong

B.N. Pandey, *Principal,* Ordinance Factory Higher Secondary School, Dehradun

C.V. Shimray, *Lecturer*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, New Delhi

Dinesh Kumar, *Reader*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, New Delhi

J.P. Gaur, *Professor,* Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi

J.S. Virdi, *Reader,* Department of Microbiology, University of Delhi, South Campus, New Delhi

K. Sarath Chandran, *Reader* (Zoology), Sri Venkateswara College, University of Delhi, Delhi

L.C. Rai, *Professor,* Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi

M.M. Chaturvedi, *Professor,* Department of Zoology, University of Delhi, Delhi

N.V.S.R.K. Prasad, *Reader* (Botany), Sri Venkateswara College, University of Delhi, Delhi

Sangeeta Sharma, *PGT* (Biology), Kendriya Vidyalaya, JNU, New Delhi

Savithri Singh, *Principal*, Acharya Narendra Dev College, University of Delhi, Delhi

Shanti Chandrashekaran, *Principal Scientist,* Division of Genetics, I.A.R.I., New Delhi

Shardendu, *Reader,* Department of Botany, Science College, Patna University, Patna

Simminder K. Thukral, *Assistant Professor,* NIIT Institute of Information Technology, New Delhi

Sunaina Sharma, *Lecturer* (Biology), Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Dwarka, New Delhi

T.R. Rao, *Professor* (Retd.) School of Enviornmental Studies, University of Delhi, Delhi

V.K. Kakaria, *Reader,* Regional Institute of Education, Bhopal

V.V. Anand, *Reader,* Regional Institute of Education, Mysore

Member-coordinator

B.K. Tripathi, *Reader*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

National Council of Educational Research and Training (NCERT) gratefully acknowledges the valuable contribution of K.R. Shivanna, *Professor (Retd.)*, Department of Botany, University of Delhi, Delhi; S.K. Saidapur, *Professor*, Department of Zoology, Karnataka University Dharwad; Vani Brahmachari, *Professor*, Ambedkar Centre for Biomedical Research, University of Delhi, Delhi; A.N. Lahiri Majumdar, *Professor*, Bose Institute, Kolkata; Anil Tripathi, *Professor*, Department of Biotechnology, Banaras Hindu University, Varanasi; J.L. Jain, *Senior Physician*, WUS Health Centre, University of Delhi, Delhi, in the development of the Biology textbook for Class XII. NCERT is also grateful to K.R. Shivanna and T.Subramanyam, IIT, Kanpur for some of the photographs used in the book.

NCERT sincerely acknowledges the contributions of the members who participated in the review of the manuscripts – A.S. Dixit, *Reader*, Department of Zoology, North-Eastern Hill University, Shillong; S.L. Varte, *Lecturer*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, New Delhi; Sushma Jairath, *Reader*, Department of Women's Education, NCERT, New Delhi; Mona Yadav, *Lecturer*, Department of Women's Education, NCERT, New Delhi; Poonam A. Kant, *Reader* (Zoology), Acharya Narendra Dev College, New Delhi; Mrs. Suvarna Fonseca è Antao, *Gr. I Teacher* (Biology), Carmel Higher Secondary School, Nuvem, Goa; Rashmi Mishra, *PGT* (Biology), Carmel Convent Senior Secondary School, BHEL, Bhopal; Ishwant Kaur, *PGT* (Biology), D.M. School, RIE, Bhopal; A.K. Singh, *PGT (Biology)*, Kendriya Vidyalaya, Cantt, Varanasi; R.P. Singh, *Lecturer* (Biology), Rajkiya Pratibha Vikash Vidyalaya, Kishan ganj, Delhi; M.K. Tiwari, *PGT* (Biology), Kendriya Vidyalaya, Mandsaur, Madhya Pradesh; A.K. Ganguly, *PGT* (Biology), Jawahar Navodaya Vidyalaya, Roshnabad, Haridwar; Chaitali Dixit, *PGT* (Biology), St. Anthony's Higher Secondary School (Don Bosco), Shillong and Abhishek Chari, Acharya Narendra Dev College, New Delhi.

Special thanks are due to Rita Sharma, *Retd. Professor,* RIE Bhopal, A.K. Mohapatra *Professor*, RIE Bhubaneswar, J.S. Gill, *Retd. Professor*, DESM, NIE, G.V. Gopal, *Professor*, RIE Mysore, Jaydeep Mandal, *Professor*, RIE Bhopal, C. Padmija, *Professor*, RIE Mysore, Dr. Pushplata Verma, *Associate Professor*, DESM, NIE, Ishwant Kaur, *Vice Principal*, DM School Ajmer for their valuable contribution in review and updation of the textbook.

The Council is highly thankful to Hukum Singh, *Professor and Head,* Department of Education in Science and Mathematics, NCERT for his valuable support throughout the making of this book.

The contributions of Deepak Kapoor, *Incharge*, Computer Station; Seema Mehmi and Arvind Sharma, *DTP operators*; Deepti Sharma, *Copy Editor;* Rachna Dogra and Abhimanu Mohanty, *Proof Readers* and APC office and administrative staff of Department of Education in Science and Mathematics, NCERT also acknowledged.

The efforts of the Publication Department, NCERT, in bringing out this publication are highly appreciated.

সূচিপত্র

একক VI

জনন **1-66**

অধ্যায় 1 : সজীব বস্তুতে জননক্রিয়া 3

অধ্যায় 2 : সপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন জনন 19

অধ্যায় 3 : মানুষের জনন 42

অধ্যায় 4 : জননগত স্বাস্থ্য 57

একক VII

বংশগতি এবং বিবর্তন **67-142**

অধ্যায় 5 : বংশানুসরণ ও প্রকরণের নীতিসমূহ 69

অধ্যায় 6 : বংশগতির আনবিক ভিত্তি 95

অধ্যায় 7 : বিবর্তন 126

একক VIII

মানব কল্যাণে জীববিদ্যা **143-190**

অধ্যায় 8 : মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগ 145

অধ্যায় 9 : খাদ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধনের কৌশলসমূহ 165

অধ্যায় 10 : মানব কল্যাণে অনুজীব 179

একক IX

জীবপ্রযুক্তি বিদ্যা 191-216

অধ্যায় 11 : জীবপ্রযুক্তি বিদ্যা ঃ মূলনীতি এবং পদ্ধতিসমূহ 193

অধ্যায় 12 : জীবপ্রযুক্তি বিদ্যা ও এর প্রয়োগসমূহ 207

একক X

বাস্তব্যবিদ্যা 217-286

অধ্যায় 13 : জীবসমূহ এবং পপুলেশান 219

অধ্যায় 14 : বাস্তুতন্ত্র 241

অধ্যায় 15 : জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ 258

অধ্যায় 16 : পরিবেশগত সমস্যাসমূহ 270

একক VI

জনন (REPRODUCTION)

_অধ্যায় 1_
সজীববস্তুতে জননক্রিয়া
(Reproduction in Organisms)
_অধ্যায় 2_
সপুষ্পক উদ্ভিদে যৌনজনন
(Sexual Reproduction in flowering Plants)
_অধ্যায় 3_
মানুষের জনন
(Human Reproduction)
_অধ্যায় 4_
জননগত স্বাস্থ্য
(Reproductive Health)

জীববিদ্যার মূল ভাবটি হল পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবনের গল্প। যখন একক জীবগুলো নিশ্চিতভাবে মারা যায়, তখন প্রজাতিগুলো কোটি কোটি বছর ধরে জীবিত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট কর্মের প্রভাবে এরা বিপদগ্রস্থ হয়। জনন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা ব্যতীত প্রজাতিসমূহ দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। অযৌন অথবা যৌন জননের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীব থেকে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। যৌন জনন প্রক্রিয়ার ফলে নতুন প্রকরণের সৃষ্টি হয় এবং এরফলে পৃথিবীতে জীবদের টিকে থাকার সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এই এককে সজীববস্তুতে সংঘটিত জনন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সাধারণ নীতিগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পরে সহজ উদাহরণের সাহায্যে সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং মানুষের জনন প্রক্রিয়াগুলো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জননের জীববিদ্যা বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্যতার জন্য মানুষের জননগত স্বাস্থ্য এবং কীভাবে জননগত স্বাস্থ্য হানি এড়ানো যেতে পারে সেই বিষয়টিকেও এই এককে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চানন মাহেশ্বরী 1904 সালের নভেম্বর মাসে রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শুধুমাত্র ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য এলাহাবাদে যান এবং সেখানে D.Sc. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কলেজের দিনগুলোতে তিনি একজন আমেরিকান মিশনারী শিক্ষক ডঃ ডব্লিও ডাডজিওন (Dr W. Dudgeon) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যার ফলে তাঁর উদ্ভিদবিদ্যা বিশেষত অঙ্গসংস্থানের উপর আগ্রহ জন্মায়। তাঁর শিক্ষক এটা ব্যক্ত করেছিলেন যে, যদি তাঁর কোনো ছাত্র তাঁর থেকেও এগিয়ে যায় তবে এটি তাঁকে পরম পরিতৃপ্তি দেবে। এই কথাগুলো উদ্ভিদবিদ পঞ্চাননকে এই কথা ভাবতে উৎসাহিত করেছিল যে বিনিময়ে তিনি তাঁর শিক্ষকের জন্য কী করতে পারেন।

পঞ্চানন মাহেশ্বরী
(1904-1966)

তিনি ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর গবেষণা করেছিলেন এবং বিন্যাসবিধিতে ভ্রূণতত্ত্বগঠিত বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যবহারকে জনপ্রিয় করেছিলেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগটিকে কলাপালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি অপরিণত ভ্রূণের কৃত্রিম প্রতিপালনের উপর গবেষণা শুরুর প্রয়োজনীয়তায় জোড় দিয়েছিলেন। বর্তমান দিনে কলাপালন বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক অর্থাৎ পথনির্দেশক হয়ে উঠেছে। টেস্টটিউব ফার্টিলাইজেশান এবং ইনট্রা ওভারিয়ান পলিনেশানের উপর তাঁর গবেষণা পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছিল।

তিনি রয়েল সোসাইটি অফ লন্ডন, ইন্ডিয়ান ন্যাশানেল সায়েন্স একাডেমি এবং আরোও অনেক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ (FRS) লাভ করেছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য জীববিদ্যার সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকটি 1964 সালে NCERT দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এভাবে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

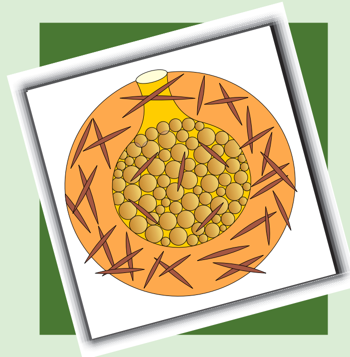

অধ্যায় 1
সজীব বস্তুতে জননক্রিয়া
(Reproduction in Organisms)

1.1 অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

1.2 যৌন জনন (Sexual Reproduction)

প্রতিটি সজীব বস্তু কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কোনো সজীব বস্তুর জন্ম থেকে শুরু করে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালই হল এর জীবনকাল। চিত্র 1.1 এ কিছু সজীব বস্তুর জীবনকাল দেওয়া হয়েছে। আরোও বেশকিছু সজীব বস্তুর চিত্র দেওয়া আছে যাদের জীবনকাল তোমরা খুঁজে বের করবে এবং প্রদত্তস্থানে তা লিখবে। এটা কী মজাদার এবং কৌতূহল উদ্দীপক নয় যে কিছু সজীব বস্তুর জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ তা মাত্র কয়েকদিনের হয় বা কিছু সজীববস্তুর জীবনকাল এতোটাই দীর্ঘ যে এটি কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত হতে পারে? বেশীরভাগ অন্যান্য সজীববস্তুর জীবনকাল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সবচেয়ে দীর্ঘ জীবনকালের মাঝামাঝি হয়। লক্ষ্য করে দেখো যে, সজীববস্তুর জীবনকাল তার আকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে, যেমন কাক ও টিয়া পাখির আকারের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই তবে তাদের জীবনকালের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একইভাবে একটি অশ্বত্থ গাছের তুলনায় একটি আম গাছের আয়ুষ্কাল অনেকটাই কম। জীবের জীবনকাল যাইহোক না কেন মৃত্যু অনিবার্য অর্থাৎ এককোশী জীব ব্যতীত কোনো জীবই অমর নয়। কেন আমরা বলি যে, এককোশী জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনা? এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়েও তুমি কি কখনও এটা ভেবে অবাক হয়েছো কীভাবে বিশাল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে টিকে রয়েছে? জীবের দেহে নিশ্চয়ই এমন কিছু প্রক্রিয়া ঘটে যা প্রজাতির এই ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করে। হ্যাঁ, আমরা জননের কথাই বলছি, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে আমরা নিশ্চিতভাবেই মানি।

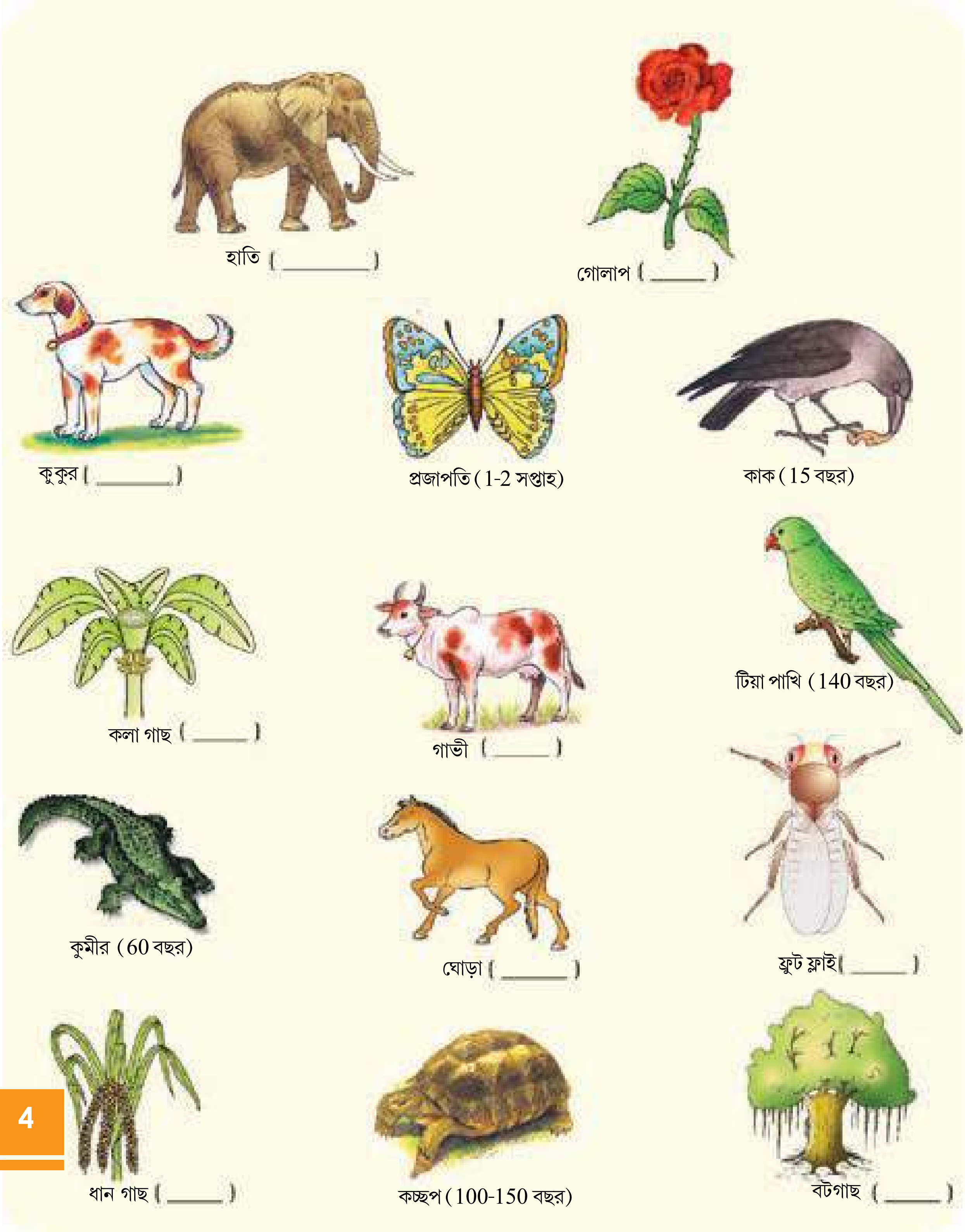

চিত্র 1.1 কিছু সংখ্যক জীবের আনুমানিক জীবনকাল।

জনন হল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জীব তার অনুরূপ জীবের (অপত্য জীব) জন্ম দেয়। অপত্য জীবরা বৃদ্ধি পায়, পরিণত হয় এবং পরবর্তী সময়ে নতুন অপত্য জীব সৃষ্টি করে। এইভাবে জীবের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর একটি চক্র রয়েছে। জননের ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কিভাবে জিনগত প্রকরণের সৃষ্টি হয় এবং প্রজননকালে তা বংশানুসরণ ঘটে এই বিষয়টি তোমরা পরবর্তী সময়ে অধ্যায় 5 এ (বংশানুসরণ ও প্রকরণের নীতি সমূহ) অধ্যয়ন কর।

জীবজগতে বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে এবং প্রতিটি জীব সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অপত্য সৃষ্টির জন্য তার দেহে নিজস্ব পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

একটি জীব কীভাবে প্রজনন করে তা জীবটির বাসস্থান, এর অভ্যন্তরীণ শারীরবৃত্ত এবং বহু অন্যান্য প্রভাবকের উপর সম্মিলিতভাবে নির্ভর করে। জনন প্রক্রিয়ায় একটি জীব নাকি দুটি জীব অংশগ্রহণ করে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া দুই ধরনের হয়। যখন একটি মাত্র জনিতৃ জীব থেকে জনন কোশ সৃষ্টি অথবা জনন কোশের উৎপাদন ছাড়াই অপত্য জীব জন্মায় সেই জনন প্রক্রিয়াকে অযৌন জনন বলে। যখন দুটি জনিতৃ জীব (বিপরীত লিঙ্গের জীব) জনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং পুংজননকোশ ও স্ত্রীজননকোশেরও মিলন ঘটে, তাকে যৌন জনন বলে।

1.1 অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

এই প্রক্রিয়ায় একটি একক জীব (জনিতৃ জীব) অপত্যজীব সৃষ্টিতে সক্ষম। এরফলে যে অপত্য জীবগুলোর সৃষ্টি হয় এরা কেবলমাত্র একে অপরের সমরূপই হয় না, এরা জনিতৃ জীবেরও অনুরূপ হয়। এই অপত্য জীবগুলো জিনগতভাবে কী সমরূপ হবে নাকি ভিন্ন ধরনের হবে? এইরূপ অঙ্গ সংস্থানগতভাবে এবং জিনগতভাবে সদৃশ জীবদের বর্ণনা করতে ক্লোন (clone) শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

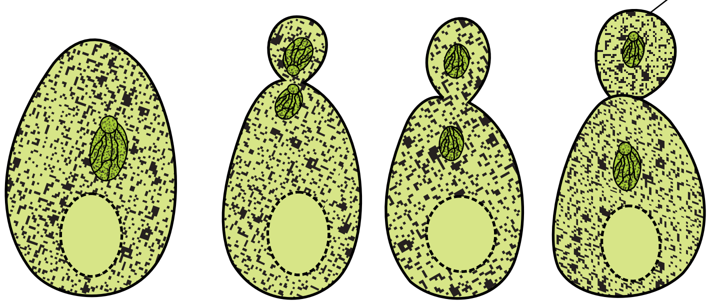

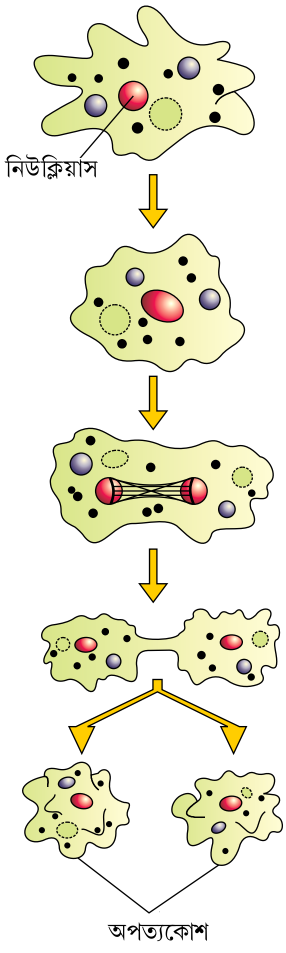

চিত্র 1.2 এককোশী জীবে কোশ বিভাজন প্রক্রিয়া : **ক)** ঈস্টে কোরকোদ্গম প্রক্রিয়া **খ)** অ্যামিবায় দ্বিবিভাজন

চলো আমরা দেখি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সজীব বস্তুর মধ্যে অযৌন জনন কতটা বিস্তৃতভাবে দেখা যায়। অযৌন জনন এককোশী জীবসমূহে এবং তুলনামূলকভাবে সরল সংগঠন বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। প্রোটিস্টা ও মোনেরা গোষ্ঠীভুক্ত জীবে সজীববস্তু বা জনিতৃ কোশ বিভাজিত হয়ে দুটি নতুন জীবের সৃষ্টি করে (চিত্র 1.2)। তাই এই ধরনের জীবে কোশ বিভাজন নিজেই একটি প্রজননের ধরন।

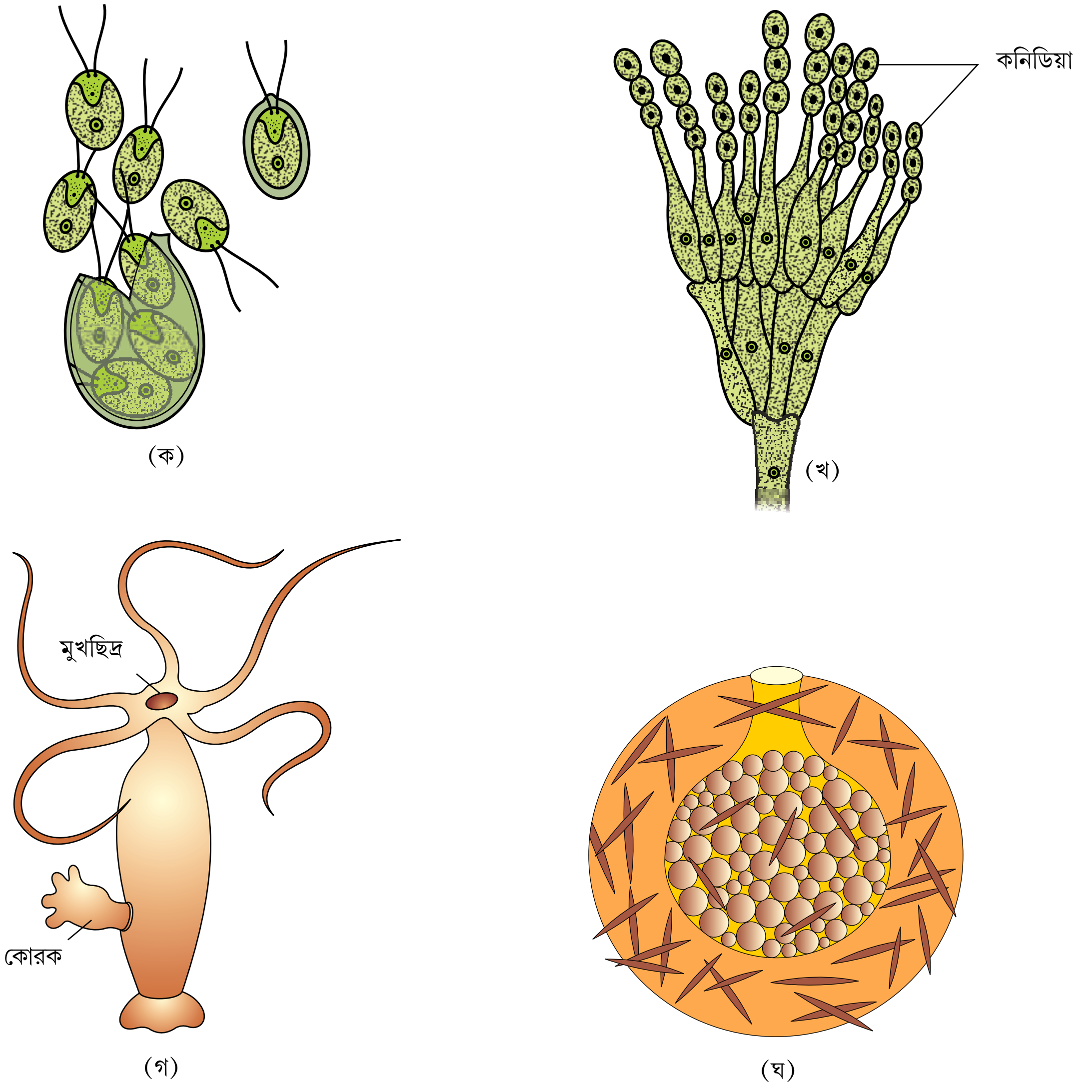

চিত্র 1.3 অযৌনজননে অংশগ্রহণকারী গঠনসমূহ ঃ ক) ক্ল্যামাইডোমোনাস এর চলরেণু খ) পেনিসিলিয়াম এর কনিডিয়া গ) হাইড্রার দেহ থেকে উৎপন্ন কোরক ঘ) স্পঞ্জে গমিউলস

বহু এককোশী জীব দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে যেখানে একটি কোশ বিভাজিত হয়ে দুটি খণ্ডাংশে পরিণত হয় এবং প্রতিটি খণ্ডাংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয় (উদাহরণ-অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম)। ঈস্টে, অসম বিভাজন ঘটে এবং কতগুলো ছোট কোরক উৎপন্ন হয় যেগুলো প্রাথমিকভাবে মাতৃকোশের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং অবশেষে কোরকগুলো মাতৃদেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পরিণত হয়ে নতুন ঈস্ট (কোশ) গঠন করে। প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবা তার ক্ষণপদগুলো গুটিয়ে নেয় এবং এর ক্ষরণ অ্যামিবাটির চারপাশে একটি শক্ত আবরণ বা সিস্ট গঠন করে। এই ঘটনাটিকে এনসিস্টেশান বলা হয়। যখন অনুকূল অবস্থা ফিরে আসে সিস্টের ভেতরে উপস্থিত অ্যামিবা বহুবিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিবা বা সিউডোপোডিওস্পোর (Pseudopodiospores) উৎপন্ন করে; ইতিমধ্যে সিস্টের প্রাচীরটি ভেঙে যায় এবং রেণুগুলো চতুর্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এবং এরা বৃদ্ধি পেয়ে অ্যামিবা গঠন করে। এই ঘটনাকে স্পোরোলেশান (Sporulation) বলে।

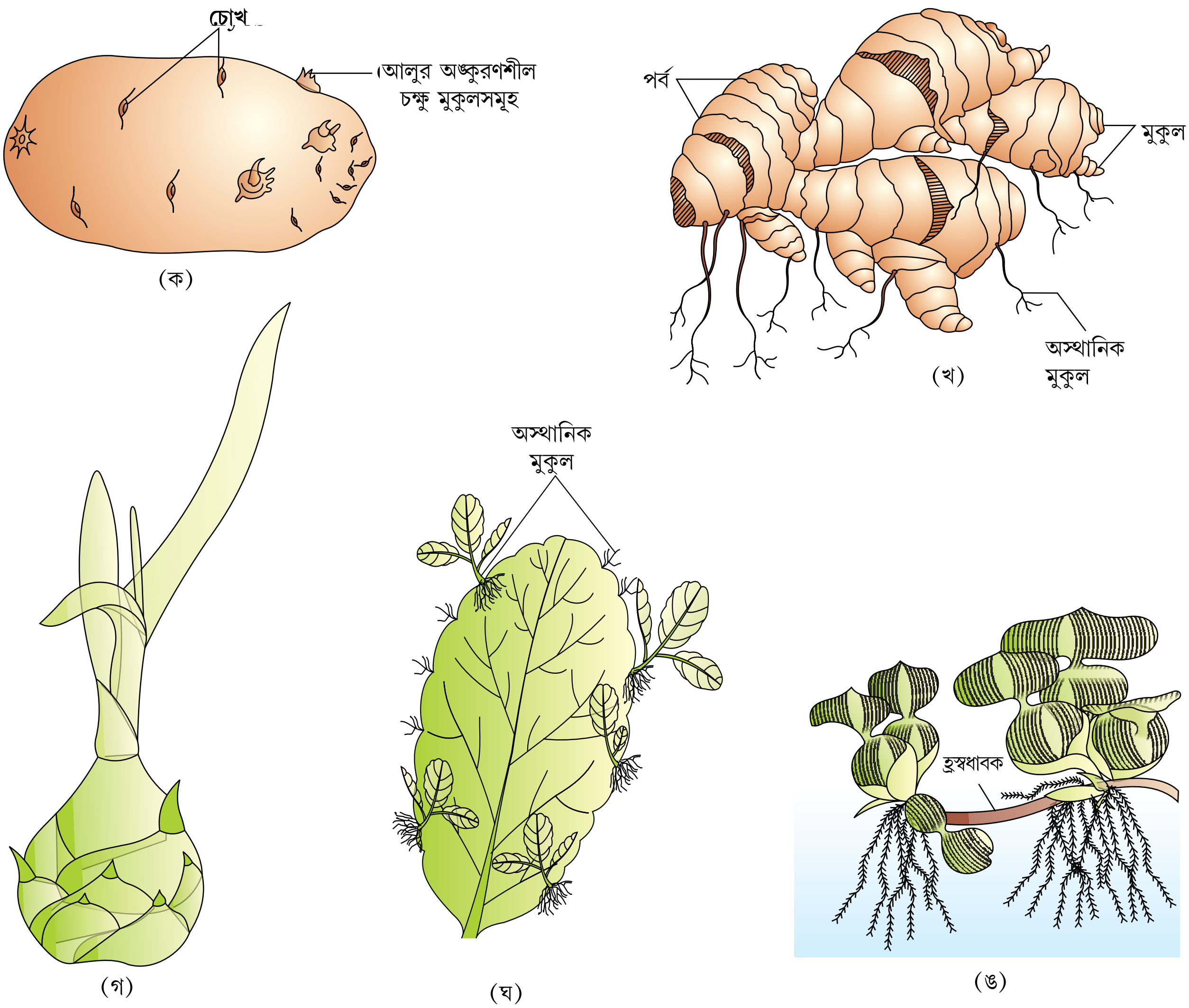

চিত্র 1.4 উদ্ভিদে অঙ্গজজননে সহায়ক গঠন ঃ ক) আলুর চোখ খ) আদার গ্রন্থিকাণ্ড সমূহ গ) এগেভ (Agave) ঘ) পাথরকুচির পত্রজ মুকুলসমূহ (ঙ) কচুরিপানার হ্রস্বধাবক।

ছত্রাক রাজ্যের সদস্য এবং শৈবালের মতো সরল উদ্ভিদগুলো বিশেষ অযৌন জননে সহায়ক গঠনসমূহের মাধ্যমে জননকার্য সম্পন্ন করে (চিত্র 1.3)। এই সকল গঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত গঠনটি হল চলরেণু (Zoospore) যেগুলো সাধারণত আনুবীক্ষণিকসচল গঠন বিশিষ্ট হয়। অন্যান্য পরিচিত অযৌন জননে সহায়ক গঠনগুলো হল কনিডিয়া (পেনিসিলিয়াম), কোরক (হাইড্রা) এবং গেমিউলস (স্পঞ্জ)। একাদশ শ্রেণিতে তোমরা উদ্ভিদের অঙ্গজজনন সম্পর্কে জেনেছো। তোমরা কি মনে করো অঙ্গজজনন এক ধরনের অযৌজনন? তোমরা কেন এরকম মনে কর? অঙ্গজজননের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য জীবদের ক্ষেত্রে ক্লোন (Clone) পরিভাষাটি প্রযোজ্য হয় কি?

যদিও প্রাণীকূল এবং অন্যান্য সরল জীবদের ক্ষেত্রে অযৌনজনন পরিভাষাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয় তবে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অঙ্গজজনন পরিভাষাটি বারংবার ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের ধাবক (runner), গ্রন্থিকাণ্ড (Rhizome), ভূ-নিম্নস্থ ধাবক (sucker), স্ফীতকন্দ (tuber), হ্রস্বধাবক (offset), কন্দ (bulb) এর মতো অঙ্গজজননের এককগুলো সবই নতুন অপত্যজীব সৃষ্টিতে সক্ষম হয় (চিত্র 1.4)।

এইগুলোকে অঙ্গজজননে সহায়ককারী গঠন বলে। যেহেতু এই গঠনগুলো সৃষ্টির জন্য দুটি জনিতৃ জীবের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয় না তাই অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটি অযৌনজনন প্রক্রিয়া। কিছু জীবের ক্ষেত্রে যদি জীবদেহটি ভেঙে গিয়ে সুস্পষ্ট খণ্ডকে পরিণত হয় তবে প্রতিটি খন্ডক বৃদ্ধি পেয়ে অপত্যজীব সৃষ্টিতে সক্ষম পূর্ণাঙ্গজীবে পরিণত হবে (উদাহরণ হাইড্রা)। এই প্রক্রিয়াটিও অযৌনজননের একটি ধরন এবং একে খন্ডীভবন (fragmentation) বলে।

তোমরা অবশ্যই জলাশয়ের ক্ষতিসৃষ্টিকারী বস্তু বা বাংলার ত্রাস (Terror of Bengal) সম্পর্কে শুনেছো। এটি জলজ উদ্ভিদ কচুরিপানা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা স্থির জলে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় এমন একটি আগাছা, এটি জল থেকে অক্সিজেন অপসারণ করে, যার ফলে মাছের মৃত্যু ঘটে। তোমরা অধ্যায় 13 এবং 14-তে এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃভাবে জানবে। তোমরা এটা জেনে মজা পাবে যে, এই উদ্ভিদটিকে তার সুন্দর ফুল পাতার আকৃতির জন্য ভারতবর্ষে আনা হয়েছিল। যেহেতু এই উদ্ভিদটি অত্যন্ত দ্রুতহারে অঙ্গজজনন করতে পারে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তাই এদের থেকে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

তোমরা কি জানো আলু, আখ, কলা, আদা, ডালিয়ার মতো উদ্ভিদগুলো কীভাবে চাষ করা হয়? আলুর মুকুল (যাদের চোখ বলা হয়) থেকে উদ্‌গত, কলা এবং আদার গ্রন্থিকাণ্ড থেকে উদ্‌গত ক্ষুদ্র উদ্ভিদগুলোকে দেখেছো কি? যখন তোমরা যত্নসহকারে উপরে উল্লিখিত উদ্ভিদগুলোতে নতুন চারাগাছের উৎপত্তিস্থল চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, এই উদ্ভিদগুলো কেবলমাত্র পরিবর্তিত কাণ্ডে উপস্থিত পর্ব থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। যখন এই উদ্ভিদের দেহস্থিত পর্বগুলো (nodes) ভেজা মাটি অথবা জলের সংস্পর্শে আসে, তখন এই অংশগুলো থেকে মূল উৎপন্ন হয় এবং নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। একইভাবে পাথরকুচি (ব্রায়োফাইলাম) পাতার পত্র কিনারায় উপস্থিত খাঁজগুলো থেকে অস্থানিক মুকুল উৎপন্ন হয়। এই ধরনের উদ্ভিদগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বাগানের মালী এবং কৃষকরা উদ্ভিদের এই ক্ষমতাটিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে।

উল্লেখ করার মতো বিষয়টি হল এই যে, অপেক্ষাকৃতভাবে সরল দেহ সংগঠন বিশিষ্ট সজীব বস্তুতে অযৌনজনন হল জননকার্য সম্পাদন করার একটি সাধারণ পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিকূল পরিবেশ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে শৈবাল ও ছত্রাকের মতো জীব যৌনজনন পদ্ধতিতে জননকার্য সম্পন্ন করে। প্রতিকূল পরিবেশ চলাকালীন সময়ে যৌন জনন কীভবে এ সমস্ত জীবদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তা খুঁজে বের করো? এইরূপ পরিস্থিতিতে যৌনজনন বিশেষ সুবিধাজনক কেন? উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদেরা অযৌন (অঙ্গজ) এবং যৌন জনন এই দুটি পদ্ধতিতেই জননকার্য সম্পন্ন করে। অপরদিকে, বেশিরভাগ প্রাণীরাই কেবলমাত্র যৌনজনন পদ্ধতিতে জননকার্য সম্পন্ন করে।

1.2 যৌন জনন (SEXUAL REPRODUCTION)

যৌনজননে বিপরীত লিঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জীবসমূহ বা একই জীব থেকে সৃষ্ট পুং ও স্ত্রী জনন কোশ (গ্যামেট) অংশগ্রহণ করে। এই জনন কোশগুলো মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে যা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন জীব সৃষ্টি করে। অযৌন জননের তুলনায় যৌন জনন দীর্ঘ, জটিল এবং ধীর প্রক্রিয়া। যৌন জনন প্রক্রিয়ায় পুং এবং স্ত্রী জননকোশের (গ্যামেট) মিলনের কারণে অপত্য জীব সৃষ্টি

হওয়ায় এই অপত্য জীবগুলো জনিতৃ জীবের অনুরূপ হয় না এবং এদের নিজেদের মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বৈচিত্র্যময় জীবকুলের (উদ্ভিদ, প্রাণী বা ছত্রাক) অধ্যয়নের ফলে এটা দেখা যায় যে, যদিও বাহ্যিক অঙ্গাসংস্থান, অভ্যন্তরীণ গঠন এবং শরীরবৃত্তীয় দিক থেকে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবুও যৌন জননকালে আশ্চর্যজনকভাবে এদের মধ্যে একই ধরন দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবদের মধ্যে কী কী সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে চলো তা নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করি।

যৌন জননে সক্ষম হওয়ার পূর্বে সব সজীববস্তু কেই তাদের জীবনকালের বৃদ্ধি এবং পরিণমনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছাতে হয়। এই সময়কালকে জুভেনাইল ফেজ (Juvenile Phase) বলে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটি অঙ্গাজ দশা বা ভেজিটেটিভ ফেজ নামে পরিচিত। বিভিন্ন জীবে এই দশার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

জুভেনাইল ফেজ বা দশা অঙ্গাজ দশার সমাপ্তি জননদশার সূচনাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত উদ্ভিদে যখন ফুল ফোটে তখন তা সহজে পরিলক্ষিত হতে পারে। গাঁদা, ধান, গম, নারকেল, আম ইত্যাদি গাছে ফুল আসতে কত সময় লাগে ? কিছু কিছু উদ্ভিদ যেখানে একাধিকবার ফুল ফোটে তাদের ফুল ফোটার অর্ন্তবর্তী সময়কালকে তুমি কী বলবে — জুভেনাইল দশা অথবা পরিণতির দশা।

তোমার এলাকার কিছু বৃক্ষ পর্যবেক্ষণ করো, এইসব বৃক্ষে কি বছরের পর বছর একই মাসে ফুল ফোটে ? তুমি কেন মনে করো যে, আম, আপেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল একটি ঋতুতেই সহজলভ্য হয় ? কিছু কিছু উদ্ভিদে কি সারা বছর ধরেই ফুল ফোটে আবার কিছু উদ্ভিদে কি একটি ঋতুতেই ফুল ফোটে ? একবর্ষজীবি এবং দ্বিবর্ষজীবি উদ্ভিদে সুস্পস্টভাবে অঙ্গাজ দশা, জনন দশা এবং বার্ধক্য দশা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ প্রজাতিতে সুস্পষ্টভাবে এই দশাগুলোর সীমা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। কিছু কিছু উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্পোদ্গমের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। এদের মধ্যে কিছু প্রজাতি যেমন বাঁশ গাছের প্রজাতিতে এদের জীবনকালে সাধারণত 50-100 বছর পর একবার ফুল ফোটে, গাছগুলোতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয় এবং এরপর গাছগুলো মারা যায়। স্ট্রোবিল্যানথাস কোনথিয়ানা (Strobilanthous Kunthiana (neelakuranji) নামক অপর একটি উদ্ভিদে 12 বছরে একবার ফুল ফোটে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই জানো, 2006 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই গাছে প্রচুর ফুল ফুটেছিল। সেই সময় এত বেশি ফুল ফোটায় কেরালা, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর বিশাল পার্বত্য অঞ্চল নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছিল এবং এর আকর্ষণে বহু পর্যটকের সমাগম ঘটেছিল। কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে জুভেনাইল ফেজের পর সক্রিয় প্রজননগত বৈশিষ্ট্য লাভ করার জন্য অঙ্গা সংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন জীবে জনন দশার সময় সীমাও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো মানুষের জনন ক্ষমতার সম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে কী তুমি লিপিবন্ধ করতে পারবে ?

প্রাণীদের মধ্যে যেমন পাখিরা কি সারা বছর ধরেই ডিম পাড়ে ? নাকি এটি নির্দিষ্ট ঋতুতে ঘটে এমন একটি ঘটনা ? ব্যাঙ এবং টিকটিকির মতো অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে কী ঘটে ? তোমরা লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী পাখিরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ঋতুতেই ডিম পাড়ে। তবে যেসব পাখিদের আবন্ধ স্থানে রেখে পালন করা হয় (যেমন পোলট্রি ফার্ম বা মুরগী খামার), এদের সারা বছর ধরেই ডিম পাড়ার উপযোগী করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ডিম পাড়া জনন ক্রিয়ার সঙ্গো সম্পর্কিত নয়। কিন্তু এটি মানব কল্যাণের জন্য বাণিজ্যিক শোষণ। অমরাযুক্ত স্ত্রী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে জনন দশা চলাকালে ডিম্বাশয় ও আনুষঙ্গিকনালী সমূহ এবং এর পাশাপাশি হরমোন সমূহের কার্যকারিতায় চক্রাকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গরু, ভেড়া, ইঁদুর, হরিণ, কুকুর, বাঘ ইত্যাদির মতো নন প্রাইমেট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জননকালে সংঘটিত এই চক্রাকার পরিবর্তন সমূহকে ইস্ট্রাস চক্র (Oestrus cycle) বলে যেখানে প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে (বানর, গরিলা এবং মানুষ) একে রজঃচক্র (Menstrual cycle) বলে। বহু স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা সাধারণত প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের চক্রাকার পরিবর্তনগুলো তাদের প্রজনন দশায় কেবলমাত্র অনুকূল ঋতুতে ঘটতে দেখা যায়। তাই এদের সিজন্যাল ব্রিডার (Seasonal breeder) বলে। অন্যান্য

আরো স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের সমগ্র প্রজনন দশা জুড়ে সক্রিয়ভাবে প্রজনন করে, তাই এদের কন্টিনিওয়াস ব্রিডার (Continuous breeder) বলে।

আমাদের সবার বয়স বৃদ্ধি (যদি আমরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি) হল এমন একটি ঘটনা যা আমরা সনাক্ত করতে পারি। কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ কী? জননদশার সমাপ্তিকে বার্ধক্য প্রাপ্তি বা বৃদ্ধ বয়সের একটি নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। জীবনকালের এই শেষ দশায় দেহে কিছু পরিবর্তন (যেমন বিপাক ক্রিয়ার হার হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি) একসাথে ঘটে। বার্ধক্যের শেষ পরিণতি হল মৃত্যু।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে এই তিন দশার মধ্যে হরমোনের রূপান্তরণ ঘটে। হরমোন এবং নির্দিষ্ট পরিবেশীয় প্রভাবকগুলোর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া জনন প্রক্রিয়াগুলোকে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণগত অভিব্যক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যৌন জননের ঘটনাবলি (Events in sexual reproduction) ঃ পূর্ণতা প্রাপ্তির পর সব যৌনজননকারী জীবে সংঘটিত ঘটনাবলি এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষণীয় মৌলিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে যৌনজননের সঙ্গে সম্পর্কিত গঠনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যৌন জননের ঘটনাবলী বিশদ এবং জটিল হলেও এগুলো একটি নিয়মিত ক্রমে ঘটে। যৌনজনন প্রক্রিয়াটি পুং এবং স্ত্রী জনন কোশের (গ্যামেট) মিলন (অথবা নিষেক), জাইগোটের গঠন এবং ভ্রূণের সৃষ্টির (embryogenesis) মাধ্যমে ঘটে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ঘটনার ক্রমগুলো তিনটি সুস্পষ্ট দশায় ভাগ করা যায়। এগুলো হল প্রাক্ নিষেক, নিষেক এবং নিষেক পরবর্তী ঘটনাবলি।

1.2.1 নিষেক পূর্ব ঘটনাবলি (Pre-fertilisation events) ঃ জনন কোশের মিলনের পূর্বে যৌন জননের সঙ্গে যুক্ত সব ঘটনাবলি নিষেক পূর্ব ঘটনাবলির অন্তর্ভুক্ত। দুটি মুখ্য নিষেক পূর্ব ঘটনাবলী হল গ্যামেট উৎপাদন (গ্যামেটোজেনেসিস) এবং গ্যামেটের স্থানান্তরণ (গ্যামেট ট্রান্সফার)।

1.2.1.1 গ্যামেটোজেনেসিস বা গ্যামেট উৎপাদন (Gametogenesis)

তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছো যে, পুংজনন কোশ এবং স্ত্রী জননকোশ এই দুই ধরনের জননকোশ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। জননকোশগুলো হ্যাপ্লয়েড হয়।

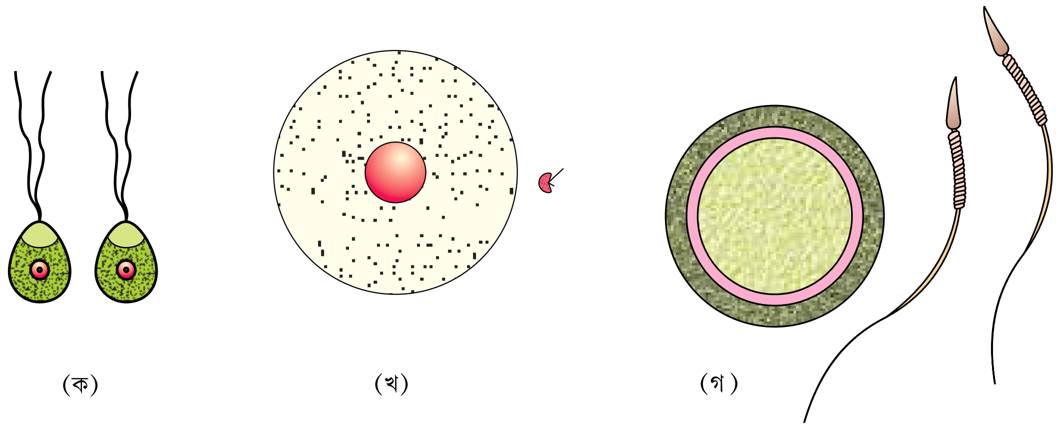

চিত্র 1.5 জননকোশের প্রকারভেদ ক) ক্লেডোফোরা এর আইসোগ্যামেট (একটি শৈবাল) খ) ফিউকাস এর হেটারোগ্যামেট (একটি শৈবাল) গ) হোমো সেপিয়েন্স এর হেটারোগ্যামেট (মানুষ)।

কিছু শৈবালের ক্ষেত্রে দুটি জননকোশ দেখতে এতটাই একরকম যে, তাদের পুংজনন কোশ এবং স্ত্রী জননকোশ হিসাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। এজন্য এদের **হোমোগ্যামেটস (আইসোগ্যামেট)** বলে (চিত্র 1.5 ক)। তবে বেশিরভাগ যৌনজননকারী জীবে উৎপন্ন জননকোশগুলো অঙ্গাসংস্থানিকভাবে স্বতন্ত্র ধরনের হয় **(হেটারোগ্যামেটস)**। এই ধরনের জীবসমূহে পুংজনন কোশকে **অ্যানথেরোজয়েড** বা **শুক্রাণু** বলে এবং স্ত্রী জননকোশকে **ডিম্বানু** বা **ওভাম** বলে (চিত্র 1.5 খ, গ)।

সজীব বস্তুর যৌন বৈশিষ্ট্য (Sexuality in Organisms) ঃ সজীব বস্তুতে যৌন জনন সাধারণত দুটি ভিন্ন একক জীব থেকে প্রাপ্ত গ্যামেটেরে মিলনের ফলে ঘটে। কিন্তু এটি সর্বদা সত্য নয়। একাদশ শ্রেণিতে তোমাদের অধীত উদাহরণগুলোর কথা মাথায় রেখে তোমরা কি কোথায় স্ব-নিষেক পরিলক্ষিত হয় তা সনাক্ত করতে পারবে? উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের উদাহরণের উল্লেখ করা সহজ।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুং এবং স্ত্রী উভয় জনন অঙ্গাগুলো একই উদ্ভিদে (উভলিঙ্গা) (চিত্র 1.6 গ,ঙ) অথবা ভিন্ন উদ্ভিদে (একলিঙ্গা) (চিত্র 1.6 ঘ) থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে **হোমোথেলিক (homothallic)** এবং **সহবাসী বা মনোসিয়াস (Monoecious)** পরিভাষাগুলো উভলিঙ্গা অবস্থাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং **হেটারোথেলিক (Heterothallic)** ও **ডায়োসিয়াস (dioecious)** এই পরিভাষাগুলো একলিঙ্গা অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদে পুংকেশরবিশিষ্ট অর্থাৎ একলিঙ্গা পুরুষ ফুলকে **স্ট্যামিনেট (Staminate)** এবং গর্ভকেশর বিশিষ্ট একলিঙ্গা স্ত্রীফুলকে **পিস্টিলেট (Pistillate)** বলে। কিছু কিছু সপুষ্পক উদ্ভিদে পুং এবং স্ত্রী ফুলগুলো একই উদ্ভিদে **সহবাসী (Monoecious)** অথবা ভিন্ন উদ্ভিদে **ভিন্নবাসী (dioecious)** থাকতে পারে। সহবাসী উদ্ভিদের কিছু উদাহরণ হল - কিউকারবিটা **গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ (cucurbits)** ও **নারকেল (coconuts)** এবং ভিন্নবাসী উদ্ভিদের উদাহরণ হল পেঁপে এবং খেঁজুর গাছ। স্ট্যামিনেট এবং পিস্টিলেট ফুলে সৃষ্ট জননকোশের প্রকৃতি উল্লেখ করো।

কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে কী ঘটে? সব প্রজাতির জীবেই পুরুষ বা স্ত্রী (একলিঙ্গা) প্রাণী কি আলাদা হয়? অথবা এমন কোনো প্রজাতি রয়েছে কি যে প্রজাতির একই জীবে দুটি জনন অঙ্গাই (উভলিঙ্গা) বর্তমান? তোমরা সম্ভবত বিভিন্ন একলিঙ্গা প্রাণী প্রজাতির একটি তালিকা তৈরি করতে পারো। উভলিঙ্গা প্রাণীর কিছু আদর্শ উদাহরণ হল কেঁচো (চিত্র 1.6 ক), স্পঞ্জ, ফিতাকৃমি এবং জোঁক যাদের দেহে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জনন অঙ্গাই রয়েছে। এদের উভলিঙ্গা (hermaphrodites) প্রাণী বলে। একলিঙ্গা প্রাণী প্রজাতির একটি উদাহরণ হল - আরশোলা (চিত্র 1.6 খ)।

জননকোশ গঠনকালে কোশ বিভাজন (Cell division during gamete formation) ঃ সমস্ত হেটারোগেমেটিক প্রজাতির জননকোশ দুই ধরনের হয়, যথা - পুংজননকোশ এবং স্ত্রী জননকোশ। হ্যাপ্লয়েড অথবা ডিপ্লয়েড জনিতৃ উদ্ভিদদেহ থেকে সৃষ্ট জনন কোশগুলো হ্যাপ্লয়েড হবে। একটি হেপ্লয়েড জনিতৃ জীব মাইটোটিক বিভাজনের দ্বারা জননকোশ উৎপন্ন করে। এর অর্থ কী এই যে, হ্যাপ্লয়েড জীবে কখনই মিয়োসিস ঘটে না? এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর পাওয়ার জন্য একাদশ শ্রেণিতে অধীত (অধ্যায় 3) শৈবালের জীবনচক্রের রেখচিত্রটি (flow chart) যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করো।

মোনেরা, ছত্রাক, শৈবাল এবং ব্রায়োফাইট গোষ্ঠীর অন্তর্গত বহুজীবের দেহ হ্যাপ্লয়েড হয়। কিন্তু টেরিডোফাইটা, জিমনোস্পার্ম বা ব্যক্তবীজী, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম বা গুপ্তবীজীর অন্তর্গত জীবেরা এবং মানুষ সহ বেশিরভাগ প্রাণীদের জনিতৃদেহটি ডিপ্লয়েড হয়। এটি সুস্পষ্ট যে, যদি ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট জীব থেকে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জননকোশ উৎপন্ন হতে হয় তবে মিয়োসিস বা হ্রাস বিভাজন ঘটে।

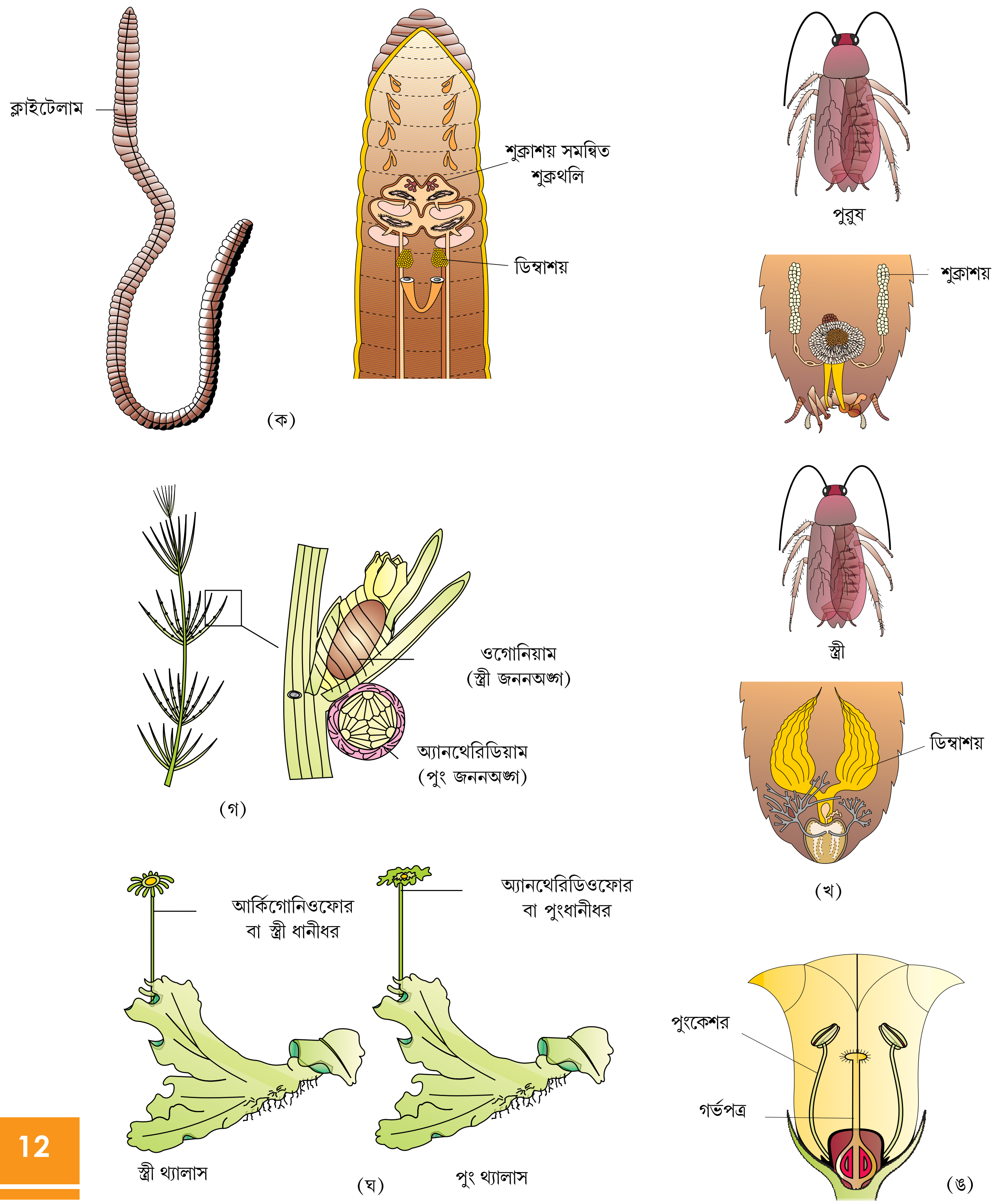

চিত্র 1.6 সজীববস্তুতে জননগত বৈচিত্র্য ক) উভলিঙ্গ প্রাণী (কেঁচো) খ) একলিঙ্গ প্রাণী (আরশোলা) গ) সহবাসী উদ্ভিদ (কারা) ঘ) ভিন্নবাসী উদ্ভিদ (মার্কেনসিয়া); ঙ) উভলিঙ্গ ফুল (মিষ্টি আলু)।

টেবিল 1.1 কিছু সজীব বস্তুর মিয়োসাইট (ডিপ্লয়েড, 2n) এবং গ্যামেটসমূহের (হ্যাপ্লয়েড, n) এর ক্রামোজোম সংখ্যা। শূন্যস্থান পূরণ করো।

সজীববস্তুর নাম	মিয়োসাইট এর ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n)	জননকোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা (n)
মানুষ	*46*	*23*
মাছি	*12*	-
ইঁদুর	-	*21*
কুকুর	*78*	-
বিড়াল	-	*19*
ফ্রুট ফ্লাই	*8*	-
ওফিওগ্লোসা (একটি ফার্ণ)	-	*630*
আপেল	*34*	-
ধান	-	*12*
ভুট্টা	*20*	-
আলু	-	*24*
প্রজাপতি	*380*	-
পেঁয়াজ	-	*8*

ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট জীবে, যে বিশেষিত কোশসমূহে মিয়োসিস ঘটে, এদের **মিয়োসাইট** (জনন মাতৃকোশ) বলে। মিয়োসিস বিভাজনের শেষে জনিতৃকোশের কেবলমাত্র একটি ক্রোমোজোম সেট প্রতিটি **অপত্য** জননকোশের অন্তর্ভুক্ত হয়। টেবিল 1.1 সযত্নে অধ্যয়ন করো এবং প্রদত্ত স্থানে জীবের ডিপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা লিখো। মিয়োসাইট এবং জননকোশের (গ্যামেটের) ক্রোমোজোম সংখ্যার মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে?

1.2.1.2 জননকোশের স্থানান্তরণ (Gamete Transfer) ঃ পুংজননকোশ এবং স্ত্রীজননকোশ গঠিত হওয়ার পর নিষেক ক্রিয়ার জন্য এগুলো অবশ্যই শারীরিকভাবে কাছাকাছি আসে। তুমি কি কখনও এটা ভেবে অবাক হয়েছো যে কীভাবে জননকোশগুলো মিলিত হয়? বেশিরভাগ জীবেই পুং জননকোশটি সচল হয় এবং স্ত্রী জননকোশটি নিশ্চল হয়। কিছু ছত্রাক এবং শৈবাল হলো এর ব্যতিক্রম এবং এদের মধ্যে উভয় প্রকার জনন কোশই সচল (চিত্র 1.7 ক) হয়। পুংজনন কোশগুলো চলাচলের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। শৈবাল, ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটার মতো কিছু সরলদেহী উদ্ভিদে জননকোশগুলো জলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। তবে একটা বিশাল সংখ্যক পুংজননকোশ স্ত্রী জননকোশের সংস্পর্শে যেতে সক্ষম হয় না। স্থানান্তরণকালে পুংজননকোশের এই ঘাটতি পূরণ করতে স্ত্রী জননকোশের সংখ্যার তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি সংখ্যক পুং জননকোশ উৎপন্ন হয়।

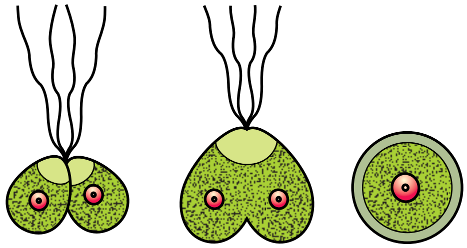

(ক)

(খ)

চিত্র 1.7 (ক) শৈবালে সমরূপ গ্যামেটের মিলন
(খ) একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত পরাগরেণু

বীজগঠিত হয় এমন উদ্ভিদে পরাগরেণুগুলো পংগ্যামেট বহন করে এবং ডিম্বাণুটি ডিম্বকে থাকে। পরাগরেণুগুলো পরাগধানীতে উৎপন্ন হয় বলে নিষেকের পূর্বে এদের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন (চিত্র1.7 খ)। স্বনিষেক ঘটে এমন উভলিঙ্গ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে (যেমন মটর গাছ) পরাগধানী এবং গর্ভমুণ্ড পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করায় পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরণ তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। পরাগধানী থেকে পরাগরেণুগুলো নির্গমনের ঠিক পরেই এই রেণুগুলো গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে। অপরদিকে ইতর পরাগী উদ্ভিদগুলোতে (ভিন্নবাসী উদ্ভিদসমূহ সহ) একটি বিশেষিত পদ্ধতি গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুগুলোর স্থানান্তরণে সাহায্য করে, একে পরাগযোগ বলে। গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর সেখানে পরাগরেণুগুলো অঙ্কুরিত হয় ও পুংজননকোশ বহনকারী পরাগনালীটি ডিম্বকে পৌঁছায় এবং পুংজনন কোশগুলোকে ডিম্বাণুর কাছাকাছি স্থানে মুক্ত করে। একলিঙ্গ প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেহেতু পুংজননকোশ এবং স্ত্রী জনন কোশ ভিন্ন একক জীবে উৎপন্ন হয় তাই গ্যামেট স্থানান্তরণের জন্য এই জীবগুলোতে একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। যৌনজননের সবচেয়ে জটিল ঘটনাটি অর্থাৎ নিষেকের জন্য জননকোশগুলোর সফলভাবে স্থানান্তরণ এবং পরস্পরের কাছাকাছি আসা আবশ্যক।

1.2.2 নিষেক (Fertilisation)

দুটি জননকোশের মিলন সম্ভবত যৌনজননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পদ্ধতিকে সিনগ্যামি বলে, যার ফলস্বরূপ ডিপ্লয়েড জাইগোটের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াটি বোঝাতে প্রায়শই নিষেক শব্দটি ব্যবহত হয়। সিনগ্যামি এবং নিষেক এই পরিভাষা দুটো প্রায়শই ব্যবহৃত হয় তবে একটি পরিভাষা অপরটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

সিনগ্যামি না ঘটলে কী হবে?

তবে এখানে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে রটিফার, মৌমাছির মতো কিছু জীবে এবং এমনকি কিছু টিকটিকি ও কিছু পাখিতে (টার্কি) জনন কোশটি নিষেক ছাড়াই বিকশিত হয়ে নতুন জীবের সৃষ্টি করে। এই ঘটনাটিকে পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) বলে।

সিনগ্যামী কোথায় ঘটে? অধিকাংশ জলজ জীবে, যেমন বেশির ভাগ শৈবাল এবং মাছ সেই সাথে উভচর জীবে সিনগ্যামী বাহ্যিক পরিবেশে (জল) ঘটে অর্থাৎ জীবের দেহের বাইরে ঘটে। জননকোশীয় মিলনের এই ধরনটিকে বহিঃনিষেক বলে। সিনগ্যামির সম্ভানা বৃদ্ধির জন্য বহিঃনিষেক ঘটে এমন দুটি লিঙ্গের জীব এবং চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে (জল) এদের দেহ থেকে প্রচুর সংখ্যক গ্যামেট নির্গমনের মধ্যে ব্যাপক সমলয়তা পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটনাটি অস্থিযুক্ত মাছ এবং ব্যাঙের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যেখানে প্রচুর অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তবে এর একটি প্রধান অসুবিধা হল এই যে, অপত্য প্রাণীগুলো শিকারি প্রাণীগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাই পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এদের টিকে থাকার বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে।

বহু স্থলজজীব যেমন ছত্রাক গোষ্ঠীভুক্ত জীব, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ীর মতো উন্নত প্রাণী এবং বেশিরভাগ উদ্ভিদে (ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী) সিনগ্যামী জীবদেহের অভ্যন্তরে ঘটে তাই এই প্রক্রিয়াটিকে অন্তঃনিষেক বলে। এইসব জীবে স্ত্রীদেহের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই এরা পুংজনন কোশের সঙ্গো মিলিত হয়। অন্তঃনিষেক ঘটে এমন জীবে পুংজনন কোশটি সচল হয় এবং ডিম্বাণুটির সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্য পুংজনন কোশটিকে ডিম্বানুর কাছে পৌঁছাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক শুক্রাণু উৎপন্ন হলেও ডিম্বাণুর সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। বীজগঠিত হয় এমন উদ্ভিদে নিশ্চল পুংজননকোশগুলো পরাগনালীর মাধ্যমে বাহিত হয়ে স্ত্রী জননকোশের কাছাকাছি আসে।

1.2.3 নিষেক পরবর্তী ঘটনা (Post-fertilisation events)

যৌন জননে জাইগোট সৃষ্টির পরবর্তী ঘটনাগুলোকে নিষেক পরবর্তী ঘটনা বলে।

1.2.3.1 জাইগোট (The Zygote)

সব যৌনজননকারী জীবে ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি একটি সার্বজনীন ঘটনা। বহিঃনিষেক ঘটে এমন জীবসমূহে জাইগোট দেহের বহিঃপরিবেশে (সাধারণত জল) গঠিত হয়, অপরদিকে, অন্তঃনিষেক ঘটে এমন জীবসমূহে জাইগোট জীবদেহের দেহের অভ্যন্তরে গঠিত হয়।

জাইগোটের পরবর্তী বৃদ্ধি, জীবের জীবনচক্রের প্রকৃতি এবং যে পরিবেশে জীবটি অবস্থান করে এর উপর নির্ভর করে। ছত্রাক এবং শৈবালের অন্তর্গত জীবসমূহে জাইগোটকে ঘিরে একটি পুরু প্রাচীর গঠিত হয় যা জাইগোটটিকে শুষ্ক হয়ে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে জাইগোটটি কিছু সময় পর্যন্ত বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে। যে সমস্ত জীবে হ্যাপ্লন্টিক জীবনচক্র দেখা যায় (যা তোমরা একাদশ শ্রেণিতে পড়েছো) তাদের জাইগোট মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপাদন করে যা বৃদ্ধি পেয়ে হ্যাপ্লয়েড জীবে পরিণত হয়। *যেসব জীবে ডিপ্লন্টিক এবং হ্যাপ্লো-ডিপ্লোন্টিক জীবনচক্র দেখা যায় তাদের জাইগোটে কী ধরনের বিকাশ ঘটে তা একাদশ শ্রেণির বইয়ের সাহায্য নিয়ে খুঁজে বের করো।*

জাইগোট হল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র যা জীবের একটি জনুর জীবসমূহ এবং পরবর্তী জনুর জীবসমূহের মধ্যে প্রজাতির ধারাবাহিকতাকে সুনিশ্চিত করে। মানুষ সহ প্রতিটি যৌন জননকারী জীবে জীবন শুরু একটি একক কোশ রূপে এবং এই একক কোশটি হল জাইগোট।

1.2.3.2 ভ্রূণ গঠন বা এম্ব্রায়োজেনেসিস (Embryogenesis)

জাইগোট থেকে ভ্রূণের বিকাশের প্রক্রিয়াকে বলে **এম্ব্রায়োজেনেসিস**। ভ্রূণগঠন কালে জাইগোটের বিভাজন (মাইটোসিস) এবং কোশের বিভেদীকরণ ঘটে, যখন কোশ বিভাজনের ফলে বর্ধনশীল ভ্রূণে কোশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন কোশ বিভেদীকরণ, বিশেষিত কলা এবং অঙ্গা গঠনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠনের জন্য কোশগুচ্ছে নির্দিষ্ট পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে কোশ বিভাজন এবং বিভেদীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছো।

জাইগোটের বিকাশ স্ত্রী জনিতৃজীবদেহের বাইরে না কি ভেতরে ঘটে অর্থাৎ এরা নিষিক্ত/অনিষিক্ত ডিম পাড়ে অথবা অপত্য জীবের জন্ম দেয়, এর উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের অন্ডজ (ওভিপেরাস) এবং জরায়ুজ (ভিভি পেরাস) এই দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। সরিসৃপ এবং পক্ষীর মতো অন্ডজ প্রাণীরা পরিবেশের একটি সুরক্ষিত স্থানে শক্ত চুন নির্মিত খোলকে আবৃত নিষিক্ত ডিম পাড়ে; এই ডিমে তা দেওয়ার কিছুটা সময় পর নতুন অপত্য জীব ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে জরায়ুজ প্রাণীদের মধ্যে (মানুষ সহ অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা) স্ত্রী জীবদেহের অভ্যন্তরে জাইগোটের বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে অপত্য জীব সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট দশা অতিক্রম করার পর স্ত্রী জীবদেহ হতে বাচ্চা প্রসব হয়। জরায়ুজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে জীবটি ভ্রূণাবস্থায় যথাযথ যত্ন এবং সুরক্ষা পাওয়ায় অপত্য জীবগুলোর টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি হয়।

সপুষ্পক উদ্ভিদে ডিম্বকের অভ্যন্তরে জাইগোট গঠিত হয়। নিষেকের পর ফুলের বৃত্যংশ, পাপড়ি ও পুংকেশর শুকিয়ে যায় এবং ঝড়ে পড়ে। তুমি কি এমন একটি উদ্ভিদের নাম বলতে পারো যার মধ্যে বৃত্যাংশ যুক্ত থেকে যায়? যদিও গর্ভকেশরটি উদ্ভিদের সাথেই যুক্ত থেকে যায়। জাইগোট বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণে এবং ডিম্বক বৃদ্ধি পেয়ে বীজে পরিণত হয়। গর্ভাশয় বৃদ্ধি পেয়ে ফলে পরিণত হয় এবং ফল পেরিকার্প নামক একটি পুরু প্রাচীর তৈরি করে যার কাজ হলো ফলকে সুরক্ষা প্রদান করা (চিত্র 1.8)। ফল থেকে ছড়িয়ে পড়ার পর বীজগুলো অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয় এবং নতুন উদ্ভিদসমূহের জন্ম হয়।

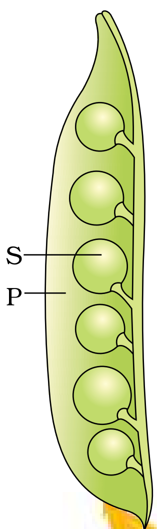

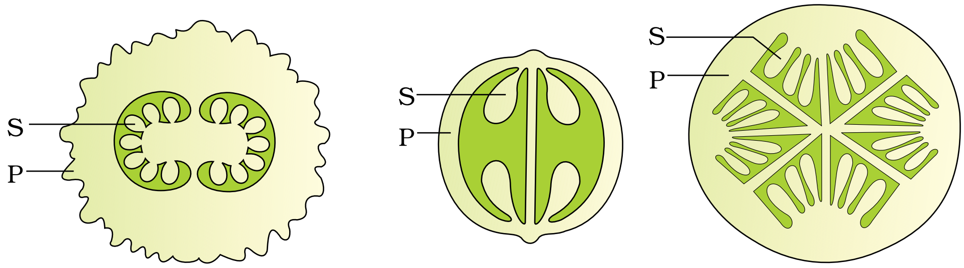

চিত্র 1.8 কিছু প্রকারের ফল যেগুলোতে বীজ (S) এবং সুরক্ষা প্রধানকারী পেরিকার্প (P) দেখা যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

প্রজননের জন্য একটি প্রজাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। সজীব বস্তুতে জননকে ব্যাপক অর্থে অযৌন জনন এবং যৌন জনন এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। অযৌনজননে জননকোশের মিলন ঘটে না। ছত্রাক, শৈবাল এবং কিছু অমেরুদন্ডী প্রাণীর মতো তুলনামূলকভাবে সরল সংগঠন বিশিষ্ট জীবে সচরাচর অযৌন জনন ঘটে। অযৌন জননের ফলে সৃষ্ট অপত্য জীবরা সমরূপ হয় এবং তাদেরকে ক্লোন বলা যেতে পারে। বহু শৈবাল এবং ছত্রাকের দেহের সচরাচর সবচেয়ে বেশি গঠিত অযৌন জননে সহায়ক অঙ্গাগুলো হল — জুস্পোর বা চলরেণু, কনিডিয়া ইত্যাদি। অনুন্নত শ্রেণির প্রাণীতে সচরাচর কোরকোদ্গাম এবং গেমিউল গঠনের মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটতে দেখা যায়।

প্রোক্যারিওট এবং এককোশী জীবরা জনিতৃ কোশের বিভাজন বা দ্বিবিভাজন পদ্ধতির দ্বারা অযৌন জনন সম্পন্ন করে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদ গোষ্ঠীর বিভিন্ন জলজ এবং স্থলজ প্রজাতিতে ধাবক (Runners),

গ্রন্থিকন্দ (Rhizomes), ভূনিম্নস্থ ধাবক (Suckers), স্ফীতকন্দ (Tubers), খর্বধাবক (Offsets) ইত্যাদির মতো গঠন সমূহ নতুন অপত্য জীব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। অযৌন জননের এই পদ্ধতিটিকে সাধারণত অঙ্গজজনন বলে।

গ্যামেটের সৃষ্টি এবং গ্যামেটের মিলন যৌন জনন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এটি অযৌন জননের তুলনায় একটি জটিল এবং ধীর প্রক্রিয়া। বেশির ভাগ প্রাণীরা বংশবিস্তারের জন্য প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই যৌনজনন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। যৌনজননের ঘটনাগুলোকে প্রাক্ নিষেক, নিষেক এবং নিষেক পরবর্তী ঘটনা হিসেবে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রাক্ নিষেকের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলো হল জননকোশ বা গ্যামেট উৎপাদন (গ্যামেটোজেনেসিস) এবং জনন কোশের স্থানান্তরণ (গ্যামেট ট্রান্সফার), যেখানে জাইগোট সৃষ্টি এবং ভ্রূণ গঠন হল নিষেক পরবর্তী ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

জীবসমূহ উভলিঙ্গ বা একলিঙ্গ হতে পারে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়, বিশেষত গুপ্তবীজী উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের ফুল উৎপন্ন হওয়ার কারণে এরূপ ভিন্নতা দেখা যায়। উদ্ভিদগুলোকে সহবাসী এবং ভিন্নবাসী রূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ফুলগুলো উভলিঙ্গ বা একলিঙ্গ হতে পারে।

গ্যামেটগুলো হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির হয় এবং সাধারণত এগুলো মিয়োসিস বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয় তবে এর ব্যতিক্রম হল — এই যে, হ্যাপ্লয়েড জীবে জনন কোশগুলো মাইটোসিসের ফলে উৎপন্ন হয়।

যৌন জননের একটি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা হল— পুং গ্যামেটের স্থানান্তরণ। এই স্থানান্তরণ প্রক্রিয়াটি উভলিঙ্গ জীবে তুলনামূলকভাবে সহজে ঘটে। একলিঙ্গ প্রাণীদের দেহে এটি যৌন মিলনের মাধ্যমে বা একই সাথে জননকোশ নির্গমনের মাধ্যমে ঘটে। একটি বিশেষ প্রক্রিয়া গুপ্তবীজী উদ্ভিদে পরাগরেণুর স্থানান্তরণকে সুনিশ্চিত করে, একে পরাগযোগ বলে। এই প্রক্রিয়ায় পরাগরেণুগুলো পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে বাহিত হয়।

স্ত্রী জনন কোশ এবং পুং জননকোশের মধ্যে সিনগ্যামী (নিষেক) ঘটে। সিনগ্যামী বাহ্যিকভাবে অর্থাৎ জীবদেহের বাইরে অথবা অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ জীবদেহের অভ্যন্তরে ঘটতে পারে। সিনগ্যামীর ফলে একটি বিশেষিত কোশ সৃষ্টি হয়, একে জাইগোট বলে।

জাইগোট থেকে ভ্রূণের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ভ্রূণগঠন বা এম্ব্রায়োজেনেসিস বলে। প্রাণীদেহে জাইগোট সৃষ্টির পর পরই এর বিকাশ শুরু হয়। প্রাণীরা অন্ডজ বা জরায়ুজ হতে পারে। জরায়ুজ প্রাণীতে ভ্রূণটি উন্নততর সুরক্ষা এবং যত্ন পায়।

সপুষ্পক উদ্ভিদে নিষেকের পর ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। পরিণত বীজের ভেতরে পরবর্তী জুনর আদি গঠনটি (Progenitor) অর্থাৎ, ভ্রূণ অবস্থান করে।

অনুশীলনী

1. সজীব বস্তুর জন্য জনন অত্যাবশ্যক কেন?
2. জননের উন্নত ধরন কোনটি ঃ যৌনজনন না কি অযৌনজনন? কেন?
3. অযৌন জননে সৃষ্ট অপত্যদের কেন ক্লোন বলা হয়?
4. যৌনজননের ফলে সৃষ্ট অপত্যদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন? এই উক্তিটি সর্বদা সত্য হয় কি?
5. অযৌন জননের ফলে সৃষ্ট অপত্যরা যৌন জননের ফলে সৃষ্ট অপত্যদের থেকে কীভাবে আলাদা হয়?

6. অযৌন এবং যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। অঙ্গাজ জননকে আবার অযৌন জনন রূপে গণ্য করা হয় কেন?

7. অঙ্গাজজনন কী? দুটি উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

8. সংজ্ঞা লিখ

(a) জুভেনাইল দশা

(b) জনন দশা

(c) বার্ধক্য দশা

9. যৌনজননের জটিলতা সত্ত্বেও উন্নত জীবরা যৌনজনন করে কেন?

10. মিয়োসিস এবং গ্যামেটোজেনেসিস সবসময় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কেন তা ব্যাখ্যা কর।

11. একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করো এবং তা হ্যাপ্লয়েড (n) অথবা ডিপ্লয়েড (2n) কিনা লিখ।

(a) গর্ভাশয় ______________________

(b) পরাগধানী ______________________

(c) ডিম্বাণু ______________________

(d) পরাগরেণু ______________________

(e) পুংগ্যামেট ______________________

(f) জাইগোট ______________________

12. বহিঃনিষেকের সংজ্ঞা দাও। এর অসুবিধাগুলো লেখ।

13. একটি চলরেণু বা জুস্পোর এবং একটি জাইগোটের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

14. এম্ব্রায়োজেনেসিস এবং গ্যামেটোজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

15. একটি ফুলের মধ্যে নিষেক পরবর্তী কী কী ঘটনা ঘটে তা বর্ণনা করো।

16. উভলিঙ্গ ফুল কাকে বলে? তোমার আশেপাশের এলাকা থেকে পাঁচটি উভলিঙ্গ ফুল সংগ্রহ করো এবং শিক্ষকের সাহায্যে এদের প্রচলিত নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম খুঁজে বের করো।

17. কিউকারবিটা গোত্রের অন্তর্গত যে কোনো একটি উদ্ভিদের কিছু ফুল পরীক্ষা করে দেখো এবং স্ট্যামিনেটফুল বা পুংকেশর বিশিষ্ট ফুল এবং পিস্টিলেটফুল বা গর্ভকেশর বিশিষ্ট ফুলগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করো। তোমরা কি এমন কোনো উদ্ভিদের নাম জানো যার ফুলগুলো একলিঙ্গ হয়?

18. জরায়ুজ প্রাণীদের অপত্যদের তুলনায় অন্ডজ প্রাণীদের অপত্যরা তাদের জীবনকালে অধিকতর ঝুঁকির সম্মুখীন হয় কেন?

অধ্যায় -2

সপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন জনন (SEXUAL REPRODUCTION IN FLOWERING PLANTS)

2.1 ফুল- গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি চিত্তাকর্ষক অঙ্গ (Flower- A Fascinating Organ of Angiosperms)

2.2 প্রাক-নিষেক ঃ গঠনসমূহ এবং ঘটনাবলি (Pre-fertilisation : Structures and Events)

2.3 দ্বিনিষেক (Double Fertilisation)

2.4 নিষেক পরবর্তী গঠন ও ঘটনাসমূহ (Post-fertilisation : Structures and Events)

2.5 অ্যাপোমিক্সিস এবং বহুভ্রূণতা (A pomixis and Polyembryony)

আমরা কি ভাগ্যবান নই যে, উদ্ভিদরা যৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে? আমরা যে বহু বিভিন্ন ফুলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেগুলোর শোভা উপভোগ করি, যে সুবাস এবং সুগন্ধে আমরা বিমুগ্ধ হই, যে উজ্জ্বল বর্ণসমূহ আমাদের আকৃষ্ট করে এসবই উদ্ভিদের যৌন জননে সহায়তা প্রদান করে। ফুল শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই ফোটে না সব সপুষ্পক উদ্ভিদেই যৌনজনন পরিলক্ষিত হয়। পুষ্পবিন্যাস, ফুল এবং ফুলের বিভিন্ন অংশের গঠনগত বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে যৌন জননের ফলে উৎপন্ন অন্তঃপদার্থসমূহ অর্থাৎ ফল এবং বীজ গঠনকে সুনিশ্চিত করতে বিস্তৃত পরিসরে আশ্চর্যজনক সব অভিযোজন দেখতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে চলো আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের (গুপ্তবীজী) অঙ্গ সংস্থান, গঠন এবং যৌন জননের পদ্ধতিগুলো বোঝার চেষ্টা করি।

2.1 ফুল- গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি চিত্তাকর্ষক অঙ্গ (FLOWER - A FASCINATING ORGAN OF ANGIOSPERMS)

অনাদিকাল থেকেই ফুলের সাথে মানুষের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। ফুল হল এমন বস্তু যার নান্দনিক, শোভাবর্ধক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে এগুলো সর্বদাই মানুষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি যেমন ভালোবাসা, স্নেহ, সুখ, দুঃখ, শোক ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কমপক্ষে এমন পাঁচটি শোভাবর্ধক ফুলের নাম লিপিবদ্ধ করো যে ফুলের গাছগুলো সাধারণত বাড়িতেএবং বাগানে লাগানো হয়।

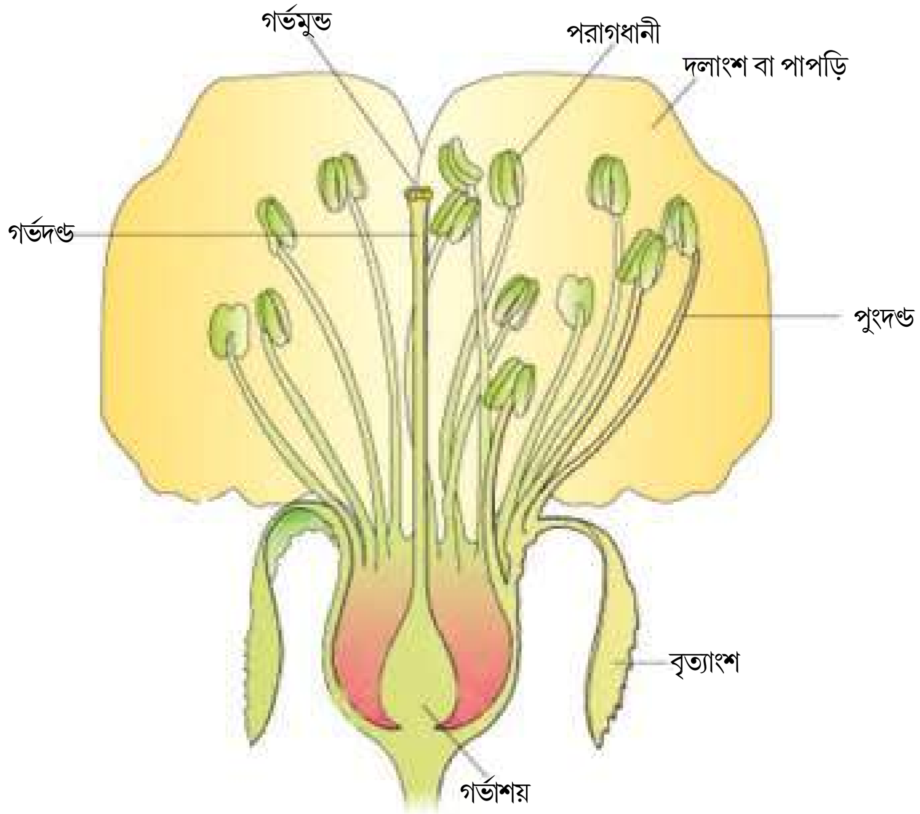

চিত্র 2.1 একটি ফুলের লম্বছেদের চিত্ররূপ উপস্থাপনা

এমন আরও পাঁচটি ফুলের নাম খুঁজে বের করো যেগুলো তোমাদের পরিবারে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত হয়। তোমরা কি 'ফুলচাষ' (Floriculture) সম্পর্কে শুনেছো — এটি কী নির্দেশ করে?

একজন জীববিজ্ঞানীর কাছে ফুল হল অঙ্গ সংস্থানগত এবং ভ্রূণতত্ত্বগত দিক থেকে একটি আশ্চর্যজনক বস্তু এবং যৌন জননের স্থান। একাদশ শ্রেণিতে তোমরা একটি ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে পড়েছো। চিত্র 2.1 তোমাদেরকে একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী তা মনে করাতে সাহায্য করবে। তোমরা কি একটি ফুলের দুটি অংশের নাম উল্লেখ করতে পার যে অংশগুলোতে যৌন জননের দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একক গঠিত হয়?

2.2 প্রাক-নিষেক ঃ গঠনসমূহ ও ঘটনাবলি (Pre-fertilisation: Structures and Events)

একটি উদ্ভিদে প্রকৃত ফুল গঠিত হওয়ার বহু আগেই এই আভাস পাওয়া গিয়েছিল যে উদ্ভিদে ফুলের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। বহু হরমোনঘটিত এবং গঠনগত পরিবর্তনসমূহের সূচনার ফলে ফুলের আদি গঠনটি অর্থাৎ ফ্লোরাল প্রাইমোরডিয়াম (floral primordium)-এর বিভেদীকরণ এবং অধিকতর পরিস্ফুরণ ঘটে। পুষ্পবিন্যাস গঠিত হয় যা পুষ্প মুকুল ধারণ করে এবং এই পুষ্প মুকুল পরে ফুলে পরিণত হয়। ফুলে পুং এবং স্ত্রী জননতন্ত্র গঠনকারী অংশসমূহের বিভেদীকরণ ঘটে এবং পুং স্তবক ও স্ত্রীস্তবক বিকশিত হয়। তোমরা মনে করে দেখ যে পুংস্তবক পুংকেশরের একটি আবর্ত দ্বারা গঠিত হয়ে ফুলের পুংজনন অঙ্গাকে নির্দেশ করে এবং স্ত্রীস্তবকটি ফুলের স্ত্রী জনন অঙ্গাকে নির্দেশ করে।

2.2.1 পুংকেশর, পুংরেণুস্থলী এবং পরাগরেণু (Stamen, Microsporangium and Pollen Grain)

চিত্র 2.2 (ক)তে একটি আদর্শ পুংকেশরের দুটি অংশ দেখানো হয়েছে। দীর্ঘ ও সরু বৃন্তটিকে পুংদণ্ড বলে এবং সাধারণত দুই খণ্ডবিশিষ্ট প্রান্তীয় গঠনটিকে পরাগধানী বলে। পুংদণ্ডের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী অংশটি পুষ্পাক্ষ বা ফুলের পাপড়ির সাথে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির ফুলে পুংকেশরের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। যদি তুমি দশটি ফুলের (প্রতিটি ভিন্ন প্রজাতির) প্রতিটি থেকে একটি করে পুংকেশর সংগ্রহ কর এবং সেগুলোকে একটি স্লাইডের উপর সজ্জিত কর, তাহলে তুমি প্রকৃতিতে পুংকেশরের ব্যাপক আকারগত ভিন্নতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। একটি ডিসেকটিং মাইক্রোস্কোপ (Dissecting Microscope)-এর সাহায্যে প্রতিটি পুংকেশরের সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কন বিভিন্ন ফুলে পরাগধানীর আকৃতি এবং সংযুক্তির বিস্তৃত ধরনকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করবে।

একটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আদর্শ পরাগধানী দ্বি-খণ্ডক বিশিষ্ট হয় এবং প্রতিটি খন্ডক আবার দুইটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ এগুলো দ্বিপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (Dithecous) (চিত্র 2.2 খ)। প্রায়শই একটি অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ পরাগধানীর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়ে প্রকোষ্ঠ দুটিকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখে। চল আমরা একটি পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদে দৃশ্য বিভিন্ন কলা এবং তাদের সংগঠন সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করি (চিত্র 2.3 ক)। একটি পরাগধানীর দ্বিখণ্ডক বিশিষ্ট গঠনটি এর প্রস্থচ্ছেদে খুবই সুস্পষ্ট হয়। পরাগধানী একটি চারপার্শ্ববিশিষ্ট গঠন যা চারটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া সমন্বিত হয়। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াগুলো পরাগধানীর কোনাগুলোতে অবস্থান করে। দ্বিখণ্ডকবিশিষ্ট পরাগধানীর প্রতিটি খন্ডকে দুটি করে মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া থাকে।

মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া আরো বৃদ্ধি পায় এবং পরাগথলিতে পরিণত হয়। এগুলো একটি পরাগধানীর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর অনুদৈর্ঘ্যভাবে বিস্তৃত থাকে এবং পরাগরেণুতে পরিপূর্ণ থাকে।

চিত্র 2.2 (ক) একটি আদর্শ পুংকেশর (খ) একটি পরাগধানীর ত্রিমাত্রিক ছেদ দৃশ্য

মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের গঠন ঃ প্রস্থচ্ছেদে একটি আদর্শ মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রান্তরেখা অনেকটা বৃত্তাকার হয়। এটি সাধারণত চারটি প্রাচীরস্তর দ্বারা পরিবৃত থাকে (চিত্র 2.3 খ), যথা- এপিডারমিস, এন্ডোথেসিয়াম, মধ্যস্তরসমূহ এবং ট্যাপেটাম। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের বাইরের দিকের তিনটি প্রাচীর স্তর সুরক্ষা প্রদানের কাজ করে এবং পরাগধানীর বিদারণ ঘটিয়ে পরাগরেণুর নির্গমনে সাহায্য করে। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের সবচেয়ে ভেতরের প্রাচীরের স্তরটি হল ট্যাপেটাম। এটি বর্ধনশীল পরাগরেণুগুলোতে পুষ্টির যোগান দেয়। ট্যাপেটামের কোশগুলো ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে এবং সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়। তোমরা কি ভাবতে পারো যে কীভাবে ট্যাপেটামের কোশগুলো দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হতে পারে?

যখন পরাগধানীটি অপরিণত থাকে তখন একগুচ্ছ ঘনসন্নিবিষ্টভাবে সজ্জিত একই প্রকারের (Homogenous) কোশ দ্বারা গঠিত রেণুধারণ কলা (Sporogenous tissue) প্রতিটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের কোশীয় অংশটি দখল করে থাকে।

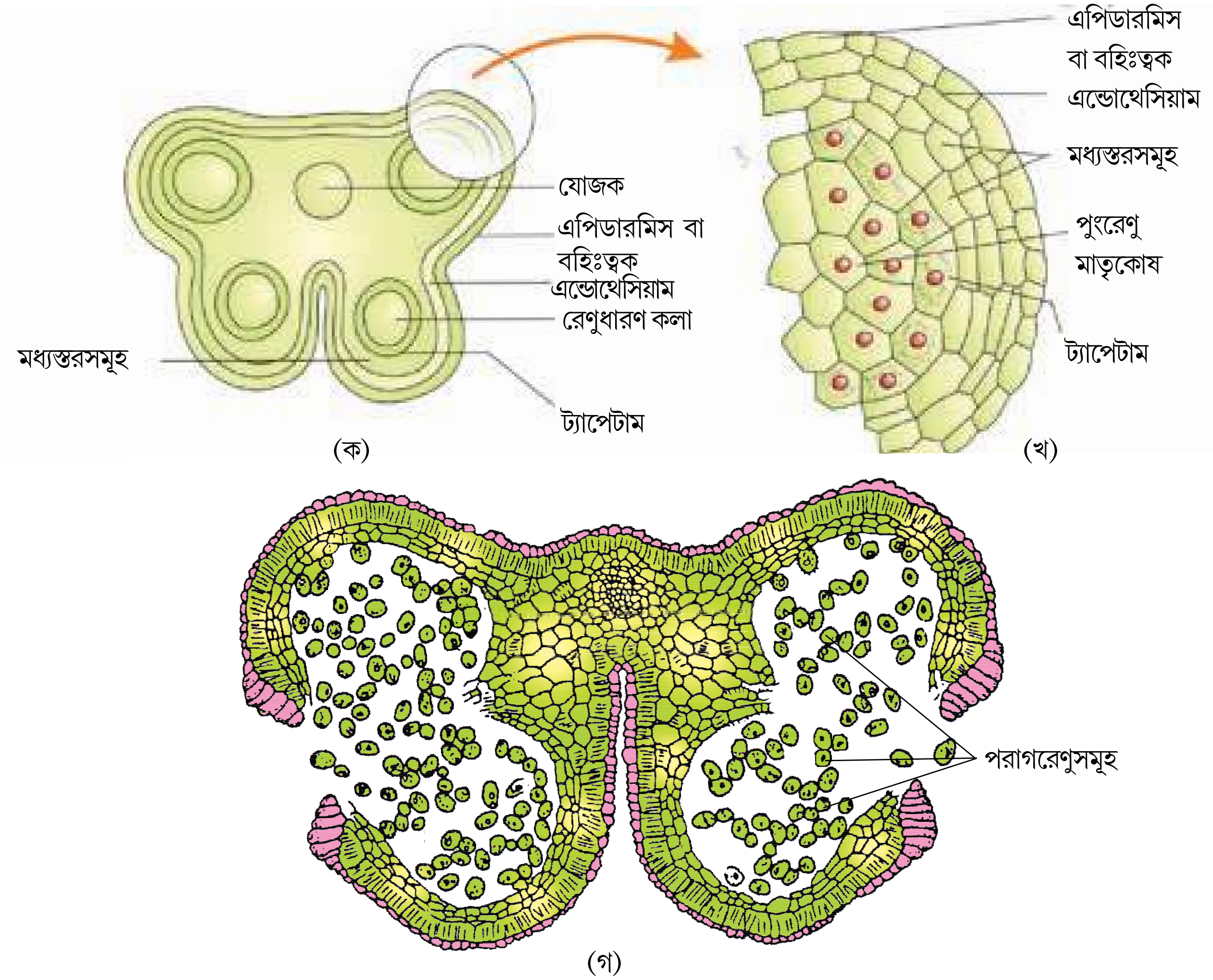

চিত্র 2.3 (ক) একটি অপরিণত পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ (খ) একটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের বিবর্ধিত চিত্র যেখানে প্রাচীরের স্তরসমূহ দেখানো হয়েছে। (গ) বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া একটি পরিণত পরাগধানী

মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস ঃ পরাগধানীর বৃদ্ধির সাথে সাথে রেণুধারণ কলার কোশগুলো মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে পুং রেণু চতুষ্টয় (Microspore tetrad) গঠন করে। এই রেণুচতুষ্টয় কোশগুলোর প্লয়ডি কী হবে?

যেহেতু রেণুধারণ কলার প্রতিটি কোশ পুংরেণু চতুষ্টয় গঠনে সক্ষম তাই রেণুধারণ কলার প্রত্যেক কোশই পরাগরেণু মাতৃকোশ বা পুংরেণু মাতৃকোশ হওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। একটি পরাগরেণু মাতৃকোশ (PMC) থেকে মিয়োসিসের মাধ্যমে পুংরেণু বা মাইক্রোস্পোর সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস বলে। পুংরেণুগুলো তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এরা চারটি কোশের একটি থোকারূপে সজ্জিত থাকে, একে পুং রেণুচতুষ্টয় (**Microspore tetrad**) বলে (চিত্র **2.3** ক)। যখন পরাগধানীগুলো পরিণত ও শুষ্ক হয় তখন পুংরেণুগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং পরাগরেণুতে পরিণত হয় (চিত্র **2.3** খ)। একটি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের ভেতরে বহু সহস্র মাইক্রোস্পোর বা পুংরেণু গঠিত হয় যেগুলো পরাগধানীর বিদারণের ফলে বাইরে নির্গত হয় ((চিত্র **2.3** গ)।

চিত্র 2.4 কিছু পরাগরেণুর স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ

পরাগরেণু (Pollen grain) পরাগরেণু পুংলিঙ্গাধর দেহকে উপস্থাপন করে। যদি তোমরা হিবিসকাস বা অন্য কোনো ফুলের বিদীর্ণ পরাগধানী স্পর্শ কর তাহলে তোমরা তোমাদের আঙুলে হলুদাভ, পাউডারের মতো পরাগরেণুগুলো লেগে থাকতে দেখবে। একটি কাচের স্লাইডের উপর নেওয়া একফোঁটা জলের উপর এই রেণুগুলোকে ছিটিয়ে দাও এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কর। তোমরা বিভিন্ন প্রজাতি উদ্ভিদের ফুল থেকে সংগৃহীত পরাগরেণুগুলোর আকার, আকৃতি, বর্ণ দেহ নক্সা বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস দেখে সত্যিই অভিভূত হবে (চিত্র 2.4)

পরাগরেণুগুলো সাধারণত গোলকাকার ও প্রায় 25-30 মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট হয়। এতে একটি সুস্পষ্ট দ্বিস্তরী প্রাচীর রয়েছে। পরাগরেণুর কঠিন বহিঃত্বক বা এক্সাইন স্পোরোপোলেনিন দ্বারা গঠিত হয় যা আমাদের জ্ঞাত সর্বাধিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব বস্তুর মধ্যে একটি। এটি উচ্চতাপমাত্রা এবং তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারীয় পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। যতদূর জানা গেছে, কোনও উৎসেচকই স্পোরোপোলেনিনকে ধ্বংস করতে পারে না। পরাগরেণুর বহিঃত্বক বা এক্সাইনে উপস্থিত সুস্পস্ট ছিদ্রগুলোই হল রেণুরন্ধ্র (germ pore), যেখানে স্পোরোনোলেনিন অনুপস্থিত। স্পোরোপোলেনিনের উপস্থিতির কারণেই পরাগরেণুগুলো জীবাশ্ম হিসাবে সুসংরক্ষিত থাকে। রেণুবহিঃত্বক বা এক্সাইনে খুবই আকর্ষণীয় কারুকার্য এবং নক্সা দেখা যায়। তোমাদের কেন মনে হয় যে রেণুবহিঃত্বক বা এক্সাইন অবশ্যই কঠিন হতে হবে? রেণুরন্ধ্রের কাজ কী? পরাগরেণুর অন্তরপ্রাচীরটিকে রেণুঅন্তঃত্বক বা ইন্টাইন বলে। এটি সেলুলোজ এবং পেকটিন দ্বারা গঠিত একটি পাতলা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তর। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম একটি প্লাজমাপর্দা দ্বারা পরিবৃত থাকে। পরাগরেণু পরিণত হলে এটি দুটি কোশ সমন্বিত হয় — কোশগুলো হল অঙ্গজ কোশ এবং জেনারেটিভ কোশ (চিত্র 2.5 খ)। অঙ্গজ কোশটি তুলনামূলকভাবে বড়, পর্যাপ্ত সঞ্চিত খাদ্য সমন্বিত এবং একটি বৃহৎ অনিয়তাকৃতির নিউক্লিয়াসশিষ্ট হয়। জেনারেটিভ কোশটি ক্ষুদ্র এবং এটি অঙ্গজ কোশের সাইটোপ্লাজমে ভাসমান থাকে। এটি মাকু আকৃতিবিশিষ্ট এবং ঘন সাইটো প্লাজম ও একটি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। 60 শতাংশেরও বেশি গুপ্তবীজী উদ্ভিদে পরাগরেণুর বিস্তার এই দ্বিকোশী অবস্থাতেই ঘটে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বাদ বাকি প্রজাতিগুলোতে পরাগধানী থেকে পরাগরেণুর নির্গমনের পূর্বে জেনারেটিভ কোশটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটো পুং গ্যামেট সৃষ্টি করে (তিন কোশীয় দশা)।

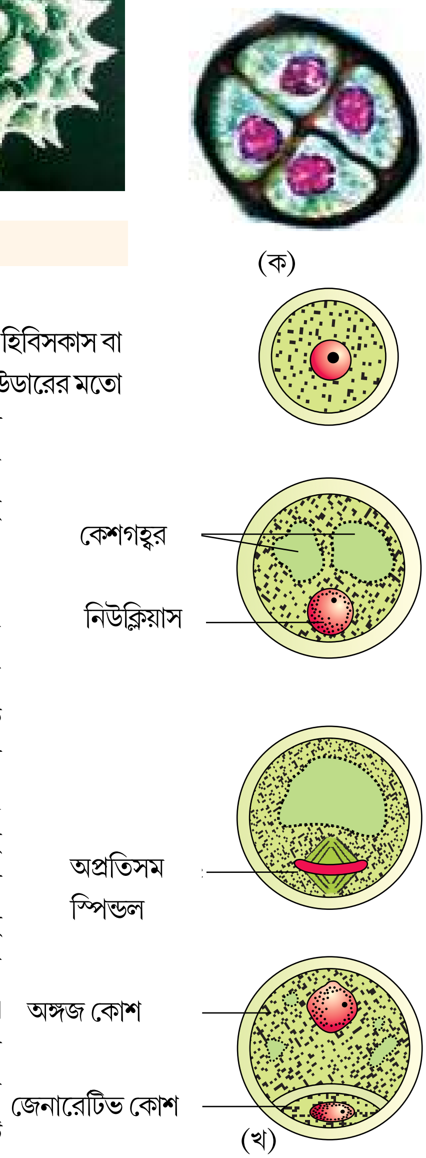

চিত্র 2.5 (ক) একটি পরাগরেণু চতুষ্টয়ের বিবর্ধিত দৃশ্য
(খ) একটি পুংরেণুর পরাগরেণুতে পরিণত হওয়ার দশাসমূহ

বহু প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগরেণুগুলো বহু মানুষের কাছে মারাত্মক এলার্জি এবং ব্রংকাসের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা প্রায়শই শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিগুলো যেমন- শ্বাসকস্ট, ব্রংকাইটিস ইত্যাদির সৃষ্টি করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পার্থেনিয়াম বা ক্যারটগ্রাস আমদানিকৃত গমের সাথে মিশ্রিত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। এই গাছগুলো এখন সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং পরাগরেণুঘটিত এলার্জির সৃষ্টি করে।

পরাগরেণুসমূহ পরিপোষক পদার্থ সমৃদ্ধ হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সম্পূরক খাদ্য হিসাবে পরাগ ট্যাবলেটের ব্যবহার একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমি দেশগুলোতে পরাগরেণু থেকে উৎপাদিত প্রচুর সংখ্যক পণ্য ট্যাবলেট এবং সিরাপরূপে বাজারে খুব সহজেই পাওয়া যায়। এরূপ দাবি করা হয় যে খাদ্য হিসাবে পরাগরেণুর ব্যবহার ক্রীড়াবিদ এবং দৌড়ে অংশগ্রহণ করে এমন ঘোড়ার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (চিত্র 2.6)

(চিত্র 2.6) পরাগজাত বস্তুসমূহ

পরাগরেণুগুলোকে যদি নিষেক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হয় তবে পরাগধানী থেকে নির্গত হওয়ার পর পরই কর্মক্ষমতা হারানোর পূবে, এদের গর্ভমুন্ডে পতিত হতে হবে। পরাগরেণুগুলো কতটা সময় পর্যন্ত তাদের কর্মক্ষমতা ধরে রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? পরাগরেণুর কর্মক্ষম থাকার সময়কাল অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হয় এবং তা কিছুটা হলেও পরিবেশীয় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। কিছু দানাশস্য যেমন ধান ও গমের ক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলো নির্গমনের **30** মিনিটের মধ্যেই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং Rosaceae, Leguminoseae G Solanasceae গোত্রের কিছু উদ্ভিদে পরাগরেণুর কর্মক্ষমতা মাসাধিককাল অবধি বজায় থাকে। তোমরা হয়ত কৃত্রিম ইনসেমিনেশন- এর জন্য মানুষসহ বহু প্রাণীর বীর্য/শুক্ররস সংরক্ষণের কথা শুনে থাকবে। বহু সংখ্যক প্রজাতির পরাগরেণুগুলোকে বহু বছর ধরে তরল নাইট্রোজেনে (-196^0c) সংরক্ষণ করা সম্ভব। এধরণের সঞ্চিত পরাগরেণুগুলো 'সীড ব্যাঙ্কের' মত পোলেন ব্যাঙ্ক' হিসাবে শস্য প্রজনন কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হতে পারে।

2.2.2 গর্ভকেশর, স্ত্রীরেণুস্থলী (ডিম্বক) ওবং ভ্রণস্থলী (The pistil, Megasporangiums(ovule) and Embryo sac) ঃ স্ত্রীস্তবক একটি ফুলের স্ত্রী জননতন্ত্রটিকে উপস্থাপন করে। স্ত্রীস্তবক একটি মাত্র গর্ভকেশর দ্বারা গঠিত হতে পারে (একগর্ভপত্রী বা monocarpellary) বা একাধিক গর্ভকেশরবিশিষ্ট (বহুগর্ভপত্রী বা multicarpellary) হতে পারে। স্ত্রীস্তবকটি একাধিক গর্ভকেশরবিশিষ্ট হলে গর্ভকেশরগুলো পরস্পর যুক্ত (যুক্ত গর্ভপত্রী বা syncarpous) (চিত্র 2.7 খ) অথবা মুক্ত (মুক্ত গর্ভপত্রী বা apocarpous) (চিত্র 2.7 গ) হতে পারে। প্রতিটি গর্ভকেশর তিনটি অংশ সমন্বিত (চিত্র 2.7ক) গর্ভমুন্ড, গর্ভদন্ড এবং গর্ভাশয়। গর্ভমুণ্ডটি পরাগরেণুর অবতরণস্থল হিসাবে কাজ করে। গর্ভমুণ্ডের নীচের দীর্ঘ সরু অংশটি হল গর্ভদণ্ড। গর্ভকেশরের মূলদেশের স্ফীত অংশটি হল গর্ভাশয়। গর্ভাশয়ের

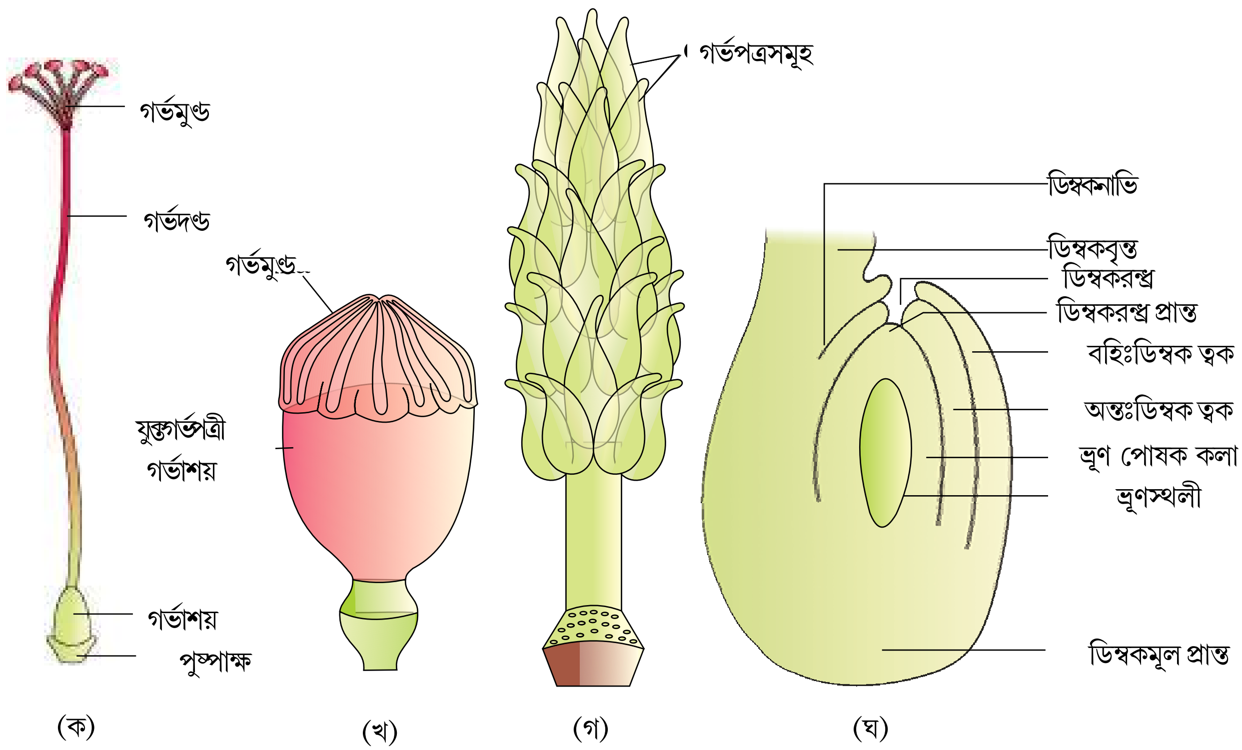

চিত্র 2.7 (ক) Hibiscus-এর একটি ব্যবচ্ছিন্ন ফুলের দৃশ্যমান গর্ভকেশর (ফুলের অন্যান্য অংশগুলো অপসারণ করা হয়েছে) (খ) Papaver-এর বহুগর্ভপত্রী, যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশর (গ) Michelia-এর বহুগর্ভপত্রী, মুক্তগর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবক (ঘ) একটি আদর্শ অধোমুখী ডিম্বকের চিত্ররূপ প্রদর্শন

অভ্যন্তরে গর্ভাশয় প্রকোষ্ঠ (লকিউল) রয়েছে। গর্ভাশয় প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে অমরা (placenta) অবস্থান করে। অমরা বিন্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদগুলো মনে করে দেখ যেগুলো তোমরা একাদশ শ্রেণিতে পড়েছো। অমরা থেকে উৎপন্ন গঠনগুলোকে মেগাস্পোরাঞ্জিয়া বা সচরাচর ডিম্বক বলে। একটি গর্ভাশয়ে ডিম্বকের সংখ্যা এক (গম, ধান, আম) থেকে বহু (পেঁপে, তরমুজ, অর্কিড) হতে পারে।

স্ত্রীরেণুস্থলী (ডিম্বক) (The megasporangiun (Ovule)) ঃ চল আমরা একটি আদর্শ গুপ্তবীজী ডিম্বকের গঠনের সাথে পরিচিত হই (চিত্র 2.7 ঘ)। ডিম্বক হল একটি ক্ষুদ্র গঠন যা ডিম্বক বৃন্তের (funicle) সাহায্যে অমরার সাথে যুক্ত থাকে। ডিম্বক দেহটি যে অঞ্চলে ডিম্বক বৃন্তের সাথে মিশে যায় তাকে ডিম্বকনাভি (hilium) বলে। তাই ডিম্বক নাভি ডিম্বক ও ডিম্বক বৃন্তের মধ্যেকার সংযোগস্থলটিকে উপস্থাপন করে। প্রতিটি ডিম্বকের একটি বা দুটি সুরক্ষা আবরণী রয়েছে যেগুলোকে ডিম্বক ত্বক বলে। ডিম্বকত্বক ভ্রূণপোষক কলার শীর্ষস্থিত একটি ছোট রন্ধ্র ব্যাতীত বাকি অংশটিকে আবৃত করে রাখে এবং এই ছিদ্রটিকে ডিম্বকরন্ধ্র বলে। ডিম্বক রন্ধ্র প্রান্তের বিপরীত দিকটি হল ডিম্বক মূল যা ডিম্বকের মূলদেশকে উপস্থাপন করে।

ডিম্বকত্বক দ্বারা পরিবৃত একটি কোশগুচ্ছকে ভ্রূণপোষক কলা (nucells) বলে। ভ্রূণপোষক কলার কোশগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্য রয়েছে। ভ্রূণপাষক কলার মধ্যবর্তী স্থানে ভ্রূণস্থলী বা স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহ বর্তমান। একটি ডিম্বকে সাধারণত একটি স্ত্রীরেণু থেকে গঠিত একটি মাত্র ভ্রূণস্থলী থাকে।

মেগাস্পোরোজেনেসিস (Megasporogenesis) : স্ত্রী রেণু মাতৃকোশ (Megaspore mother cell) থেকে স্ত্রীরেণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই মেগাস্পোরোজেনেসিস বলে। ডিম্বকসমূহ ভ্রূণপোষক কলার ডিম্বকরন্ধ্রীয় অঞ্চলে বিভেদীত হয়ে একটি মাত্র স্ত্রী-রেণুমাতৃকোশ (MMC) গঠন করে। এটি হল ঘন সাইটোপ্লাজম এবং একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস সমন্বিত বৃহৎ কোশ। স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। স্ত্রীরেণুমাতৃকোশের মিয়োসিস বিভাজনের গুরুত্ব কী? মিয়োসিসের ফলে চারটি মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু সৃষ্টি হয়।

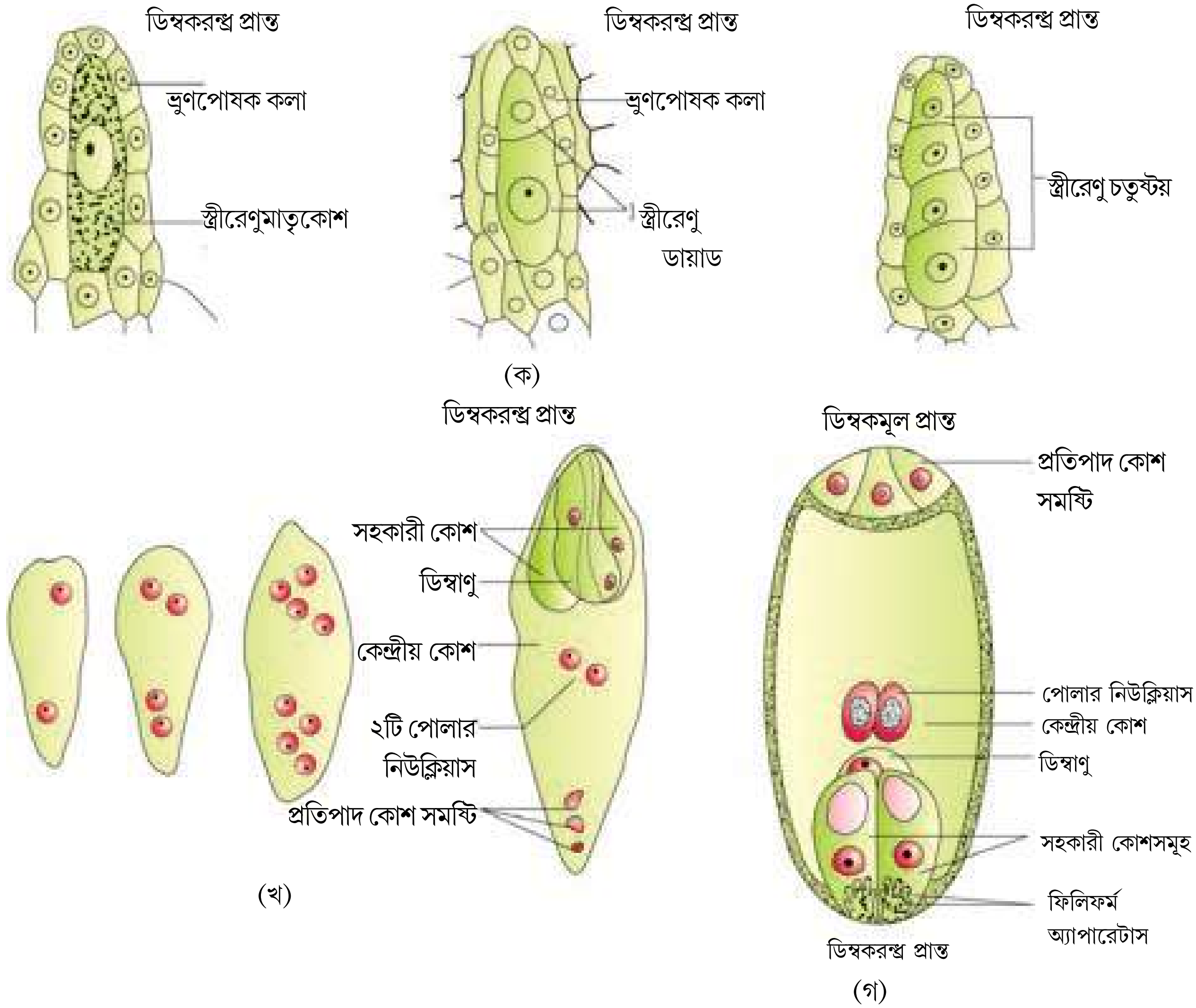

চিত্র 2.8 (ক) ডিম্বকের অংশসমূহ, যেখানে একটি বৃহৎ স্ত্রীরেণু মাতৃকোশ, একটি স্ত্রীরেণু ডায়াড ও একটি স্ত্রীরেণু চতুষ্টয় দেখানো হয়েছে। (খ) ভ্রূণস্থলীর 2, 4, ও 8 - নিউক্লিয়াসযুক্ত দশা এবং একটি পরিণত ভ্রূণস্থলী; (গ) একটি পরিণত ভ্রূণস্থলীর চিত্ররূপ উপস্থাপনা।

স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহ (Female gametophyte) ঃ বেশীরভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদসমূহেই স্ত্রীরেণুগুলোর মধ্যে একটি কার্যকর হয় এবং অপর তিনটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কেবলমাত্র কার্যকর স্ত্রীরেণুটিই স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহ (ভ্রণস্থলী) গঠন করে। একটিমাত্র স্ত্রী রেণু থেকে ভ্রূণস্থলী তৈরী হওয়ার এই পদ্ধতিকে মনোস্পোরিক (monosporic) বৃদ্ধি বলা হয়। ভ্রূণপোষক কলা, স্ত্রীরেণুমাতৃকোশ, কার্যকর স্ত্রীরেণু এবং স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহের কোশগুলোর প্লয়ডি কী হবে?

চল আমরা আরোও কিছুটা বিস্তারিতভাবে ভ্রূণস্থলীর গঠন সম্পর্কে অধ্যয়ন করি (চিত্র 2.8খ)। কার্যকর স্ত্রীরেণুর নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে, যেগুলো পরস্পরের বিপরীত মেরুতে পৌঁছানোর পর 2- নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ভ্রূণস্থলী গঠন করে ।

নিউক্লিয়াসের আরো দুটি পর্যায়ক্রমিক মাইটোসিস বিভাজনের ফলে ভ্রূণস্থলীর 4- নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ও পরে 8-নিউক্লিয়াসযুক্ত দশার সৃষ্টি হয়। এটি লিপিবদ্ধ করা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক যে এই সব মাইটোসিস বিভাজনগুলো পুরোপুরিভাবে মুক্ত নিউক্লিয়াস বিভাজন অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর পরই কোশপ্রাচীর গঠিত হয় না। 8- নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট দশার পর পরই কোশপ্রাচীর গঠিত হওয়ায় একটি আদর্শ স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহ বা ভ্রূণস্থলীর সংগঠন তৈরী হয়। ভ্রূণস্থলী (embryo sac) - এর অভ্যন্তরে কোশসমূহের বিন্যাস পর্যবেক্ষণ কর (চিত্র 2.8 খ,গ)। আটটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছয়টি নিউক্লিয়াস কোশপ্রাচীর দ্বারা পরিবৃত থাকে এবং কোশ গঠন করে। অবশিষ্ট দুটি নিউক্লিয়াস যেগুলোকে পোলার নিউক্লিয়াস বলা হয় তা গর্ভযন্ত্রের (egg apparatus) নিচে বৃহৎ কেন্দ্রীয় কোশটিতে অবস্থান করে।

ভ্রূণস্থলীতে কোশসমূহের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক বিন্যাস দেখা যায়। ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে তিনটি কোশ একত্রিত হয়ে গর্ভযন্ত্র গঠন করে। গর্ভযন্ত্রটি আবার দুটি সহকারী কোশ (synergids) এবং একটি ডিম্বকোশ (egg cell) নিয়ে গঠিত হয়। ডিম্বকরন্ধ্রের শীর্ষভাগে সহকারী কোশগুলোতে (synergids) বিশেষ কোশীয় স্থূলীকরণ দেখা যায়, যেগুলোকে ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস বলে যা সহকারী কোশ অভিমুখে পরাগনালীর বৃদ্ধি পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ডিম্বক মূল প্রান্তে (chalazal end) উপস্থিত তিনটি কোশকে প্রতিপাদ কোশসমষ্টি (Antipodals) বলে। পূর্বে উল্লেখিত বৃহৎ কেন্দ্রীয় কোশটিতে দুটি পোলার নিউক্লিয়াস রয়েছে। তাই গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি আর্দশ ভ্রূণস্থলী পরিণত অবস্থায় 8- নিউক্লিয়াসযুক্ত হলেও 7- কোশবিশিষ্ট হয়।

2.2.3 পরাগযোগ (pollination)

পূর্ববতী অনুচ্ছেদগুলোতে তোমরা শিখেছো যে সপুষ্পক উদ্ভিদে পুং এবং স্ত্রী গ্যামেটসমূহ যথাক্রমে পরাগরেণু এবং ভ্রূণস্থলীতে উৎপন্ন হয়। যেহেতু উভয় ধরনের গ্যামেটই চলনে অক্ষম তাই নিষেক সংঘটিত করার জন্য এগুলোকে পরস্পরের সন্নিকটে নিয়ে আসতে হয়। এটি কীভাবে সম্ভবপর হয়?

পরাগযোগ হল সেই পদ্ধতি যা এই উদ্দেশ্য পূরণে অর্থাৎ গ্যামেটগুলোকে নিষেকের জন্য পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে। একটি গর্ভকেশরের গর্ভমুন্ডে পরাগরেণুর (পরাগধানী থেকে নির্গত) স্থানান্তরনকে পরাগযোগ বলে। পরাগযোগ সম্পন্ন করার জন্য সপুষ্পক উদ্ভিদে আশ্চর্যজনক কিছু অভিযোজনগত বৈশিষ্টের উদ্ভব ঘটেছে। এই উদ্ভিদরা পরাগযোগ ঘটানোর জন্য বাহ্যিক বাহকগুলোকে ব্যবহার করে থাকে। তোমরা কি সম্ভাব্য বাহ্যিক বাহকগুলোর নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবে?

পরাগযোগের প্রকারভেদ (kinds of pollination) ঃ পরাগরেণুর উৎসের উপর নির্ভর করে পরাগযোগ তিন প্রকারের হয়।

(I) **অটোগ্যামি (Autogamy)** ঃ এক্ষেত্রে একই ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে। একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণুর গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরণ ঘটে (চিত্র 2.9 ক)। একটি স্বাভাবিক ফুল যেটি প্রস্ফুটিত হয় এবং এর পরাগধানী ও গর্ভমুন্ড উন্মীলিত হয় সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অটোগ্যামির ঘটনা খুবই বিরল। এই ধরনের ফুলে অটোগ্যামি ঘটার জন্য পরাগরেণুর নির্গমন ও গর্ভমুন্ডের পরাগরেণু গ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে সমলয়তা থাকা দরকার এবং গর্ভমুন্ড

(ক)

(খ)

(c)

চিত্র 2.9 (ক) স্বপরাগী ফুল
(খ) ইতর পরাগী ফুল
(গ) ক্লিস্টোগ্যামাস ফুল

ও পরাগধানী পরস্পরের কাছাকাছি থাকাও উচিত যাতে স্ব-পরাগযোগ ঘটতে পারে। Viola (সাধারণ প্যানজি), Onalis এবং Commelina-এর মত কিছু উদ্ভিদে দুই ধরনের ফুল উৎপন্ন হয় যথা- চ্যাসমোগ্যামাস ফুল যেগুলো উন্মীলিত পরাগধানী ও গর্ভমুন্ডবিশিষ্ট অন্য প্রজাতির ফুলের মত হয় এবং ক্লিস্টোগ্যামাস ফুল যা কখনোই উন্মীলিত হয় না (চিত্র 2.9 গ)। এই ধরনের ফুলে পরাগধানী এবং গর্ভমুন্ডপরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। যখন পুষ্পমুকুলের অভ্যন্তরে পরাগধানী বিদারণ ঘটে তখন পরাগরেণুগুলো পরাগযোগ ঘটানোর জন্য গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে। তাই, ক্লিস্টোগ্যামাস ফুলগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বপরাগী হয় কারণ এক্ষেত্রে গর্ভমুণ্ডে অন্য ফুলের পরাগরেণু পতিত হওয়ার এবং ইতর পরাগযোগ ঘটার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এমনকি ক্লিস্টোগ্যামাস ফুলে, পরাগযোগে সাহায্যকারী বাহকের অনুপস্থিতিতেও বীজ গঠন সুনিশ্চিত হয়। তোমাদের কী মনে হয়- উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্লিস্টোগ্যামী সুবিধাজনক না অসুবিধাজনক? কেন?

(II) গেইটোনোগ্যামি (Geitonogamy) ঃ এক্ষেত্রে, একটি ফুলের পরাগধানী থেকে নির্গত পরাগরেণু একই উদ্ভিদের অপর একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। যদিও গেইটোনোগ্যামি কার্যগতভাবে ইতর পরাগযোগ যেখানে পরাগযোগে সাহায্যকারী বাহকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জিনগতভাবে এটি অটোগ্যামি সদৃশ যেহেতু পরাগরেণুগুলো একই উদ্ভিদের অন্য ফুল থেকে আসে।

(III) জেনোগ্যামি (Xenogamy) ঃ এক্ষেত্রে পরাগধানী থেকে নির্গত পরাগরেণুগুলো একটি ভিন্ন উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র 2.9 খ)। কেবলমাত্র এই প্রকার পরাগযোগেই জিনগতভাবে ভিন্ন ধরনের পরাগরেণুগুলো পরাগযোগকালে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়।

পরাগযোগের বাহকসমূহ (Agents of Pollination) ঃ উদ্ভিদরা দুটি অজীবজ (বায়ু ও জল) এবং একটি জীবজ (প্রাণী) বাহকের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটায়। বেশিরভাগ উদ্ভিদই পরাগযোগ ঘটাতে জীবজ মাধ্যমসমূহকে ব্যবহার করে থাকে। কেবলমাত্র খুব কম সংখ্যক উদ্ভিদই এই কাজে অজীবজ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে। বায়ুপরাগী ও জলপরাগী ফুলের ক্ষেত্রে পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসার ঘটনাটি দৈবাৎ ঘটে। এই অনিশ্চয়তাসমূহ এবং এর ফলে পরাগরেণুর অপচয়জনিত ক্ষতি পূরণ করার জন্য ফুলে পরাগযোগের জন্য যতসংখ্যক ডিম্বকের প্রয়োজন হয় তার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় পরাগরেণু উৎপন্ন হয়।

অজীবজ বাহকের সাহায্যে ঘটা পরাগযোগগুলোর মধ্যে বায়ুর মাধ্যমে ঘটা পরাগযোগই সচরাচর বেশি দেখা যায়। বায়ুর মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটার জন্য পরাগরেণুগুলো হালকা এবং চটচটে নয় এমন হওয়াও প্রয়োজন যাতে সেগুলো বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বাহিত হতে পারে। বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুগুলোকে সহজে ধরার জন্য উদ্ভিদগুলো প্রায়শই সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত পুংকেশর (যাতে পরাগধানী থেকে নির্গত পরাগরেণুগুলো বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সহজে বাহিত হতে পারে, চিত্র 2.10) এবং বৃহৎ প্রায়-পক্ষল গর্ভমুণ্ড থাকে। বায়ুপরাগী ফুলগুলোর প্রতিটি ডিম্বাশয়ে প্রায়শই একটি করে ডিম্বক থাকে এবং বহু সংখ্যক ফুল একটি পুষ্পবিন্যাস হিসাবে সজ্জিত থাকে। একটি অতি পরিচিত উদাহরণ হল ভুট্টার শিষ (Corn cob)— তোমরা ভুট্টার শিষের যে সূত্রাকার অংশগুলো দেখ সেগুলো হল গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড যা পরাগরেণু ধরার জন্য বায়ুতে আন্দোলিত হয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে বায়ুর মাধ্যমে পরাগযোগ সচরাচর বেশি দেখা যায়।

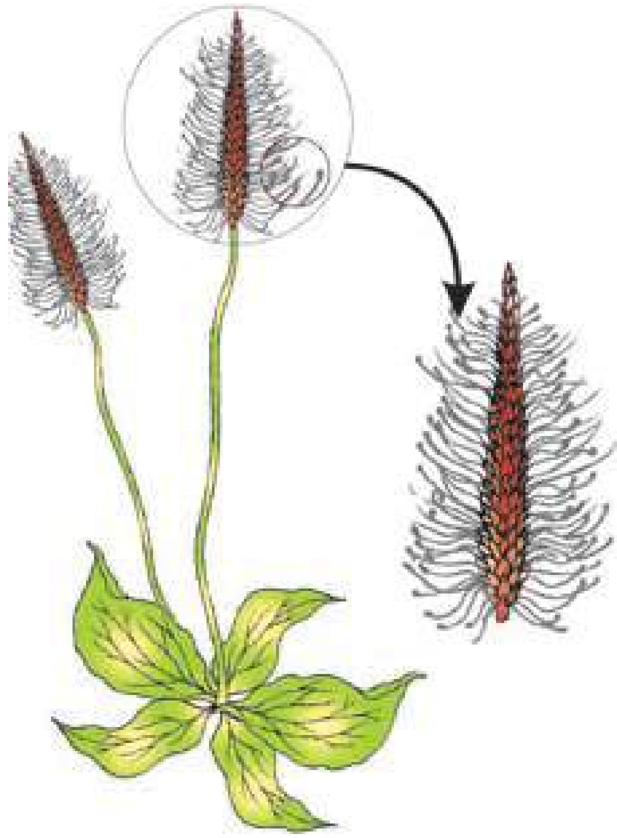

চিত্র 2.10 একটি বায়ুপরাগী উদ্ভিদের ঘনবিন্যস্ত পুষ্পবিন্যাস এবং সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত পুংকেশর দেখানো হয়েছে।

সপুষ্পক উদ্ভিদে জলের মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটার ঘটনা খুবই বিরল এবং এই প্রকার পরাগযোগ প্রায় 30 টি গণ-এ সীমাবদ্ধ ও এদের বেশিরভাগই একবীজপত্রী। বিপরীতভাবে বলতে গেলে, তোমরা মনে করে দেখ যে শৈবাল, ব্রায়োফাইট এবং টেরিডোফাইটের মত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে পুং গ্যামেটের স্থানান্তরণের সহায়ক একটি নিয়মিত মাধ্যম হল জল। বিশেষত কিছু ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাস করা হয় যে পুং গ্যামেটের স্থানান্তরণ এবং নিষেকের জন্য জলের প্রয়োজন হয় বলে এদের বিস্তার সীমিত। কিছু জল পরাগী উদ্ভিদের উদাহরণ হল স্বাদু জলে জন্মানো Vallisneria ও Hydrilla এবং বহু সামুদ্রিক ঘাস যেমন Zostera। সব জলজ উদ্ভিদেই জলের মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটে না। কচুরিপানা ও শাপলার মত বেশিরভাগ জলজ উদ্ভিদের ফুলগুলোই জলস্তরের উপরে অবস্থান করে এবং বেশিরভাগ স্থলজ উদ্ভিদের মতই পতঙ্গ বা বায়ুর মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটে। Vallisneria- এর স্ত্রী ফুলটি দীর্ঘ বৃন্তের সাহায্যে জলের উপরিতলে পৌঁছায় এবং পুরুষ ফুলগুলো বা পরাগরেণুগুলো মুক্ত হয়ে জলের উপরিতলে পৌঁছায়। এগুলো জলস্রোতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাহিত হয় (চিত্র 2.11 ক); পরাগরেণুগুলোর মধ্যে কিছু পরাগরেণু অবশেষে স্ত্রী ফুলে এবং গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। অপর এক গোষ্ঠীভুক্ত জলপরাগী উদ্ভিদ যেমন সামুদ্রিক ঘাসের স্ত্রী ফুলগুলো জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে এবং পরাগরেণুর নির্গমন জলের ভেতরে ঘটে। এ ধরনের বহু প্রজাতির পরাগরেণুগুলো দীর্ঘ ফিতের মতো হয় এবং এগুলো জলের ভেতরে নিষ্ক্রিয়ভাবে বাহিত হয়; এদের মধ্যে কিছু পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পৌঁছায় এবং পরাগযোগ সম্পন্ন করে। বেশিরভাগ জলপরাগী উদ্ভিদ প্রজাতির পরাগরেণুগুলোই মিউসিলেজ আবরণী দ্বারা আবৃত থাকায় সিক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। বায়ু ও জলপরাগী উভয় ধরনের ফুলগুলোই খুব একটা রঙীন হয়না এবং মকরন্দ তৈরি করে না। এর কারণ কী হতে পারে?

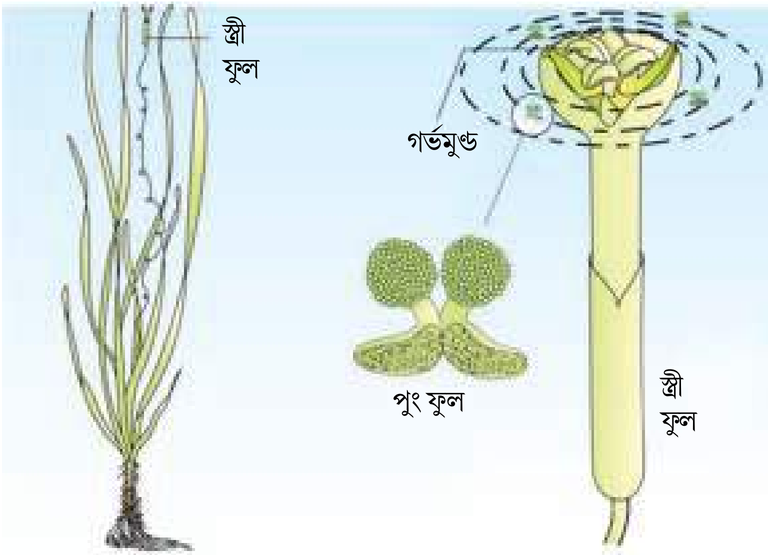

(ক)

(খ)

চিত্র 2.11 (ক) *Vallisneria*-তে জলের মাধ্যমে পরাগযোগ
(খ) পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগযোগ

ব্যাপক পরিসরে প্রাণীরা বেশিরভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদে পরাগযোগের বাহকরূপে কাজ করে। পরাগযোগের বাহকরূপে কাজ করে এমন কিছু অতি পরিচিত প্রাণী হল মৌমাছি, প্রজাপতি, মাছি গুবরে পোকা, বোলতা, পিঁপড়া, মথ, পাখি (সানবার্ড ও হামিং বার্ড) এবং বাদুড় (চিত্র 2.11 খ)। প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গশ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা, বিশেষত, মৌমাছিরা হল প্রধান জীবজ পরাগ বাহক। এমনকি বৃহদাকার প্রাণীসমূহ যেমন কিছু প্রাইমেট (লেমুর), আরবোরিয়েল (বৃক্ষবাসী) ইঁদুরে মত তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ রোডেন্টস বা এমনকি সরিসৃপও (গেছো টিকটিকি এবং বাগানের টিকটিকি) কিছু উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে পরাগ বাহক হিসাবে কাজ করে।

প্রায়শই প্রাণীপরাগী উদ্ভিদের ফুলগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণীর জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়। বেশিরভাগ পতঙ্গপরাগী ফুলগুলো বড় আকৃতির, বর্ণময়, সুগন্ধযুক্ত এবং মকরন্দ সমৃদ্ধ হয়। যখন ফুলগুলো ছোট আকারের হয়, তখন এইরূপ কিছু সংখ্যক ফুল গুচ্ছবন্ধ হয়ে পুষ্পমঞ্জরি গঠন করে এবং এর ফলে ফুলগুলো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীরা ফুলের বর্ণ ও গন্ধের জন্য এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে ফুলগুলোতে মাছি এবং গুবরে পোকার মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটে সেই ফুলগুলো ঐ প্রাণীদের আকৃষ্ট করতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ফুলের উপর পরাগ বাহক প্রাণীর বসা সুনিশ্চিত করতে ফুলগুলোর প্রাণীদেরকে বেশ কিছু পুরস্কার দিতে হয়। প্রাণীরা ফুল থেকে সাধারণত যে পুরস্কারগুলো পায় সেগুলো হল মকরন্দ ও পরাগরেণু। প্রাণীরা ফুল থেকে যে পুরস্কার লাভ করে তা সংগ্রহ করার জন্য আগন্তুক প্রাণীরা পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে। পরাগবাহক প্রাণীদের দেহকে ঘিরে পরাগরেণুর একটি আস্তরণ তৈরি হয়। প্রাণী পরাগী ফুলের ক্ষেত্রে এই পরাগরেণুগুলো সাধারণত চটচটে হয়। যখন পরাগবাহী প্রাণীর দেহের সাথে যুক্ত পরাগরেণুগুলো গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে তখনই পরাগযোগ ঘটে।

কিছু উদ্ভিদ প্রজাতির ফুল পরাগবাহকদেরকে পুরস্কার হিসাবে ডিম পাড়ার জন্য সুরক্ষিত স্থান প্রদান করে; এর একটি উদাহরণ হল Amorphophallus-এর দীর্ঘতম ফুল (ফুলটির দৈর্ঘ্য প্রায় 6 ফুট হয়)। মথের একটি প্রজাতি ও Yucca নামক উদ্ভিদের মধ্যে এই একই ধরনের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে মথ ও উদ্ভিদ উভয় প্রজাতিই একে অপরে সাহায্য ছাড়া তাদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

মথটি ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠে ডিম পাড়ে এবং পরিবর্তে ফুলটিতে মথের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটে। বীজের বিকাশ শুরুর সাথে সাথে ঐ ডিমগুলো থেকে মথের লার্ভা বেরিয়ে আসে।

তোমরা নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহ যেমন, শশা, আম, বট, ধনিয়া, পেঁপে, পেঁয়াজ, সীম, তুলো, তামাক, গোলাপ, লেবু, ইউক্যালিপটাস, কলা (বা তোমাদের কাছাকাছি উপলব্ধ অন্য কোনো উদ্ভিদ) ইত্যাদির ফুলগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছো না কেন? কোন্ প্রাণীগুলো এই ফুলগুলোতে বসে এবং তারা পরাগবাহক কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। তোমাদেরকে ধৈর্য্য সহকারে কিছু দিন ধরে এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে ফুলগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তোমরা এও দেখার চেষ্টা করতে পারো যে একটি ফুল এবং যে প্রাণীটি সেই ফুলের উপর বসে উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে কিনা। ফুলের উপর বসে এমন প্রাণীগুলোর মধ্যে কোনো প্রাণী পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসছে কিনা তা যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ কর, কারণ কেবলমাত্র এ ধরনের প্রাণীরাই পরাগযোগ ঘটাতে পারে। এমন বহু পতঙ্গ রয়েছে যারা পরাগযোগে সাহায্য করে না কিন্তু মকরন্দ ভক্ষণ করে ফেলে। ফুল ভ্রমণকারী এ ধরনের প্রাণীদের পরাগ/মকরন্দ চোর (robbers) বলে। তোমরা হয়ত পরাগবাহকদের শনাক্তকরণে সক্ষম হতে পারো বা নাও হতে পারো, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতভাবে তোমাদের এই প্রচেষ্টাটিকে উপভোগ করবে!

বহিঃপ্রজনন কৌশলসমূহ (Outbreeding Devices): বেশিরভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদেই উৎপন্ন ফুলগুলো উভলিঙ্গ হয় এবং পরাগরেণুগুলো সম্ভবত একই ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে। ক্রমাগত স্বপরাগযোগের ফলে অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্ব-পরাগযোগ প্রতিহত করতে ও ইতর পরাগযোগে উৎসাহ যোগাতে সপুষ্পক উদ্ভিদে বহু কৌশলের সৃষ্টি হয়। কিছু প্রজাতিতে পরাগ নির্গমণ ও গর্ভমুণ্ডের ধারণক্ষম হওয়া এই দুটি ঘটনা সমকালীন হয় না অর্থাৎ একই সময়ে ঘটে না। হয় গর্ভমুণ্ড ধারণক্ষম হওয়ার আগেই পরাগ নির্গমন ঘটে নতুবা পরাগ নির্গমণের বহু আগেই গর্ভমুণ্ড ধারণক্ষম হয়ে যায়। অন্য কিছু প্রজাতিতে, পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড ভিন্ন অবস্থানে থাকায় পরাগরেণুগুলো একই ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসতে পারে না। উভয় কৌশলই অটোগ্যামিতে বাধাদান করে। অন্তঃপ্রজনন প্রতিরোধে তৃতীয় কৌশলটি হল স্ব-অসংগতি (Self- incompatibility)। এটি একটি জিনগত পদ্ধতি এবং এটি গর্ভকেশরে পরাগরেণুর অঙ্কুরণ বা পরাগ নালিকার বৃদ্ধিতে বাধা দিয়ে একই ফুলের পরাগরেণু (একই ফুল থেকে বা একই উদ্ভিদের ভিন্ন ফুল থেকে প্রাপ্ত) দ্বারা সেই ফুলের ডিম্বকের নিষিক্তকরণ প্রতিরোধ করে। স্ব-পরাগযোগ প্রতিরোধে অপর কৌশলটি হল একলিঙ্গ ফুলের সৃষ্টি হওয়া। যদি একই উদ্ভিদে যেমন রেড়ি ও ভুট্টায় (সহবাসী) পুং এবং স্ত্রী উভয় ধরনের ফুলই ফোটে তবে তা অটোগ্যামিতে বাধা দেয় কিন্তু গেইটোনোগ্যামিতে বাধা দেয় না। পেঁপের মতো বহু প্রজাতির ক্ষেত্রে পুং এবং স্ত্রী ফুলগুলো ভিন্ন উদ্ভিদে ফোটে অর্থাৎ প্রতিটি উদ্ভিদ হয় পুরুষ উদ্ভিদ বা স্ত্রী উদ্ভিদ (Dioecy)। এই অবস্থাটি অটোগ্যামি ও গেইটোনোগ্যামি উভয় ক্ষেত্রেই বাধাদান করে।

পরাগ-গর্ভকেশর আন্তঃক্রিয়া (Pollen-pistil interaction): পরাগযোগ সঠিক ধরনের পরাগরেণু স্থানান্তরণকে সুনিশ্চিত করে না (গর্ভমুণ্ডের প্রজাতির সাথে সংগতিপূর্ণ পরাগরেণু)। প্রায়শই ভিন্ন প্রজাতি থেকে বা একই উদ্ভিদ থেকে আগত (যদি তা স্ব-অসংগতিপূর্ণ হয়) গর্ভমুণ্ডের জন্য সঠিক নয় এমন পরাগরেণুও সেই গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। পরাগরেণুটি সঠিক ধরনের (সামঞ্জস্যপূর্ণ) কিনা বা সঠিক নয় এমন ধরনের (অসামঞ্জস্যপূর্ণ) কিনা তা শনাক্ত করার ক্ষমতা গর্ভকেশরের রয়েছে। যদি পরাগরেণুটি সঠিক ধরনের হয় তবে গর্ভকেশর পরাগরেণুটিকে গ্রহণ করবে এবং এর পরাগযোগ পরবর্তী ঘটনাবলী উদ্দীপিত করবে, যার ফলশ্রুতিতেই নিষেক প্রক্রিয়াটি ঘটে। যদি পরাগরেণুটি সঠিক ধরনের না হয় তাহলে গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরণে বা গর্ভদণ্ডে পরাগনালির বৃদ্ধিতে বাধা দিয়ে গর্ভকেশরটি পরাগরেণুটিকে বর্জন করবে।

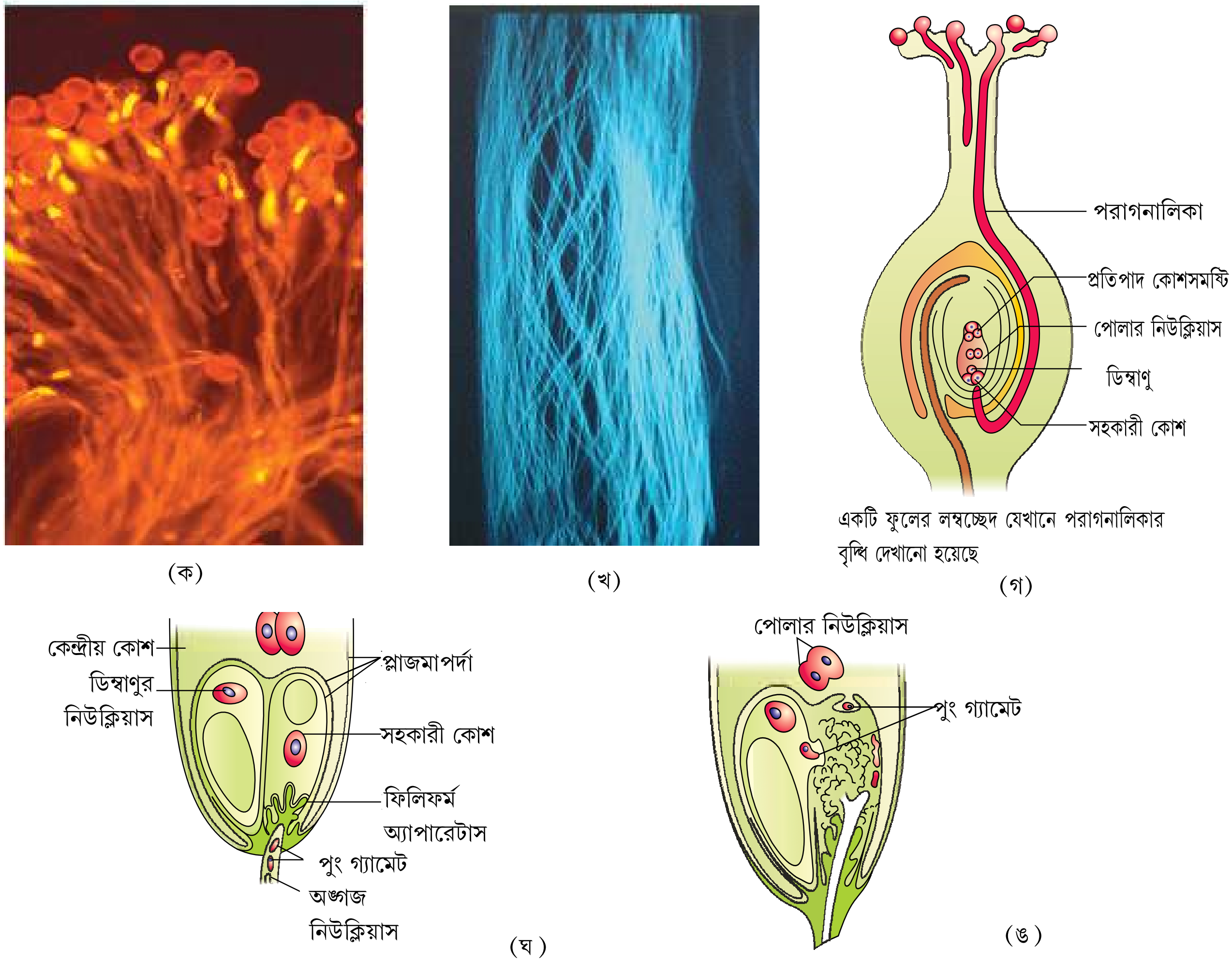

চিত্র 2.12 (ক) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরণ (খ) গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে পরাগনালির বৃদ্ধি (গ) গর্ভকেশরের লম্বচ্ছেদ যেখানে পরাগনালির বৃদ্ধির অভিমুখ দেখানো হয়েছে (ঘ) ডিম্বক যন্ত্রের বিবর্ধিত দৃশ্য যেখানে সহকারী কোশে পরাগনালির প্রবেশ দেখানো হয়েছে (ঙ) একটি সহকারী কোশে পুং গ্যামেটসমূহের নির্গমণ এবং শুক্রাণুসমূহের চলন, এদের একটি ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে এবং অপরটি কেন্দ্রীয় কোশের সাথে মিলিত হয়।

গর্ভকেশরের পরাগরেণু শনাক্তকরণের ক্ষমতা এবং পরবর্তীকালে এর গ্রহণ বা বর্জন হল পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের মধ্যে অবিরাম বার্তাবিনিময়ের ফলশ্রুতি। ঐ সকল গর্ভকেশরের সাথে আন্তঃক্রিয়ারত পরাগরেণুর রাসায়নিক উপাদানগুলো এই বার্তাবিনিময়ে মধ্যস্থতা করে। কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতেই উদ্ভিদবিদগণ কিছু পরাগরেণু এবং গর্ভকেশরের উপাদানসমূহ এবং তাদের আন্তঃক্রিয়ার ফলে পরাগরেণুর স্বীকৃতি ও পরবর্তীতে এদের গ্রহণ বা বর্জন সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংগতিপূর্ণ পরাগযোগের পর রেণুরন্ধ্রগুলোর যে কোনো একটির মধ্য দিয়ে পরাগনালি তৈরি করার জন্য গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরণ ঘটে (চিত্র 2.12 ক)। পরাগরেণু মধ্যস্থ বস্তুসমূহ পরাগনালিতে স্থানান্তরিত হয়।

পরাগনালিকা, গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ডের কলাসমূহের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায় এবং গর্ভাশয়ে পৌঁছায় (চিত্র 2.12 খ, গ)। তোমরা মনে করতে পারবে যে কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলো তাদের দ্বি-কোশীয় দশায় পরাগধানী থেকে নির্গত হয় (একটি অঙ্গজ কোশ ও একটি জেনারেটিভ কোশ)। এ ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গর্ভমুণ্ডে পরাগনালির বৃদ্ধি চলাকালে জেনারেটিভ কোশটি বিভাজিত হয়ে দুটি পুং গ্যামেট সৃষ্টি করে। যে সব উদ্ভিদে পরাগরেণুর নির্গমণ পরাগরেণুগুলোর তিন-কোশীয় দশায় ঘটে সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরাগযোগের পূর্বেই পুং গ্যামেট দুটি গঠিত হয় এবং তাই শুরু থেকেই পরাগনালিকা দুটো পুং গ্যামেট বহন করে। গর্ভাশয়ে পৌঁছানোর পর পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে এবং এরপর ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাসের মধ্য দিয়ে একটি সহকারী কোশে প্রবেশ করে (চিত্র 2.12 ঘ, ঙ)। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে উপস্থিত সহকারী কোশগুলো থেকে সৃষ্ট ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস পরাগনালির প্রবেশের অভিমুখ নির্দেশ করে। গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর জমা হওয়া থেকে শুরু করে ডিম্বকে পরাগনালির প্রবেশ পর্যন্ত এই সব ঘটনাবলীকেই একসাথে পরাগ গর্ভকেশর আন্তঃক্রিয়ারূপে উল্লেখ করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে পরাগ-গর্ভকেশর আন্তঃ ক্রিয়া হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যেখানে পরাগরেণুর শনাক্তকরণের পর পরাগরেণুর অঙ্কুরণ ঘটে বা অঙ্কুরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান উদ্ভিদ প্রজননকারীদের পরাগ-গর্ভকেশর আন্তঃ ক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটাতে, এমনকি অসংগতিপূর্ণ পরাগযোগের ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত সংকর উদ্ভিদ লাভ করতে সাহায্য করবে।

একটি কাঁচের স্লাইডের ওপর একফোঁটা শর্করার দ্রবণ (প্রায় 10 শতাংশ) নিয়ে এর উপর মটর, ছোলা, অতসী, উচ্ছে এবং মালতি-এর মত উদ্ভিদের ফুল থেকে কিছু পরাগরেণু ঝেড়ে নেওয়া হল এবং এইভাবে তোমরা সহজেই পরাগরেণুর অঙ্কুরণ অধ্যয়ন করতে পারবে। প্রায় 10-30 মিনিট পর স্লাইডটিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কম বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কর। তোমরা সম্ভবত পরাগরেণু থেকে যে পরাগনালি বেরিয়ে এসছে তা দেখতে পাবে।

উদ্ভিদ প্রজনন (plant breeding) সম্বন্ধীয় অধ্যায়টিতে (অধ্যায় 9) তোমরা জানবে যে ইপ্সিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাণিজ্যিকভাবে উচ্চগুণমানসম্পন্ন ভ্যারাইটি উৎপন্ন করার জন্য প্রজননবিদরা ভিন্ন প্রজাতি এবং এমনকি ভিন্নগণের উদ্ভিদের মধ্যেও সংকরায়ণ ঘটাতে আগ্রহী। শস্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপায়গুলোর মধ্যে একটি মূখ্য উপায় হল কৃত্রিম সংকরায়ণ (Artificial hybridisation)। এ ধরনের সংকরায়ণ পরীক্ষাগুলোতে এটি সুনিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরাগযোগের জন্য কেবলমাত্র কাঙ্ক্ষিত পরাগরেণুগুলোই ব্যবহৃত হবে এবং গর্ভমুণ্ডটি দূষিতকরণের হাত থেকে (অবাঞ্ছিত পরাগরেণু থেকে) সুরক্ষিত থাকবে। ইমাসকুলেশন এবং ব্যাগিং কৌশলের সাহায্যে কৃত্রিম সংকরায়ণ সম্ভবপর হয়।

যদি স্ত্রী জনিতৃ উদ্ভিদটি উভয়লিঙ্গ ফুল ধারণ করে তবে পরাগধানীর বিদারনের পূর্বেই পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত চিমটা বা ফরসেপের সাহায্যে পুষ্পমুকুল থেকে পরাগধানীর অপসারণ প্রয়োজন। এই ধাপটিকেই ইমাসকুলেশন (emasculation) বলা হয়। অবাঞ্ছিত পরাগরেণু দ্বারা ইমাসকুলেশন করা ফুলগুলোর গর্ভমুণ্ডের দূষিতকরণ ঠেকাতে ফুলগুলোকে সাধারণত তৈলাক্ত কাগজ দ্বারা তৈরি উপযুক্ত আকারের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাগিং (bagging) বলা হয়। যখন ব্যাগিং করা ফুলের গর্ভমুণ্ডটি পরাগরেণু ধারণে সক্ষম হয় তখন পুং জনিতৃ উদ্ভিদের পরাগধানী থকে সংগৃহীত পরিণত পরাগরেণুগুলো গর্ভমুণ্ডে ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং ফুলগুলোকে পুনরায় আবৃত করা হয় এবং ফল গঠন শুরু হতে দেওয়া হয়।

স্ত্রী জনিতৃ উদ্ভিদটি একলিঙ্গ ফুল উৎপন্ন করলে ইমাসকুলেশনের কোনো প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী পুষ্পমুকুলটিকে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই আবৃত করে ফেলা হয়। গর্ভমুণ্ডটি ধারণক্ষম হলে কাঙ্ক্ষিত পরাগ দ্বারা পরাগযোগ ঘটানো হয় এবং ফুলটিকে পুরনায় আবৃত করে রাখা হয়।

2.3 দ্বি-নিষেক (Double Fertilisation)

একটি সহকারী কোশে প্রবেশ করার পর, পরাগনালিটি থেকে দুটি পুং গ্যামেট সহকারী কোশের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হয়। দুটি পুং গ্যামেটের মধ্যে একটি পুং গ্যামেট ডিম্বাণুর দিকে অগ্রসর হয় এবং এর নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এবং এইভাবে সিনগ্যামি সম্পন্ন করে। এর ফলে একটি ডিপ্লয়েড কোশ অর্থাৎ জাইগোট গঠিত হয়। অপর পুং গ্যামেটটি কেন্দ্রীয় কোশস্থিত দুটি পোলার নিউক্লিয়াসের দিকে অগ্রসর হয় এবং এদের সাথে মিলিত হয়ে একটি ট্রিপ্লয়েড প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস বা প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস (PEN) গঠন করে (চিত্র 2.13 ক)। যেহেতু এক্ষেত্রে তিনটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে তাই একে ট্রিপল ফিউশন বলে। যেহেতু, সিনগ্যামি এবং ট্রিপল ফিউশন এই দুই ধরনের মিলন একটি ভ্রূণস্থলীতেই ঘটে, তাই এই ঘটনাটিকে দ্বি-নিষেক (double fertilisation) বলে যা সপুষ্পক উদ্ভিদে সংগঠিত একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। ট্রিপল ফিউশনের পর কেন্দ্রীয় কোশটি প্রাথমিক সস্য কোশ বা প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম সেল (PEC) গঠন করে এবং সস্যে পরিণত হয়। অন্যদিকে, জাইগোট থেকে ভ্রূণ গঠিত হয়।

চিত্র 2.13 (ক) নিষিক্ত ভ্রূণস্থলীতে জাইগোট এবং প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস বা প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস (PEN) দেখানো হয়েছে। (খ) একটি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে ভ্রূণের বিকাশের দশাসমূহ (চিত্র (ক)-এর তুলনায় ছোট আকারে দেখানো হয়েছে।)

2.4 নিষেক পরবর্তী গঠন ও ঘটনাসমূহ (Post-fertilisation Structures and Events)

দ্বি-নিষেকের পর সস্য ও ভ্রূণের বিকাশ, ডিম্বকের বীজে পরিণত হওয়া এবং গর্ভাশয় থেকে ফলের সৃষ্টি এই ঘটনাগুলোকে একত্রে নিষেক-পরবর্তী ঘটনাবলিরূপে গণ্য করা হয়।

2.4.1 সস্য (Endosperm)

সস্য গঠিত হওয়ার পূর্বেই ভ্রূণ গঠিত হয় কেন? প্রাথমিক সস্য কোশটি বারবার বিভাজিত হয় এবং একটি ট্রিপ্লয়েড সস্য কলা গঠন করে। এই কলার কোশগুলো সঞ্চিত খাদ্য উপাদান দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং

বর্ধনশীল ভ্রূণে পুষ্টি যোগাতে ব্যবহৃত হয়। সস্য গঠনের সর্বাধিক পরিচিত ধরনটিতে PEN ক্রমাগত নিউক্লিয়ার বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউক্লিয়াসমূহের সৃষ্টি করে। সস্য গঠনের এই ধাপটিকে মুক্ত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সস্য (free nuclear endosperm) বলে। এর পর পরই কোশপ্রাচীর গঠিত হয় এবং সস্য কোশীয় গঠনবিশিষ্ট হয়। কোশীয় গঠন লাভ করার পূর্বে সৃষ্ট মুক্ত নিউক্লিয়াসের সংখ্যার ব্যাপক তারতম্য ঘটে। কচি নারিকেল বা ডাব থেকে পাওয়া নারিকেল জলের সাথে তোমরা পরিচিত আছো। এই নারিকেল জল মুক্ত সস্য নিউক্লিয়াস ছাড়া আর কিছুই না (হাজার হাজার মুক্ত নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত) এবং চারপাশের সাদা শাঁসটি (kernel) হল কোশীয় সস্য।

বীজ পরিণমনের পূর্বেই বর্ধনশীল ভ্রূণ দ্বারা সস্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে (উদাহরণ, মটর, বাদাম, ধান) বা পরিণত বীজে থেকেও যেতে পারে (উদাহরণ, রেড়ি ও নারিকেল) যা বীজের অঙ্কুরোদগমকালে ব্যবহৃত হয়। রেড়ি, মটর, বীন, বাদামের কিছু বীজ এবং নারিকেলের ফলকে ফাটিয়ে উন্মুক্ত কর এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সস্যটিকে লক্ষ কর। গম, ধান এবং ভুট্টার মতো দানাশস্যে শস্য স্থায়ীভাবে রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের কর।

2.4.2 ভ্রূণ (Embryo)

ভ্রূণস্থলীর ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে, যেখানে জাইগোটটি রয়েছে সেখানেই এই জাইগোটটি থেকে ভ্রূণ গঠিত হয়। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ সস্য গঠিত হওয়ার পরই বেশিরভাগ জাইগোট বিভাজিত হয়। বর্ধনশীল ভ্রূণে পুষ্টির যোগান সুনিশ্চিত করতে এই অভিযোজনটি ঘটে। বীজগুলোতে ব্যাপক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক দশাগুলো (ভ্রূণের পরিস্ফুরণ) একবীজপত্রী ও দ্বিবজীপত্রী উভয় ধরনের উদ্ভিদগুলোর ক্ষেত্রে একই। চিত্র 2.13 -তে একটি দ্বি-বীজপত্রী ভ্রূণের পরিস্ফুরণের দশাগুলো দেখানো হয়েছে। জাইগোট থেকে আদি ভ্রূণ (proembryo) গঠিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে এর থেকে গোলাকার, হৃৎপিণ্ডের আকৃতির এবং পরিণত ভ্রূণ গঠিত হয়।

একটি আদর্শ দ্বি-বীজপত্রী ভ্রূণ (চিত্র 2.14 ক) একটি ভ্রূণাক্ষ এবং দুটি বীজপত্র নিয়ে গঠিত হয়। ভ্রূণাক্ষের যে অংশটি বীজপত্রসমূহের উপরের স্তরে অবস্থান করে তাকে বীজপত্রাধিকাণ্ড (epicotyl) বলে যা ভ্রূণমুকুল (plumule) বা কাণ্ডের শীর্ষভাগ গঠন করে। বীজপত্রের নিচের স্তরে অবস্থিত বেলনাকার অংশটি হল বীজপত্রকাণ্ড (Hypocotyl) যার নিম্নপ্রান্তটি ভ্রূণমূল (radicle) বা মূলাগ্র গঠন করে। মূলের শীর্ষ ভাগটি মূলত্র দ্বারা আবৃত থাকে।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণ (চিত্র 2.14 খ) কেবলমাত্র একটি বীজপত্রবিশিষ্ট হয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের গোত্রে যে বীজপত্রটি গঠিত হয় তাকে স্কুটেলাম (Scutellum) বলে যা ভ্রূণাক্ষের এক দিকে (পার্শ্ব অভিমুখে) অবস্থান করে। ভ্রূণাক্ষের নিম্নপ্রান্তে ভ্রূণমূল এবং মূলত্র রয়েছে যা ভ্রূণমূলাবরণী নামক একটি অবিভেদিত পর্দা দ্বারা পরিবৃত থাকে। ভ্রূণাক্ষের যে অংশটি স্কুটেলামের সংযোগস্থলের উপরের স্তরে অবস্থান করে তা হল বীজ পত্রাধিকাণ্ড। বীজপত্রাধিকাণ্ডে একটি বিপট শীর্ষ

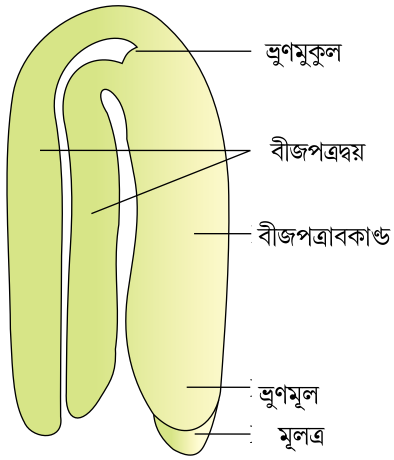

(ক)

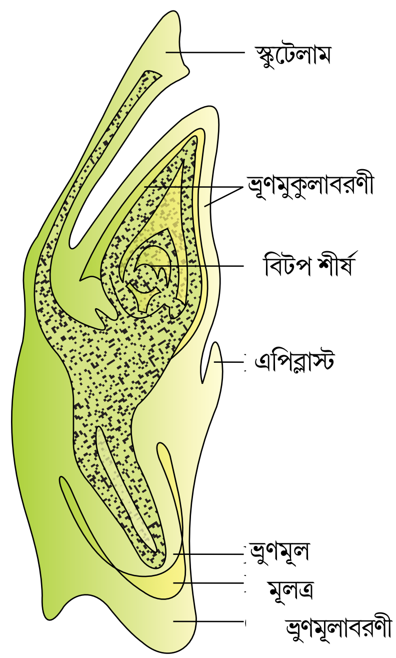

(খ)

চিত্র 2.14 (ক) একটি আদর্শ দ্বি-বীজপত্রী ভ্রূণ (খ) ঘাসের ভ্রূণের লম্বচ্ছেদ

এবং কিছু পত্র গঠনকারী কোশীয় উপবৃদ্ধি (Leaf Primordia) থাকে যা একটি ফাঁপা পত্রজ গঠন দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই ফাঁপা পত্রজ গঠনটিকে ভ্রূণমুকুলাবরণী (Coleoptile) বলে।

কিছু বীজ (যেমন গম, ভুট্টা, মটর, ছোলা, বাদাম) সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখ। তারপর বীজগুলোকে বিদীর্ণ কর এবং ভ্রূণ ও বীজের বিভিন্ন অংশগুলোকে পর্যবেক্ষণ কর।

2.4.3 বীজ (Seed)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে যৌন জননের ফলে উৎপন্ন সর্বশেষ বস্তুটি হল বীজ। একে প্রায়শই একটি নিষিক্ত ডিম্বকরূপে বর্ণনা করা হয়। বীজগুলো ফলের অভ্যন্তরে গঠিত হয়। একটি আদর্শ বীজ, বীজত্বক, বীজপত্র এবং ভ্রূণাক্ষ নিয়ে গঠিত হয়। ভ্রূণের বীজপত্রগুলো (চিত্র 2.15 ক) সরল গঠনবিশিষ্ট হয় এবং খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ের ফলে সাধারণত পুরু এবং স্ফীত হয় (যেমন শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে)। পরিণত বীজগুলো অসস্যল বা সস্যল হতে পারে। অসস্যল (Non-albuminous) বীজগুলোতে ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে সস্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ায় বীজে কোনো সস্য অবশিষ্ট থাকে না (উদাহরণ, মটর, বাদাম, সূর্যমুখী)। সস্যল (Albunious) বীজগুলোতে ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে সস্য সম্পূর্ণ ব্যহৃত না হওয়ায় বীজগুলোতে কিছু পরিমাণ সস্য অবশিষ্ট থেকে যায় (উদাহরণ গম, ভুট্টা, বার্লি, রেড়ি)। কখনো কখনো গোলমরিচ ও বীটের মত কিছু উদ্ভিদের বীজে ভ্রূণপোষক কলার অবশিষ্টাংশও থেকে যায়। এই অবশিষ্ট, স্থায়ী ভ্রূণপোষক কলাকে পেরিস্পার্ম (Perisperm) বলে।

ডিম্বকের ডিম্বকত্বকগুলো শক্ত ও দৃঢ় হয়ে সুরক্ষাপ্রদানকারী বীজত্বকে পরিণত হয় (চিত্র 2.15 ক)। ডিম্বকরন্ধ্রটি বীজত্বকে একটি ছোট ছিদ্র হিসাবে থেকে যায়। এই ডিম্বকরন্ধ্র অঙ্কুরোদগমকালে বীজের অভ্যন্তরে অক্সিজেন ও জলের প্রবেশে সহায়তা করে। বীজ পরিণত হওয়ার সাথে সাথে এতে জলের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং বীজসমূহ তুলনামূলকভাবে শুষ্ক হয়ে পড়ে (ভরের 10-15 শতাংশ অর্দ্রতাসম্পন্ন)। ভ্রূণের স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার হার হ্রাস পায়। ভ্রূণটি একটি নিষ্ক্রিয় দশায় প্রবেশ করতে পারে, যাকে সুপ্ত দশা (Dormancy) বলে বা অনুকূল পরিবেশে (পর্যাপ্ত আর্দ্রতা, অক্সিজেন এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা) এদের অঙ্কুরণ ঘটে।

ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় অর্থাৎ ডিম্বকসমূহের বীজে রূপান্তরিত হওয়া এবং গর্ভাশয়ের ফলে পরিণত হওয়ার ঘটনা একই সাথে ঘটে। গর্ভাশয়ের প্রাচীর থেকে ফলের প্রাচীর অর্থাৎ পেরিকার্প গঠিত হয়। ফলগুলো রসালো (পেয়ারা, কমলালেবু, আম ইত্যাদির ফল) বা শুষ্ক (বাদাম এবং সরিষা ইত্যাদির ফল) হতে পারে। বীজের বিস্তারের জন্য বহু ফলে বহু পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা ফলের শ্রেণিবিন্যাস ও সেগুলোর বিস্তারের পদ্ধতি সম্পর্কে যা অধ্যয়ন করেছো সেগুলো মনে কর। *একটি ডিম্বাশয়ে ডিম্বকের সংখ্যা এবং একটি ফলে উপস্থিত বীজের সংখ্যার মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি?*

বেশিরভাগ উদ্ভিদেই ডিম্বাশয় থেকে ফল গঠিত হওয়ার সময় ফুলের অন্যান্য অংশগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং ঝড়ে পড়ে। তবে আপেল, স্ট্রবেরী, কাজুবাদাম ইত্যাদির মত কিছু প্রজাতির উদ্ভিদে পুষ্পাক্ষও ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের ফলগুলোকে অপ্রকৃত ফল (False fruit) বলে (চিত্র 2.15 খ)। যদিও বেশিরভাগ প্রজাতিতে নিষেকের ফলেই ফল গঠিত হয়। তবে এমন কিছু প্রজাতিও রয়েছে যেখানে নিষেক ছাড়াই ফল গঠিত হয়।

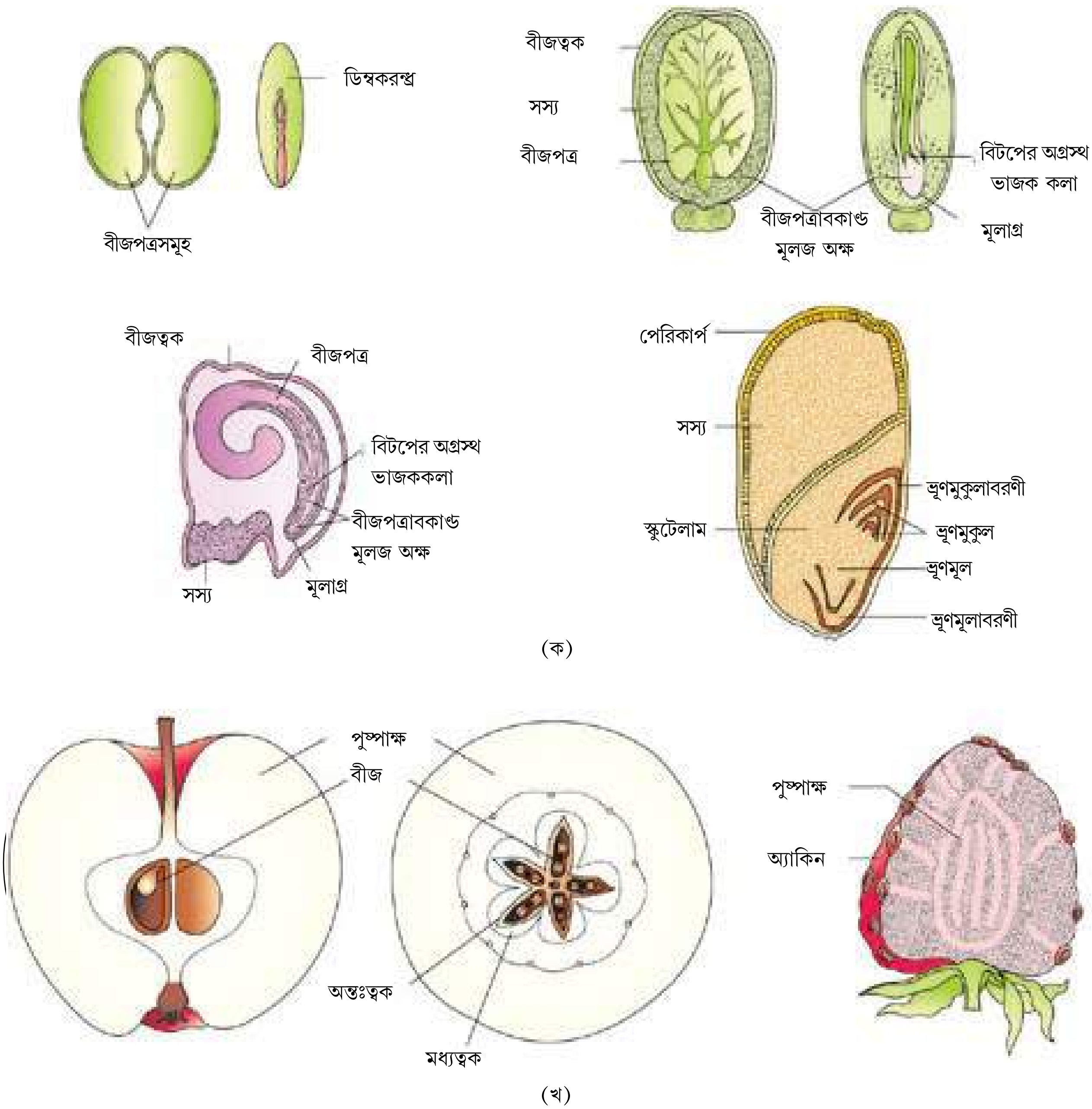

চিত্র 2.15 (ক) কিছু বীজের গঠন (খ) আপেল ও স্ট্রবেরী-এর অপ্রকৃত ফল

এ ধরনের ফলগুলোকে পার্থেনোকার্পিক ফল (Parthenocarpic fruit) বলে। এমন একটি ফলের উদাহরণ হল কলা। বৃদ্ধি হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে পার্থেনোকার্পিকে উদ্দীপিত করা যেতে পারে এবং এ ধরনের ফলগুলো বীজবিহীন হয়।

বীজ গঠিত হওয়ায় গুপ্তবীজী উদ্ভিদ বহু সুবিধা লাভ করে। প্রথমতঃ জনন প্রক্রিয়াগুলো যেমন পরাগযোগ ও নিষেক জল-নির্ভর প্রক্রিয়া না হওয়ায়, বীজ গঠন প্রক্রিয়াটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়। এছাড়াও নতুন আবাসস্থলগুলোতে বিস্তার লাভের জন্য বীজসমূহে অধিকতর উন্নত অভিযোজনগত কৌশলও দেখা যায় এবং তা প্রজাতিসমূহকে অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে বসতি গঠনে সাহায্য করে। বীজে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত

খাদ্য থাকায় বীজ কচিচারাগাছগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত এরা নিজে থেকে সালোকসংশ্লেষে সক্ষম হয়। শক্ত বীজত্বক তরুণ ভ্রূণটিকে সুরক্ষা প্রদান করে। বীজ যৌন জনন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তু হওয়ায় এতে নতুন জিনগত সংমিশ্রণের সৃষ্টি হয় যার ফলে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে।

আমাদের কৃষিকার্যের ভিত্তি হল বীজ। পরিণত বীজের জল বিয়োজন এবং সুপ্তাবস্থা বীজের সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে বীজ সারা বছর ধরে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং পরবর্তী ঋতুতে শস্য উৎপাদনের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। তোমরা বীজের অনুপস্থিতিতে বা বীজ গঠনের পর পরই সরাসরি অঙ্কুরিত হয় এবং গুদামজাত করা যেতে পারে না এমন সব বীজ নিয়ে কৃষিকার্যের কথা ভাবতে পারো কি ?

বিস্তারের পর বীজগুলো কত সময় পর্যন্ত সজীব থাকতে পারে ? এই সময়কালও আবার ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়। কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে বীজগুলো কয়েক মাসের মধ্যেই এদের ক্রিয়াশীলতা হারিয়ে ফেলে। বহু সংখ্যক প্রজাতির বীজগুলোই বহু বছর পর্যন্ত সজীব থাকে। কিছু বীজ কয়েকশ বছর পর্যন্তও সজীব থাকতে পারে। বহু বছর পুরনো কিন্তু ক্রিয়াশীল এমন বীজের অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম বীজটি হল লুপিন (Lupinus arcticus) উদ্ভিদের বীজ, যা সুমেরুর তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে খননকালে পাওয়া গিয়েছিল। আনুমানিক 10,000 বছর সুপ্ত থাকার পর বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল এবং উৎপন্ন উদ্ভিদে ফুল ফুটেছে এমন তথ্য রয়েছে। মৃত সাগর (Dead sea) এর কাছাকাছি রাজা হেরোডস-এর প্রাসাদে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে খুঁজে পাওয়া খেজুর গাছের (Phoenix dactylifera) 2000 বছরের পুরোনো ক্রিয়াশীল বীজ হল এ ধরনের বীজ সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক তথ্য।

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জননের সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন শেষ করার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে কিছু সপুষ্পক উদ্ভিদের অত্যধিক প্রজনন ক্ষমতা বোঝার জন্য এটি একটি সার্থক প্রয়াস হবে ঃ একটি ভ্রূণস্থলীতে কতগুলো ডিম্বাণু উপস্থিত থাকে? একটি ডিম্বকে কতগুলো ভ্রূণস্থলী থাকে? একটি গর্ভাশয়ে কতগুলো ডিম্বক থাকে? একটি আদর্শ ফুলে কতগুলো গর্ভাশয় থাকে? একটি বৃক্ষে কতগুলো ফুল ফোটে? ইত্যাদি ইত্যাদি ...।

তোমরা কি এমন কিছু উদ্ভিদের কথা ভাবতে পারো যেগুলোর ফল বহু বীজবিশিষ্ট হয়। এজাতীয় একটি ফল হল অর্কিড এবং অর্কিডের প্রতিটি ফল হাজার হাজার ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত হয়। Orobanche ও Striga- এর মত কিছু পরজীবী প্রজাতির উদ্ভিদের ফলগুলোও একই ধরনের হয়। তোমরা কি Ficus অর্থাৎ বট জাতীয় বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র বীজ দেখেছো ? সেই ক্ষুদ্র বীজটি থেকে বিকশিত হওয়া Ficus উদ্ভিদে কত বিলিয়ন বীজ উৎপন্ন হয় ? তোমরা কি অন্য কোনো উদাহরণের কথা কল্পনা করতে পারো যেখানে এ ধরনের ক্ষুদ্র গঠন বছরের পর বছর ধরে এরূপ একটি বিশাল বায়োমাসের সৃষ্টি করে ?

2.5 অ্যাপোমিক্সিস এবং বহুভ্রূণতা (Apomixis and Polyembryony)

যদিও বীজ সাধারণত নিষেকের ফলে উৎপন্ন বস্তু, কিন্তু *Asteraceae* এবং ঘাসের মত কিছু প্রজাতির উদ্ভিদসমূহে নিষেক ছাড়াই বীজ উৎপাদনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে, একে অ্যাপোমিক্সিস বলে। নিষেক ছাড়াই ফলের উৎপাদনকে কী বলে ? তাই অ্যাপোমিক্সিস হল অযৌন জননের একটি ধরন যা যৌন জননকে অনুকরণ করে। অ্যাপোমিকটিক বীজ গঠনের বহু পন্থা রয়েছে। কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে , হ্রাস বিভাজন ছাড়াই ডিপ্লয়েড ডিম্বকোশ সৃষ্টি হয় এবং নিষেক ছাড়াই এই ডিম্বকোশটি থেকে ভ্রূণগঠিত হয়। প্রায়শই, *Citrus* ও আমের বহু ভ্যারাইটিতে ভ্রূণস্থলীর চারপাশে থাকা ভ্রূণপোষক কোশগুলোর মধ্যে কিছু কোশ বিভাজিত হতে শুরু করে এবং ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণ গঠন করে।

এ ধরনের প্রজাতিতে প্রতিটি ডিম্বক বহু ভ্রুণবিশিষ্ট হয়। একটি বীজে একাধিক ভ্রূণ উপস্থিত থাকলে তাকে বহুভ্রূণতা (Polyembryony) বলে। কমলার কিছু বীজ বের করে নাও এবং সেগুলোকে নিষ্পেষণ কর। প্রতিটি বীজ থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন আকার ও আকৃতির বহু সংখ্যক ভ্রূণকে পর্যবেক্ষণ কর। প্রতিটি বীজে উপস্থিত ভ্রূণের সংখ্যা গুণে নাও। অ্যাপোমিকটিক ভ্রূণের জিনগত প্রকৃতি কিরূপ হবে? এদেরকে ক্লোন বলা যেতে পারে কি?

আমাদের খাদ্যশস্য ও শাকসব্জির বহু হাইব্রিড বা সংকর ভ্যারাইটির ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। সংকর উদ্ভিদের চাষের ফলে উৎপাদন অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংকর উদ্ভিদ চাষের একটি অসুবিধা হল যে প্রতি বছরই সংকর বীজ উৎপন্ন করতে হয়। যদি সংকর উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত বীজগুলোকে বপন করা হয় তবে অপত্য জনুতে উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্যসমূহের পৃথকীভবন ঘটে এবং সংকর বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় থাকে না। সংকর বীজের উৎপাদন খুবই ব্যয়সাপেক্ষ এবং তাই কৃষকদের কাছে সংকর বীজের মূল্য খুবই বেশি। যদি এই হাইব্রিড উদ্ভিদগুলোকে অ্যাপোমিকটিক উদ্ভিদে পরিণত করা হয় তবে সংকর অপত্য জনুতে বৈশিষ্ট্যগুলোর পৃথকীভবন ঘটেনা। তখন কৃষকরা বছরের পর বছর ধরে নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য এই সংকর বীজগুলোর ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারে এবং কৃষককে প্রতি বছর সংকর বীজ কিনতে হয় না। সংকর বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে অ্যাপোমিক্সিসের গুরুত্ব থাকায়, অ্যাপোমিক্সিসের জিনতত্ত্ব বোঝার এবং সংকর প্রজাতিসমূহে অ্যাপোমিকটিক জিন স্থানান্তরণের জন্য সমগ্র বিশ্বের বহু পরীক্ষাগারে সক্রিয় গবেষণা চলছে।

সার সংক্ষেপ

ফুল হল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সেই অঙ্গ যেখানে যৌন জনন ঘটে। পুংকেশর সমন্বিত পুংস্তবক এবং গর্ভকেশর সমন্বিত স্ত্রীস্তবক হল যথাক্রমে ফুলের পুংজনন অঙ্গ ও স্ত্রী জনন অঙ্গ। একটি আদর্শ পরাগধানী দ্বিখণ্ডকযুক্ত, দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট এবং চারটি রেণুস্থলী সমন্বিত হয়। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ার ভেতরে পরাগরেণু গঠিত হয়। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামকে ঘিরে চারটি প্রাচীরস্তর থাকে এগুলো হল — বহিঃত্বক, এন্ডোথেসিয়াম, মধ্যস্তর এবং ট্যাপেটাম। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের কেন্দ্রস্থিত রেণুধারণ কলার কোশগলো মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে রেণুচতুষ্টয় সৃষ্টি করে। প্রতিটি একক পুংরেণু পরিণত হয়ে পরাগরেণু গঠন করে।

পরাগরেণুগুলো পুং লিঙ্গাধর জনুটিকে উপস্থাপন করে। পরাগরেণুগুলোর একটি দ্বি-স্তরী প্রাচীর রয়েছে, বাইরের দিকের রেণুবহিত্বক বা এক্সাইন এবং ভেতরের দিকের রেণুঅন্তঃত্বক বা ইন্টাইন। রেণুবহিঃত্বক বা এক্সাইন স্পোরোপোলেনিন দ্বারা গঠিত হয় এবং এতে রেণুরন্ধ্র রয়েছে। পরাগধানী থেকে পরাগরেণুর নির্গমনকালে এগুলো দুই কোশবিশিষ্ট (একটি অঙ্গজ কোশ এবং একটি জেনারেটিভ কোশ) বা তিন কোশবিশিষ্ট (একটি অঙ্গাজ কোশ এবং দুটি পুং গ্যামেট) হতে পারে।

গর্ভকেশর তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত — গর্ভমুণ্ড , গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয়। ডিম্বকগুলো গর্ভাশয়ে অবস্থান করে। ডিম্বকসমূহে একটি বৃন্ত, সুরক্ষা প্রদানকারী ডিম্বকত্বক এবং একটি রন্ধ্র রয়েছে। ডিম্বকস্থিত এই বৃন্ত ও রন্ধ্রকে যথাক্রমে ডিম্বকবৃন্ত ও ডিম্বকরন্ধ্র বলে। ডিম্বকের কেন্দ্রস্থিত কলাটি হল ভ্রূণপোষক কলা যেখানে আর্কেস্পোরিয়াম বিভেদিত হয়। আর্কেস্পোরিয়ামের একটি কোশ অর্থাৎ স্ত্রী-রেণুমাতৃকোশটি মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং উৎপন্ন স্ত্রীরেণুগুলোর মধ্যে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণস্থলী (স্ত্রি লিঙ্গাধর দেহ) গঠন করে। পরিণত ভ্রূণস্থলীটি 7 কোশীয় এবং 8 নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়। ডিম্বকের ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে দুটি সহকারী কোশ ও একটি ডিম্বাণু নিয়ে গঠিত গর্ভযন্ত্র রয়েছে।

ডিম্বকমূল প্রান্তে তিনটি প্রতিপাদ কোশসমষ্টি রয়েছে। ভ্রূণস্থলীর কেন্দ্রে দুটি পোলার নিউক্লিয়াস সমন্বিত একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় কোশ রয়েছে।

পরাগযোগ হল পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণু স্থানান্তরনের পদ্ধতি। পরাগ বাহকগুলো অজীবজ (বায়ু এবং জল) যা জীবজ (প্রাণী) প্রকৃতির হয়।

গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর পতিত হওয়া থেকে শুরু করে ভ্রূণস্থলীতে পরাগনালীর প্রবেশ (যখন পরাগরেণুগুলো সংগতিপূর্ণ হয়) যা পরাগরেণুর অঙ্কুরণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া (যখন পরাগরেণুগুলো অসংগতিপূর্ণ হয়) এইসব ঘটনাগুলোই পরাগ-গর্ভকেশর আন্তঃক্রিয়ার অন্তর্গত। সংগতিপূর্ণ পরাগযোগের পর গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণুগুলো অঙ্কুরিত হয় এবং এর ফলস্বরূপ পরাগনালিটি গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ডিম্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অবশেষে দুটি সহকারী কোশের মধ্যে একটিতে পুং গ্যামেট দুটি মুক্ত হয়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদে দ্বি-নিষেক দেখা যায় কারণ প্রতিটি ভ্রূণস্থলীতে দুইবার নিষেক ঘটে অর্থাৎ সিনগ্যামি এবং ট্রিপল ফিউশন ঘটে। এই নিষেকগুলোর ফলে উৎপন্ন বস্তুগুলো হল ডিপ্লয়েড জাইগোট এবং ট্রিপ্লয়েড প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (প্রাথমিক সস্য কোশে গঠিত হয়)। জাইগোট থেকে ভ্রূণ গঠিত হয় এবং প্রাথমিক সস্য কোশ থেকে সস্য কলা গঠিত হয়। সর্বদাই সস্য গঠনের পূর্বে ভ্রূণ গঠিত হয়।

বর্ধনশীল ভ্রূণটি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে প্রাথমিক ভ্রূণ, গোলাকার এবং হৃৎপিণ্ডের আকৃতির ভ্রূণ দশাগুলোর মত বিভিন্ন দশা অতিক্রম করে। পরিণত দ্বি-বীজপত্রী ভ্রুণে দুটি বীজপত্র এবং বীজপত্রাধিকাণ্ড ও বীজ পত্রাবকাণ্ড সমন্বিত একটি ভ্রূণাক্ষ রয়েছে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণগুলো এক বীজপত্রবিশিষ্ট হয়। নিষেকের পর গর্ভাশয় ফলে ও ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হয়।

কিছু গুপ্তবীজী উদ্ভিদে, বিশেষত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে অ্যাপোমিক্সিস ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে নিষেক ছাড়াই বীজ গঠিত হয়। উদ্যানবিদ্যা এবং কৃষিকার্যে অ্যাপোমিক্সিসের বহু সুবিধা রয়েছে।

কিছু গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজে একাধিক ভ্রূণ গঠিত হয়, এই ঘটনাটিকে বহুভ্রূণতা বলে।

অনুশীলনী

1. একটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফুলের সেই অংশগুলোর নাম উল্লেখ কর যেখানে পুং এবং স্ত্রী লিঙ্গাধর দেহ গঠিত হয়।
2. মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস ও মেগাস্পোরোজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। এই ঘটনাগুলোর চলার সময় কোন্ ধরনের কোশ বিভাজন ঘটে? এই দুটি ঘটনার শেষে সৃষ্ট গঠনসমূহের নাম উল্লেখ কর।
3. নিম্নলিখিত শব্দগুলোকে বিকাশের সঠিক ক্রম অনুসারে সাজাও ঃ পরাগরেণু, রেণুধর কলা, রেণুচতুষ্টয়, পরাগরেণু মাতৃকোশ, পুং গ্যামেট।
4. একটি আদর্শ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকের একটি পরিচ্ছন্ন, চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
5. স্ত্রী লিঙ্গাধরের দেহের মনোস্পোরিক বিকাশ বলতে কী বোঝ?

6. একটি পরিচ্ছন্ন চিত্রের সাহায্যে স্ত্রী-লিঙ্গধরের দেহের 7- কোশীয়, 8- নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
7. চ্যাসমোগ্যামাস ফুল কী? ক্লিস্টোগ্যামাস ফুলে ইতর পরাগযোগ ঘটতে পারে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে কারণ দর্শাও।
8. ফুলে স্ব-পরাগযোগ প্রতিরোধের দুটি কৌশল উল্লেখ কর।
9. স্ব-অসংগতি কী? স্ব-অসংগতিপূর্ণ প্রজাতিতে স্ব-পরাগযোগের ফলে বীজ গঠিত হয় না কেন?
10. ব্যাগিং কৌশল কী? উদ্ভিদ প্রজনন কর্মসূচিতে এটি কীভাবে উপযোগী হয়?
11. ট্রিপল ফিউশন কী? এটি কোথায় এবং কীভাবে ঘটে? ট্রিপল ফিউশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নিউক্লিয়াসগুলোর নাম উল্লেখ কর।
12. একটি নিষিক্ত ডিম্বকে জাইগোটটি কেন কিছু সময়ের জন্য সুপ্তাবস্থায় থাকে বলে তোমরা মনে কর?
13. পার্থক্য নিরূপণ করঃ
    ক) বীজপত্রাবকাণ্ড ও বীজপত্রাধিকাণ্ড
    খ) ভ্রূণমুকুলাবরণী ও ভ্রূণমূলাবরণী
    গ) ডিম্বকত্বক ও বীজবহিঃত্বক (টেস্টা)
    ঘ) পেরিস্পার্ম ও পেরিকার্প
14. আপেলকে অপ্রকৃত ফল বলে কেন? ফুলের কোন অংশটি বা অংশগুলো থেকে ফল গঠিত হয়?
15. ইমাসকুলেশন বলতে কী বোঝায়? একজন উদ্ভিদ প্রজননবিদ কখন এবং কেন এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন?
16. যদি কেউ বৃদ্ধি সহায়ক উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে পার্থেনোকার্পিকে উদ্দীপিত করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে তোমরা কোন ফলগুলোকে এর জন্য নির্বাচন করবে এবং কেন?
17. পরাগরেণুর প্রাচীর সৃষ্টিতে ট্যাপেটামের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
18. অ্যাপোমিক্সিস কী এবং এর গুরুত্ব কী?

অধ্যায় 3

মানুষের জনন
(HUMAN REPRODUCTION)

3.1 পুং-জনন তন্ত্র *(The Male Reproductive System)*

3.2 স্ত্রী-জনন তন্ত্র *(The Female Reproductive System)*

3.3 গ্যামেটোজেনেসিস বা জননকোশ উৎপাদন প্রক্রিয়া *(Gametogenesis)*

3.4 রজঃচক্র *(Menstrual Cycle)*

3.5 নিষেক এবং নিষিক্ত ডিম্বানু *(Fertilisation and Implantation)*

3.6 গর্ভাবস্থা এবং ভ্রুণের বিকাশ *(Pregnancy and Embryonic Development)*

3.7 প্রসব এবং দুগ্ধক্ষরণ *(Parturition and Lactation)*

তোমরা জান যে মানুষ যৌন জননকারী এবং জরায়ুজ প্রাণী। মানবদেহে সংঘটিত জনন সংক্রান্ত ঘটনাবলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল- জননকোশ তৈরি (গ্যামেটোজেনেসিস) অর্থাৎ পুরুষের দেহে শুক্রানু এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাণুর সৃষ্টি, স্ত্রী যোনিপথে শুক্রানুর স্থানান্তর (ইনসেমিনেশান) এবং পুং ও স্ত্রী জনন কোশের মিলনের ফলে (নিষেক) জাইগোট গঠন। জাইগোট গঠনের পরেই ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি হয় এবং এর বিকাশ ঘটে এবং এটি জরায়ুর গাত্রে আবদ্ধ হয় (নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপন), ভ্রুণের বিকাশ ঘটে (গেসটেশন বা গর্ভকাল) এবং শিশু মাতৃগর্ভ থেকে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে (প্রসব)। তোমরা জেনেছ যে, জনন সম্পর্কিত এই ঘটনাগুলো বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছানোর পরেই ঘটে। পুরুষ ও স্ত্রী দেহে জনন সংক্রান্ত ঘটনাবলির মধ্যে লক্ষ্যনীয় পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পুরুষ দেহে শুক্রানু তৈরির প্রক্রিয়াটি চললেও স্ত্রী দেহে কিন্তু পঞ্চাশ বছরের আশেপাশে এই প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। চলো আমরা, পুং এবং স্ত্রী জননতন্ত্রগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

3.1 পুং জনন তন্ত্র (The Male Reproductive System) :

মানব দেহে পুংজননতন্ত্রটি শ্রোণি অঞ্চলে (পেলভিস রিজিয়ন) অবস্থান করে (চিত্র 3.1ক)। এটি আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসহ একজোড়া শুক্রাশয়, গ্রন্থি এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। শুক্রাশয়গুলো উদর গহ্বরের বাইরে একটি থলির মধ্যে অবস্থান করে, একে স্ক্রোটাম (Scrotum) বলে।

স্ক্রোটাম শুক্রাশয়ের নিম্নতাপমাত্রা (দেহের অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় 2–2.5^{0}c কম) বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা স্পার্মাটোজেনেসিসের জন্য অপরিহার্য। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতিটি শুক্রাশয় ডিম্বাকৃতির, দৈর্ঘ্যে প্রায় 4-5 সেমি এবং প্রস্থে প্রায় 2–3 সেমি হয়। শুক্রাশয়টি একটি ঘন আবরক দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয়ে 250টি প্রকোষ্ঠ থাকে, যাদের টেস্টিকিউলার লোবিউল (testicular lobules) বলে (চিত্র 3.1 খ)।

চিত্র 3.1 (ক) পুরুষের শ্রোণিদেশের ছেদদৃশ্যের চিত্ররূপ যেখানে প্রজননতন্ত্রটি দেখানো হয়েছে।

প্রতিটি লোবিউলে (lobules) 1–3টি অধিক কুণ্ডলীকৃত সেমিনিফেরাস নালিকা (Seminiferous tobules) থাকে। এই সেমিনিফেরাস নালিকাগুলোতে শুক্রানু উৎপন্ন হয়। প্রতিটি সেমিনিফেরাস নালিকার অন্তঃগাত্রে দুই ধরনের কোশ থাকে এদের পুরুষ জার্মকোশ (Spermato gonia) এবং সারটোলি কোশ (Sertoli cells) বলে (চিত্র 3.2)। পুরুষ জার্মকোশগুলো মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অবশেষে শুক্রানু উৎপাদন করে যেখানে সারটোলি কোশসমূহ জার্মকোশগুলোকে পুষ্টি সরবরাহ করে। সেমিনিফেরাস নালিকাসমূহের বাইরের অঞ্চলটিকে আন্তরকোশীয় স্থান (Interstitial Space) বলে এবং এই স্থানটি রক্তবাহ এবং ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ বা লেডিগ কোশ সমন্বিত হয় (চিত্র 3.2)। লেডিগ কোশে সংশ্লেষিত এবং এই কোশ থেকে ক্ষরিত টেস্টিকিউলার হরমোন (testicular hormone) সমূহকে এণ্ড্রোজেন বলে। এই স্থানে অনাক্রম্যতা প্রদানে সক্ষম অন্যান্য কোশসমূহও উপস্থিত থাকে।

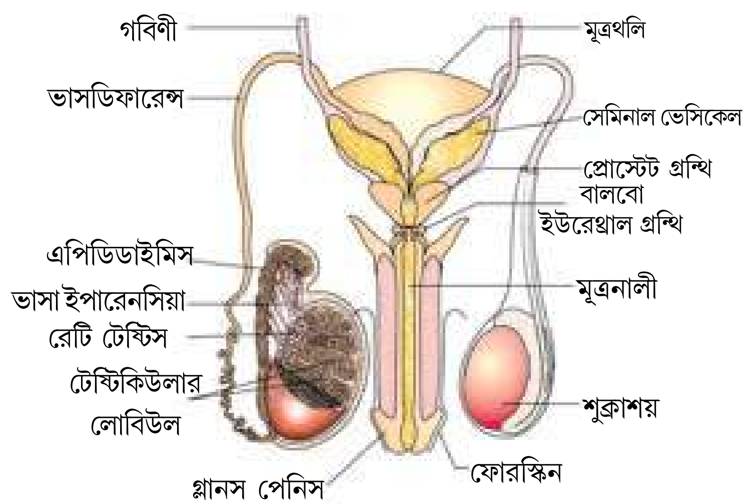

চিত্র 3.1 (খ) পুংজননতন্ত্রের চিত্ররূপ উপস্থাপন (শুক্রাশয়ের ভেতরটিকে বিস্তৃতভাবে দেখানোর জন্য এর একটি অংশ উন্মুক্ত আছে)।

পুং যৌন আনুষঙ্গিক নালিকাগুলো হল— রেটি টেস্টিস (rete testis), ভাসা ইফারেনসিয়া (vasa efferentia), এপিডিডাইমিস (epididymis) এবং ভাস ডিফারেন্স (vas derefens) (চিত্র 3.1খ)। শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস টিউবিউলসমূহ রেটি টেস্টিটের মাধ্যমে ভাসা ইফারেনসিয়াতে উন্মুক্ত হয়। ভাসা ইফারেনসিয়া শুক্রাশয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাদ পৃষ্ঠতল বরাবর অবস্থিত এপিডিডাইমিসে উন্মুক্ত হয়। ভাস ডিফারেন্স এপিডিডাইমিস থেকে গঠিত হয় যা উপর দিকে উঠে গিয়ে উদর গহ্বরে পৌঁছায় এবং মূত্রথলির উপর লুপ গঠন করে। সেমিনাল ভেসিকেল থেকে নির্গত একটি নালী ভাসডিফারেন্সে উন্মুক্ত হয় এবং এরপর ভাস ডিফারেন্স নিক্ষেপণ নালী রূপে মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয় (চিত্র 3.1ক)। এই নালীসমূহ শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন শুক্রাণুগুলোকে জমা করে এবং মূত্রনালীর মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিবহন করে। মূত্রনালীটি মূত্রথলি থেকে উৎপন্ন হয় এবং শিশ্নের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে এর বহিঃছিদ্র ইউরেথ্রাল মিটাসে (urethral meatus) পর্যন্ত পৌঁছায়।

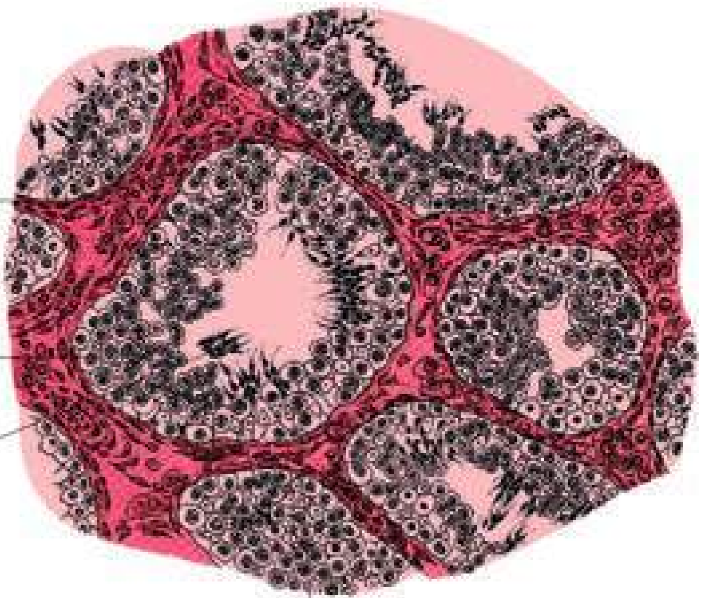

চিত্র 3.2 সেমিনিফেরাস নালিকার ছেদদৃশ্যের চিত্ররূপ

পুরুষের ক্ষেত্রে শিশ্ন হচ্ছে বাহ্যিক যৌনাঙ্গ (চিত্র 3.1ক,খ) এটি বিশেষকলা দ্বারা গঠিত হয় যা শুক্রানুর নির্গমন সহজতর করার জন্য শিশ্নকে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। শিশ্নের বর্ধিত প্রান্তটিকে গ্লানস পেনিস (glans penis) বলে। গ্লানস পেনিসটি একটি পাতলা ভাঁজযুক্ত চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, একে ফোর স্কিন (foreskin) বলে।

পুরুষের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক গ্রন্থিগুলো (চিত্র 3.1ক,খ) হল— একজোড়া শুক্রথলি, একটি প্রস্টেট গ্রন্থি এবং একজোড়া বালবো ইউরেথ্রাল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণ সেমিনাল প্লাজমা গঠন করে। সেমিনাল প্লাজমা ফ্রুক্টোজ, ক্যালসিয়াম এবং কিছু উৎসেচক সমৃদ্ধ হয়। বালবো ইউরেথ্রাল গ্রন্থির ক্ষরণ শিশ্নের পিচ্ছিলকরণেও সহায়তা করে।

3.2 স্ত্রী জনন তন্ত্র (The Female Reproductive System)

শ্রোণি অঞ্চলে অবস্থিত মানুষের স্ত্রীজনন তন্ত্রটি একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বনালী, জরায়ু, সারভিক্স, যোনি এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গ নিয়ে গঠিত (চিত্র 3.3ক)। একজোড়া স্তনগ্রন্থি সহ স্ত্রীজননতন্ত্রের এই অংশগুলো গঠনগত ও কার্যগতভাবে সমন্বয়িত হয়ে ডিম্বাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়া, নিষেক, গর্ভাবস্থা, শিশুর জন্ম এবং শিশুর যত্নের মতো প্রক্রিয়াগুলোর সম্পাদনে সহায়তা করে।

ডিম্বাশয়গুলো হল- স্ত্রী দেহের প্রাথমিক যৌনাঙ্গ যেগুলো ডিম্বাণু এবং বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন (ডিম্বাশয় নি:সৃত হরমোন) উৎপন্ন করে। উদরগহ্বরের নিম্নদেশে প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি ডিম্বাশয় অবস্থান করে (চিত্র 3.3খ)। প্রতিটি ডিম্বাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় 2-4 সেমি হয় এবং শ্রোণি প্রাচীর ও জরায়ুর সাথে লিগামেন্টের সাহায্যে যুক্ত থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় একটি পাতলা আবরণীর দ্বারা আবৃত থাকে, যা ডিম্বাশয়ের ধাত্র বা স্ট্রোমাকে বেষ্টন করে অবস্থান করে। স্ট্রোমাটি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত থাকে যথা- পরিধিস্থ কর্টেক্স এবং অন্তঃস্থ মেডালা।

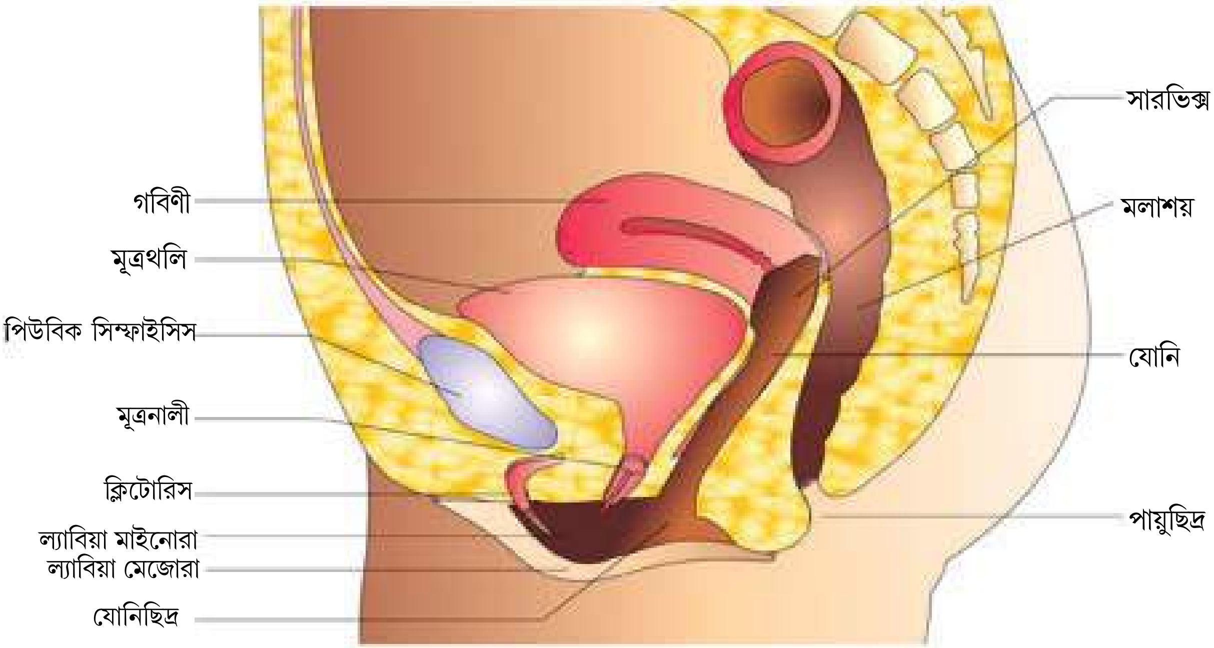

চিত্র 3.3(ক) স্ত্রী শ্রোণিদেশের ছেদদৃশ্যের চিত্ররূপ যেখানে প্রজননতন্ত্রটি দেখানো হয়েছে।

ডিম্বনালী (ফেলোপিয়ান টিউব), জরায়ু এবং যোনি স্ত্রী আনুষঙ্গিক নালিকা গঠন করে। প্রতিটি ডিম্বনালী প্রায় 10-12 সেমি লম্বা হয় এবং এগুলো প্রতিটি ডিম্বাশয়ের পরিধি থেকে জরায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে (চিত্র 3.3খ)। ডিম্বাশয় সংলগ্ন ডিম্বনালীর ফানেল আকৃতির অংশটি হল ইনফান্ডিবুলাম। ইনফান্ডিবুলামের কিনারা আঙুলের ন্যায় কতগুলো প্রবর্ধক সমন্বিত হয়, এগুলোকে

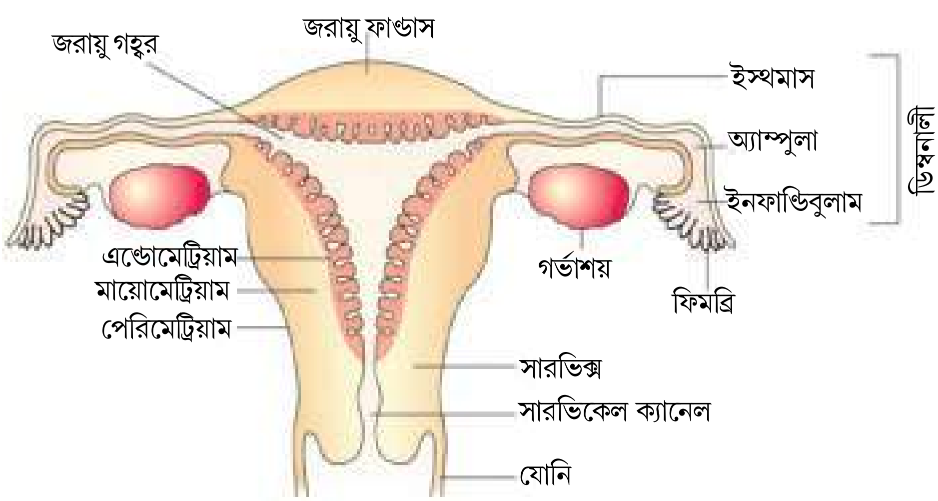

চিত্র 3.3 (খ) স্ত্রী জননতন্ত্রের ছেদদৃশ্যের চিত্ররূপ

ফিমব্রি (fimbriae) বলে। ডিম্বাণু নিঃসরণের পর ফিমব্রি ডিম্বাণু সংগ্রহে সাহায্য করে। ইনফান্ডিবুলামটি ডিম্বনালীর যে প্রশস্থ অংশে উন্মুক্ত হয় তাকে অ্যাম্পুলা (ampulla) বলে। ডিম্বনালীর শেষ প্রান্তটিকে বলে ইস্থমাস। ইস্থমাস অংশে একটি সরু নালিকা থাকে যা জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

স্ত্রীদেহে একটিমাত্র জরায়ু থাকে, একে গর্ভও (Womb) বলে। জরায়ুর আকৃতি উল্টানো নাসপাতির মতো হয়। শ্রোণিপ্রাকারের সঙ্গে যুক্ত জরায়ুটিকে লিগামেন্ট সহায়তা প্রদান করে। জরায়ুটি একটি সরু সারভিক্সের মাধ্যমে যোনিতে উন্মুক্ত হয়। সারভিক্সের গহ্বরটিকে সারভিক্যাল ক্যানেল (Cervical canal) বলে (চিত্র 3.3খ) যা যোনির সাথে একত্রিত হয়ে প্রসবে সহায়ক নালী বা বার্থ ক্যানেল (birth canal) গঠন করে। জরায়ুর প্রাচীর তিনটি কলাস্তর বিশিষ্ট হয়। এটি বহি:স্থ পাতলা ঝিল্লীময় পেরিমেট্রিয়াম, মধ্যস্থ মসৃণ পেশির পুরুস্তর বিশিষ্ট মায়োমেট্রিয়াম এবং ভেতরের গ্রন্থিময় স্তর এণ্ডোমেট্রিয়াম দ্বারা গঠিত হয়। এণ্ডোমেট্রিয়াম স্তরটি জরায়ু গহ্বরের আবরণী গঠন করে। রজঃ চক্রের সময় এন্ডোমেট্রিয়ামে চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে যেখানে সন্তান প্রসবকালে মায়োমেট্রিয়ামে তীব্র সংকোচন ঘটে।

স্ত্রীদেহে বাহ্যিক যৌনাঙ্গগুলো হল- মানস পিউবিস, ল্যাবিয়া মেজোরা, ল্যাবিয়া মাইনোরা, হাইমেন এবং ক্লিটোরিস (চিত্র 3.3ক)। মানস পিউবিসটি হল চর্ম এবং পিউবিক রোম দ্বারা আচ্ছাদিত নরম চর্বিকলার পুটুলি বিশেষ (cushion)। ল্যাবিয়া মেজোরা হল কলাস্তরের মাংসল ভাঁজ যা মনস পিউবিস থেকে নীচের দিকে বিস্তৃত হয় এবং যোনি ছিদ্রটিকে (vaginal opening) ঘিরে অবস্থান করে। ল্যাবিয়া মোজারার নীচে অবস্থিত কলাকোশের যুগ্ম ভাঁজটি হল ল্যাবিয়া মাইনোরা। যোনি ছিদ্রটি প্রায়ই একটি পাতলা আবরণী দ্বারা আংশিকভাবে আবৃত থাকে, একে হাইমেন বলে। ক্লিটোরিস একটি ক্ষুদ্র আঙুলের মতো গঠন যা মূত্রছিদ্রের উপরে দুটি ল্যাবিয়া মাইনোরার উর্ধ্বপ্রান্তের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। প্রথম যৌন মিলনকালে (যৌনসঙ্গম) প্রায়শই হাইমেন নামক পর্দাটি ছিঁড়ে যায়। *তবে হঠাৎ করে পড়ে গেলে বা ধাক্কা খেলে, যোনিপথে তুলোর পট্টি ঢুকিয়ে দিলে, ঘোড় সওয়ারী,*

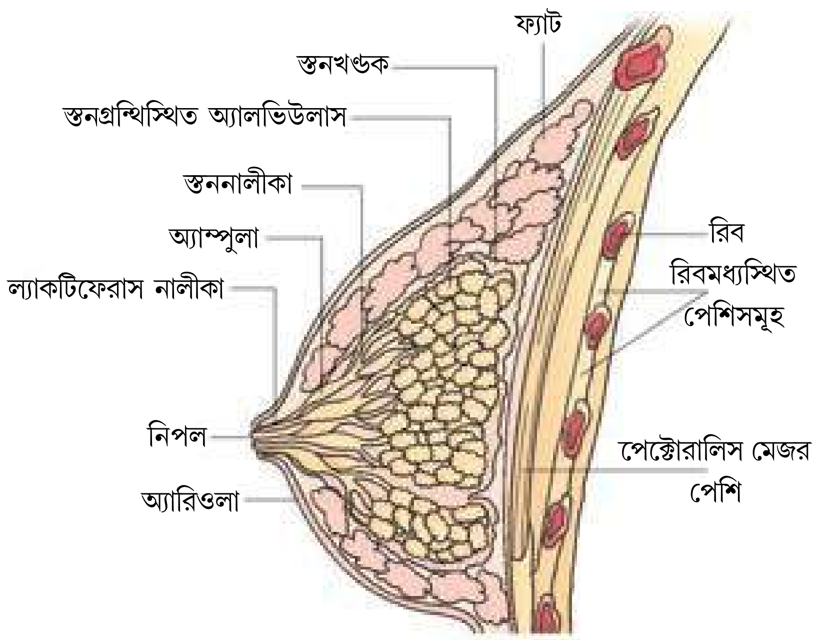

চিত্র 3.4 স্তনগ্রন্থির ছেদ-দৃশ্যের একটি চিত্ররূপ

সাইক্লিং ইত্যাদির মতো কিছু খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও এটি ছিঁড়ে যেতে পারে। কিছু কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌন মিলনের পরেও হাইমেন পর্দাটি থেকে যায়। বাস্তবে হাইমেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যৌন অভিজ্ঞতা বা কুমারীত্বের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশক নয়।

সব স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তাদের দেহে কার্যকরী স্তনগ্রন্থির উপস্থিতি। স্তনগ্রন্থি হল যুগ্মগঠন যা গ্রন্থিময় কলা সমন্বিত হয় এবং এতে ফ্যাটের পরিমাণ স্ত্রী প্রাণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রতিটি স্তনের গ্রন্থিময় কলা 15-20টি স্তনখণ্ডকে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি স্তনখন্ডক একগুচ্ছ কোশ সমন্বিত হয় এবং এই কোশগুচ্ছকে অ্যালভিউলাই (alveoli) বলে (চিত্র 3.4)। অ্যালভিউলাইয়ের কোশগুলো দুগ্ধক্ষরণ করে যা অ্যালভিউলাই গহ্বরে (Lumens) সঞ্চিত হয়। অ্যালভিউলাই স্তননালিকায় উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি স্তনখন্ডকে নালিকাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি স্তননালী (mammary duct) গঠন করে। বহু স্তননালী পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রশস্ত স্তন অ্যাম্পুলা গঠন করে যা ল্যাকটিফেরাস নালীর (lactiferous duct) সঙ্গো সংযুক্ত থাকে। এই নালীর মাধ্যমে শিশুর দ্বারা দুগ্ধ চোষিত হয়।

3.3 জননকোশ উৎপাদন প্রক্রিয়া বা গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis) :

যে প্রক্রিয়ায় মুখ্য জনন অঙ্গাসমূহ অর্থাৎ পুরুষদেহে শুক্রাশয়ে এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয়ে যথাক্রমে শুক্রানু এবং ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়, তাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। বয়ঃসন্ধিকালে শুক্রাশয়ে অপরিণত পুংজননকোশগুলো (স্পার্মাটোগোণিয়া) থেকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর উৎপাদন শুরু হয়। সেমিনিফেরাস নালীকার অন্তঃপ্রাকারে বর্তমান স্পার্মাটোগোণিয়া (একবচনে-স্পার্মাটোগোণিয়াম) মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং এরফলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি স্পার্মাটোগোণিয়াম ডিপ্লয়েড হয় এবং এতে 46টি ক্রোমোজোম থাকে। কিছু স্পার্মাটোগোণিয়াকে প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইট বলে এবং এরা নির্দিষ্ট সময় পর পর মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। একটি প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইট বা প্রাথমিক পর শুক্রাণু কোশ প্রথম মিয়োসিস বিভাজন (হ্রাস বিভাজন) সম্পূর্ণ করার পর দুটি সমআকৃতির হ্যাপ্লয়েড কোশ গঠন করে, এদের গৌণ স্পার্মাটোসাইট বা গৌণ পরঃশুক্রাণু বলে। প্রতিটি গৌণ স্পার্মাটোসাইট কোশে 23টি ক্রোমোজোম থাকে। গৌণ স্পার্মাটোসাইট কোশগুলো দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে (মিয়োসিস II) চারটি সমআকৃতির হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড গঠন করে (চিত্র 3.5)। প্রতিটি স্পার্মাটিডের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? যে প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডগুলো স্পার্মাটোজোয়ায় (শুক্রাণু) রূপান্তরিত হয় তাকে, স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) বলে। স্পার্মিওজেনেসিসের পর শুক্রাণুর মস্তকটি সারটোলি কোশসমূহের ভেতরে আবদ্ধ হয় এবং অবশেষে যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুগুলো সেমিনিফেরাস টিউবিউলে নির্গত হয় তাকে স্পার্মিয়েশান বলে।

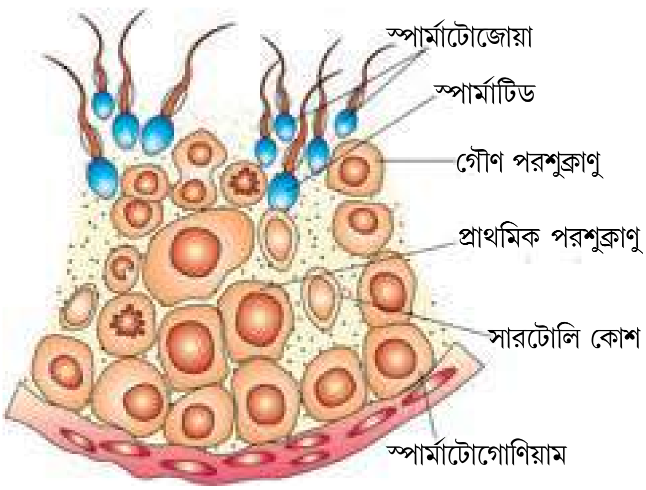

চিত্র 3.5 একটি সেমিনিফেরাস নালীকার (বিবর্ধিত) ছেদ দৃশ্যের চিত্ররূপ

বয়ঃসন্ধিকালে গোনোডোট্রপিন রিলিজিং হরমোনের (GnRH) ক্ষরণ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্পার্মাটোজেনেসিস শুরু হয়। তোমরা মনে করে দেখো এই হরমোনটি একটি হাইপোথ্যালামিক হরমোন। GnRH হরমোনের এই বর্ধিত মাত্রা এরপর পিট্যুইটারির সম্মুখ খন্ডকের উপর ক্রিয়া করে এবং লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) ও ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) নামক এই দুটি গোনাডোট্রপিনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। অন্যদিকে অ্যান্ড্রোজেন স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। LH লেডিগ কোশসমূহের উপর ক্রিয়া করে এবং

চিত্র 3.6 একটি শুক্রাণুর গঠন

অ্যান্ড্রোজেনের সংশ্লেষ ও ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। অন্যদিকে অ্যান্ড্রোজেন স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। FSH সারটোলি কোশসমূহের উপর ক্রিয়া করে এবং স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী কিছু প্রভাবকের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

চলো আমরা একটি শুক্রাণুর গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করি। এটি একটি আনুবীক্ষণিক গঠন যা মস্তক, গ্রীবা, মধ্যাংশ এবং একটি পুচ্ছ (চিত্র 3.6) সমন্বিত হয়। এটি প্লাজমা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। শুক্রাণুর মস্তকটিতে একটি লম্বাটে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে যার সম্মুখভাবে একটি টুপিসদৃশ গঠন অ্যাক্রোজোম দিয়ে ঢাকা থাকে। অ্যাক্রোজোমটি ডিম্বাণু নিষিক্তকরণে সহায়ক উৎসেচক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। শুক্রাণুর মধ্যাংশটি অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া সমন্বিত হয় যেগুলো শুক্রাণুর পুচ্ছের চলনের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে। নিষেকের জন্য শুক্রাণুর চলনের প্রয়োজন হয় যেখানে এই শক্তি শুক্রাণুর চলনে সাহায্য করে। সঙ্গমকালে পুরুষের দেহ থেকে প্রায় 200-300 মিলিয়ন শুক্রাণু নির্গত হয় এবং স্বাভাবিক নিষেকের জন্য কমপক্ষে 60 শতাংশ শুক্রাণুকে অবশ্যই স্বাভাবিক আকার এবং আকৃতি বিশিষ্ট এবং কমপক্ষে 40 শতাংশ শুক্রাণুকে অবশ্যই তীব্র গতিসম্পন্ন হতে হবে।

সেমিনিফেরাস নালীকা থেকে নির্গত শুক্রাণুগুলো সহায়কনালীর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। এপিডিডাইমিস, ভাস-ডিফারেন্স, সেমিনাল ভেসিকেল এবং প্রস্টেটগ্রন্থির ক্ষরণ শুক্রাণুর চলন এবং পরিণমনের জন্য আবশ্যক। সেমিনাল প্লাজমা ও শুক্রাণু মিলে শুক্ররস (semen) গঠন করে। টেস্টিকুলার হরমোনগুলোর (অ্যান্ড্রোজেন) দ্বারা পুংযৌন আনুষঙ্গিক নালীকাসমূহ এবং গ্রন্থিসমূহের কার্যকারিতা বজায় থাকে।

পরিণত স্ত্রীজনন কোশ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে ঊজেনেসিস (oogenesis) বলে, যা সুস্পষ্টভাবে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া থেকে আলাদা হয়। ভ্রূণের বিকাশকালে ঊজেনেসিস প্রক্রিয়া শুরু হয় যেখানে ভ্রূণের প্রতিটি ডিম্বাশয়ে লক্ষ লক্ষ জননমাতৃকোশ (ওগোনিয়া) তৈরি হয়। শিশুর জন্মের পর আর নতুন কোনো ওগোনিয়া তৈরি হয় না এবং এদের সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটে না। এই ওগোনিয়াগুলো বিভাজিত হতে শুরু করে ও মিয়োসিসের প্রফেজ দশায় প্রবেশ করে এবং ঐ দশায় কোশবিভাজন অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই কোশগুলোকে প্রাথমিক পরডিম্বাণু (primary oocytes) বলে। প্রতিটি প্রাথমিক পরডিম্বাণু এরপর গ্র্যানুলোসা নির্মিত স্তর দ্বারা পরিবৃত হয় এবং এদেরকে প্রাথমিক ডিম্বথলি (Primary follicle) (চিত্র 3.7) বলে। জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধির সূচনাকাল পর্যন্ত এই ডিম্বথলিগুলোর অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ডিম্বাশয়ে শুধুমাত্র 60,000-80,000 প্রাথমিক ডিম্বথলি অবশিষ্ট থাকে। প্রাথমিক ডিম্বথলিগুলো গ্র্যানুলোসা কোশ নির্মিত আরোও কয়েকটি স্তর এবং একটি নতুন থিকার দ্বারা পরিবৃত থাকে এবং এদের গৌণ ডিম্বথলি (Secondary follicles) বলে।

গৌণ ডিম্বথলিটি শীঘ্রই প্রগৌণ ডিম্বথলিতে রূপান্তরিত হয়। প্রগৌণ ডিম্বথলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এতে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর বা এন্ট্রাম (antrum) থাকে। থিকা স্তরটি একটি অন্তঃস্থ থিকা (থিকা ইন্টারনা) এবং একটি বহিঃস্থ থিকা (থিকা এক্সটারনা) এই দুটি স্তর নিয়ে সংঘটিত হয়। তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দশায় প্রগৌণ ডিম্বথলিস্থিত (tertiary follicle) প্রাথমিক পরডিম্বাণুটি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রথম মিয়োসিস বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। এটি একটি অসমবিভাজন এবং এরফলে একটি বৃহদাকার হ্যাপ্লয়েড গৌণ পরডিম্বাণু ও একটি ক্ষুদ্র

চিত্র 3.7 ডিম্বাশয়ের ছেদ-দৃশ্যের চিত্ররূপ

প্রথম পোলার বডি (চিত্র 3.8 খ)গঠিত হয়। গৌণ পরডিম্বাণুতে প্রাথমিক পরডিম্বাণুর পরিপোষক সমৃদ্ধ সাইটোপ্লাজমের বেশিরভাগ অংশই থেকে যায়। তোমরা কী এর কোনো উপযোগিতা আছে বলে মনে করো? প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের ফলে উৎপন্ন প্রথম পোলার বডিটি কি আবারো বিভাজিত হয় নাকি সেটি বিনষ্ট হয়ে যায়? এখন পর্যন্ত আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নই। প্রগৌণ ডিম্বথলিটি এরপর পরিবর্তিত হয়ে পরিণত ডিম্বথলি বা গ্রফিয়ান ফলিকলে (Graffian follicle) (চিত্র 3.7) পরিণত হয়। গৌণ পরডিম্বাণুটিকে ঘিরে একটি নতুন পর্দা গঠিত হয় এবং একে জোনা পেলুসিডা (Zona pellucida) বলে। এই সময় ডিম্বাশয় থেকে গৌণ পরডিম্বাণুটি বেরিয়ে আসার জন্য গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয়। ডিম্বাশয় থেকে গৌণ পরডিম্বাণুর বেরিয়ে আসার এই প্রক্রিয়াকে ওভুলেশান বা ডিম্বনি:সরণ বলে। তোমরা কি স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিসের মধ্যে মুখ্য পার্থক্যগুলোকে সনাক্ত করতে পারবে? স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিসের একটি চিত্ররূপ উপস্থাপন নীচে দেওয়া হয়েছে (চিত্র 3.8)।

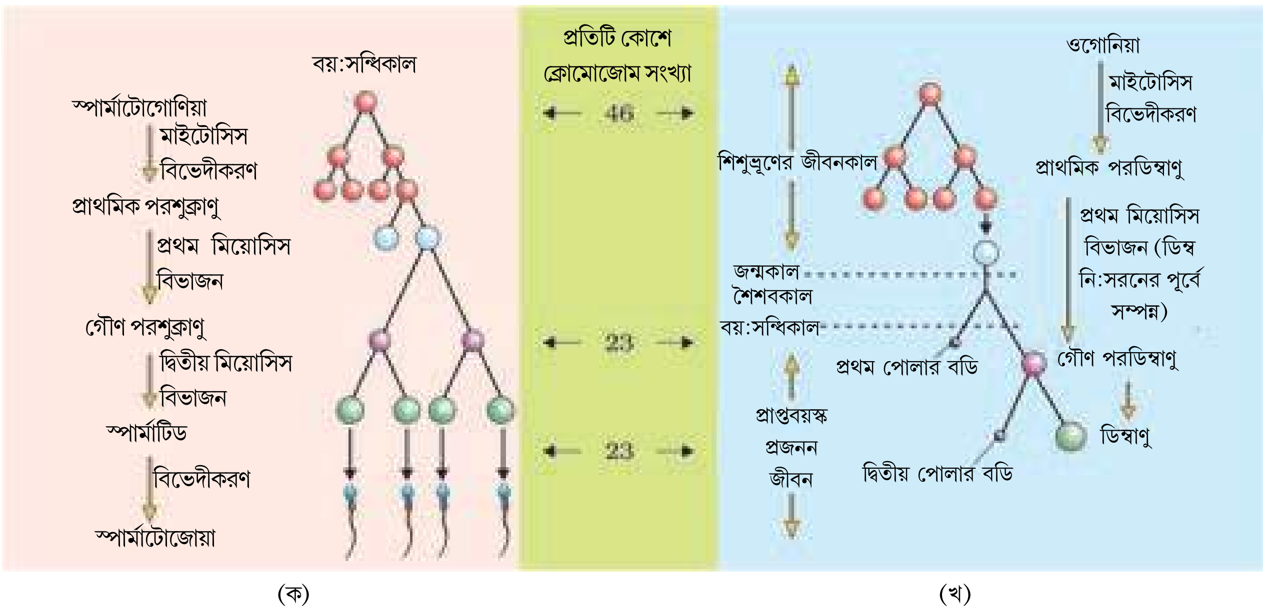

চিত্র 3.8 ছকের সাহায্যে ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (খ) উজেনেসিসের উপস্থাপন

3.4 রজ:চক্র (Menstrual Cycle)

প্রাইমেট বর্গভুক্ত স্ত্রী প্রাণীদের দেহে (উদাহরণ বানর, গরিলা এবং মানুষ) সংঘটিত জনন সম্পর্কিত চক্রটিকে রজ:চক্র (Menstrual cycle) বলে। বয়:সন্ধিকালের প্রারম্ভে প্রথম রজ:চক্র শুরু হয় এবং একে মেনার্ক (menarche) বলে। মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীদের দেহে রজ:চক্রটি গড়ে 28/

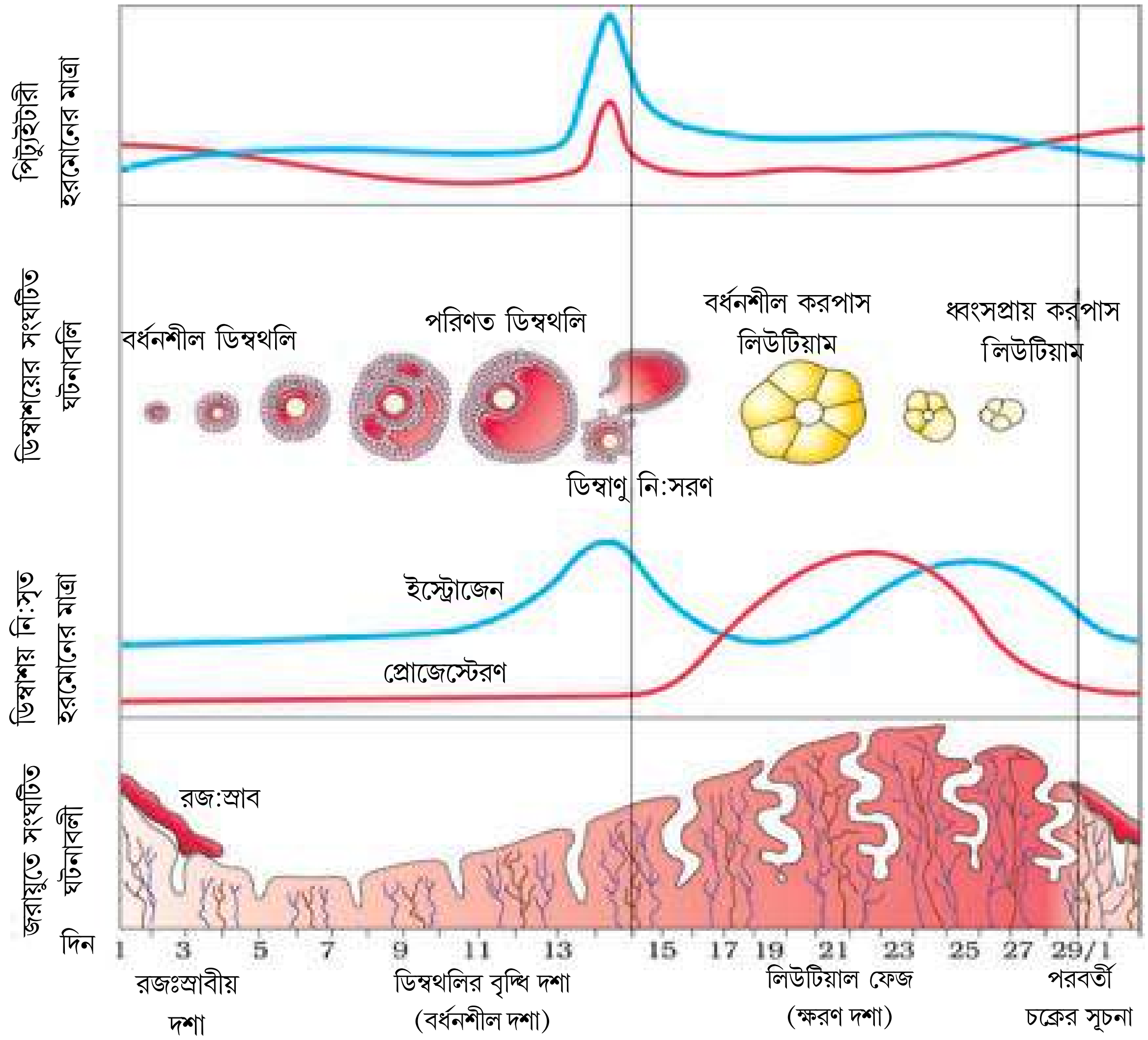

চিত্র 3.9 একটি রজঃচক্র চলাকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্ররূপ উপস্থাপন

29দিন অন্তর পুনরাবর্তিত হয় এবং একটি রজঃস্রাবীয় দশার শুরু থেকে পরবর্তী রজ:স্রাবীয় দশার শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত চক্রাকার ঘটনাবলীকে রজঃচক্র বলে। প্রতিটি রজঃচক্রের মধ্যবর্তী সময়ে একটি ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) হয়। রজঃচক্রে সংঘটিত মুখ্য ঘটনাবলি চিত্র 3.9-এ দেখানো হয়েছে। এই চক্রটি রজঃস্রাবীয় দশা (menstrual phase) দিয়ে শুরু হয় এবং রজঃস্রাবীয় দশা শুরু হলে এটি 3-5দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জরায়ুর এন্ড্রোমেট্রিয়াম প্রাকার এবং এর সাথে যুক্ত রক্তবাহগুলোর ভাঙ্গানের ফলে রজঃস্রাব শুরু হয় এবং এই ভাঙ্গানের ফলে উৎপন্ন তরল যোনিপথের মধ্য দিয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ডিম্বাণুটির নিষিক্তকরণ না হলেই কেবলমাত্র রজ:চক্র ঘটে। রজঃ চক্র না ঘটা গর্ভসঞ্চারের সংকেত হতে পারে। তবে মানসিক চাপ, দুর্বল স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো অন্যান্য কিছু কারণেও এটি ঘটতে পারে। রজঃস্রাবীয় দশার পরেই ফলিকুলার দশা বা ডিম্বথলির বৃদ্ধি দশা শুরু হয়। ফলিকুলার দশা চলাকালে ডিম্বাশয়ের প্রাথমিক ডিম্বথলিগুলো বৃদ্ধি পেয়ে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত গ্রাফিয়ান ফলিকল গঠন করে এবংত্র একই সাথে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পুনর্গঠিত হয়। পিটুইটারী এবং গর্ভাশয় নিঃসৃত হরমোনগুলোর মাত্রার পরিবর্তন দ্বারাই গর্ভাশয় এবং জরায়ুর এই

পরিবর্তনগুলো সাধিত হয় (চিত্র 3.9)। ফলিকুলার দশা বা ডিম্বথলির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দশা চলাকালে গোনোডোট্রপিনসমুহের (LH এবং FSH) ক্ষরণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং এই হরমোনগুলো ডিম্বথলির বৃদ্ধিসহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ডিম্বথলি থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। রজ:চক্রের মধ্যবর্তীসময়ে (প্রায়14তম দিনে) LH এবং FSH উভয়ের ক্ষরণ সর্বাধিক হয়। রজঃচক্রের মাঝামাঝি সময়কালে LH হরমোনের দ্রুত ক্ষরণের ফলে এর মাত্রা সর্বাধিক হয় এবং একে LH সার্জ বলে। LH সার্জ এর প্রভাবেই গ্রাফিয়ান ফলিকলটি (ডিম্বথলি) বিদীর্ণ হয় এবং এর থেকে ডিম্বাণুর নিঃসরণ (ovulation) ঘটে। ডিম্বাণুর নিঃসরণ দশার (ovulatory phase) পরপরই ক্ষরণ দশা বা লিউটাল ফেজ (Luteal phase) শুরু হয় এবং এই দশা চলাকালে গ্রাফিয়ান ফলিকলের অবশিষ্ট অংশগুলো করপাস লিউটিয়ামে রূপান্তরিত হয় (চিত্র 3.9)। করপাস লিউটিয়াম অধিক পরিমাণে প্রোজেস্টেরণ ক্ষরণ করে যা জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের গঠন বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যক। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের এরূপ গঠন নিষিক্ত ডিম্বাণুর রোপণ এবং গর্ভাবস্থায় সংঘটিত অন্যান্য ঘটনাবলির জন্য প্রয়োজনীয়। গর্ভাবস্থায় রজঃচক্রের সব ঘটনাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং রজঃস্রাব ঘটে না। ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ না ঘটলে করপাস লিউটিয়াম বিনষ্ট হয়ে যায়। এরফলে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের স্তরগুলো বিদীর্ণ হতে শুরু করে ও রজঃস্রাব শুরু হয় এবং এই ঘটনাটি নতুন চক্রের সূচনাকে নির্দেশ করে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় 50 বছর বয়সে রজ:চক্র বন্ধ হয়ে যায় এবং একে রজ:নিবৃত্তি বা মেনোপজ বলে। রজ:চক্রের চক্রাকার আবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রজনন দশাকে সূচিত করে এবং এই চক্রটি রজোদর্শন (menarche) থেকে রজঃনিবৃত্তি (menopause) সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

রজ:চক্রকালীন স্বাস্থ্যবিধি

রজ:চক্র চলাকালে স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যবিধান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় নিয়মিত স্নান করবে এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। সেনিটারী নেপকিন অথবা বাড়িতে তৈরি পরিষ্কার প্যাড ব্যবহার করবে। সেনিটারী নেপকিন অথবা বাড়িতে তৈরি পরিষ্কার প্যাডগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে প্রতি 4-5ঘন্টা পর পর বদলাবে। সেনিটারী নেপকিনগুলোকে ব্যবহারের পর কোনো কাজে ব্যবহৃত কাগজে সঠিকভাবে মুড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। ব্যবহৃত নেপকিনগুলোকে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে আসা নলে অথবা খোলা জায়গায় ফেলা উচিত নয়। নেপকিনগুলোকে ফেলে দেওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

3.5 নিষেক এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপণ (Fertilisation and Implantation)

সঙ্গামকালে শিশ্ন দ্বারা নির্গত শুক্ররস যোনিপথে প্রবেশ করে (insemination)। গতিশীল শুক্রাণুগুলোর দ্রুত সন্তরণের দ্বারা সারভিক্সের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং অবশেষে ফ্যালোপিয়ান নালীর অ্যাম্পুলা অঞ্চলে পৌঁছায় (চিত্র 3.11খ)। ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণুটি ফ্যালোপিয়ান নালীর অ্যাম্পুলা অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং এই স্থানে ডিম্বাণুটির নিষিক্তকরণ ঘটে। ডিম্বাণুটি এবং শুক্রানুগুলো ফ্যালোপিয়ান নালীর অ্যাম্পুলা অঞ্চলে পৌঁছলেই কেবলমাত্র ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ ঘটতে পারে। এই কারণেই সব যৌন মিলনের ফলশ্রুতিতে নিষেক এবং গর্ভসঞ্চার হয় না।

শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকেই নিষেক বলে। নিষেককালে একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনাপেলুসিডা স্তরের সংস্পর্শে আসে (চিত্র 3.10) এবং ডিম্বাণুর প্রাকারের পরিবর্তনসমূহকে ত্বরান্বিত করে যা অতিরিক্ত শুক্রাণু প্রবেশে বাধাদান করে। তাই এই ঘটনাটি এটা সুনিশ্চিত করে যে, কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকেই নিষিক্ত করতে পারে। অ্যাক্রোজোমের ক্ষরণ শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর প্লাজমা পর্দা এবং জোনা পেলুসিডা ভেদ করে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এটি গৌণ

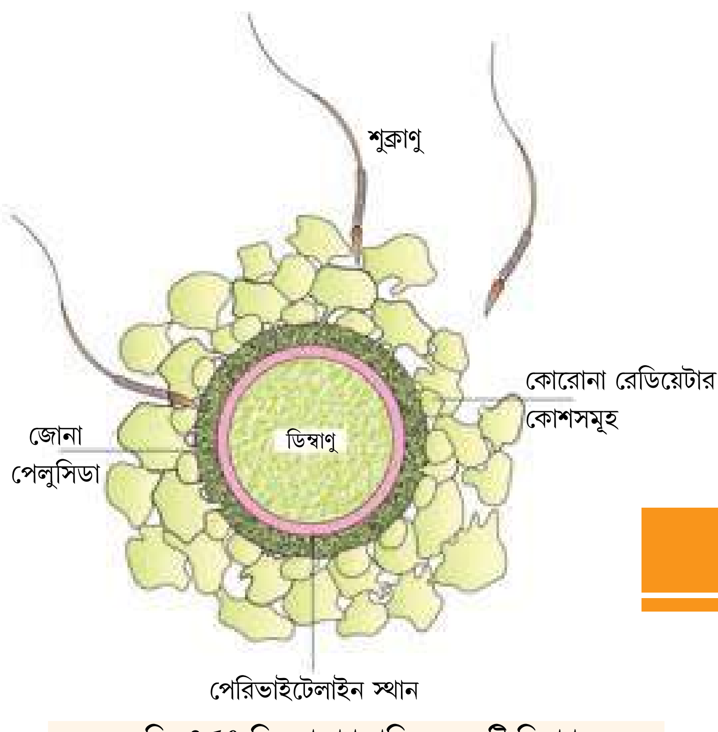

চিত্র 3.10 কিছু শুক্রাণু পরিবৃত একটি ডিম্বাণু

পরডিম্বাণুর (secondary oocytes) মিয়োসিস বিভাজন সম্পূর্ণ করার কাজটিকে উদ্দীপিত করে। দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনটিও অসম হয় এবং এরফলে একটি দ্বিতীয় পোলার বডি (second polar body) এবং একটি হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু (ootid) গঠিত হয়। অতিশীঘ্রই শুক্রাণুটির হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন করে। *জাইগোটে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকবে?*

এটা মনে রাখতে হবে যে, এই দশাতেই শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। চলো দেখি, এটি কীভাবে ঘটে? তোমরা জান যে, মানুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রোমোজোমের ধরন (pattern) হল XX এবং পুরুষের এটি XY। তাই মহিলাদের দেহে উৎপন্ন সব হ্যাপ্লয়েড জননকোশগুলোতেই (ডিম্বাণু) 'X' যৌন ক্রোমোজোমটি থাকে, যেখানে পুরুষের দেহে উৎপন্ন জননকোশগুলো (শুক্রাণুগুলো) X বা Y যৌন ক্রোমোজোমবিশিষ্ট হতে পারে। তাই পুরুষের দেহে উৎপন্ন শুক্রাণুগুলোর 50 শতাংশ X ক্রোমোজোম এবং 50 শতাংশ Y ক্রোমোজোমবিশিষ্ট হয়। পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে উৎপন্ন জাইগোটটি, X-ক্রোমোজোমবাহিত শুক্রাণু নাকি Y ক্রোমোজোমবাহিত শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুটির নিষিক্তকরণে সৃষ্টি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই জাইগোট XX বা XY ক্রোমোজোম বহন করবে। XX ক্রোমোজোমবাহিত জাইগোট একটি কন্যা সন্তান এবং XY ক্রোমোজোম বাহিত জাইগোট একটি পুত্র সন্তানে পরিণত হবে (পঞ্চম অধ্যায়ে তোমরা ক্রোমোজোমের সজ্জারীতির বিষয়ে আরোও জানবে)। *এই কারণে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটি বলা সঠিক যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই বাবার ভূমিকা রয়েছে!*

জাইগোটটি ডিম্বনালী অর্থাৎ ফ্যালোপিয়াননালীর ইসথ্মাস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জরায়ুর দিকে বাহিত হওয়ার সময় এর মাইটোসিস বিভাজন শুরু হয়। একে ক্লিভেজ বলে (চিত্র 3.11) এবং এই

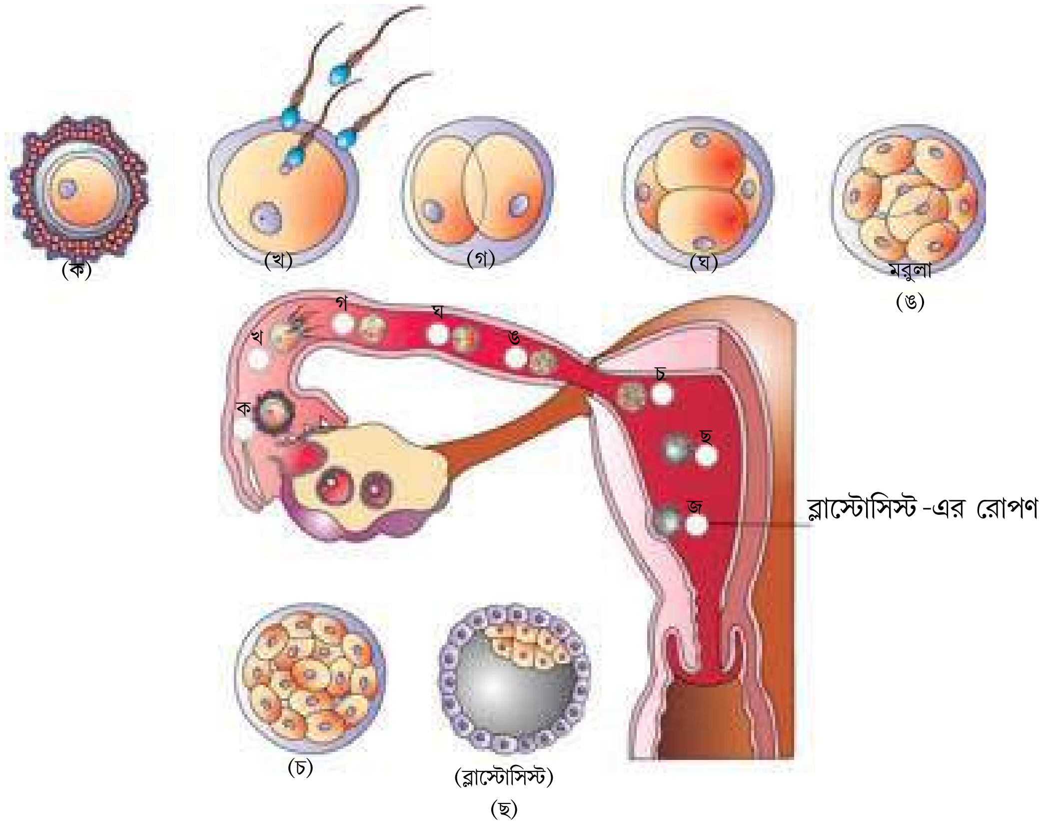

চিত্র 3.11 ফ্যালোপিয়ান নালীর মধ্য দিয়ে ডিম্বাণুর পরিবহণ, নিষেক এবং বর্ধনশীল ভ্রূণের গমন

বিভাজনের ফলে 2, 4, 8, 16 সংখ্যক অপত্য কোশের সৃষ্টি হয় এবং এদের ব্লাস্টোমিয়ার বলে। 8-16 ব্লাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট ভ্রূণটিকে মরুলা বলে (চিত্র 3.11ঙ)। এই মরুলা ক্রমাগত বিভাজিত হয় এবং জরায়ুর আরোও ভেতরে প্রবেশ করার সময় এটি ব্লাস্টোসিস্টে রূপান্তরিত হয় (চিত্র 3.11 ছ)। ব্লাস্টোসিস্টের পরিধির দিকের ব্লাস্টোমিয়ারগুলো সজ্জিত হয়ে একটি বহিঃস্তর গঠন করে এবং একে ট্রোফোব্লাস্ট (trophoblast) বলে। ব্লাস্টোসিস্টের ভেতরের দিকের কোশগুচ্ছের কোশগুলো ট্রোফোব্লাস্টের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই কোশগুচ্ছকে অভ্যন্তরীণ কোশপুঞ্জ (Inner cell mass) বলে। ট্রোফোব্লাস্ট স্তরটি এরপর এন্ডোমেট্রিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অভ্যন্তরীণ কোশপুঞ্জটি বিভেদিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। ট্রোফোব্লাস্টটি জরায়ুর গাত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর জরায়ুর কোশগুলো দ্রুত বিভাজিত হয় এবং কোশগুলো ব্লাস্টোসিস্টকে ঘিরে অবস্থান করে। এরফলে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় (চিত্র 3.11জ)। একে ডিম্বাণুর রোপণ (Implantation) বলে এবং এরফলেই গর্ভাবস্থার সূচনা হয়।

3.6 গর্ভাবস্থা এবং ভ্রূণের বিকাশ (Pregnancy and Embryonic development) :

জরায়ুগাত্রে ভ্রূণের রোপণের পর ট্রোফোব্লাস্ট স্তরে কিছু অঙ্গুলী-সদৃশ অভিক্ষেপ দেখা যায়, এগুলোকে কোরিওনিক ভিলাই (Chorionic villi) বলে। এই কোরিওনিক ভিলাইগুলো জরায়ু-কলা এবং মাতৃদেহের রক্ত দ্বারা পরিবৃত থাকে। এই কোরিওনিক ভিলাই এবং জরায়ু কলাসমূহ একে অপরের সাথে আলিঙ্গানাবদ্ধ হয় এবং যুগ্মভাবে বর্ধনশীল ভ্রূণ এবং মাতৃদেহের মধ্যে যে গঠনগত ও কার্যগত একক তৈরি করে তাকে অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta) বলে (চিত্র 3.12)।

ভ্রূণে অক্সিজেন ও পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ এবং ভ্রূণে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও রেচন /বর্জ্য পদার্থের অপসারণেও প্লাসেন্টা বা অমরা সহায়তা করে। প্লাসেন্টা একটি নাভিরজ্জুর (Umbilical cord) মাধ্যমে ভ্রূণের সাথে যুক্ত থাকে যা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণের দিকে এবং ভ্রূণ থেকে মাতৃদেহের দিকে বস্তুসমূহের পরিবহনে সাহায্য করে। প্লাসেন্টা একটি অন্তঃক্ষরা কলা (endocrine tissue) রূপেও কাজ করে এবং এতে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (hCG), হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন (hPL), ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরণ ইত্যাদির মতো হরমোন উৎপন্ন হয়। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গর্ভাশয় থেকে রিলাক্সিন নামক হরমোনও ক্ষরিত হয়। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে hCG, hPL এবং রিলাক্সিন হরমোনগুলো কেবলমাত্র গর্ভাবস্থায় উৎপন্ন হয়। এছাড়া গর্ভাবস্থায় মায়ের রক্তে অন্যান্য হরমোন যেমন ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরণ, কর্টিসল, প্রোল্যাকটিন, থাইরক্সিন ইত্যাদির মাত্রা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। শিশু ভ্রূণের বৃদ্ধি, মাতৃদেহের বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তন এবং গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য এই হরমোনগুলোর অতিরিক্ত উৎপাদন হওয়া আবশ্যক।

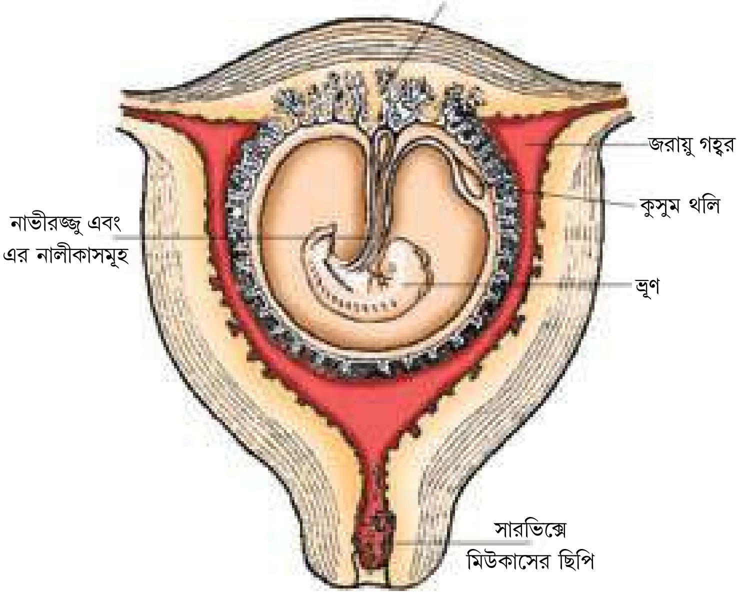

চিত্র 3.12 জরায়ুর অভ্যন্তরে মানব শিশু ভ্রূণ

নিষিক্ত ডিম্বাণুরোপণের ঠিক পরেই, অভ্যন্তরীণ কোশপুঞ্জ (ভ্রূণ) বিভেদিত হয়ে একটি বহিঃস্তর এবং একটি অন্তঃস্তর গঠন করে। বহি:স্তরটিকে এক্টোডার্ম এবং অন্ত:স্তরটিকে এন্ডোডার্ম বলে। শীঘ্রই এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্মের মধ্যবর্তীস্থানে মেসোডার্মের আবির্ভাব ঘটে। এই তিনটি স্তর থেকেই পূর্ণাঙ্গজীবের সব কলা (অঙ্গ) গঠিত হয়। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অভ্যন্তরীণ কোশপুঞ্জ (Inner cell mass) কিছু নির্দিষ্ট কোশ সমন্বিত হয় এবং এদের স্টেমকোশ বলে। এই স্টেম কোশগুলোর সব কলা এবং অঙ্গ তৈরির ক্ষমতা রয়েছে।

গর্ভাবস্থার বিভিন্ন মাসে ভ্রূণের বিকাশের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? মানুষের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা নয়মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তোমরা কী জানো কুকুর, হাতি এবং বিড়ালের গর্ভাবস্থার সময়কাল কত? এর উত্তরটি খুঁজে বের করো। মানুষের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার প্রথম একমাস পর ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড গঠিত হয়। বর্ধনশীল শিশুভ্রূণের প্রথম লক্ষণটি স্টেথোস্কোপের সাহায্যে সতর্কভাবে হৃদধ্বনি শোনার মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় মাসের শেষে, শিশুভ্রূণের হাত ও পা এবং আঙ্গুলগুলো গঠিত হয়। গর্ভাবস্থার 12 সপ্তাহের শেষে (প্রথম তিনমাস কাল বা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার) অধিকাংশ অঙ্গাতন্ত্র গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাত-পা এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গগুলো সুগঠিত হয়। গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসকালে সাধারণত শিশুভ্রূণের প্রথম নড়াচড়া বোঝা যায় এবং মস্তকে চুল গজায়। গর্ভাবস্থার প্রায় 24 সপ্তাহের শেষে (দ্বিতীয় তিন মাসকাল বা সেকেণ্ড ট্রাইমেস্টার শেষে) শিশুভ্রূণের দেহ ক্ষুদ্র রোম দ্বারা আবৃত হয়, চক্ষুপল্লবগুলো পৃথক হয় এবং পল্লব-রোম গঠিত হয়। গর্ভাবস্থার নয় মাসের শেষে শিশুভ্রূণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং প্রসব অর্থাৎ মাতৃদেহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়।

3.7 প্রসব এবং দুগ্ধক্ষরণ (Parturition and Lactation)

মানুষের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার গড় সময়কাল হল প্রায় 9 মাস যাকে গর্ভকাল (gestation period) বলে। গর্ভাবস্থার শেষে জরায়ুর তীব্র সংকোচনের কারণে শিশু ভ্রূণটি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে বা শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুভ্রূণের মাতৃগর্ভ থেকে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসার (শিশুর জন্ম) এই প্রক্রিয়াকে প্রসব (parturition) বলে। একটি জটিল স্নায়বিক-অন্তঃক্ষরা পদ্ধতি (neuroendocrine mechanism) দ্বারা প্রসব প্রক্রিয়াটি ঘটে। পূর্ণবিকশিত শিশুভ্রূণ এবং অমরা (Placenta) থেকে প্রসবের সংকেত সৃষ্টি হয় যা জরায়ুতে মৃদু সংকোচন ঘটায়, একে ফিটাল ইজেকশান রিফ্লেক্স (foetal ejection reflex) বলে। এটি মাতৃদেহের পিট্যুইটারী গ্রন্থি থেকে অক্সিটোসিন হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। অক্সিটোসিন জরায়ুর পেশীর উপর ক্রিয়া করে এবং এরফলে জরায়ুর তীব্র সংকোচন ঘটে যা পরবর্তীতে অক্সিটোসিনের আরোও ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। জরায়ুর সংকোচন এবং অক্সিটোসিনের ক্ষরণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি চলতে থাকে এবং এরফলে জরায়ুর সংকোচন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। এর ফলশ্রুতিতে জরায়ু থেকে যোনিপথের মধ্য দিয়ে শিশু দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ প্রসব ঘটে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জরায়ু থেকে অমরাও দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। *তোমরা কী মনে করো প্রসব ঘটানোর জন্য ডাক্তারবাবুদের আসন্ন প্রসবা মাতাকে ইনজেকশান দিতে হয়?*

মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন সময় স্তনগ্রন্থিগুলো বিভেদিত হয় এবং গর্ভাবস্থার শেষের দিকে দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াকে দুগ্ধক্ষরণ (lactation) বলে। এটি মাতাকে সদ্যজাত শিশুকে স্তন্যপান করাতে সাহায্য করে। দুগ্ধক্ষরণকালে প্রথম কিছুদিন যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাকে কোলোস্ট্রাম (colostrum) বলে। এই কোলোস্ট্রাম বহু অ্যান্টিবডি সমন্বিত হয় যা নবজাতকের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক। এটি সুস্থ শিশুর প্রতিপালনের জন্য শিশুর বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসকগণ স্তন্যপান করানোর পরামর্শ দেন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ যৌনজননকারী এবং জরায়ুজ প্রাণী। পুং জননতন্ত্র একজোড়া শুক্রাশয়, পুং যৌন আনুষঙ্গিক নালিকাসমূহ এবং আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহ ও বাহ্যিক যৌনাঙ্গা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি শুক্রাশয়ে 250টি প্রকোষ্ঠ থাকে, এদের টেস্টিকুলার লোবিউল বলে এবং প্রতিটি লবিউল 1-3টি অধিক কুণ্ডলীকৃত সেমিনিফেরাস টিউবিউল সমন্বিত হয়। প্রতিটি সেমিনিফেরাস নালিকার অন্তঃগাত্রে স্পার্মাটোগোণিয়া এবং সারটোলি কোশ অবস্থান করে। স্পার্মাটোগোণিয়া মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন করে। অন্যদিকে সারটোলিকোশসমূহ বিভাজনরত জার্মকোশগুলোকে (germ cell) পুষ্টি সরবরাহ করে। সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরের দিকে অবস্থিত লেডিগ কোশগুলো টেস্টিকুলার হরমোনসমূহের সংশ্লেষ ও ক্ষরণ ঘটায়। এই হরমোনগুলোকে অ্যান্ড্রোজেন বলে। পুরুষের বাহ্যিক যৌনাঙ্গাটিকে শিশ্ন বলে।

স্ত্রীজনন তন্ত্রটি একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বনালী, জরায়ু, যোনি, বাহ্যিক যৌনাঙ্গা এবং একজোড়া স্তনগ্রন্থি নিয়ে গঠিত। ডিম্বাশয়গুলোতে স্ত্রীজননকোশ (ডিম্বাণু) এবং কিছু স্টেরয়েড হরমোন (ডিম্বাশয় নিঃসৃত হরমোন) উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়ের ফলিকলগুলো এদের বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় ডিম্বাশয়ের ধাত্রে বা স্ট্রোমায় নিমজ্জিত থাকে।

স্ত্রী যৌন আনুষঙ্গিক নালীকাগুলো হল-ডিম্বনালী, জরায়ু এবং যোনি। জরায়ুটিতে পেরিমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম এবং এন্ডোমেট্রিয়াম নামক তিনটি স্তর রয়েছে। স্ত্রীদেহের বাহ্যিক যৌনাঙ্গগুলো হল- মনস পিউবিস, ল্যাবিয়া মেজোরা, লেবিয়া মাইনরা, হাইমেন, ক্লিটোরিস। স্ত্রী দেহের গৌণ যৌন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হল স্তনগ্রন্থির উপস্থিতি।

স্পার্মাটোজেনেসিসের ফলে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এই শুক্রাণুগুলো পুং যৌন আনুষঙ্গিক নালীকাসমূহের দ্বারা পরিবাহিত হয়। মানুষের একটি স্বাভাবিক শুক্রাণু মস্তক, গ্রীবা, মধ্যাংশ এবং পুচ্ছ নিয়ে গঠিত। পরিণত স্ত্রীজনন কোশ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উজেনেসিস বলে। প্রাইমেটবর্গভুক্ত স্ত্রী প্রাণীদের জননচক্রটিকে রজ:চক্র বলে। রজঃচক্র কেবলমাত্র যৌন পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর (বয়ঃসন্ধিকাল) শুরু হয়। প্রতিটি রজঃচক্রে ডিম্ব নিঃ সরণকালে কেবলমাত্র একটি ডিম্বাণুই নির্গত হয়। রজঃচক্রের সময় গর্ভাশয় এবং জরায়ুতে সংঘটিত চক্রাকার পরিবর্তনগুলো পিটুইটারী এবং ডিম্বাশয় নিঃসৃত হরমোনের পরিবর্তনের প্রভাবে ঘটে। যৌনমিলন বা যৌন সঙ্গমের পর, শুক্রাণুগুলো ইসথমাস এবং অ্যাম্পুলার সংযোগস্থলে পরিবাহিত হয় যেখানে শুক্রাণুটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে এবং এরফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠিত হয়। শুক্রাণুতে X অথবা Y ক্রোমোজোমের উপস্থিতি ভ্রূণের লিঙ্গা নির্ধারণ করে। এরপর জাইগোট বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে একটি ব্লাস্টোসিস্ট গঠন করে যা জরায়ুর গাত্রে রোপিত হলে গর্ভসঞ্চার ঘটে। গর্ভাবস্থার নয়মাস পর, শিশু ভ্রূণটি পূর্ণ বিকশিত হয় এবং প্রসবের জন্য প্রস্তুত হয়। শিশুর জন্ম গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে প্রসব বলে, যা একটি জটিল স্নায়বিক অন্তঃক্ষরা পদ্ধতির প্রভাবে ঘটে এবং এতে কর্টিসল, ইস্ট্রোজেন এবং অক্সিটোসিন অংশগ্রহণ করে। গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থিগুলো বিভেদিত হয় এবং শিশুর জন্মের পর এই গ্রন্থিগুলো থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। শিশুর বৃদ্ধির প্রথম কয়েকমাসকালে নবজাতক শিশুটিকে স্তন্যপান করানো হয়।

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) মানুষ _______ প্রক্রিয়ায় (অযৌন/যৌন) প্রজনন করে।

খ) মানুষ হল _______ (অন্তজ, জরায়ুজ, অণ্ড জরায়ুজ) প্রাণী।

গ) মানুষ সংঘটিত নিষেক প্রক্রিয়াটি হল _______ (অন্তঃনিষেক/বহিঃনিষেক)।

ঘ) পুং ও স্ত্রী জনন কোশগুলো হল _______ (ডিপ্লয়েড/হ্যাপ্লয়েড)।

ঙ) জাইগোট হল _______ (ডিপ্লয়েড/হ্যাপ্লয়েড)।

চ) পরিণত ডিম্বথলি থেকে ডিম্বাণু নির্গমনের প্রক্রিয়াকে _______ বলে।

ছ) ডিম্বাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াটি ________ হরমোনটির দ্বারা উদ্দীপিত হয়।
জ) পুং ও স্ত্রী জনন কোশের মিলনকে ________ বলে।
ঝ) জাইগোটটি বিভাজিত হয়ে ________ গঠন করে যা জরায়ু গাত্রে রোপিত হয়।
ঞ) মানুষের দেহে নিষেক প্রক্রিয়াটি ________ স্থানে ঘটে।
ট) শিশুভ্রূণ এবং জরায়ুর মধ্যে রক্তবাহ সমন্বিত সংযোগ রক্ষাকারী গঠনটি হল ________।

2. মানুষের পুংজননতন্ত্রের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
3. মানুষের স্ত্রী জননতন্ত্রের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
4. শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় প্রতিটির দুটি করে প্রধান কাজ লিখ।
5. সেমিনিফেরাস নালিকার গঠন বর্ণনা কর।
6. স্পার্মাটোজেনেসিস কী ? স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
7. স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারী হরমোনগুলোর নাম লিখ।
8. স্পার্মিওজেনেসিস এবং স্পার্মিয়েশানের সংজ্ঞা দাও।
9. শুক্রানুর একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
10. সেমিনাল প্লাজমার প্রধান উপাদানগুলো কী কী ?
11. পুং যৌন আনুষঙ্গিক নালিকাসমূহ এবং গ্রন্থিসমূহের মুখ্য কাজগুলো কী কী?
12. উজেনেসিস কী ? উজেনেসিস প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
13. ডিম্বাশয়ের ছেদদৃশ্যের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
14. গ্রাফিয়ান ফলিকলের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
15. নিম্নলিখিত গুলোর কাজ লিখ —
    (ক) করপাস লিউটিয়াম (খ) এন্ডোমেট্রিয়াম (গ) অ্যাক্রোজোম (ঘ) শুক্রাণুর পুচ্ছ (ঙ) ফিম্ব্রি
16. সত্য / মিথ্যা বিবৃতিগুলো সনাক্ত কর। প্রতিটি মিথ্যা বিবৃতিকে সঠিক করে নিয়ে সত্য বিবৃতিতে পরিণত কর।

ক) সারটোলি কোশে অ্যান্ড্রোজেনগুলো উৎপন্ন হয়। (সত্য/মিথ্যা)
খ) স্পার্মাটোজোয়া সারটোলি কোশ থেকে পুষ্টি পায়। (সত্য/মিথ্যা)
গ) লেডিগ কোশগলো ডিম্বাশয়ে পাওয়া যায় (সত্য/মিথ্যা)।
ঘ) লেডিগ কোশগুলো অ্যান্ড্রোজেনসমূহ সংশ্লেষ করে (সত্য/মিথ্যা)।
ঙ) কারপাস লিউটিয়ামে উজেনেসিস ঘটে (সত্য/মিথ্যা)।
চ) গর্ভাবস্থায় রজঃচক্র বন্ধ থাকে (সত্য/মিথ্যা)।
ছ) হাইমেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যৌন অভিজ্ঞতার একটি নির্ভরযোগ্য সূচক নয়। (সত্য/মিথ্যা)

17. রজঃচক্র কী? কোন্ হরমোনগুলো রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ করে?
18. প্রসব কী? কোন্ হরমোনগুলোর প্রভাবে প্রসব প্রক্রিয়াটি ঘটে?
19. আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য প্রায়শই মহিলাদের দায়ী করা হয়। কেন এটি সঠিক নয়, তোমরা কী ব্যাখ্যা করতে পারো?
20. মানুষের ডিম্বাশয় থেকে প্রতিমাসে কয়টি ডিম্বাণু নির্গত হয়? সম যমজ সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের দেহে কতগুলো ডিম্বাণু নির্গমণ ঘটে বলে তোমরা মনে কর? যদি বিষম যমজ হয় তবে তোমার উত্তরের কোনো পরিবর্তন হবে কি?
21. ছয়টি কুকুর ছানার জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে কুকুরীটির ডিম্বাশয় থেকে কতগুলো ডিম্বাণু নির্গমন হবে বলে তোমরা মনে করো?

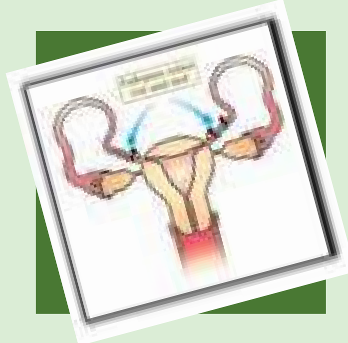

অধ্যায়-4

জননগত স্বাস্থ্য
(Reproductive Health)

4.1 জননগত স্বাস্থ্য সমস্যাবলী এবং কৌশলসমূহ (Reproductive Health Problems and Strategies)

4.2 জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ (Population Explosion and Birth Control)

4.3 মেডিকেল টার্মিনেশান অফ প্রেগনেন্সি (Medical Termination of Pregnancy)

4.4 যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগসমূহ (Sexually Transmitted Diseases)

4.5 বন্ধ্যাত্ব (Infertility)

তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা মানুষের জননতন্ত্র এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে জেনেছো। চলো এখন আমরা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি বিষয়- জননগত স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করি। জননগত স্বাস্থ্য- এই পরিভাষা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি? সহজভাবে এই পরিভাষাটি বলতে ,স্বাভাবিক কাজ করে এমন সুস্থ জনন অঙ্গাসমূহকে বোঝায়। তবে এর একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে এবং জননের আবেগপূর্ণ এবং সামাজিক দিকগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী জননগত স্বাস্থ্য বলতে জননের সবগুলো দিক থেকে অর্থাৎ শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, আচরণগত এবং সামাজিক দিক থেকে সামগ্রিক সুস্থতাকে বোঝায়। তাই একটি সমাজকে জননগত দিক থেকে সুস্থ তখনই বলা হবে যখন সেই সমাজের লোকেদের জননঅঙ্গাসমূহ শারীরিক এবং কার্যকরীভাবে স্বাভাবিক থাকবে এবং যৌন সংক্রান্ত সব বিষয় গুলোতে নিজেদের মধ্যে প্রক্ষোভিক এবং আচরণগত আন্তঃক্রিয়াগুলো স্বাভাবিক হবে। জননগত স্বাস্থ্য বজায় রাখা তাৎপর্যপূর্ণ কেন এবং এই লক্ষ্য পূরণে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? চলো আমরা সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

4.1 জননগত স্বাস্থ্য - সমস্যাবলী এবং কৌশলসমূহ (Reproductive Health - Problems and Strategies)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষই হল প্রথম দেশ যেখানে একটি সামাজিক লক্ষ্য হিসাবে সম্পূর্ণ জননগত স্বাস্থ্য লাভ করার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গঠন করা হয়েছিল। এই কমসূচী গুলোকে 'পরিবার পরিকল্পনা' বলে এবং 1951 সালে এই কর্মসূচীগুলোর সূচনা হয়েছিল ও গত দশক গুলো ধরে নির্দিষ্ট সময় পর পর এগুলোর মূল্যায়ন করা হয়েছিল। জনন

সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহকে নিয়ে যে উন্নত কর্মসূচি গুলো বর্তমানে কাজ করে চলছে তা "জননগত এবং শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি" বা "রিপ্রোডাকটিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার প্রোগামস্" {Reproductive and Child Health Care (RCH) Programmes} নামেই বহুল প্রচলিত। এই কর্মসূচিগুলোর অন্তর্ভূক্ত মুখ্য কাজগুলো হল জননগত দিক থেকে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষে জনসাধারণের মধ্যে জনন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলোর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও সুযোগ সুবিধা এবং সহায়তা প্রদান করা।

জন সাধারণের মধ্যে জনন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলোর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা গুলো অডিও ভিস্যুয়াল ও প্রিন্ট মিডিয়ার সহায়তায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপরোক্ত তথ্যগুলোর সম্প্রচারে পিতামাতা, অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বন্ধুবান্ধবদেরও মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার প্রবর্তনকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে যাতে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা জননসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য পায় এবং এবিষয়ে কাল্পনিক এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূরীভূত হয়। জনন অঙ্গাসমূহ, বয়ঃসন্ধি এবং এর সম্পর্কিত পরিবর্তনসমূহ, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত যৌনক্রিয়া, যৌনসংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগসমূহ (STD), AIDS ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জনসাধারণকে বিশেষত যারা কৈশোর বয়সে রয়েছে তাদের জননগতভাবে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করে। জনসাধারণকে বিশেষত প্রজননে সক্ষম দম্পতিদের এবং বিবাহযোগ্যদের জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজলভ্য পদ্ধতি, গর্ভবতী মায়েদের যত্ন, সদ্যোজাত শিশু এবং মায়ের যত্ন, মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব, ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের সমান সুযোগসুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ভাবে সচেতন অভীষ্ট আকারের সুস্থ পরিবার গড়ে তোলা। অনিয়ন্ত্রিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যৌন সম্পর্কিত অপরাধসমূহ এবং যৌন নিপীড়ন ইত্যাদির মতো সামাজিক দুষ্কর্মের কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলো সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে তারা এই সব বিষয়ে চিন্তা করতে পারে এবং এগুলোর বাধাদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ও এইভাবে সামাজিকভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

জননগত স্বাস্থ্য অর্জনে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলোর সফলভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পরিকাঠামোগত সুবিধা, পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন উপাদানগত সহায়তার প্রায়োজন হয়। এগুলো জনসাধারণকে গর্ভাবস্থা, প্রসব, যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগ সমূহ, গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ, রজঃচক্র সংক্রান্ত সমস্যাবলী, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি জনন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে চিকিৎসা সহায়তা এবং যত্ন প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সময় পর পর উন্নততর পদ্ধতি সমূহ এবং নতুন কৌশল সমূহের বাস্তবায়ণ জনসাধারণকে আরোও সেবাযত্ন ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজন। আইনসম্মতভাবে ক্রমবর্ধমান কন্যাভ্রূণহত্যা রুখতে, লিঙ্গানির্ধারণের জন্য অ্যামনিওসেন্টেসিস (amniocentesis) এর উপর বিধিসম্মত নিষেধাজ্ঞা জারি করা, ব্যাপকহারে শিশুর টিকাকরণ ইত্যাদি হল এই প্রসঙ্গো উল্লেখ্য কিছু সফল কর্মসূচি। অ্যামনিওসেন্টেসিস প্রক্রিয়ায় ভ্রূণকোশসমূহ এবং অ্যামনিওটিক তরলে দ্রবীভূত বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করার জন্য অ্যামনিওন ও বর্ধনশীল ভ্রূণের মাঝে অবস্থিত অ্যামনিওটিক তরল থেকে কিছু পরিমাণ তরল সংগ্রহ করা হয়। ডাউন সিনড্রোম, হিমোফিলিয়া, সিক্‌লসেল অ্যানিমিয়া ইত্যাদির মতো কিছু জিনগত রোগসমূহের উপস্থিতি, ভ্রূণের বেঁচে থাকা নির্ধারণ করতে এই পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করতে এবং অথবা প্রচলিত পদ্ধতিগুলোকে আরোও উন্নত করার লক্ষে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো জনন সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর উপর গবেষণায় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করছে। তোমরা কি জানো ভারতের লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CDRI) এর বিজ্ঞানীরা মহিলাদের জন্য একটি নতুন গর্ভ নিরোধক বড়ি (Oral Contraceptive) 'সহেলি' (Saheli) তৈরী করেছে? যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা, চিকিৎসাকর্মীর সহায়তায় প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি, জন্ম পরবর্তী সময়ে শিশু এবং মায়ের অধিক যত্নের ফলে মা ও শিশুর মৃত্যুর হ্রাস,

ছোট পরিবারে আগ্রহী দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধি, যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগসমূহের (STDs) অপেক্ষাকৃত সঠিক নির্ধারণ ও নিরাময় এবং সব-যৌন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর জন্য চিকিৎসা প্রদানের সামগ্রিক উন্নয়ন ইত্যাদি সবই হল সমাজের উন্নত জননগত স্বাস্থ্যের নির্ধারক।

4.2 জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ (Population Explosion and Birth Control)

বিগত শতাব্দীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখ্যযোগ্যভাবে উন্নতি ঘটেছে। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির উপর উন্নততর জীবন যাত্রার মানের সাথে বর্ধিত স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি সুতীব্র প্রভাব ছিল। বিশ্বের জনসংখ্যা যা 1900 সালে ছিল প্রায় 2 বিলিয়ন (2000 মিলিয়ন) তা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে 2000 সালে 6 বিলিয়ন এবং 2011 সালে 7.2 বিলিয়ন পৌঁছায়। ভারতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। স্বাধীনতার সময় আমাদের জনসংখ্যা প্রায় 350 মিলিয়ন ছিল যা 2000 সালে প্রায় বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছায় এবং 2011 সালে 'মে' এর মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা 1.2 বিলিয়ন অতিক্রম করে যায়। জনসংখ্যার এই অতিবৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণগুলো হল— মৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পাওয়া, মায়ের মৃত্যু হার ও, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া এবং এর পাশাপাশি প্রজনন দশায় পৌঁছেছে এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। রিপ্রোডাকটিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার (RCH) প্রোগ্রামস্ এর মাধ্যমে যদিও আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করতে পেরেছি তবে জনসংখ্যা খুব সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। 2011 সালে জনগণনার তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা 2 ভাগের ও কম ছিল অর্থাৎ বছরে 1000 জনে 20 জন, এই হারে আমাদের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের চাহিদার মতো মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা সত্ত্বেও জনসংখ্যার এরূপ বিপদজনক বৃদ্ধির হারের ফলে এগুলোর চরম ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির হার রুখতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সমস্যাটি থেকে উত্তরণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হল ছোট পরিবারগুলোকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা। তোমরা হয়তো প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন সমূহের পাশাপাশি পোস্টার/বিল ইত্যাদিতে 'হাম দো, হামারে দো' (আমরা দুই, আমাদের দুই) এই শ্লোগান সহ দুটি শিশু সমেত সুখী দম্পতির ছবি দেখেছ। বহু দম্পতি যাদের অধিকাংশই কমবয়সী, শহরের বসবাসকারী, চাকুরিজীবি তারা "একটি শিশু নীতি" (One Child Norm) গ্রহণ করেছেন। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য যে অন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তা হল — আইনসম্মতভাবে বিবাহের বয়স বাড়িয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে 18 ও ছেলেদের ক্ষেত্রে 21 বছর করা এবং ছোটো পরিবারগুলোর দম্পতিদের অনুদান (Incentive) দেওয়া। চলো, আমরা এমন কিছু সচরাচর ব্যবহৃত জন্ম নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো অবাঞ্ছিত গর্ভ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

একটি আদর্শ জন্ম নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি সহজ ব্যবহারযোগ্য, সহজলভ্য, কার্যকরী এবং প্রতিবর্তনযোগ্য (Reversible) ও সামান্য অথবা একেবারেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন হওয়া উচিৎ। এটি কোনোভাবেই ব্যবহারকারীর যৌন চাহিদা, যৌন ইচ্ছা এবং অথবা যৌন ক্রিয়ায় ও কোনো রূপ অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। বর্তমানে সহজলভ্য বিস্তৃত পরিসরে প্রাপ্ত জন্ম নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিগুলোকে নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে ব্যাপক ভাবে গোষ্ঠীভূত করা যেতে পারে যথা- প্রাকৃতিক/প্রথাগত পদ্ধতি, বাধাদায়ক (Barrier) পদ্ধতি, ইনট্রাইউটেরাইন ডিভাইস সমূহ (IUDS), গর্ভনিরোধক বড়ি, ইনজেকশনের মাধ্যমে গর্ভরোধ, ইমপ্ল্যান্টসমূহ এবং শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি বা সার্জিক্যাল পদ্ধতি।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের সম্ভাবনা এড়ানোর নীতির উপর কাজ করে। নির্দিষ্ট সময় ধরে বিরত থাকা (Periodic Abstinence) হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দম্পতিরা রজঃচক্রের 10-17 দিন সময় কালে যখন ডিম্বাণু নিঃসরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই সময়ে যৌন মিলন এড়াতে পারে বা এর থেকে বিরত থাকতে পারে। এই সময়কালে নিষেকের সম্ভাবনা

অত্যন্ত বেশি হওয়ায় একে উর্বরকাল (Fertile Period) বলে। তাই এই সময় কালে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকলে গর্ভসঞ্চার এড়ানো যেতে পারে। তুলে নেওয়া (Withdrawal) অথবা যৌন মিলনে বিঘ্ন ঘটানো হল অপর একটি পদ্ধতি যেখানে গর্ভধান (Insemination) রোধের জন্য পুরুষ সঙ্গী বীর্যপাতের ঠিক পূর্বে স্ত্রী দেহের যোনি থেকে তার শিশ্নটি বের করে নিয়ে আসে। ল্যাকটেশনাল অ্যামোনোরিয়া (Lectational Amenorrhea) (রজঃস্রাব বন্ধ থাকা) পদ্ধতিটি প্রসবের পর প্রগাঢ় দুগ্ধক্ষরণ কালে ডিম্বাণু নিঃসরণ না হওয়া এবং একারণে রজঃচক্রটি না ঘটার উপর নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত মাতা শিশুকে সম্পূর্ণরূপে স্তন দুগ্ধ পান করায় ততদিন পর্যন্ত গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। যদিও সমীক্ষায় দেখাগেছে, এই পদ্ধতিটি শিশুর জন্মের পর কেবলমাত্র সর্বাধিক ছয়মাস পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এই পদ্ধতিতে যেহেতু কোনো ঔষধ অথবা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না, তাই এক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায় নেই। যদিও এই পদ্ধতিটির ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশী।

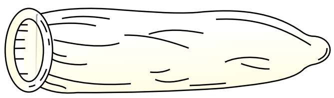

চিত্র 4.1 (ক) পুরুষের জন্য কনডোম

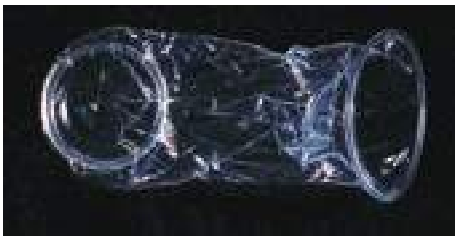

চিত্র 4.1 (খ) মহিলাদের জন্য কনডোম

চিত্র 4.2 কপার T (CuT)

বাধাদায়ক পদ্ধতিতে (Barrier Methods) শুক্রাণু এবং ডিম্বানুর পরস্পরের সংস্পর্শে এসে মিলিত হওয়ার ঘটনাটিকে প্রতিবন্ধক সমূহের সাহায্যে প্রতিরোধ করা হয়। এই পদ্ধতি গুলো পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের জন্যই সহজলভ্য। কনডোম (চিত্র 4.1 ক,খ) হল পাতলা রাবার অথবা লেটেক্স শিথ দ্বারা তৈরী বাধাদায়ক বা প্রতিবন্ধক যেগুলো পুরুষের ক্ষেত্রে শিশ্ন অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে যোনিপথ এবং সারভিক্সের আচ্ছাদক হিসাবে যৌন মিলনের ঠিক পূর্বে ব্যবহার করা হয় যাতে পুরুষ যৌনাঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য স্ত্রী দেহের জনননালীতে প্রবেশ করতে না পারে। এটি গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করতে পারে। পুরুষের জন্য কনডোমের একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হল 'নিরোধ'। কনডোম ব্যবহারকারীরা STI (Sexually Transmitted Infections) এবং AIDS সমূহ এর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং কনডোমের অতিরিক্ত এই সুবিধার কারণে সাম্পতিক বছরগুলোতে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কনডোমগুলো ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া যায়, নিজে নিজেই লাগাতে পারে (Self Inserted) এবং তাই ব্যবহারকারীকে গোপনীয়তা প্রদান করে। ডায়াফ্রাম, সারভিক্যাল ক্যাপ এবং ভল্ট হল রাবারের তৈরী বাধাদায়ক (Barriers) যেগুলো যৌনমিলনকালে সারভিক্সকে ঢেকে রাখতে স্ত্রী দেহের জনন নালীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো সারভিক্সের মধ্য দিয়ে শুক্রাণুর প্রবেশে বাধা দিয়ে গর্ভসঞ্চার রোধ করে এই বাধা দায়ক গুলোর গর্ভনিরোধক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে এগুলোর সাথে সাধারণত স্পার্মিসাইডল ক্রিম, জেলি এবং ফোম ব্যবহৃত হয়।

অন্য একটি জনপ্রিয় এবং কার্যকারী পদ্ধতি হল ইনট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস (IUDs) এর ব্যবহার। এই যন্ত্রগুলো ডাক্তার অথবা অভিজ্ঞ নার্সের দ্বারা যোনিপথের মধ্যে দিয়ে জরায়ুতে নিহিত করা হয়। এই (IUDs) সমূহ বর্তমানে নিম্নলিখিত রূপে সহজলভ্য হয়। যেমন নন মেডিকেটেড বা ঔষধ বিহীন IUDs সমূহ (উদা:-লিপস্ লুপ), কপার নিঃসরণকারী IUD সমূহ (CuT, Cu7, মাল্টিলোড 375) এবং হরমোন নিঃসরণকারী IUD সমূহ (প্রোজেস্টাসার্ট LNG-20) (চিত্র-4.2)। IUD গুলো জরায়ুর মধ্যে শুক্রাণুর ফ্যাগোসাইটোসিস বৃদ্ধি করে এবং নিঃসৃত CU আয়নগুলো শুক্রাণুর চলন ও শুক্রাণুর নিষিক্তকরণের ক্ষমতাকে অবদমিত করে। এছাড়াও হরমোন নিঃ সরণকারী IUD গুলো জরায়ুকে নিষিক্ত ডিম্বানু রোপনের জন্য অনুপযোগী করে তোলে এবং সারভিক্সকে শুক্রাণুর চলাচলের জন্য প্রতিকূল করে তোলে। মহিলাদের মধ্যে যারা দেরীতে গর্ভধারণ করতে চায় অথবা দুটি সন্তানের মধ্যে ব্যবধান রাখতে চায় সেসব মহিলাদের জন্য IUD হল আদর্শ গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা। এটি ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে গৃহীত গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি।

মহিলারা ব্যবহার করে এমন অপর একটি গর্ভনিরোধক পদ্ধতি হল অল্পমাত্রায় প্রোজেস্টোজেন অথবা প্রোজেস্টোজেন - ইস্ট্রোজেন সংমিশ্রণটি বড়ি হিসাবে গ্রহণ করা। এগুলো টেবলেট রূপে ববেহৃত হয় এবং তাই এগুলো গর্ভনিরোধক বড়ি (Pill) নামে জনপ্রিয়। এই বড়ি গ্রহণ রজঃচক্রের প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে যে কোনো দিন থেকে শুরু করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রতিদিন একটি করে 21 দিন ধরে এই বড়ি গুলো খেয়ে যেতে হবে। এরপর 7 দিন (যখন ঋতুস্রাব ঘটে) বন্ধ রেখে একই নিয়মে এই বড়িগুলো খেয়ে যেতে হবে যতদিন না পর্যন্ত মহিলাটি গর্ভধারণ করতে চায়। এই বড়িগুলো ডিম্বাণু নিঃসরণ এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপনে বাধা দেয় এবং এর পাশাপাশি স্ত্রী জনন পথে শুক্রাণুর প্রবেশের হার হ্রাস করার জন্য সারভিক্স থেকে ক্ষরিত মিউকাসের গুনগত পরিবর্তন ঘটায়। এই বড়ি গুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয় ও এগুলো অত্যন্ত কার্যকারী হয় এবং মহিলাদের কাছে এদের গ্রহণ যোগ্যতা বেশী। মহিলাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে স্টেরয়েড নয় এমন একটি গর্ভনিরোধক বড়ি হল — 'সহেলী' । এটি খুবই সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট উচ্চগর্ভানিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বড়ি যা সপ্তাহে একবার গ্রহণ করতে হয়।

চিত্র 4.3 ইমপ্ল্যান্টস

মহিলারা ইনজেকশানের মাধ্যমে বা ত্বকের নীচে ইমপ্ল্যান্ট রূপে কেবলমাত্র প্রোজেস্টোজেন বা প্রোজেস্টোজেন - ইস্টোজেন সংমিশ্রণ ও ব্যবহার করতে পারে (চিত্র- 4.3)। এদের কার্যপদ্ধতি গর্ভনিরোধক বড়ির মতো একই রকম হয় কিন্তু এগুলো অনেকটা বেশী সময় ধরে কার্যকরী থাকে। এটা দেখা গেছে যে, যৌনমিলনের 72 ঘন্টার মধ্যে প্রোজেস্টোজেন বা প্রোজেস্টোজেন ইস্ট্রোজেন সংমিশ্রণ অথবা IUD সমূহের ব্যবহার আপদকালীন গর্ভনিরোধক হিসাবে খুবই কার্যকারী হয় কারণ এগুলো হঠাৎ অসুরক্ষিত যৌনমিলন বা ধর্ষণের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য ও গর্ভসঞ্চার এড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

শল্যচিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে নির্বীজকরণ বা বন্ধ্যাত্বকরণও বলা হয় এবং এই পদ্ধতিগুলো পরবর্তী যে কোনো গর্ভসঞ্চার রোধে স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে সাধারণত পুরুষ/মহিলা সঙ্গীদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে জনন কোশ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং এভাবে গর্ভসঞ্চারে বাধাদান করা হয়। পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বকরণের প্রক্রিয়াকে যথাক্রমে ভ্যাসেক্টমি ও টিউবেক্টমি বলে। ভ্যাসেক্টমি পদ্ধতিতে স্ক্রুটামের উপর কিছুটা অংশ কেটে তার মধ্যে দিয়ে ভাস ডিফারেন্সের

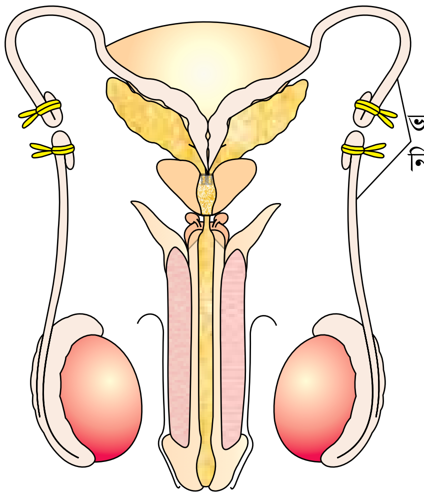

চিত্র 4.4 (ক) ভ্যাসেক্টমি

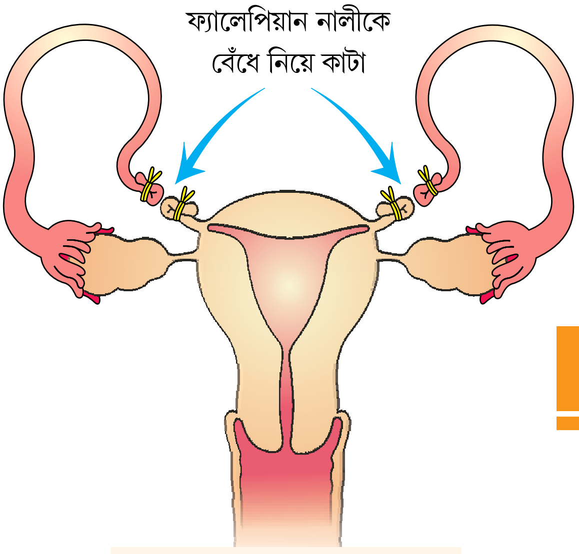

চিত্র 4.4 (খ) টিউবেক্টমি

ভারত সরকার বেআইনী গর্ভপাতের ঘটনা ও একই সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর হার এবং অন্যান্য উপসর্গ গুলো হ্রাস করতে মেডিকেল টার্মিনেশান অফ প্রেগনেন্সি (সংশোধনী) আইন, 2017 {The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act 2017} চালু করে ছিল। এই আইন অনুযায়ী একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণকে বিবেচনাযোগ্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের প্রথম 12 সপ্তাহের এর মধ্যে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মতামত নিয়ে অপসারণ করা যেতে পারে অর্থাৎ মহিলার গর্ভপাত করানো যেতে পারে। গর্ভাবস্থার সময়কাল যদি 12 সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয় কিন্তু 24 সপ্তাহের কম হয়, সেই ক্ষেত্রে দুজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সদভাবনার উপর ভিত্তি করে গঠিত মতবাদটি এমন হবে যে, গর্ভপাতের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র রয়েছে তাহলেই গর্ভপাত করানো যেতে পারে। এরূপ গর্ভপাতের জন্য ক্ষেত্রগুলো হল —

(i) গর্ভাবস্থা চলতে থাকলে যদি গর্ভবতী মহিলার প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং তা শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকারক হতে পারে; বা

(ii) জন্ম গ্রহণ করলে যদি শিশুটির জীবন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, শিশুটি এমন শারিরীক অথবা মানসিক অস্বাভাবিকতায় ভুগতে পারে যার ফলে শিশুটি মারাত্মক ভাবে বিকলাঙ্গ ও হতে পারে।

একটি ক্ষুদ্র অংশকে বাদ দেওয়া হয় অথবা বেঁধে দেওয়া হয় (চিত্র 4.4 ক)। অপরদিকে টিউবেক্টমি পদ্ধতিতে উদরের একটি ছোট অংশ কেটে তার মধ্যে দিয়ে বা যোনিপথের মধ্যে দিয়ে ফ্যালোপিয়ান নালীর একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদ দেওয়া হয় (চিত্র 4.4 খ) অথবা বেঁধে দেওয়া হয়। এই কৌশলসমূহ গর্ভসঞ্চার রোধে অত্যন্ত কার্যকরী হয় কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোতে ভাস-ডিফারেন্স এবং ফ্যালোপিয়ান নালীকে পূর্বের গঠনে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব।

এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন যে একটি উপযুক্ত গর্ভনিরোধ পদ্ধতির নির্বাচন এবং এর ব্যবহার সর্বদা যোগ্য পেশাদার চিকিৎসাকর্মীর পরামর্শে করা উচিত। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এটাও মনে রাখতে হবে যে জননগত স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য গর্ভনিরোধকগুলোর নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বস্তুত পক্ষে, এগুলো জনন বিষয়ক স্বাভাবিক ঘটনা অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার গর্ভাবস্থা রোধে ব্যবহার করা হয়।

কেউ হয়তো কখনোও ব্যক্তিগত কারণে গর্ভসঞ্চার রোধ করার জন্য অথবা গর্ভসঞ্চার বিলম্বিত করার জন্য অথবা দুটি গর্ভসঞ্চারের মধ্যে ব্যবধান রাখতে এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এই পদ্ধতিগুলোর ব্যাপক ব্যবহার নিঃসন্দেহে জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি রোধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাগুলোর ব্যবহারের ফলে বমি বমি ভাব, উদরে ব্যথা অনুভব করা, রজঃ-স্রাব রূপে নির্গত রক্ত, রজঃচক্রের সময় অনিয়মিত রক্তক্ষরণ অথবা এমনকি স্তনের ক্যানসারের মতো সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো যদিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় তথাপি এগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

4.3 মেডিকেল টার্মিনেশান অফ প্রেগনেন্সি (Medical Termination of Pregnancy-MTP)

গর্ভাবস্থার পূর্ণ সময়কালের পূর্বে ইচ্ছাকৃত অথবা ঐচ্ছিক গর্ভপাতকে MTP বা প্রণোদিত গর্ভপাত বলে। সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছরে প্রায় 45-50 মিলিয়ন গর্ভপাত করানো হয় যা হিসাব করলে এক বছরে মোট গর্ভসঞ্চারের একপঞ্চমাংশ (1/5 অংশ) হয়। গর্ভপাতের সাথে প্রক্ষোভিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলো যুক্ত থাকার কারণে গর্ভপাতকে মেনে নেওয়া বা আইনসিদ্ধ করা উচিত কিংবা অনুচিত এ নিয়ে বহু দেশে বিতর্ক চলছে। গর্ভপাতের অপব্যবহার রোধে ভারত সরকার 1971 সালে কিছু কঠোর বিধিনিষেধ সহ গর্ভপাত (MTP) কে আইন সিদ্ধ করে। নির্বিচারে এবং বেআইনিভাবে কন্যাভ্রূণ হত্যা যা তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষে সর্বাধিক তা রুখতে এইধরনের বিধিনিষেধ গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

MTP এর প্রয়োজন কেন? অবশ্যই এর উত্তর হবে এই যে, সাধারণভাবে অসুরক্ষিত যৌন মিলনের কারণে অথবা সঙ্গমকালে অথবা ধর্ষণকালে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার থেকে রেহাই পেতে MTP এর প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র যেখানে গর্ভাবস্থা চলতে থাকলে সেটি মাতা বা শিশুভ্রূণ বা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বা এমনি প্রাণনাশেরও কারণ হতে পারে সেসব ক্ষেত্রেও MTP অত্যাবশ্যক।

গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস সময়কালে অর্থাৎ গর্ভাবস্থার ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত MTP কে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ গণ্য করা হয়। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় তিনমাস সময়কালে গর্ভপাত করানো হলে তা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এ বিষয়ে একটি গোলমেলে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, তা হল এই যে, বেশিরভাগ MTP অযোগ্য হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা বেআইনীভাবে করানো হয়, যা কেবলমাত্র অসুরক্ষিতই নয় প্রাণনাশেরও কারণ হতে পারে। MTP এর ক্ষেত্রে অপর একটি বিপদজনক প্রবণতা হল -

অ্যামনিওসিন্টোসিসও অপব্যবহারের মাধ্যমে গর্ভস্থশিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করা। বার বারই যদি দেখাযায় শিশুভ্রূণটি একটি কন্যা-ভ্রূণ এবং এরপর গর্ভপাত ঘটানো হয় তবে এটি সম্পূর্ণরূপে বেআইনী কাজ। MTP এর এই ধরনের ব্যবহারগুলো পরিহার করা উচিৎ কারণ এগুলো কমবয়সী মাতা এবং গর্ভস্থ শিশু উভয়ের জন্য বিপদজনক। অসুরক্ষিত যৌন মিলন পরিহারের প্রয়োজনীয়তা ও বেআইনী

গর্ভপাতের সঙ্গো জড়িত ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাবকগুলো সম্পর্কে কার্যকরী পরামর্শদান এবং এর পাশাপাশি আরোও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান উল্লিখিত অস্বাস্থ্যকর প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

4.4 যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণসমূহ (Sexually Transmitted Infections - STIS)

যে রোগসমূহ বা সংক্রমণ যৌন মিলনের মাধ্যমে বাহিত হয় সেগুলোকে একত্রে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণ বা STIs অথবা ভেনারেল ডিজিজ (VD) অথবা জনন নালীর সংক্রমণ (Reproductive Tract Infections - RTI) বলে। যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সচরাচর সংক্রমণগুলো হল - গনোরিয়া, সিফিলিস, জেনিটেল হার্পিস, ক্ল্যামাইডিয়াসিস, জেনিটেল ওয়ার্টস, ট্রাইকোমেনিওসিস, হেপাটাইসিস- B এবং অবশ্যই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সর্বাধিক আলোচিত সংক্রমন AIDS যা HIV এর সংক্রমণের ফলে ঘটে। এগুলোর মধ্যে HIV এর সংক্রমণ সবচেয়ে বিপদজনক এবং অধ্যায় 4 এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

HIV এবং হেপাটাইটিস-B এর মতো এ ধরনের কিছু সংক্রমণ সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত ইনজেকশনের সূঁচ, শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহার, রক্তসঞ্চালন, অথবা সংক্রামিত মায়ের থেকে শিশুভ্রূণের দেহেও ছড়াতে পারে। হেপাটাইটিস-B, জেনিটাল হার্প এবং HIV এর সংক্রমণ ব্যতীত অন্য রোগগুলোর ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণের প্রথম অবস্থায় সনাক্ত করা গেলে এবং যথাযথভাবে চিকিৎসা হলে এই রোগগুলোর সম্পূর্ণভাবে নিরাময় সম্ভব। এই রোগগুলোর মধ্যে বেশীরভাগ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ গৌণ হয় এবং এগুলো যৌনাঙ্গো পরিলক্ষিত হয়, এবং এগুলো হল - যৌনাঙ্গোর, চুলকানি, যৌনাঙ্গো স্বল্প ব্যাথা, যৌনাঙ্গো স্ফীতি এবং যৌনাঙ্গা থেকে তরল নি:সরণ ইত্যাদি। সংক্রামিত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই রোগের লক্ষণগুলোর বহি:প্রকাশ ঘটে না এবং তাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোগগুলোর সনাক্তকরণ নাও হতে পারে। সংক্রমণের প্রাথমিক দশায় লক্ষণগুলো অনুপস্থিত থাকায় বা লক্ষনগুলো কম তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় এবং যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণগুলোর সঙ্গো সামাজিক কলঙ্ক জড়িত থাকায় একজন ব্যক্তিকে সময়মতো রোগের সনাক্তকরণে এবং সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণে নিবৃত্ত করে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আরোও জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেগুলো হল - শ্রোণীর প্রদাহ জনিত রোগ সমূহ বা পেলভিক নিফ্লামেটোরি ডিজিস (PTD), গর্ভপাত, মৃতসন্তান প্রসব (Still Birth), এক্টোপিক প্রেগনেন্সি (Ectopic pregnancy), বন্ধ্যাত্ব অথবা এমনকি জনন নালীর ক্যান্সার। যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণগুলো (STIs) সুস্থ সমাজের পক্ষে একটি প্রধান হুমকি স্বরূপ। তাই জনন স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি (Reproductive Health care Programme) এর অধীনে এই রোগগুলোর প্রতিরোধ বা প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্তকরণ এবং রোগের নিরাময়কে মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে। যদিও সব ব্যক্তিতেই এই সংক্রমণগুলো ঘটতে পারে তবে 15-24 বছর বয়সীরা, যে বয়সের গ্রুপে তোমরাও আছো এই সংক্রমণ অত্যন্ত বেশী হারে ঘটতে দেখা গেছে। তবে এনিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই কারণ এই সংক্রমণগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করলে একজন ব্যক্তি এই সংক্রমণগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারে - i) অপরিচিত সঙ্গী / বহুসঙ্গীর সঙ্গো যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা।

ii) যৌন মিলনকালে সর্বদা কনডোম ব্যবহার করা।

iii) এজাতীয় সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে কিনা এসম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে সেক্ষেত্রে একজন যোগ্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিৎ এবং যদি সংক্রমণটির সনাক্তকরণ হয় এর সম্পূর্ণ চিকিৎসা করা উচিৎ।

4.5 বন্ধ্যাত্ব (Infertility) :

জননগত স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যদি না এতে বন্ধ্যাত্বের উল্লেখ থাকে। সারা পৃথিবী জুড়ে বহুসংখ্যক বন্ধ্যা দম্পতিরা অর্থাৎ গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যৌন মিলনে লিপ্ত হলে এরা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় না। বন্ধ্যাত্ব বহু কারণে দেখা দিতে পারে। এই

কারণগুলো হল - শারীরিক, বংশগত, রোগসংক্রান্ত, ড্রাগসংক্রান্ত, অনাক্রম্যতা সম্পর্কিত এবং এমনকি মনস্তাত্ত্বিকও হতে পারে। ভারতবর্ষে প্রায়শই সন্তানহীনতার জন্য মহিলাদের দায়ী করা হয় কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এটি ঠিক নয়, পুরুষ সঙ্গীটির সমস্যার কারণেও এটি হতে পারে। বিশেষিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলো (ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক ইত্যাদি) বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়ে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো মধ্যে কিছু সমস্যা চিকিৎসার মাধ্যমে সমাধান এবং সন্তানহীন দম্পতিদের সন্তান লাভে সাহায্য করতে পারে। তবে যেক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা সমূহের এধরনের সমাধান সম্ভব হয় না। সেইক্ষেত্রে দম্পতিরা নির্দিষ্ট বিশেষ প্রযুক্তির সহায়ে সন্তান লাভ করতে পারে, এদের সচরাচর সহযোগী জননগত প্রযুক্তি বা assisted reproductive technology (ART) বলে।

এই ধরনের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি হল ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশান (IVF - দেহের ভেতরে যে পরিস্থিতিতে নিষেক সংঘটিত হয় দেহের বাইরে প্রায় একই পরিস্থিতিতে নিষেক সংঘটিত হলে একে IVF বলে) এবং এরপর জরায়ুতে ভ্রূণের স্থানান্তরণ অর্থাৎ এমব্রায়ো ট্রান্সফার (Embryo Transfer - ET)। এই পদ্ধতিটি টেস্টটিউব বেবি কর্মসূচি (Test Tube baby programe) নামে জনপ্রিয়। এই পদ্ধতিতে স্ত্রীদেহ / দাতা (মহিলা) থেকে ডিম্বাণু এবং স্বামী / দাতা (পুরুষ) থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে জাইগোট গঠনের জন্য শুক্রাণুও ডিম্বাণুর মিলনকে উদ্দীপিত করা হয়। জাইগোট বা আদি ভ্রূণটি (৪ কোশবিশিষ্ট ব্লাস্টোমিয়ার পর্যন্ত) এরপর ফ্যালোপিয়ান নালীতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। (ZIFT - জাইগোট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার) এবং ৪ কোশের অধিক ব্লাস্টোমিয়ার সমন্বিত ভ্রূণটিকে পরবর্তী বিকাশের জন্য জরায়ুতে স্থানান্তরিত (IUT ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফার) করা হয়। যেসব মহিলারা গর্ভধারণে অক্ষম এদের ক্ষেত্রে সন্তান লাভের জন্য ইনভিভো ফার্টিলাইজেশানের মাধ্যমে সৃষ্ট ভ্রূণটি (মাতৃদেহে গ্যামেটের মিলন) স্থানান্তরনের জন্যও ব্যবহার কার যেতে পারে।

এক্ষেত্রে অপর একটি পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে, যে পদ্ধতিতে দাতার দেহ থেকে সংগৃহীত ডিম্বাণু, ডিম্বাণু উৎপাদনে অক্ষম কিন্তু নিষেক ও ভ্রূণের পরবর্তী বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রদানে সক্ষম এমন একজন মহিলার ফ্যালোপিয়ান নালীতে (GIFT- গ্যামেট ইন্ট্রা ফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার) স্থানান্তরিত করা হয়। পরীক্ষাগারে ভ্রূণ সৃষ্টির অন্য একটি বিশেষিত পদ্ধতি হল - ইন্ট্রা সাইটো প্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশান (ICSI) যেখানে একটি শুক্রাণু ইনজেকশানের মাধ্যমে সরাসরি ডিম্বাণুর ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পুরুষ সঙ্গীটি স্ত্রীদেহে গর্ভাধানে (insemination) অক্ষম হওয়ার কারণে বা পুরুষ দেহ থেকে নি:সৃত বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা খুব কম হওয়ার কারণে যদি বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে কৃত্রিম গর্ভাধান (Artificial insemination- AI). পদ্ধতির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে স্বামী অথবা সুস্থ স্বাভাবিক দাতার দেহ থেকে শুক্ররস সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীদেহের যোনিপথে বা জরায়ুর অভ্যন্তরে (IUI- ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশান) প্রতিস্থাপন করা হয়)

যদিও বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বহু বিকল্প পথ রয়েছে কিন্তু উপরে বর্ণিত সব পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে সন্তান লাভের জন্য বিশেষজ্ঞ পেশাদার চিকিৎসকের দ্বারা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিচালনা এবং ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। তাই দেশের খুব অল্প কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে। এটা স্পষ্টতই কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক লোকেরাই এই সুবিধাগুলো গ্রহণ করার মতো আর্থিক সংগতি রয়েছে। মানসিক আবেগ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক প্রভাবকগুলোও এই পদ্ধতি সমূহের গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যেহেতু এই পদ্ধতিগুলোর সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল সন্তানলাভ করা তবুও আমাদের ভারতে প্রচুর অনাথ এবং পরিত্যক্ত শিশু রয়েছে যাদের যত্ন না নিলে সম্ভবত এরা পূর্ণবয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে না। আমাদরে দেশের আইন বৈধভাবে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিয়েছে এবং আজ অবধি এটি পিতৃত্ব বা মাতৃত্বে প্রত্যাশী দম্পতিদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

সারসংক্ষেপ

জননগত স্বাস্থ্য হল - জননের সবদিকে থেকে অর্থাৎ দৈহিক দিক, মানসিক দিক, আচরণগত দিক ও সামাজিক দিক থেকে সামগ্রিক সুস্থতা। জননগত দিক থেকে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা সূচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশগুলোর মধ্যে আমাদের দেশই প্রথম।

জননগত দিক থেকে সুস্থ থাকার লক্ষ্যে প্রাথমিক ধাপটি হল - জনসাধারণের মাধ্যে জনন অঙ্গাসমূহ, বয়:সন্ধিকাল ও এর সঙ্গো সম্পর্কিত পরিবর্তন সমূহ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর যৌনক্রিয়া, AIDS সহ বিভিন্ন যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণ (STIs) সমূহ সম্পর্কে পরামর্শ দান করা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা। জননগত এবং শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচীর (রিপ্রোডাকটিভ এন্ড চাইল্ড কেয়ার প্রোগ্রামস - RCH) অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল - অনিয়মিত রজ:চক্র গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, প্রসব, মেডিকেল টার্মিনেশান অফ প্রেগনেন্সি, STIs, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বন্ধ্যাত্ব, জন্ম পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুর যথাযথ পরিচর্যা ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলোতে চিকিৎসা সুবিধা ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান।

মা ও শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রাথমিক অবস্থায় যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণগুলো নির্ণয় ও নিরাময়, সন্তানহীন দম্পতিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি আমাদের দেশের সামগ্রিক জননগত স্বাস্থ্যের উন্নয়নকে নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নততর জীবন যাপন জনসংখ্যার অত্যাধিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধির কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর বিস্তারকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। প্রাকৃতিক পদ্ধতি, প্রথাগত পদ্ধতি, বাধাদায়ক পদ্ধতি, IUDs, গর্ভনিরোধক বড়ি, ইনজেকশানের মাধ্যমে গর্ভরোধ, ইমপ্ল্যান্টস এবং শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি সমূহের মতো বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো এখন সহজলভ্য। যদিও জননগত স্বাস্থ্যের জন্য জন্মনিরোধকগুলো সবসময় প্রয়োজনীয় নয় তথাপি কোনো মহিলা গর্ভসঞ্চার এড়াতে অথবা বিলম্বিত গর্ভসঞ্চারের অথবা দুটি গর্ভধারণের মধ্যে ব্যবধান বজায় রাখতে জন্মনিরোধকগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশে MTP আইনগতভাবে স্বীকৃত। MTP সাধারণত ধর্ষণ, অপরিকল্পিতভাবে দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার থেকে রেহাই পেতে করা হয়। এছাড়া গর্ভাবস্থা চলাকালে যদি দেখাযায় যে এটি মা অথবা শিশুভ্রূণ বা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বা প্রাণহানিকর তবে সেক্ষেত্রেও MTP করা হয়।

যৌন মিলনের মাধ্যমে যে সংক্রমণগুলো বা রোগগুলো বাহিত হয় তাদের যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগসমূহ (STIs) বলে। শ্রোণীর প্রদাহজনিত রোগসমূহ (পেলভিক ইনফ্লামেটরী ডিজিজ - PIDs), মৃত সন্তান প্রসব (Still birth), বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি হল STI জনিত কিছু জটিলতা। প্রাথমিক অবস্থায় রোগগুলোর সনাক্তকরণ করা হলে রোগ নিরাময় অধিকতর সহজ হয়। যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সংক্রমণগুলোর (STIs) এড়ানোর জন্য কিছু সাধারণ সতর্কতামূলক উপায় হল - অপরিচিত / বহু সঙ্গীর সঙ্গো যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা, যৌন মিলনকালে কনডোম ব্যবহার করা।

গর্ভধারণে অক্ষম বা দুই বছর ধরে অসুরক্ষিত যৌন মিলনের পরও সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হওয়াকে বন্ধ্যাত্ব বলে। এই ধরনের দম্পতিদের সহায়তার জন্য অনেক পদ্ধতি এখন সহজলভ্য। এরূপ একটি পদ্ধতি হল ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশান অর্থাৎ দেহের বাইরে নিষেক ঘটানোর পর ভ্রূণটিকে স্ত্রীদেহের ফ্যালোপিয়ান নালীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং একে সচরাচর 'টেস্ট টিউব বেবি' কর্মসূচি ('Test Tube baby' programme) বলে।

অনুশীলনী

1. একটি সমাজে জননগত স্বাস্থ্যের কী তাৎপর্য রয়েছে বলে তোমরা মনে কর।
2. বর্তমান পরিস্থিতিতে জননগত স্বাস্থ্যের যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করা প্রয়োজন সেগুলোর সম্পর্কে প্রস্তাব রাখ।
3. বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষা প্রয়োজন কি ? কেন ?
4. তোমরা কি মনে কর আমাদের দেশে বিগত 50 বছরে জনগত স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে? তোমাদের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় এরূপ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখ করো যেখানে এসম্পর্কিত উন্নয়ন হয়েছে।
5. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণগুলো আলোচনা কর।
6. গর্ভনিরোধক গুলোর ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত ? কারণ দর্শাও।
7. জনন অঙ্গোর অপসারণকে একটি গর্ভনিরোধক ব্যবস্থারূপে বিবেচনা করা হয়না কেন ?
8. আমাদের দেশে লিঙ্গ নির্ধারনের জন্য অ্যামনিওসিন্টেসিস (Amniocentesis) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর নিষিদ্ধ করনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এ সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
9. সন্তানহীন দম্পতিদের সন্তানলাভে সহায়ক কিছু পদ্ধতির প্রস্তাব করো।
10. যৌনসংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগগুলোর (STDs) সংক্রমণ প্রতিরোধে কোনো ব্যক্তির কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
11. ব্যাখ্যা সহকারে বিবৃতিগুলো সত্য / মিথ্যা উল্লেখ কর -
    (ক) গর্ভপাত স্বত:স্ফূর্ত ভাবেও ঘটতে পারে - (সত্য / মিথ্যা)
    (খ) বন্ধ্যাত্বকে জীবিত সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এটি সর্বদাই মহিলা সঙ্গীটির অস্বাভাবিকতা / ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে। (সত্য / মিথ্যা)
    (গ) পুরোপুরি ভাবে দুগ্ধক্ষরণ মহিলাদের গর্ভনিরোধনের একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতিরূপে কাজ করতে পারে। (সত্য / মিথ্যা)
    (ঘ) মানুষের জননগত স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হল একটি কার্যকরী পদ্ধতি। (সত্য / মিথ্যা)
12. নিম্নলিখিত বিবৃতি গুলো শুদ্ধ করে লিখ:
    (ক) গর্ভনিরোধনের শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি গুলো গ্যামেট সৃষ্টিতে বাধা দান করে।
    (খ) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত সব রোগ গুলো সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় যোগ্য।
    (গ) গ্রামীন মহিলাদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গর্ভনিরোধক বড়ির (Oral Pill) ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়।
    (ঘ) ভ্রূণ স্থানান্তরণ পদ্ধতিতে (Embryos Transfer Technique) ভ্রূণ গুলোকে সর্বদাই জরায়ুতে স্থানান্তরিত করা হয়।

একক - VII

বংশগতি ও বিবর্তন (Genetics and Evolution)

অধ্যায় - 5 (Chapter-5)
বংশানুসরণ এবং প্রকরণের নীতি সমূহ
(Principles of Inheritance and Variation)

অধ্যায় - 6 (Chapter-6)
বংশানুসরণের আনবিক ভিত্তি
(Molecular Basis of Inheritance)

অধ্যায় - 7 (Chapter-7)
বিবর্তন (Evolution)

মেন্ডেল এবং তাঁর অনুগামী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক কাজ আমাদেরকে বংশানুসরণের ধরনসমূহের একটি ধারনা প্রদান করে ছিল তবে জীবের ফেনোটাইপ নির্ধারকারী ঐ ‘ফ্যাক্টর’ গুলোর প্রকৃতি, কি তা স্পষ্ট ছিল না। যেহেতু এই ফেক্টরগুলো বংশানুসরণের জিনগত ভিত্তিকে উপস্থাপন করে, তাই জিনবস্তুর গঠন এবং জিনোটাইপ ও ফেনোটাইপের রূপান্তরণের গাঠনিক ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে পরবর্তী শতাব্দীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আনবিক জীববিদ্যার পুরো বিষয়টি ছিল একটি ধারাবাহিক বিকাশ যা ওয়াটসন্ (Watson), ক্রিক (Crick), নিরেনবার্গ (Nirenberg), খোরানা (Khorana), কর্নবার্গয় (Kornbergs : পিতা ও পুত্র), বেঞ্জার (Benger), মোনোদ (Monod), ব্রেনার (Brenner) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মুখ্য অবদান সমূহের ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয়েছিল। সেই সময়কালে আরও যে সমান্তরাল সমস্যাটি মোকাবিলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তা ছিল বিবর্তন পদ্ধতি সম্পর্ক অবগত হওয়া। আনবিক বংশগতিবিদ্যা, গাঠনিক জীববিদ্যা এবং বায়োইনফরম্যাটিক্স এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা, বিবর্তনের আনবিক ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই এককে DNA এর গঠন ও কাজ এবং বিবর্তনের কাহিনি ও তত্ত্বগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জেমস্ ডিউই ওয়াটসন্ (james Dewey Watson) 1928 সালের 6 ই এপ্রিল চিকাগো শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।1947 সালে তিনি প্রানীবিদ্যা বিষয়ে B.Sc ডিগ্রি লাভ্ করেন। এই বছরগুলোতেই পাখী পর্যবেক্ষণে তাঁর আগ্রহ পরিণত হয়ে তাঁর মধ্যে বংশগতি বিষয়ে অধ্যায়নের তীব্র ইচ্ছার উদ্রেক করেছিল। এটি তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন তিনি ব্লুমিংটনের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে প্রানীবিদ্যা বিষয়ে অধ্যায়নের জন্য ফেলোশীপ লাভ করেছিলেন ও যেখানে তিনি ব্যকটিরিওফাজের বংশবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে উপর হার্ড এক্স-রে (Hard x-ray) এর প্রভাবের উপর অধ্যায়ন করে 1950 সালে Ph.D. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে ক্রিক এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং তিনি এটা আবিষ্কার করেছিলেন যে DNA -এর গাঠনিক রূপ উদ্ঘাটনে এদের সাধারণ আগ্রহ রয়েছে। এবিষয়ে তাঁদের প্রথম ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি সন্তোষজনক ছিল না। অধিকতর পরীক্ষামূলক প্রমাণ এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সম্পর্কিত জ্ঞানের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে তাঁদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে 1953 সালের মার্চের প্রথমদিকে DNA এর পরিপূরক দ্বিতন্ত্রী হেলিক্যাল গঠনটি প্রস্তাব আকারে বের হয়েছিল।

JAMES WATSON
FRANCIS CRICK

ফ্রান্সিস হ্যারি কম্পটন (Francis Harry Compton) ক্রিক ইংল্যান্ডের নর্থামটন শহরে 1916 সালের 8ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে পদার্থবিদ্যা অধ্যায়ন করেন এবং 1937 সালে B.Sc. ডিগ্রি লাভ করেন। 1954 সালে তিনি "এক্স-রে ডিফ্রাকশন (X-ray Diffraction) ঃ পলিপেপটাইড এবং প্রোটিন" নামক গবেষণা পত্রটির কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন।

জে.ডি. ওয়াটসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ক্রিকের কর্মজীবনে একটি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেই সময় ওয়াটসন ছিলেন 23 বৎসরের যুবক। এই বন্ধুত্বের ফলশ্রুতিতেই 1953 সালে DNA -এর দ্বিতন্ত্রী হ্যালিক্যাল গঠন এবং প্রতিলিপি করনের নক্সা প্রস্তাবাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 1959 সালে ক্রিক একজন FRS হিসাবে মনোনীত হন। ওয়াটসন এবং ক্রিক যৌথভাবে যে যে সম্মান লাভ করেছিলেন, সেগুলো হলো- 1959 সালে ম্যাসাচুসেড জেনারেল হসপিটালের জন কলিন ওয়ারেন পুরস্কার (John Collins Warren Prize); 1959 সালে লাস্কার পুরস্কার (Lasker Prize); 1962 সালে রিসার্চ করপোরেশন পুরস্কার (Research Corporation Prize); এবং সর্বোপরি 1962 সালে নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize)।

অধ্যায়-5

বংশানুসরণ এবং প্রকরণের নীতিসমূহ
(Principles of Inheritance and Variation)

5.1 মেন্ডেলের বংশানুসরণের সূত্রাবলি (Mendel's Laws of Inheritance)

5.2 একটি জিনের উত্তরাধিকার (Inheritance of one Gene)

5.3 দুইটি জিনের উত্তরাধিকার (Inheritance of Two Genes)

5.4 লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex Determination)

5.5 পরিব্যক্তি (Mutation)

5.6 জিনগত অস্বাভাবিকতা (Genetic Disorders)

তুমি কি কখনো এটা ভেবে অবাক হয়েছ যে কেন একটি হাতি সর্বদাই একটি শিশু হাতিরই জন্ম দেয়, অন্য আর কোনো প্রাণীর নয়? অথবা কেন একটি আমের আটি থেকে কেবলমাত্র একটি আম গাছই সৃষ্টি হয়, আর অন্য কোন উদ্ভিদ নয়?

এরূপ ঘটে বলেই কি, অপত্যজীবরা দেখতে এদের জনিতৃজীবের মত হয়? অথবা এরা কি এদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রদর্শন করে? তোমাদের কি কখনো এটা ভেবে অবাক লাগে না যে কেন কখনো কখনো ভাইবোনরা দেখতে একেবারে একইরকম হয়? অথবা কখনো বা অনেকটাই ভিন্ন হয়?

এইগুলো এবং প্রাসঙ্গিক আরও অনেক প্রশ্নাবলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জীববিদ্যার যে শাখায় আলোচনা করা হয়, সেই শাখাটিই 'বংশগতি' নামে পরিচিত। এই বিষয়টিতে বংশানুসরণের পাশাপাশি জনিতৃজীব থেকে অপত্য জীবে সঞ্চারিত, এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকরণ নিয়েও আলোচনা করা হয়। বংশানুসরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জনিতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হয়; এটিই হল বংশগতির ভিত্তি। বিভেদ বা প্রকরণের সাহায্যে অপত্যজনুর সাথে তাদের জনিতৃ জনুর পার্থক্যের মাত্রা সূচিত হয়।

8000-1000 খ্রিস্টপূর্ব থেকে মানুষ তা-ই জানতো যে প্রকরণের জন্য দায়ী কারণ সমূহের মধ্যে একটি কারণ যৌন জননের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। তারা কাঙ্খিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব নির্বাচনের জন্য নির্বচিত প্রজনন ঘটাতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীসমূহের বন্য পপুলেশন সমূহে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান প্রকরণসমূহের ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান গরুর পূর্বপুরুষ বন্যগরুর থেকে কৃত্রিম নির্বাচন এবং গৃহপরিবেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে আমরা গরুর সুপরিচিত

চিত্র 5.1 মেন্ডেল অধিত মটর গাছের সাতজোড়া বিপরীত ধর্মী প্রলক্ষণ।

ভারতীয় ব্রীডগুলো পেয়েছি। উদাহরণ পাঞ্জাবের শাহীওয়ালা গরু। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে যদিও আমাদের পূর্বপুরুষেরা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং প্রকরণের বংশপরম্পরায় সঞ্চরণ সম্মন্ধে অবগত ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বল্প।

5.1 মেন্ডেলের বংশানুসরণের সূত্রাবলী (Mendel's Laws of Inheritance) :

উনিশ শতকের মধ্যভাগে 'বংশানুসরণ' বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল। গ্রেগর মেন্ডেল সাত বৎসর (1856-1863) ধরে মটর গাছের ওপর সংকরায়ণ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং সজীব বস্তুতে বংশানুসরণের সূত্রাবলীর প্রস্তাব করেছিলেন। বংশানুসরণের ধরন বিষয়ে মেন্ডেলের অনুসন্ধান কালে এই প্রথম জীববিদ্যার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর পরীক্ষাগুলোতে ব্যবহৃত নমুনার আকার ছিল বৃহৎ, যা তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলীকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করেছিল। তাঁর পরীক্ষাধীন উদ্ভিদগুলোর পরবর্তী জনুর উপর সংঘটিত পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে তাঁর সিদ্ধান্তেরও নিশ্চিতকরণ হয়েছিল। এর থেকে এটাও প্রমানিত হয়েছিল যে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল অপ্রমাণিত ধারণা সমূহের চেয়ে বংশানুসরণের সাধারণ সূত্রাবলীর দিকেই ইঙ্গিত করছিল। মেন্ডেল বাগানের মটর গাছগুলোর যেগুলোতে দুটি বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণ রয়েছে সেগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘ অথবা খর্ব উদ্ভিদ, হলুদ অথবা সবুজ বীজ এটি বংশানুসরণ নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহের একটি মৌলিক কাঠামো তৈরীতে সাহায্য করেছিল, যা সব বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ সমূহ এবং এদের মধ্যে বংশানুক্রমে আগত জটিলতা বিবৃত করার জন্য পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছিল। মেন্ডেলের মটরগাছের বেশকিছু বিশুদ্ধ বংশধারা (True-Breeding Line) ব্যবহার করে একধরনের কৃত্রিম পরাগসংযোগ/ইতর পরাগযোগ সম্মন্ধীয় পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন। একটি বিশুদ্ধ বংশধারা হল এমন একটি বংশধারা যেখানে অবিরাম স্বপরাগযোগ ঘটে এবং তা স্থিতিশীল প্রলক্ষণসমূহের বংশানুসরণ এবং বেশ কয়েকটি জনুতে এক প্রকাশ ঘটায়। মেন্ডেল বিশুদ্ধ বংশধারার 14 টি মটর গাছের ভ্যারাইটিকে জোড় হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন যেগুলোতে বিপরীত প্রলক্ষণ যুক্ত একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া বাকি সবগুলোই সদৃশ বৈশিষ্ট্য ছিল। নির্বাচিত বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণগুলো ছিল মসৃন বা কুঞ্চিত বীজ, হলুদ বা সবুজ বীজ, স্ফীত বা খাঁজযুক্ত সবুজ অথবা হলুদ ফল এবং দীর্ঘ বা খর্ব উদ্ভিদ (চিত্র 5.1, সারনি 5.1)

সারনি 5.1 মেন্ডেল—অধীত মটর গাছের বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণ সমূহ :

ক্রমিক সংখ্যা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণসমূহ
1.	কান্ডের দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ/খর্ব
2.	ফুলের বর্ণ	বেগুনি/সাদা
3.	ফুলের অবস্থান	কাক্ষিক/শীর্ষস্থ
4.	শুঁটি/ফলের আকৃতি	স্ফীত/খাঁজযুক্ত
5.	শুঁটি/ফলের বর্ণ	সবুজ/হলুদ
6.	বীজের আকৃতি	গোলাকৃতি/কুঞ্চিত আকৃতি
7.	বীজের বর্ণ	হলুদ/সবুজ

5.2 একটি জিনের বংশানুসরণ (Inheritance of One Gene) :

চল আমরা উদাহরণ হিসেবে মেন্ডেলকৃত এমন একটি সংকরায়ণের পরীক্ষাকে লক্ষ করি যেখানে তিনি একটি জিনের বংশানুসরণের বিষয়টি অধ্যায়ন করার জন্য দীর্ঘ এবং খর্ব মটরগাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়েছিলেন (চিত্র 5.2)। তিনি এই সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন বীজগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই বীজগুলো কে বপন করে তিনি প্রথম সংকর জনুর উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছিলেন। এই উদ্ভিদ জনুটিকে প্রথম অপত্য জনু বা F_1 বলে। মেন্ডেল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে F_1 জনুর সবকটি উদ্ভিদই এদের জনিতৃ উদ্ভিদগুলোর একটির মত দীর্ঘ হয়েছিল, একটিও খর্ব উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়নি (চিত্র 5.3)। অন্যান্য প্রলক্ষণ জোড়ের ক্ষেত্রেও তাঁর পর্যবেক্ষণ একই ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে F_1 জনুর অপত্য উদ্ভিদগুলো সবসময়ই জনিতৃ জীবের যে কোনো একটির মত হয় এবং অন্য জনিতৃ জীবের প্রলক্ষণটি F_1 জনুর উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশ পায় না।

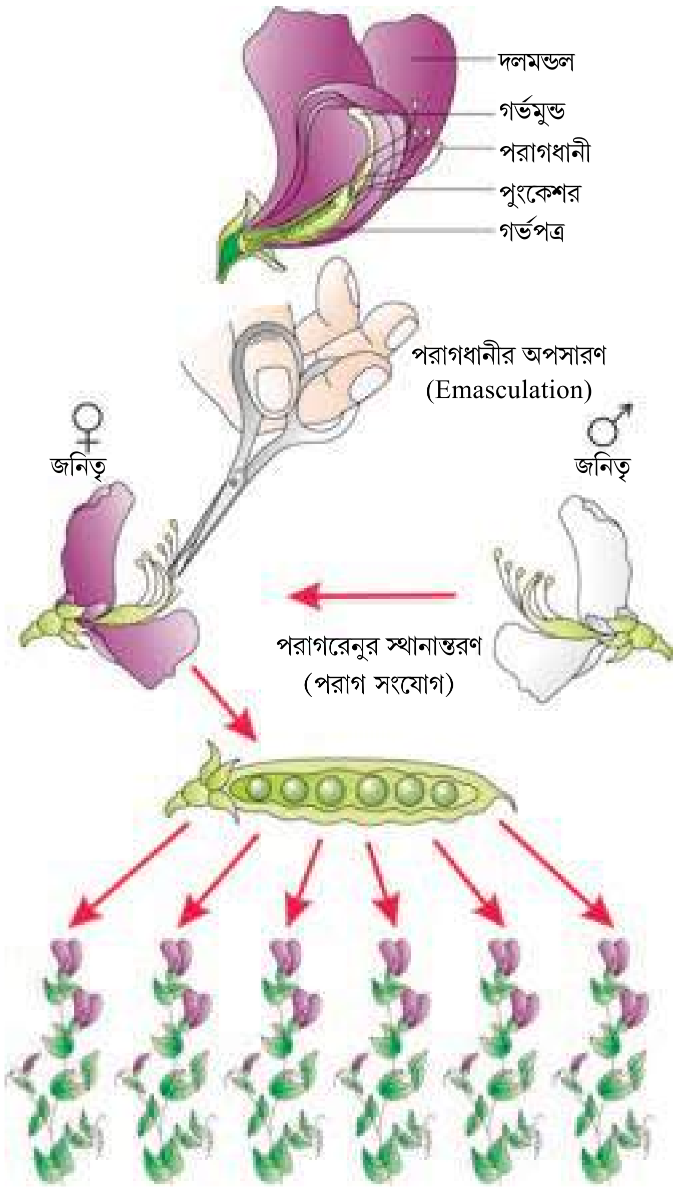

চিত্র 5.2 মটর গাছের সংকরায়ণের ধাপসমূহ

তখন মেন্ডেল F_1 জনুর দীর্ঘ জনুর দীর্ঘ উদ্ভিদগুলোর মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটালেন এবং তিনি আশ্চর্যজনকভাবে দেখেছিলেন যে F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্য উদ্ভিদগুলোর মধ্যে কিছু উদ্ভিদ খর্ব হয়েছিল। যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি F_1 জনুর উদ্ভিদগুলোতে প্রকাশিত হয় নি যেটি এখন অর্থাৎ F_2 জনুতে প্রকাশিত হয়েছে। F_2 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলোর $^1/_4$ বা এক চতুর্থাংশ উদ্ভিদ খর্ব এবং $^3/_4$বা তিনচতুর্থাংশ উদ্ভিদ দীর্ঘ হয়েছিল। দীর্ঘ এবং খর্ব প্রলক্ষণগুলো এদের জনিতৃ জীবের ধরনের সাথে অভিন্ন ছিল এবং এই উদ্ভিদ গুলোতে কোনো মিশ্র প্রলক্ষণ প্রকাশ পায় নি, অর্থাৎ সব অপত্য উদ্ভিদই হয় দীর্ঘ না হয় খর্ব হয়েছিল, কোনটিই মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের হয় নি (চিত্র 5.3)।

অন্যান্য আরও যে যে প্রলক্ষণ সমূহ নিয়ে তিনি অধ্যায়ন করেছিলেন, সব ক্ষেত্রেই তিনি একই ফল লাভ করেছিলেন। জনিতৃ জীবের প্রলক্ষণ সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একটি প্রলক্ষণই F_1 জনুতে প্রকাশ পেয়েছিল, আবার F_2 জনুতে 3 : 1 অনুপাতে উভয় প্রলক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল। F_1 বা F_2 জনুর কোনো জনুতেই বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণ সমূহের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়নি।

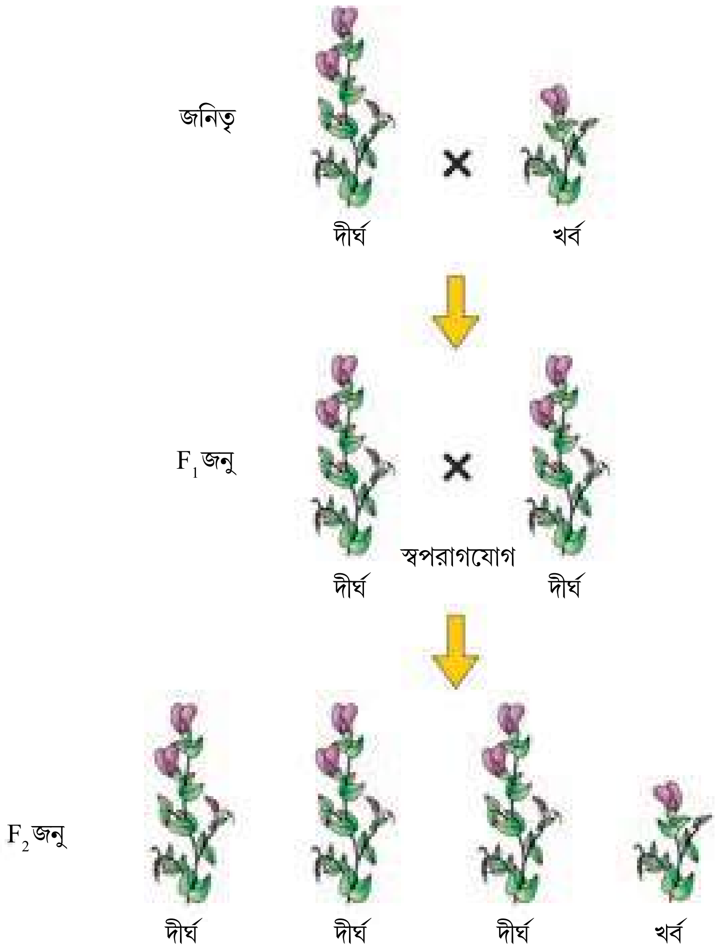

চিত্র 5.3 এক সংকর জননের চিত্ররূপ উপস্থাপন

এই পর্যবেক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে মেন্ডেল এই প্রস্তাব করেছিলেন যে জনুর পর জনু ধরে জনিতৃ জীব থেকে জনন কোশের (Gamote) মাধ্যমে কোনো একটা কিছু অপরিবর্তিত অবস্থায় অপত্য জীবে স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত হয়। তিনি এগুলোকে ফ্যাক্টর নামে অভিহিত করেন। বর্তমানে আমরা এগুলোকে 'জিন' (Gene) বলে থাকি। তাই জিন হল বংশানুসরণের একক। একটি জীবে একটি নির্দিষ্ট প্রলক্ষণের প্রকাশ ঘটার জন্য যে তথ্য বা সংকেত এর প্রয়োজন হয় জিন সেই সমস্ত তথ্য বা সংকেত বহন করে। যে জিনগুলো একজোড়া বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণের বহিঃপ্রকাশের জন্য দায়ী, তাদের অ্যালীল বলে। অর্থাৎ এগুলো একই জিনের সামান্য পরিবর্তিত রূপ।

যদি আমরা প্রতিটি জিনকে চিহ্নিতকরণের জন্য বর্ণমালার বর্ণগুলো ব্যবহার করি, তখন F_1 জনুতে যে প্রলক্ষণটির প্রকাশ ঘটে তার জন্য বড় হর্‌ফের অক্ষর এবং অপর লক্ষণটির ক্ষেত্রে ছোট হর্‌ফের অক্ষর ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কান্ডের দৈর্ঘ্য এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে 'দীর্ঘ' প্রলক্ষণের জন্য 'T' এবং খর্ব প্রলক্ষণের জন্য 't' ব্যবহার করা হয়েছে। 'T' এবং 't' এরা একে অপরের অ্যালীল। তাই উদ্ভিদগুলোর কান্ডের দৈর্ঘ্যের জন্য যে অ্যালীল জোড়াগুলো ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হল— TT, Tt বা tt। মেন্ডেল এও প্রস্তাব করেছিলেন যে একটি খাঁটি প্রজননের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অথবা খর্ব মটর গাছের ভ্যারাইটিতে দৈর্ঘ্যের জন্য জিনের অ্যালীলজোড়া অভিন্ন বা হোমোজাইগাস হয় এবং এরা যথাক্রমে TT এবং tt হয়। TT এবং tt কে উদ্ভিদের জিনোটাইপ বলে যেখানে দীর্ঘ এবং খর্ব এই বর্ণনামূলক পরিভাষাগুলোকে ফেনোটাইপ বলে। যে উদ্ভিদটির জিনোটাইপ Tt, তার ফেনোটাইপ কী হতে পারে?

যেহেতু মেন্ডেল দেখেছিলেন Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট F_1 হেটোটোজাইগোট Tt কে দেখতে একেবারে TT জিনোটাইপ বিশিষ্ট জনিতৃ উদ্ভিদের মতো হয়, তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে একজোড়া বিসদৃশ ফ্যাক্টরের মধ্যে একটি 'ফ্যাক্টর' অন্যটিকে (F_1 জনুর মতো) দাবিয়ে রাখে অর্থাৎ একটি অপরটির সাপেক্ষে প্রকট হয় এবং তাই একে প্রকট ফ্যাক্টর বলে। যেখানে অপরটিকে বলে প্রচ্ছন্ন ফ্যাক্টর। এইক্ষেত্রে T (দীর্ঘ কান্ডের জন্য), t (খর্ব কান্ডের জন্য) ফ্যাক্টর এর উপর প্রকট হয়, অর্থাৎ t একটি প্রচ্ছন্ন ফ্যাক্টর। তিনি লক্ষ করেছিলেন অন্য সবগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ যেগুলোকে নিয়ে তিনি অধ্যায়ন করেছিলেন সবগুলোই সমরূপ বা অভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে।

কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকটতা এবং প্রচ্ছন্নতা সম্পর্কিত এই ধারণাকে মনে রাখার ক্ষেত্রে যথাক্রমে কোনো একটি বর্ণ বা আলফাবেটের বড় হরফের অক্ষর এবং ছোট হরফের অক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং যুক্তি সংগত। (দীর্ঘ প্রলক্ষণ এর জন্য T এবং খর্ব প্রলক্ষণের জন্য d ব্যবহার করবে না, কারণ তোমরা দেখবে যে এটি মনে রাখা খুবই কষ্টকর হবে যে T এবং d কি একই বৈশিষ্ট্যের অ্যালীল? নাকি তা নয়) TT এবং tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট হোমোজাইগোটাস এর TT এবং tt এর

ক্ষেত্রে অ্যালীলগুলো একই রকম অথবা Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট হেটোরোজাইগোট Tt এর অ্যালীলগুলো ভিন্নরকম হতে পারে।

যেহেতু Tt জিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদটি একটি বৈশিষ্ট্য (কান্ডের দৈর্ঘ্য) নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলোর জন্য হেটোরোজাইগাস হয়, তাই এটি একটি একসংকর (Monohybrid) এবং TT এবং tt জিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ কে একসংকর জনন বলে।

F_2 জনুতে অপত্য উদ্ভিদ সমূহে জনিতৃ জীবের প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণ কোনোরূপ সংমিশ্রণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে যখন মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ এবং খর্ব উদ্ভিদ গ্যামেট সৃষ্টিকালে জনিতৃ জীবের অ্যালীলজোড়া একটি অপরটির থেকে পৃথক বা আলাদা হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র একটি অ্যালীলই একটি জনন কোশে সঞ্চারিত হয়। অ্যালীলগুলোর এই পৃথকীকরণ একটি এলোমেলোভাবে সংঘটিত ক্রিয়া এবং তাই গ্যামেটের যে কোনো এক প্রকার অ্যালীল সমন্বিত হওয়ার 50 শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে, যা কিনা সংকরায়ণের ফলাফল দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। এইভাবে TT বিশিষ্ট দীর্ঘ উদ্ভিদের গ্যামেট গুলোতে T এবং tt বিশিষ্ট খর্ব উদ্ভিদের গ্যামেটগুলোতে t অ্যালীল থাকে। নিষেককালে দুটি অ্যালীল ধরা যাক্ একটি জনিতৃ জীব থেকে T পরাগরেনুর মাধ্যমে এবং অন্য জনিতৃ জীব থেকে ডিম্বাণুর মাধ্যমে t মিলিত হয়ে একটি জাইগোট বা ভ্রূণাণু সৃষ্টি করে এবং এতে একটি T এবং একটি t অ্যালীল থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে এই সংকর উদ্ভিদগুলোর জিনোটাইপ হল Tt যেহেতু এই সংকর উদ্ভিদগুলোতে বর্তমান অ্যালীল সমূহ বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণ গুলো প্রকাশ করে; তাই এই উদ্ভিদ গুলোকে হেটোরোজাইগাস বলে।

যে ছকের সাহায্যে জনিতৃজীব দ্বারা গ্যামেট উৎপাদন, জাইগোট গঠন, F_1 এবং F_2 জনুতে প্রাপ্ত উদ্ভিদ সমূহকে বোঝানো যেতে পারে তাকে পানেট বর্গ (Punnett Square) বলে (যা চিত্র 5.4 এ দেখানো হয়েছে)। এই পানেট বর্গ ব্রিটিশ জিনতত্ত্ববিদ্ Reginald C. Punnett তৈরী করেছিলেন। কোনো একটি জিনগত সংকরায়ণে সৃষ্ট অপত্যসমূহের সব সম্ভাব্য জিনোটাইপের সম্ভাবনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি রৈখিক উপস্থাপন (Graphical Representation)। সম্ভাব্য গ্যামেটগুলোকে বর্গটির দুইধারে লেখা হয়, সাধারণত একেবারে ওপরের সারি এবং বাঁদিকের স্তম্ভগুলোতে। সবধরনের সম্ভাব্য সংমিশ্রণগুলো বর্গগুলোর নিম্নস্থ বাক্সগুলোতে বসানো হয়। এরফলে একটি বর্গাকার গঠনের সৃষ্টি হয়।

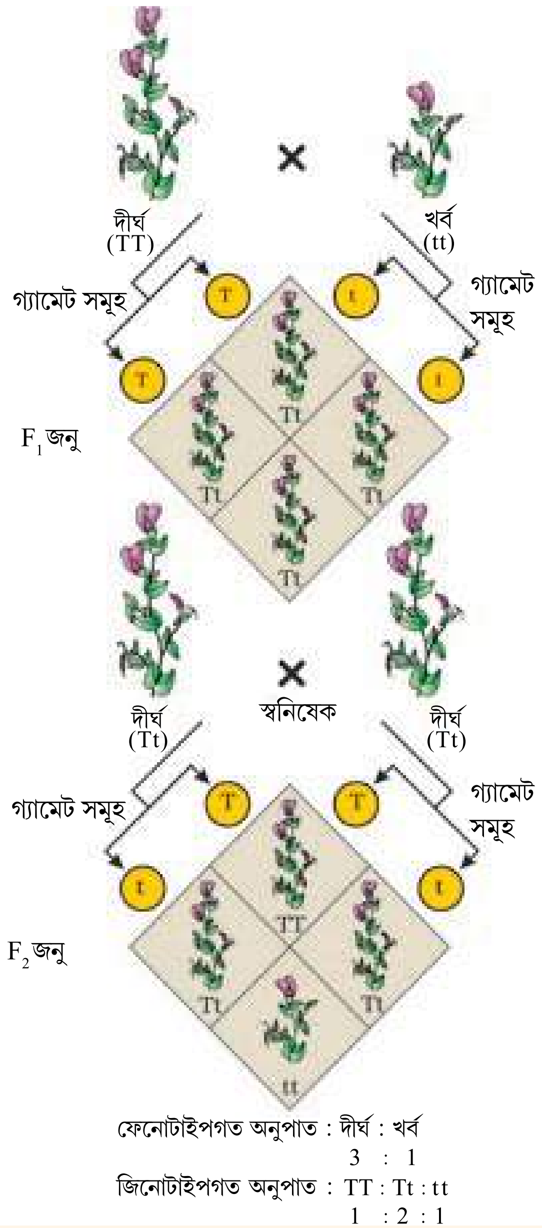

চিত্র 5.4 মেন্ডেল সম্পাদিত, বিশুদ্ধ দীর্ঘ উদ্ভিদ এবং বিশুদ্ধ খর্ব উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে সংঘটিত একটি আদর্শ এক সংকর জনন উপলব্ধ করতে, একটি পানেট বর্গ ব্যবহার করা হয়েছে।

পানেট বর্গটিতে TT জিনোটাইপ বিশিষ্ট জনিতৃ দীর্ঘ উদ্ভিদগুলো (পুরুষ) এবং tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট জনিতৃ খর্ব উদ্ভিদগুলো (স্ত্রী), এদের দ্বারা সৃষ্ট গ্যামেট, এবং F_1 জনুর Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট উদ্ভিদের দেখানো হয়। F_1 জনুর Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট উদ্ভিদগুলোর মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটানো হয়। ♀ এবং ♂ এই চিহ্নগুলো যথাক্রমে F_1 জনুর স্ত্রী (ডিম্বাণু) এবং পুরুষ (পরাগরেণু) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Tt জিনোটাইপবিশিষ্ট F_1 অপত্য উদ্ভিদ গুলির মধ্যে যখন স্বপরাগযোগ ঘটে, তখন এই উদ্ভিদগুলো সমঅনুপাতে T এবং t জিনোটাইপবিশিষ্ট গ্যামেট উৎপন্ন করে।

যখন নিষেক প্রক্রিয়ার সংঘটিত হয়, তখন T জিনোটাইপবিশিষ্ট পরাগরেনুর T জিনোটাইপবিশিষ্ট ফুলের পাশাপাশি 't' জিনোটাইপবিশিষ্ট ডিম্বাণু উৎপাদনকারী ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটার সম্ভাবনা 50 শতাংশ হয়। আবার t জিনোটাইপবিশিষ্ট পরাগরেণু T এবং এর পাশাপাশি t জিনোটাইপবিশিষ্ট ডিম্বানু উৎপাদনকারী ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটানোর সম্ভাবনাও 50 শতাংশ হয়। যদৃচ্ছভাবে সংঘটিত নিষেকের ফলে সৃষ্ট জাইগোটগুলোর জিনোটাইপ TT, Tt বা tt হতে পারে।

পানেট বর্গ (Punnett Square) থেকে এটা সহজেই দেখা যায় যে যদৃচ্ছভাবে সংঘটিত নিষেকের ফলে নিষেকের ফলে উৎপন্ন জীবগুলোর মধ্যে $^1/_4$ বা একচতুর্থাংশ জীব TT জিনোটাইপবিশিষ্ট, $^1/_2$ বা অর্ধেক জীব Tt জিনোটাইপবিশিষ্ট এবং $^1/_4$ জীব tt জিনোটাইপবিশিষ্ট হয়। যদিও F_1 জনুর অপত্য উদ্ভিদগুলোর জিনোটাইপ Tt, কিন্তু ফেনোটাইপগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদেরকে দীর্ঘ দেখায়। F_2 জনুতে সৃষ্ট অপত্য উদ্ভিদগুলোর মধ্যে $^3/_4$ উদ্ভিদ 'দীর্ঘ' হয়, যেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক TT জিনোটাইপবিশিষ্ট এবং বাকী গুলো Tt জিনোটাইপবিশিষ্ট হয়। বাহ্যিক দিক থেকে TT জিনোটাইপবিশিষ্ট এবং Tt জিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলোর মধ্যে পৃথক করা সম্ভব হয় না। তাই TT জিনোটাইপ জোড়াস্থিত কেবলমাত্র একটি বৈশিষ্ট 'T' অর্থাৎ 'দীর্ঘ' বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়। তাই এই কথা বলা যায় যে 'T' বৈশিষ্ট্যটি বা 'দীর্ঘ' বৈশিষ্ট্যটি, অপর অ্যালীল 't' অথবা 'খর্ব' বৈশিষ্ট্যটিকে দাবিয়ে রাখে। তাই একটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অপরটির ওপর প্রকটতার কারণেই F_1 জনুর সব অপত্য উদ্ভিদই দীর্ঘ হয় (যদিও এদের সকলের জিনোটাইপ Tt) এবং F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্য উদ্ভিদের $^3/_4$ দীর্ঘ (যদিও জিনেটাইপগত ভাবে $^1/_2$ উদ্ভিদ Tt এবং মাত্র $^1/_4$ উদ্ভিদ TT হয়)। এর ফলেই যে ফেনোটাইপগত অনুপাত পাওয়া যায় তা হল — $^3/_4$ দীর্ঘ : ($^1/_4$ TT + $^1/_2$ Tt) এবং $^1/_4$ tt অর্থাৎ 3:1 অনুপাত, কিন্তু জিনোটাইপগত অনুপাত যা দাঁড়ায় তা হল 1:2:1।

TT:Tt:tt এর $^1/_4 : {}^1/_2 : {}^1/_4$ অনুপাতটি দ্বিপদ সমীকরণ $(ax + by)^2$ এর গণিতিকভাবে প্রকাশিত সংক্ষিপ্তরূপ, যেখানে T বা t জিন বহন কারী গ্যামেটগুলো $^1/_2$ এর একই ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকে। একে নিম্নলিখিতভাবে বিস্তৃতরূপে লেখা যায় : $(^1/_2 T + {}^1/_2 t)^2 = (^1/_2 T + {}^1/_2 t) \times (^1/_2 T + {}^1/_2 t) = {}^1/_4 TT + {}^1/_2 Tt + {}^1/_4 tt$ ।

মেন্ডেল F_2 জনুর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন যে F_2 জনুর খর্ব উদ্ভিদগুলো F_3 এবং F_4 জনুগুলোতে কেবলমাত্র খর্ব উদ্ভিদই সৃষ্টি করে চলেছে। এর ক্ষেত্রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে খর্ব উদ্ভিদগুলো ছিল হমোজাইগাস অর্থাৎ tt জিনোটাইপবিশিষ্ট। তিনি একটি দীর্ঘ উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ ঘটানোর ফলশ্রুতিতে কি পেতে পারতেন বলে তুমি মনে কর?

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে এটি পরিস্কার যে যদিও বা জিনোটাইপিক অনুপাত গুলো গাণিতিক সম্ভাব্যতা ব্যবহার করে নির্ণয় করা যেতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র প্রকটধর্মী প্রলক্ষণের ফেনোটাইপ পর্যবেক্ষণ করে এর জিনোটাইপগত সংগঠন জানা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ উদাহরণ হিসাবে F_1 অথবা F_2 জনুতে উৎপন্ন একটি দীর্ঘ উদ্ভিদ এর জিনোটাইপগত সাংগঠনিক TT অথবা Tt হবে — তা অনুমান করা যেতে পারে না। সুতরাং F_2 জনুর একটি দীর্ঘ উদ্ভিদের জিনোটাইপ নির্ধারণ করতে মেন্ডেল একটি খর্ব উদ্ভিদের সাথে F_2 জনু দীর্ঘ উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটিয়েছিলেন। একে তিনি টেস্ট ক্রস রূপে (Test Cross) আখ্যায়িত করেণ। একটি আদর্শ টেস্ট ক্রসে একটি জীব (এখানে মটর গাছ) যার ফেনোটাইপগত বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকটধর্মী প্রলক্ষণটির প্রকাশ ঘটেছে, (এবং যার জিনোটাইপ নির্ধারণ করতে হবে) স্বনিষেকের পরিবর্তে একে প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণ বিশিষ্ট জনিতৃ জীবের সাতে সংকরায়ণ ঘটানো হয়। পরীক্ষাধীন জীবটির জেনোটাইপটি অনুমান করতে এধরনের সংকরায়ণের ফলে প্রাপ্ত জনুগুলো সহজেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। চিত্র 5.5 এ একটি আদর্শ টেস্ট ক্রসের ফলাফল দেখানো হয়েছে, যেখানে বেগুনি বর্ণের ফুল (W) সাদা বর্ণের ফুলের (w) ওপর প্রকট।

পানেট বর্গ (Punnett Square) ব্যবহার করে একটি টেস্ট ক্রসের ফলে উৎপন্ন অপত্যজীবগুলোর প্রকৃতি খুঁজি বের করার চেস্টা কর।

তোমরা কী অনুপাত পেয়েছিলে?

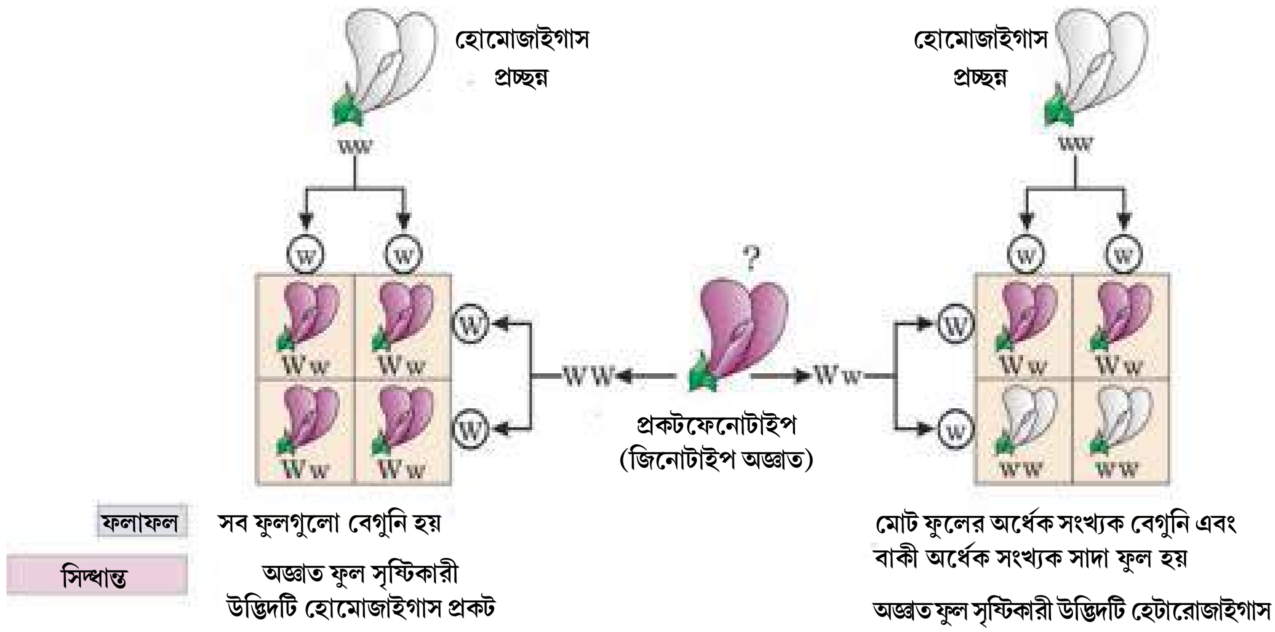

চিত্র 5.5 একটি টেস্ট ক্রসের চিত্ররূপ উপস্থাপন।

এই সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন জিনোটাইপগুলো ব্যবহার করে তোমরা কি টেস্ট ক্রসের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে পারবে?

মেন্ডেল এক সংকরায়ণ জননের (Monohybrid Cross) তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এক সংকর জননে বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা মজবুত করতে দুটি সাধারণ নীতির প্রস্তাব করেন। বর্তমানে এই নীতিগুলোকে বংশানুসরণের নীতি প্রথম সূত্র বা প্রকটতার সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র বা পৃথকীভবন সূত্র বলা হয়।

5.2.1 প্রকটতার সূত্র (Law of Dominance)

i) জীবের চীরিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বতন্ত্র একক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এদের ফ্যাক্টর (Factor) বলে।
ii) ফ্যাক্টরগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে।
iii) ফ্যাক্টরের একটি বিসদৃশ জোড়ের একটি ফ্যাক্টর প্রকট যা অপর প্রচ্ছন্ন ফ্যাক্টরকে দাবিয়ে রাখে অর্থাৎ একে প্রকাশ পেতে দেয় না।

একটি একসংকর জননের F_1 জনুতে জনিতৃ জীবের কেবলমাত্র একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়া এবং F_2 জনুতে উভয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে প্রকটতার সূত্রটি ব্যবহার করা হয়। এটি F_2 জনুতে প্রাপ্ত 3:1 অনুপাতটিকেও ব্যাখ্যা করে।

5.2.2 পৃথকীভবন সূত্র (Law of Segregation)

অ্যালীলগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায় না, এই সত্যটিই এই সূত্রের মূল ভিত্তি এবং উভয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই একইরূপে পুনরায় F_2 জনুতে প্রকাশিত হয়। যদিও এদের মধ্যে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও F_1 জনুতে প্রকাশিত হয় নি। যদিও গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনিতৃ জীবে দুটো অ্যালীলই উপস্থিত থাকে। তথাপি অ্যালীল জোড়ের প্রতিটি অ্যালীল বা ফ্যাক্টর একটি অপরটি থেকে এমনভাবে আলাদা হয়ে যায় যে একটি গ্যামেটে দুটো ফ্যাক্টরের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ফ্যাক্টরই

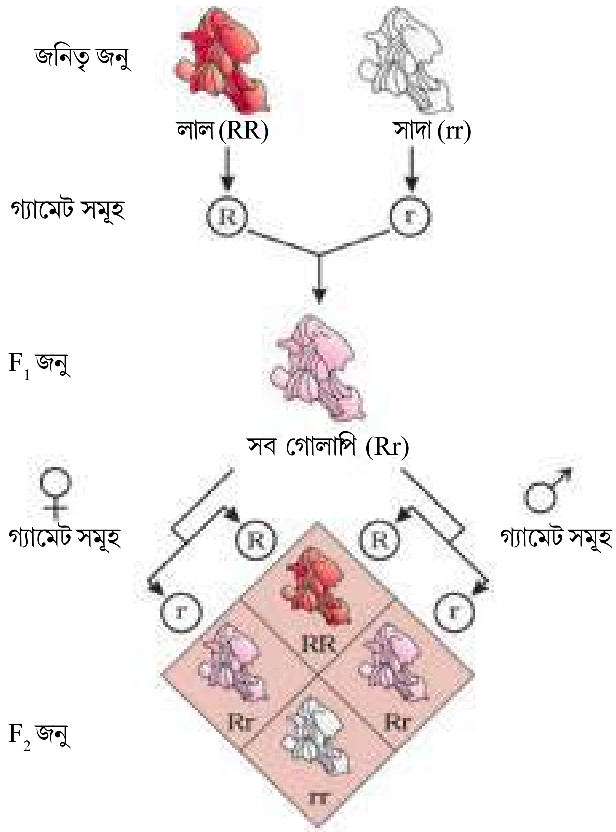

ফেনোটাইপগত অনুপাত— লাল : গোলাপি : সাদা
1 : 2 : 1
জিনোটাইপগত অনুপাত — RR : Rr : rr
1 : 2 : 1

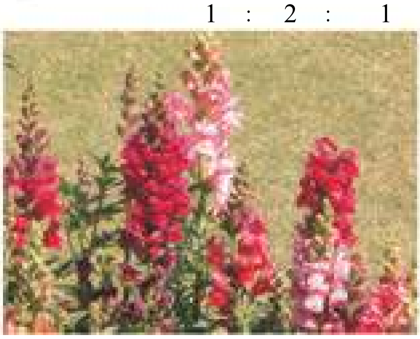

চিত্র : 5.6 স্ন্যাপড্রাগন উদ্ভিদে একসংকর জননের ফলাফল, যেখানে একটি অ্যালীল অসম্পূর্ণভাবে অপর অ্যালীলটির ওপর প্রকট।

আসে একটি হোমোজাইগাস জনিতৃ জীব থেকে সৃষ্ট সবগ্যামেট অবশ্যই একই ধরনের হয়, যেখানে একটি হেটারোজাইগাস জনিতৃ জীব দুই ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি করে, যাদের প্রতিটিতে সমঅনুপাতে একটি অ্যালীল বর্তমান থাকে।

5.2.2.1 অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance)

মটর গাছকে নিয়ে করা পরীক্ষাগুলো যখন অন্য উদ্ভিদের অন্য প্রলক্ষণগুলো ব্যবহার করে পুনরায় করা হয়েছিল, তখন এটা দেখা গিয়েছিল যে কখনো কখনো F_1 জনুতে উৎপন্ন অপত্য উদ্ভিদগুলো দুটো জনিতৃ উদ্ভিদের কোনোটির সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না এবং এদের ফেনোটাইপ, দুটো জনিতৃ জীবের ফেনোটাইপের মাঝামাঝি হয়।

ডগ্ ফ্লাওয়ার (স্ন্যাপড্রাগন বা Antirrhinum) এর ক্ষেত্রে ফুলের বর্ণের বংশানুসরণ অসম্পূর্ণ প্রকটতা বোঝার জন্য একটি ভাল উদাহরণ। বিশুদ্ধ লাল বর্ণের (RR) ফুল সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ এবং বিশুদ্ধ সাদাবর্ণের ফুল সৃষ্টিকারী (rr) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানোর ফলে F_1 জনুর অপত্য উদ্ভিদগুলোতে গোলাপি বর্ণের ফুল (Rr) সৃষ্টি হয়েছিল (চিত্র 5.6)। যখন F_1 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ ঘটানো হয়েছিল, তখন F_2 জনুতে লাল, গোলাপী ও সাদা - এই তিন ধরনের ফুল সৃষ্টি কারী উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এদের অনুপাত ছিল—1(RR) লাল:2(Rr) গোলাপী:1(rr) সাদা। এক্ষেত্রে জেনোটাইপগত অনুপাত গুলো যেকোনো মেন্ডেলীয় একসংকর জননের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশিত অনুপাতের অনুরূপ ছিল কিন্তু ফেনোটাইপিক অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন প্রলক্ষণ সমূহের 3:1 অনুপাতটির পরিবর্তন ঘটে। ঘটনাটি যা ঘটেছিল তা হল R,r এর উপর সম্পূর্ণভাবে প্রকট ছিল না। ফলস্বরূপ Rr জেনোটাইপটিকে গোলাপী বর্ণ হিসাবে RR (লাল) এবং rr (সাদা) থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রকটতার ধারণার ব্যাখ্যা (Explanation of The Concept of Dominance) :

প্রকটতা আসলে কী? কেন কিছু অ্যালীল প্রকট এবং কিছু অ্যালীল প্রচ্ছন্নধর্মী হয়? এই প্রশ্নগুলোর যোগ্য উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই বোঝতে হবে যে জিন আসলে কী করে? এখন পর্যন্ত তুমি যা জেনেছ সে অনুসারে প্রতিটি জিন নির্দিষ্ট চারিত্রিক প্রলক্ষণ প্রকাশ করার জন্য তথ্য বা সংকেত বহন করে। একটি ডিপ্লয়েড জীবে প্রতিটি জিন দুটি করে প্রতিলিপি অর্থাৎ অ্যালীল জোড় হিসাবে উপস্থিত থাকে। এখন এই দুটি অ্যালীল সব সময় সমরূপ নাও হতে পারে। যেমন হেটারোজাইগোটে অ্যালীল দ্বয় সমরূপ হয় না। কিছু পরিবর্তনের কারণে এদের মধ্যে যেকোনো একটি অ্যালীল ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। (পরবর্তী অধ্যায়ে এবং পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত অধ্যায়ন করবে)। যা ঐ নির্দিষ্ট অ্যালীলবাহিত তথ্যাবলীর কিছুটা পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

চল এমন একটি জিন কে উদাহরণ হিসাবে নেই যে জিন একটি উৎসেচক তৈরীর জন্য সংকেত বা বার্তা বহন করে, এখন এই জিনটির দুটি প্রতিলিপি অর্থাৎ দুটো অ্যালীল রয়েছে চল আমরা ধরে নিই

(সচরাচর যেটি ধরা হয়) স্বাভাবিক অ্যালীলটি একটি স্বাভাবিক উৎসেচক তৈরী করে যা একটি সাবস্ট্রেট 'S' কে রূপান্তরণের জন্য প্রয়োজনীয়। তাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত অ্যালীলটি যা উৎপাদনের জন্য বার্তা বহন করতে পারে সেগুলো হল —

i) স্বাভাবিক/কম কার্যকরী উৎসেচক অথবা
ii) একটি অকার্যকরী উৎসেচক অথবা
iii) কোনো উৎসেচকই নয়।

প্রথম ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অ্যালীলটি অপরিবর্তিত অ্যালীলটির সমতুল্য অর্থাৎ এটি একইরকম ফেনোটাইপ/প্রলক্ষণ সৃষ্টি করবে অর্থাৎ সাবস্ট্রেট 'S' এর রূপান্তরণ ঘটবে। এরূপ সমতুল্য অ্যালীল জোড় প্রায়শই দেখা যায়। কিন্তু যদি অ্যালীলটি অকার্যকরী উৎসেচক উৎপন্ন করে অথবা কোনো উৎসেচকই তৈরী না করে তবে ফেনোটাইপটি প্রভাবিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ফেনোটাইপ/প্রলক্ষণটি কিরূপ হবে তা কেবলমাত্র অপরিবর্তিত অ্যালীলটির কার্যকারিতার উপরই নির্ভর করবে। অপরিবর্তিত (কার্যকরী) অ্যালীল, যেটি মূল ফেনোটাইপটিকে উপস্থাপন করে যেটি হল প্রকট অ্যালীল এবং পরিবর্তিত অ্যালীল সাধারণত একটি প্রচ্ছন্নধর্মী অ্যালীল হয়। সুতরাং উপরের উদাহরণটিতে অকার্যকরী উৎসেচক তৈরী হওয়া অথবা কোনো উৎসেচক তৈরী না হওয়ার কারনে প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণটির প্রকাশ ঘটে।

5.2.2.2 সহ-প্রকটতা (Co-dominance)

এখনও পর্যন্ত আমরা সেই সমস্ত সংকরায়ণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে F_1 জনুর অপত্য জীবগুলো দুটো জনিতৃ জীবের মধ্যে যেকোনো একটি জীবের (প্রকটতা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল অথবা দুটো জীবের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের ছিল (অসম্পূর্ণ প্রকটতা)। কিন্তু সহ প্রকটতার ক্ষেত্রে F_1 জনুতে উৎপন্ন আপত্য জীবগুলো উভয় জনিতৃ জীবের সাথেই সাদৃশ্য প্রদর্শণ করেছিল। এর একটি ভাল উদাহরণ হল বিভিন্ন ধরনের লোহিত রক্ত কণিকা সমূহ যেগুলো মানুষের ক্ষেত্রে ABO- রক্ত শ্রেনীবিন্যাস পদ্ধতিতে রক্তের শ্রেনী নির্ধারণ করে। ABO রক্তের শ্রেনিগুলো 'I' জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর প্লাজমা পর্দায় সুগারপলিমার থাকে যেগুলো পদার্থ তল থেকে অভিক্ষেপ হিসাবে বেরিয়ে থাকে এবং এই শর্করার প্রকৃতি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জিন 'I' এবং I^A, I^B এবং i -এই তিনটি অ্যালীল রয়েছে। I^A এবং I^B অ্যালীল দুটির প্রভাব উৎপন্ন শর্করা গুলোর মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেখানে i অ্যালীলটির প্রভাবে কোনো শর্করাই তৈরী হয় না। মানুষ ডিপ্লয়েড জীব হওয়ার কারণে প্রতিটি ব্যক্তি 'I' জিনের তিনটি অ্যালীলের মধ্যে যে কোনো দুইটি অ্যালীল বহন করে। I^A এবং I^B অ্যালীল দুটো i অ্যালীলটির ওপর সম্পূর্ণরূপে প্রকট হয়। অন্য ভাবে বলতে গেলে যখন কোনো ব্যক্তিতে I^A এবং i এই দুটি অ্যালীল থাকে, তখন কেবলমাত্র I^A এর প্রভাবই প্রকাশ পায় (কারণ i এর প্রভাবে কোনো শর্করা উৎপন্ন হয় না) এবং যখন কোন ব্যক্তিতে I^B এবং i উপস্থিত

সারণি 5.2 মানুষের পপুলেশনে ব্লাডগ্রুপের জিনগত ভিত্তি সারণির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

		অপত্যের জিনোটাইপ	অপত্যসমূহের রক্তের ধরন
I^A	I^A	$I^A I^A$	A
I^A	I^B	$I^A I^B$	AB
I^A	i	$I^A i$	A
I^B	I^A	$I^A I^B$	AB
I^B	I^B	$I^B I^B$	B
I^B	i	$I^B i$	B
i	i	$i\ i$	O

থাকে তখন একই কারণে কেবলমাত্র I^B এর প্রভাবেরই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যখন ব্যক্তির দেহে I^A এবং I^B উভয় অ্যালীল একসাথে বর্তমান থাকে তখন উভয়ের প্রভাবে তাদের নিজস্ব ধরনের শর্করা উৎপন্ন হয়। এই ঘটনা সহপ্রকটতার কারণেই ঘটে। তাই লোহিত রক্ত কণিকাতে A এবং B উভয় ধরনের শর্করাই বর্তমান থাকে। যেহেতু তিনটি ভিন্ন ধরনের অ্যালীল রয়েছে এবং তাই এই তিনটি অ্যালীলের সম্ভাব্য ছয়টি ভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণ তৈরী হয় এবং তাই মানুষের ABO রক্তের ধরনে মোট ছয়টি ভিন্ন ধরনের জিনোটাইপ পরিলক্ষিত হয় (সারণি 5.2)। কত ধরনের ফেনোটাইপ পাওয়া সম্ভবপর হয়?

তোমরা কি এটা ধারণা করতে পার যে ABO রক্ত শ্রেনিবিন্যাস পদ্ধতিটির উদাহরণ 'বহু-অ্যালীলের' (Multiple Alleles) ও একটি ভাল উদাহরণ? এক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুটির বেশি অর্থাৎ তিনটি অ্যালীল দ্বারা একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং একক জীবে মাত্র দুটি অ্যালীল উপস্থিত থাকতে পারে, বহু অ্যালীল একমাত্র তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন জনসংখ্যা অধ্যয়ন করা হয়।

কদাচিৎ একটি একক জিনের প্রভাবে উৎপন্ন বস্তু একাধিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মটর বীজে শ্বেতসার সংশ্লেষণ একটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর দুটো অ্যালীল (B এবং b) রয়েছে। শ্বেতসার কার্যকরীভাবে BB হোমোজাইগোটস দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং তাই বৃহৎ শ্বেতসার দানা তৈরী হয়। বিপরীতভাবে bb হোমোজাইগোটস এর শ্বেতসার সংশ্লেষের কার্যকারী ক্ষমতা কম থাকায় এটি অপেক্ষাকৃত ছোট শ্বেতসার দানা তৈরী করে। বীজগুলো পরিণত হওয়ার পর BB বীজগুলো গোলাকৃতি এবং bb বীজগুলো কুঞ্চিত আকৃতির হয়। হেটারোজাইগোটস গোলাকৃতি বীজ সৃষ্টি করে এবং তাই B কে প্রকট অ্যালীল হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু Bb বীজগুলোতে মাঝামাঝি আকারের শ্বেতসার দানা তৈরী হয়। সুতরাং যদি শ্বেতসার দানার আকারকে ফেনোটাইপ হিসাবে বিবেচনা করা যায়, তবে এই দৃষ্টি কোন থেকে অ্যালীলগুলো অসম্পূর্ণ প্রকটতা প্রদর্শন করে।

সুতরাং প্রকটতা কোন একটি জিন অথবা জিনটির প্রভাবে উৎপন্ন বস্তু যা এই জিনের তথ্য বহন করে, তার কোনো স্বাধীন বৈশিষ্ট্য (Autonomous Feature) নয়। যেক্ষেত্রে একাধিক ফেনোটাইপ একই জিন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রকটতা জিনের প্রভাবে সৃষ্ট বস্তু এবং এই বস্তু থেকে উৎপন্ন একটি নির্দিষ্ট ফেনোটাইপের উপর যতটা নির্ভর করে, ততটাই এটি নির্ভর করে যে নির্দিষ্ট ফেনোটাইপটিকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল।

5.3 দুটি জিনের বংশানুসরণ (Inheritance of Two Genes) :

মেন্ডেল এমন সব মটর গাছ নিয়েও কাজ করে ছিলেন এবং সংকরায়ণ ঘটিয়েছিলেন, যেগুলো দুটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ছিল; যেটা হলুদ বর্ণ এবং গোলাকৃতি বীজ সৃষ্টিকারী মটর গাছ, একটি সবুজ বর্ণ এবং কুঞ্চিত আকৃতির বীজসৃষ্টিকারী মটর গাছের মধ্যে সংকরায়ণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। (চিত্র 5.7), মেন্ডেল দেখেছিলেন যে দুটি জনিতৃ জীবের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট অপত্য উদ্ভিদগুলো থেকে হলুদ বর্ণ গোলাকৃতির বীজ সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে তুমি কি বলতে পার হলুদ/সবুজবর্ণ এবং গোলাকৃতি/কুঞ্চিত আকৃতির — এই দুটি বৈশিষ্ট্য জোড়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকট ছিল?

তাই হলুদবর্ণটি সবুজ বর্ণের উপর এবং গোলাকৃতি বৈশিষ্ট্যটি কুঞ্চিত আকৃতি বৈশিষ্ট্যটির ওপর প্রকট ছিল। তিনি হলুদ এবং সবুজ বীজ সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ এবং গোলাকৃতি এবং কুঞ্চিত বীজসৃষ্টিকারী উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে একসংকর জনন ঘটিয়ে যে ফল পেয়েছিলেন তা, এই ফলাফলের অনুরূপ ছিল।

চল আমরা বীজের হলুদ বর্ণ এই প্রকট বৈশিষ্ট্যের জন্য 'Y' জিনোটাইপগত সংকেত, এবং সবুজ বর্ণের বীজের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য 'y' জিনোটাইপগত সংকেত ব্যবহার করি। পাশাপাশি গোলাকৃতি বীজের জন্য 'R' এবং কুঞ্চিত আকৃতির বীজের জন্য 'r' চিহ্ন ব্যবহার করি। এখন জনিতৃ জীবদের জিনোটাইপ RRYY এবং rryy এইভাবে লেখা যেতে পারে। দুটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণকে চিত্র 5.7, যেখানে জনিতৃ উদ্ভিদগুলোর জিনোটাইপগুলো দেখানো হয়েছে — সেভাবে লেখা যেতে পারে। RY এবং ry গ্যামেটদ্বয় নিষেক কালে মিলিত

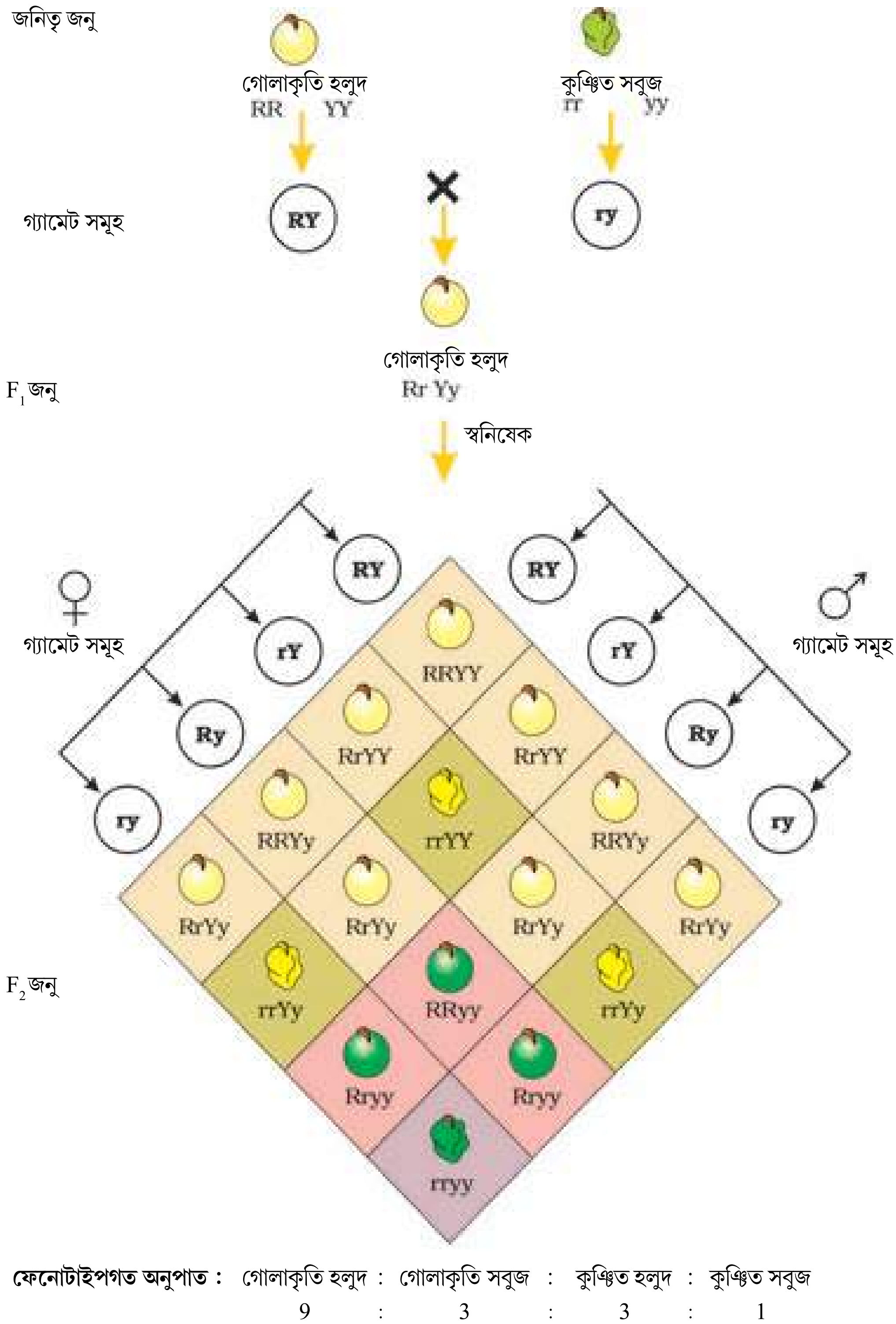

চিত্র: 5.7 একটি দ্বিসংকর জননের ফলাফল যেখানে দুটি জনিতৃ জীবের মধ্যে দুইজোড়া বিপরীতধর্মী প্রলক্ষণের পার্থক্য রয়েছে ঃ বীজের বর্ণ এবং বীজের আকৃতি।

হয়ে F_1 জনুতে RrYy জিনোটাইপ বিশিষ্ট সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। মেন্ডেল যখন F_1 জনুর সংকর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে স্ব-নিষেক ঘটালেন তখন তিনি দেখলেন যে অপত্য গুলোর মধ্যে $^3/_4$ হলুদ বর্ণ বীজ সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ এবং $^1/_4$ সবুজ বর্ণের বীজ সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছিল। হলুদ এবং সবুজ বর্ণ 3:1 অনুপাতে পৃথক হয়েছিল। আবার ঠিক একসংকর জননের মতোই বীজের গোল এবং কুঞ্চিত আকৃতিও 3:1 অনুপাতে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

5.3.1 স্বাধীন-সঞ্চারণ সূত্র (Law of Independent Assortment)

দ্বিসংকর জননে (চিত্র 5.7), গোলাকৃতি - হলুদ; কুঞ্চিত আকৃতি হলুদ; গোলকৃতি সবুজ এবং কুঞ্চিত আকৃতি সবুজ এই ফেনোটাইপগুলো 9:3:3:1 অনুপাতে প্রকাশ পেয়েছিল। এ ধরনের অনুপাত আরও কিছু বৈশিষ্ট্য জোড়, যেগুলো নিয়ে মেন্ডেল পরীক্ষা করেছিলেন এগুলোর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। 9:3:3:1 অনুপাতটি 3টি হলুদ 1টি সবুজ সহ 3টি গোলাকৃতি ও 1টি কুঞ্চিত আকৃতির সংমিশ্রণের ক্রম হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। এই উদ্ভূত ফলাফলটি নিম্নলিখিত রূপে লেখা যেতে পারে।

(3টি গোলাকৃতি : 1টি কুঞ্চিত আকৃতি) (3টি হলুদ : 1টি সবুজ) = 9টি গোলাকৃতি, হলুদ : 3টি কুঞ্চিত আকৃতি, হলুদ : 3টি গোলাকৃতি, সবুজ : 1টি কুঞ্চিত আকৃতি, সবুজ।

দ্বিসংকর জননের এইরূপ পর্যবেক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে (দুটি প্রলক্ষণে পার্থক্য রয়েছে এমন দুটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ) মেন্ডেল দ্বিতীয় সাধারণীকরণের সেট (Set of Generalisations) -এর প্রস্তাব রেখেছিলেন, যাকে আমরা মেন্ডেলের 'স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র' বলি। এই সূত্রটি এক কথাই ব্যক্ত করে যে যখন একটি সংকর জীবে দুইজোড়া প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন একজোড়া প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য অপর প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যে জোড়া থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হয়ে যায়।

মেয়োসিসের সময় F_1 জনুর RrYy উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু এবং পরাগরেণু উৎপাদন কালে দুইজোড়া জিনের স্বাধীনভাবে পৃথক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুধাবনের জন্য পানেট বর্গকে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিন 'R' এবং 'r' জিনজোড়ের পৃথকীকরণের ঘটনাটি বিবেচনা কর। উৎপন্ন জননকোশের 50 শতাংশকে জননকোশে 'R' জিন এবং বাকী 50 শতাংশ জননকোশে 'r' জিন থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্যামেটে এতে থাকা 'R' অথবা 'r' অ্যালীল ছাড়া Y অথবা y অ্যালীলও থাকবে। এখানে মনে রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই 50 শতাংশ R এবং 50 শতাংশ r এর পৃথকীভবন, 50% Y এবং 50% Y এর পৃথকীভবনের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। একইভাবে 50 শতাংশ R অ্যালীল বহন কারী গ্যামেটে Y এবং বাকী 50 শতাংশ R বহন কারী গ্যামেটে y রয়েছে। তাই গ্যামেট গুলো চার ধরনের জিনোটাইপ বিশিষ্ট হয় (চারধরনের পরাগরেনু এবং চারধরনের ডিম্বানু) এই চারধরনের গ্যামেট হল RY,Ry,rY,ry এবং প্রতিটি গ্যামেটের ক্ষেত্রে মোট উৎপন্ন গ্যামেটের ফ্রিকোয়েন্সি হয় 25 শতাংশ বা 1/4 । যখন তুমি এই চার ধরনের ডিম্বাণু এবং পরাগরেণুকে পানেট্ বর্গের দুইধারে লিখবে তখন জাইগোটের সংগঠন বের করা খুবই সহজ হবে এবং এই জাইগোট থেকেই F_2 জনুর উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে (চিত্র 5.7)। যদিও 16 টি বর্গ রয়েছে তবে কত ভিন্ন ধরনের জেনোটাইপ এবং ফেনোটাইপ সৃষ্টি হবে? এগুলো প্রদত্ত ছকে লিপিবদ্ধ কর।

ক্রমিক সংখ্যা	F_2 জনুতে প্রাপ্ত জিনোটাইপ সমূহ	এদের থেকে প্রত্যাশিত ফেনোটাইপ সমূহ

পানেট বর্গ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে তুমি কি F_2 জনুর উদ্ভিদগুলোর জিনোটাইপগত অনুপাত বের করতে এবং প্রদত্ত ছকটি পূরণ করতে পারো? এক্ষেত্রে জিনোটাইপগত অনুপাত কি 9:3:3:1 হয়?

5.3.2 বংশানুসরণের ক্রোমোজোমীয় তত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)

1865 সালে মেন্ডেল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের উপর গবেষণার কাজ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বেশ কিছু কারণে 1900 সাল পর্যন্ত তা স্বীকৃত হয় নি। প্রথমত: ঐ সময়ে যোগাযোগের বিষয়টি এখনকার মত সহজ ছিল না এবং তাই তাঁর কাজটির ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত: সুস্থিত এবং স্বতন্ত্র একক হিসাবে তার জিন সম্পর্কিত ধারণা (মেন্ডেলের ভাষায় ফ্যাক্টর) যা প্রলক্ষণ সমূহের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং অ্যালীলজোড়ের একটি অ্যালীল যে অপরটির সাথে মিশ্রিত হয় না — এই বিষয়টিকেও প্রকৃতিতে আপাতভাবে অবিরাম ঘটে চলা প্রকরণের ক্ষেত্রে একটি ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি। তৃতীয়ত: জীবজ ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেন্ডেলের গণিত ব্যবহারের পদক্ষেপটি ছিল পুরোপুরি নতুন পদক্ষেপ এবং যা তাঁর সমকালীন বহুবিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। পরিশেষে যদিও মেন্ডেলের গবেষণা এটা ব্যক্ত করেছিল যে ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) ছিল কতকগুলো স্বতন্ত্র একক। তিনি ফ্যাক্টরগুলোর অস্তিত্বের কোনোরূপ ভৌত প্রমাণ (Physical Proof) দিতে পারেন নি অথবা এগুলো কি দিয়ে তৈরী তাও বলতে পারেন নি।

1900 সালে তিনজন বিজ্ঞানী (De Vries, Correns এবং Von Tschermak) স্বাধীনভাবে বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের উপর মেন্ডেলের প্রাপ্ত ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। সেইসময় কালের মধ্যে উন্নত ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার ও ব্যবহার উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও বিজ্ঞানীরা সযত্নে কোশবিভাজন পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পর্যবেক্ষণে নিউক্লিয়াসে এমন সব গঠন অবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলো জোড়া হিসাবে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং প্রতিবার কোশ বিভাজনের ঠিক আগে এগুলোর বিভাজন ঘটেছিল। এই গঠন গুলোকে ক্রোমোজোম বলা হয় (রঞ্জিত গঠণ সমূহ; রঞ্জিতকরণের পর এদের যেরূপ দেখা গিয়েছিল)। 1902 সালের মধ্যে মিয়োসিস কালে ক্রোমোজোমের চলন বের করা হয়েছিল। Walter Sutton এবং Theodore Boveri লক্ষ্য করেছিলেন যে ক্রোমোজোম সমূহের আচরণ জিনগুলোর আচরণের সমান্তরাল ছিল এবং তাঁরা মেন্ডেলের সূত্রাবলী (ছক 5.3) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রোমোজোমের চলনকে ব্যবহার করেছিলেন (চিত্র 5.8)। মাইটোসিস কালে (সদৃশ বিভাজন) এবং মিয়োসিস কালে (হ্রাস বিভাজন) ক্রোমোজোমগুলোর আচরণ সম্পর্কে তোমরা যা অধ্যায়ণ করেছ তা মনে করে দেখ। মনে রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো হল এই যে ক্রামোজোম এবং জিন উভয়ই জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। একটি জিন জোড়ের অ্যালীলদ্বয় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর, সমসংস্থ-স্থান অর্থাৎ একই স্থানে অবস্থান করে।

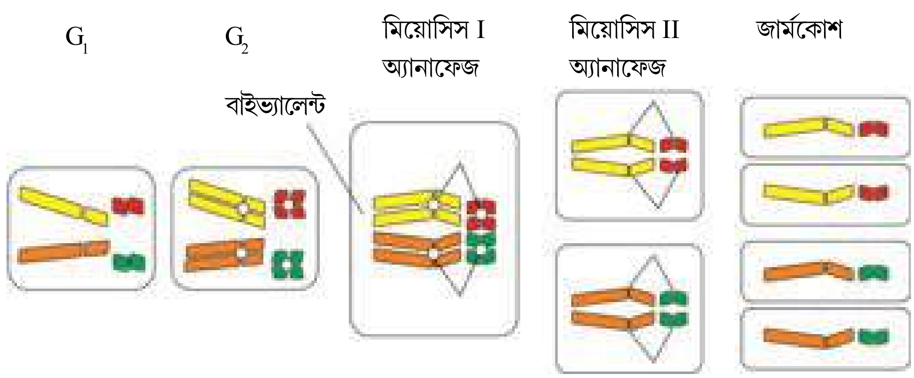

চিত্র 5.8 মিয়োসিস এবং একটি কোশে চারটি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট্য জার্ম কোশ সৃষ্টি। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ জার্ম কোশ সৃষ্টির সময় কিভাবে ক্রোমোজোমগুলো পৃথক হয়ে যায়?

সারণি 5.3 ক্রোমোজোম এবং জিন এর আচরণ এর মধ্যে তুলনা :

ক	খ
ক্রোমোজোম জোড়ায় থাকে	জিন জোড়ায় থাকে
গ্যামেট সৃষ্টিকালে এরা এমন ভাবে পৃথক হয়ে যায় যে প্রতি জোড়ার একটি প্রতিটি গ্যামেটে সঞ্চারিত হয়।	গ্যামেট গঠনকালে পৃথক হয়ে যায় এবং প্রতি জোড়ার একটি প্রতিটি গ্যামেটে সঞ্চারিত হয়।
স্বাধীন জোড়াগুলো একে অপর থেকে স্বাধীন ভাবে পৃথক হয়।	একজোড়া অন্যজোড়া থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হয়।
তুমি কি বলতে পারো 'ক' এবং 'খ' স্তম্ভগুলোর কোন্‌টি ক্রোমোজোমকে এবং কোন্‌টি জিনকে উপস্থাপন করে? তুমি তা কিভাবে স্থির করেছিলে?	

মিয়োসিস I এর অ্যানাফেজ দশা চলা কালো দুটি ক্রোমোজোম জোড়া একে অপরের সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে মেটাফেজ প্লেটে একটি রেখায় সজ্জিত হতে পারে (চিত্র 5.9)। এই বিষয়টি বোঝার জন্য বাম এবং ডান স্তম্ভে থাকা চারটি ভিন্ন বর্ণের ক্রোমোজোমগুলোর তুলনা কর। বাঁদিকের স্তম্ভে (সম্ভাবনা I) কমলা এবং সবুজ এই দুই বর্ণের ক্রোমোজোম একই সঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ডান পাশের স্তম্ভে (সম্ভাবনা II) কমলা বর্ণের ক্রোমোজোম, লালবর্ণের ক্রোমোজোমটি সহ পৃথক হয়ে যায়।

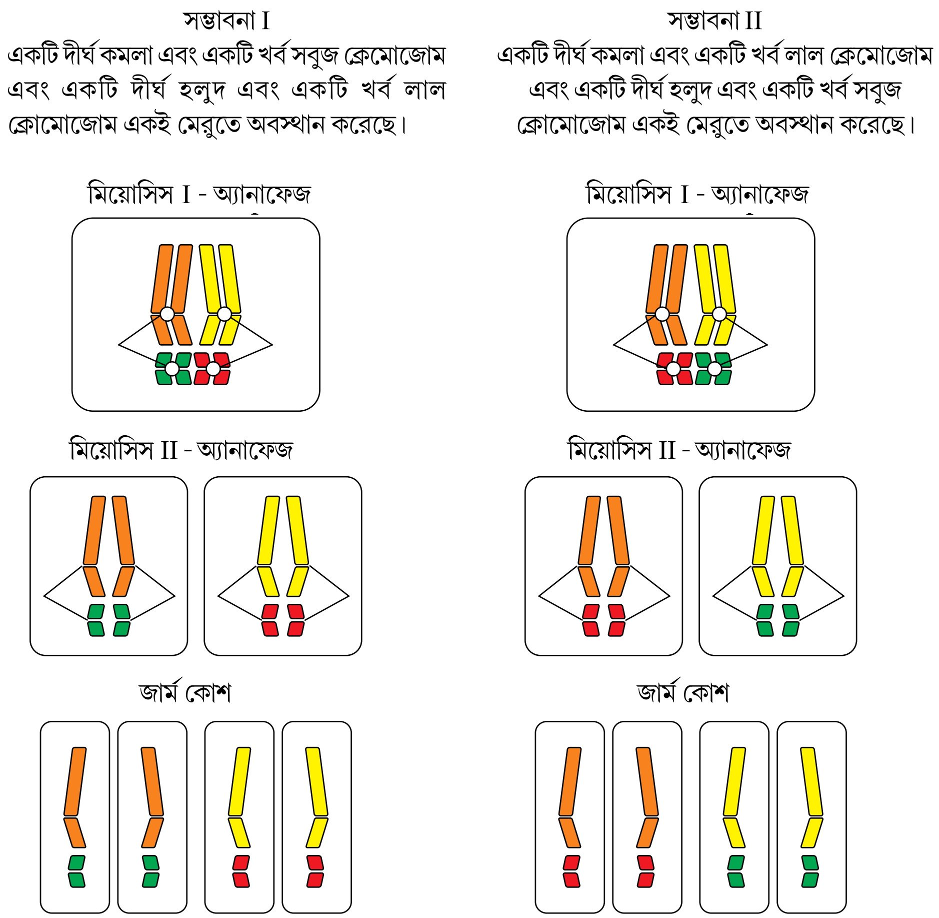

চিত্র 5.9 ক্রোমোজোমের স্বাধীন সঞ্চরণ

Sutton ও Boveri এই মন্তব্য করেছিলেন যে একজোড়া ক্রোমোজোমের জোড়বাঁধা এবং পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতেই এদের মধ্যে থাকা একজোড়া ফ্যাক্টরের পৃথকীকরণ ঘটে। Sutton ক্রোমোজোমীয় পৃথকীকরণের জ্ঞানের সাথে মেন্ডেলীয় নীতি সমূহের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন এবং একে বংশানুসরণের ক্রোমোজোমীয় তত্ত্ব রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। উদ্ভূত এই সব ধারণাগুলোকে অনুসরণ করে Thomas Hunt Morgan তাঁর সহকরীগণ দ্বারা সংঘটিত বংশানুসরণের ক্রোমোজোমীয় তত্ত্ব পরীক্ষামূলক যাচাইকরণ- যৌন জননের ফলে উদ্ভূত প্রকরণের ভিত্তি আবিষ্কারের পথ সুগম করেছিল।

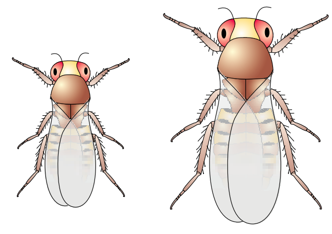

চিত্র 5.10 *Drosophila Melanogaster* (ক) পুরুষ ফলমাছি (খ) স্ত্রী ফলমাছি

Morgan - *Drosophila Melanogaster* নামক (চিত্র 5.10) অতিক্ষুদ্র ফলমাছি নিয়ে গবেষণার কাজ করেছিলেন। যেগুলোকে এই ধরনের কাজের জন্য খুবই উপযুক্ত বলে দেখা গিয়াছিল। পরীক্ষাগারে, সাধারণ কৃত্রিম ধাত্রে এই ফলমাছিগুলোর বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। এরা প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের জীবনচক্র সম্পন্ন করে এবং একটি একক সঙ্গমের ফলে বিশাল সংখ্যক অপত্য ফলমাছি সৃষ্টি হতে পারে। এদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লিঙ্গাভেদ ও বর্তমান। খুব সহজেই পুরুষ ফলমাছি ও স্ত্রী ফলমাছিকে অলাদা করা যায়। এদের বিভিন্ন ধরনের বংশগত প্রকরণও রয়েছে যা নিম্ন বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যেতে পারে।

5.3.3 লিঙ্কেজ এবং পুনঃসংযুক্তি (Linkage and Recombination)

লিঙ্গাসংযোজিত (Sex Linked) জিনসমূহ অধ্যায়নের জন্য Morgan বহুবার ড্রসোফিলায় দ্বিসংকর জনন ঘটিয়েছিলেন। এই সংকরায়ণগুলো, মেন্ডেল মটর গাছের যে দ্বিসংকর জনন গুলো ঘটিয়েছিলেন তার অনুরূপ ছিল। উদাহরণস্বরূপ Morgan হলুদবর্ণের দেহ এবং সাদা চক্ষু বিশিষ্ট্য স্ত্রী মাছিগুলোর সাথে বাদামী বর্ণের লাল চক্ষু বিশিষ্ট্য পুরুষ মাছি এবং এদের F_1 জনুতে উৎপন্ন মাছিগুলোর নিজেদের মধ্যে সংরায়ণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে দুটো জিন পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হয়ে যায় নি এবং F_2 জনুতে উৎপন্ন মাছির অনুপাত তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে 9:3:3:1 (যখন দুটি জিন স্বাধীনভাবে থাকে তখনই এই অনুপাতটি প্রত্যাশিত) থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।

Morgan এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ জানতেন যে, জিনগুলো X ক্রোমোজোমের উপর সজ্জিত ছিল (অনুচ্ছেদ 5.4) এবং দ্রুত দেখলেন যে যখন একটি দ্বিসংকর জননের ক্ষেত্রে দুটো জিন একই ক্রোমোজোমে উপস্থিত ছিল, তখন জনিতৃ জিন সংমিশ্রণের অনুপাত জনিতৃ জিন এর মত নয়, এমন ধরনের তুলনাই অনেকটা বেশি ছিল। এর কারণ হিসাবে Morgan দুটি জিনের ভৌত সংযুক্তিকরণ বা লিঙ্কেজকে দায়ী করেছেন এবং ক্রোমোজোমস্থিত জিনগুলোর মধ্যে সংযুক্তিকরণকে ব্যাখ্যা করতে 'লিঙ্কেজ' এবং জনিতৃ নয় এমন ক্ষেত্রে জিন সংমিশ্রনগুলোর সৃষ্টিকে বোঝাতে 'রিকম্বিনেশন' — এই পরিভাষা দুটি উদ্ভাবন করেন (চিত্র 5.11)। Morgan এবং তাঁর সহকর্মীরা এও লক্ষ্য করেছিলেন যে এমনকি তখন জিন গুলো দলবদ্ধ ভাবে একই ক্রোমোজোমে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রেও কিছু জিন খুবই দৃঢ়ভাবে লিঙ্কড থাকে (অত্যন্ত কম মাত্রায় রিকম্বিনেশন প্রদর্শণ করে) (চিত্র 5.11 সংকরায়ণ ক) যেখানে অন্যগুলো শিথিল ভাবে লিঙ্কড থাকে (উচ্চমাত্রায় রিকম্বিনেশন প্রদর্শন করে) (চিত্র 5.11, সংকরায়ণ খ)। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দেখলেন যে সাদা এবং হলুদ দেহ বর্ণের জন্য দায়ী জিনগুলো খুবই দৃঢ়ভাবে লিঙ্কড ছিল এবং মাত্র 1.3 শতাংশ রিকম্বিনেশন প্রদর্শন করেছিল, যেখানে সাদা এবং খর্ব ডানার ক্ষেত্রে 37.2 শতাংশ রিকম্বিনেশান দেখা গিয়েছিল। তাঁর ছাত্র Alfred Sturtevant একই ক্রোমোজোম স্থিত জিন জোড়ার মধ্যে রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সিকে জিনগুলোর মধ্যেকার ব্যবধানের পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্রোমোজোমের উপর জিনগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন।

বর্তমান দিনে সম্পূর্ণ জিনোমের সজ্জাক্রম তৈরীর ক্ষেত্রে সূচনাকারী হিসাবে জেনেটিক ম্যাপ (Genetic Map) বহুল ব্যবহৃত যা Human Genome প্রজেক্টের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা হয়েছে।

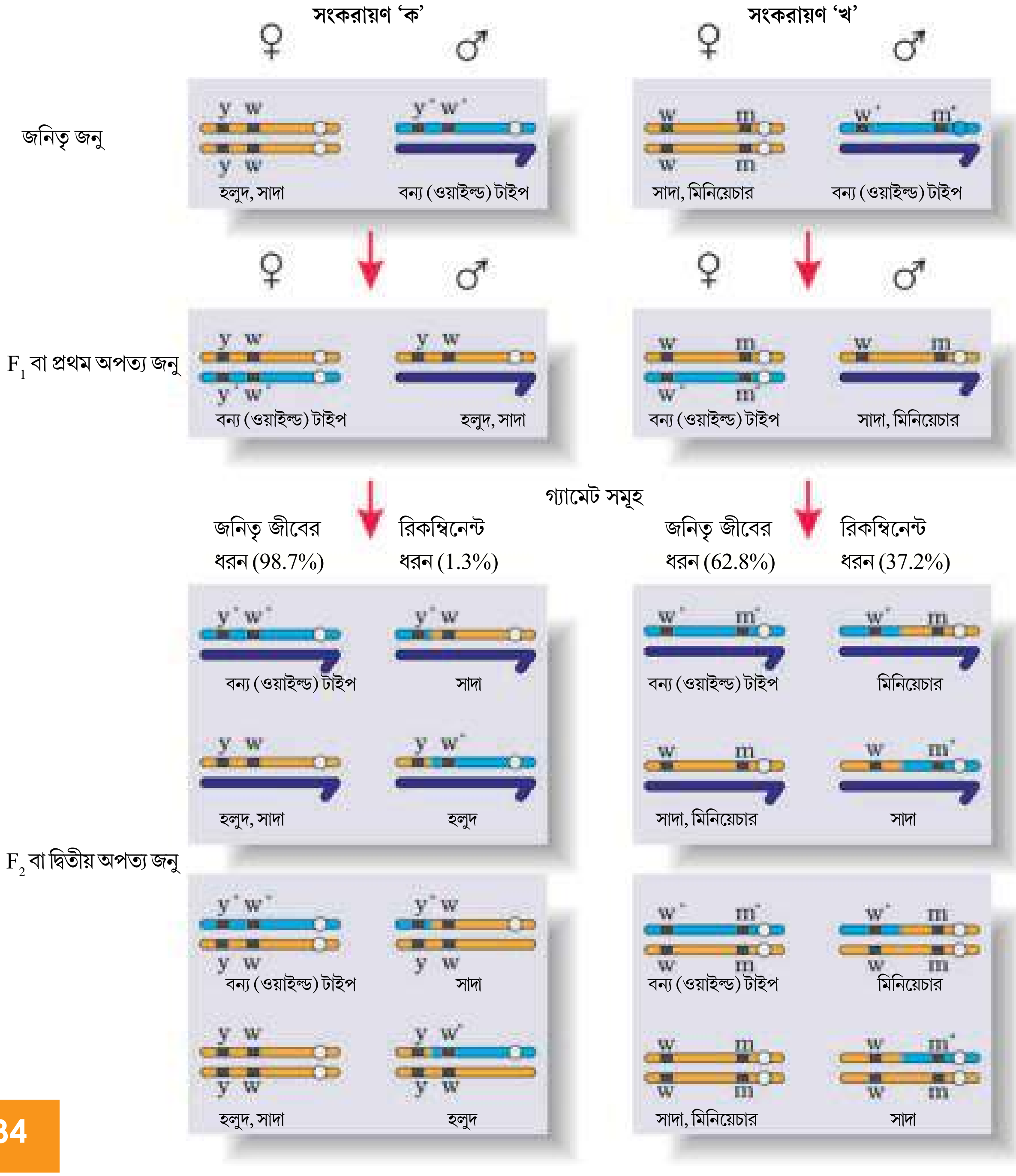

চিত্র 5.11 লিঙ্কেজ : মরগান দ্বারা সংগঠিত দুটি দ্বিসংকর জননের ফলাফল সমূহ। সংকরায়ণ 'ক' তে y জিন এবং w জিন এর মধ্যে সংকরায়ণ; সংকর 'খ' তে w এবং m জিনের মধ্যে সংকরায়ণ দেখানো হয়েছে। এখানে প্রকটধর্মী বন্য (ওয়াইল্ড) টাইপ অ্যালীলগুলোকে এদের ওপরদিকে '+' চিহ্নের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : y এবং w এর মধ্যেকার লিঙ্কেজ বল w এবং m এর মধ্যেকার লিঙ্কেজ বলের তুলনায় বেশি।

5.4 বহু জিন উত্তরাধিকার (Polygenic Inheritance)

মেন্ডেলের গবেষণা প্রধানত সেইসব প্রলক্ষণগুলোকেই বর্ণনা করেছে যেগুলোর সুস্পষ্ট বিপরীতধর্মী রূপ রয়েছে, যেমন ফুলের বর্ণ হয় গোলাপি, নয়তো সাদা। কিন্তু তোমরা যদি চারপাশে তাকাও তোমরা দেখতে পাবে যে এমন অনেক প্রলক্ষণ রয়েছে যেগুলো ততটা সুস্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান নয় এবং একটি নির্দিষ্ট নতিমাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের ক্ষেত্রে দুটো স্পষ্ট প্রলক্ষণ হিসাবে শুধুমাত্র যে লম্বা অথবা বেঁটে মানুষ রয়েছে তা নয়, সম্ভাব্য সব উচ্চতাবিশিষ্ট মানুষই রয়েছে। এই ধরনের প্রলক্ষণগুলো সাধারণত তিন অথবা তার বেশি সংখ্যক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই জন্যই এগুলোকে বহু জিনগত প্রলক্ষণ (Polygenic Trait) বলে। বহু জিনের ক্রিয়ার পাশাপাশি পরিবেশীয় প্রভাবের কারণেও বহু জিনগত উত্তরাধিকার ঘটে। মানুষের ত্বকের বর্ণ এটির আরেকটি উত্তম উদাহরণ। একটি বহুজিনগত প্রলক্ষণের ক্ষেত্রে ফেনোটাইপগত বৈশিষ্ট্যটি প্রতিটি অ্যালীলের অবদানকে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ প্রতিটি অ্যালীলের প্রভাবই এদের ক্ষমতা বর্ধনের সহায়ক হয়। এটি ভালোভাবে বোঝার জন্য চল আমরা ধরে নিই যে A,B,C এই তিনটি জিন মানুষের ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে এই জিন গুলোর প্রকটরূপ A,B,C ত্বকের গাঢ় বর্ণ এবং জিনগুলোর প্রচ্ছন্নরূপ a,b এবং c ত্বকের হালকা বর্ণের জন্য দায়ী। সবগুলো প্রকট অ্যালীলবিশিষ্ট জিনোটাইপ (AA,BB,CC) এর উপস্থিতিতে ত্বকের সবচেয়ে গাঢ় বর্ণের সৃষ্টি হয় এবং সব প্রচ্ছন্ন অ্যালীল (aa,bb,cc) এর উপস্থিতিতে ত্বকের বর্ণ সবচেয়ে হালকা হয়। প্রত্যাশা মতোই তিনটি প্রকট অ্যালীল এবং তিনটি প্রচ্ছন্ন অ্যালীল বিশিষ্ট জিনোটাইপ ত্বকের একটি মাঝামাঝি বর্ণ সৃষ্টি করে। এইভাবেই জিনোটাইপে প্রত্যেক প্রকারের অ্যালীলের সংখ্যা কোন ব্যক্তির ত্বকের বর্ণ কতটা গাঢ় হবে বা কতটা হালকা হবে তা নির্ধারণ করে।

5.5 প্লিওট্রপি (Pleotropy)

আমরা এতক্ষণ একটি একক ফেনোটাইপ বা প্রলক্ষণের ওপর একটি জিনের প্রভাব দেখেছি। তবে এমন ও উদাহরণ রয়েছে যেখানে একটি জিন বহু ফেনোটাইপের প্রকাশ ঘটাতে পারে। এই ধরনের একটি জিনকে প্লিয়োট্রপিক জিন বলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্লিওট্রপির পেছনে যে পদ্ধতি ক্রিয়াশীল তা হল বিপাকীয় পথ সমূহের ওপর একটি জিনের প্রভাব, যার ফল স্বরূপ বিভিন্ন ধরনের ফেনোটাইপের প্রকাশ ঘটে। প্লিওট্রপির একটি উদাহরণ হল ফিনাইল কিট্যুনুরিয়া রোগ যা মানব দেহে ঘটতে দেখা যায়। ফেনাইল অ্যালানিন হাইড্রোক্সিলেস (একক জিনের মিউটেশান) নামক উৎসেচকটির সংকেত বহনকারী জিনটিতে মিউটেশান ঘটার ফলে এই রোগটি সৃষ্টি হয়। এই রোগের কারণে রোগির মধ্যে যে যে ফেনোটাইপগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে সেগুলো হল জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া এবং মাথার চুল কমে যাওয়া ও ত্বকের বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া।

5.6 লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex Determination)

জিনতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি সবসময়ই একটি ধাধাঁর বিষয়। বহুপূর্বে পতঙ্গাদের উপর করা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষারগুলোতে লিঙ্গা নির্ধারণের জন্য জিনগত ক্রোমোজোমীয় পদ্ধতি বিষয়ে প্রাথমিক সংকেতটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে বেস কিছু পতঙ্গো করা কোশীয় পর্যবেক্ষণ সমূহ থেকে লিঙ্গা নির্ধারণের জিনগত/ক্রোমোজোমীয় ভিত্তি সংক্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। Henking (1891) কিছু পতঙ্গো স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার পুরো সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিয় গঠনের সন্ধান করতে পেরেছিলেন এবং তিনি এটিও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে স্পার্মাটোজেনেসিসের মাধ্যমে শুক্রাণু-উৎপাদন প্রক্রিয়ার শেষে 50 শতাংশ শুক্রাণু এই গঠনটি লাভ করেছিল, অথচ অন্য 50 শতাংশ শুক্রাণু এই নির্দিষ্ট গঠনটি লাভ করে নি। Henking এর নাম দিলেন X -বডি, কিন্তু তিনি এটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পরবর্তীতে অন্য বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান সমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে

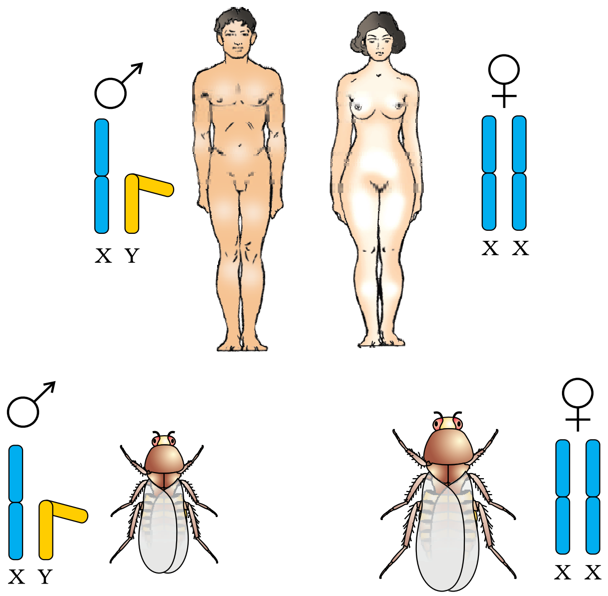

উপনীত হওয়া গেছে যে Henking এর 'X' বডি বস্তুতঃপক্ষে একটি ক্রোমোজোম এবং এই কারণেই এটিকে X-ক্রোমোজোম নামকরণ করা হয়েছিল। এটিও দেখা গিয়েছিল যে বিশাল সংখ্যক পতঙ্গো লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতি XO প্রকৃতির হয় অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে সব ডিম্বাণুই অন্য ক্রোমোজোমগুলোর (অটোজোম) ছাড়াও একটি করে অতিরিক্ত X ক্রোমোজোম বহন করে। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক শুক্রাণু X ক্রোমোজোম বহন করে আবার কিছু সংখ্যক শুক্রাণুতে X ক্রোমোজোম থাকে না। X - ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুটি নিষিক্ত হলে তা স্ত্রী প্রাণী সৃষ্টি করে। X-ক্রোমোজোম বিহীন শুক্রানু দ্বারা ডিম্বানুটি নিষিক্ত হলে তা থেকে পুরুষ প্রাণী সৃষ্টি হয়। তোমরা কি ভাবতে পার যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই প্রাণীর দেহেই সমসংখ্যাক ক্রোমোজোম রয়েছে? লিঙ্গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোমের ভূমিকা থাকার কারণে এটিকে যৌন ক্রোমোজোম (Sex Chromosome) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বাকী অন্য সব ক্রোমোজোম গুলোকে অটোজোম নামে অভিহিত করা হয়েছে। Grasshopper হল XO প্রকৃতির লিঙ্গা নির্ধারণের একটি উদাহরণ, যেক্ষেত্রে পুরুষ পতঙ্গো অটোজোম গুলোর পাশাপাশি মাত্র একটি X - ক্রোমোজোম থাকে, অপর দিকে স্ত্রী পতঙ্গো অটোজোম গুলোর পাশাপাশি একজোড়া X -ক্রোমোজোম বর্তমান। এই পর্যবেক্ষণগুলো থেকে লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতি বোঝার জন্য বেশ কিছু প্রজাতির জীবেও তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। বেশ কিছু পতঙ্গা এবং মানুষ সহ স্তন্য পায়ী প্রাণী, যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় প্রাণীই সম সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে XY প্রকৃতির লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের মধ্যে একটি X - ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকে, কিন্তু এর পরিপূরক অংশটি সুস্পষ্টভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর থাকে এবং এটিকে Y-ক্রোমোজোম বলে। আবার স্ত্রী প্রানীদের ক্ষেত্রে একজোড়া X ক্রোমোজোম থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ে সম সংখ্যক অটোজোম বহন করে। সুতরাং পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম গুলো হল অটোজোম +XY যেখানে স্ত্রী প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম গুলো হল অটোজোম +XX। মানুষ এবং ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রানীতে অটোজোমের পাশাপাশি একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম থাকে, যেখানে স্ত্রী প্রানীদের অটোজোমের পাশাপাশি একজোড়া X ক্রোমোজোম রয়েছে (চিত্র 5.12 ক,খ)

উপরের বর্ণনায় তোমরা লিঙ্গা নির্ধারণের দুটো প্রকৃতি সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছ। অর্থাৎ XO প্রকৃতি এবং XY প্রকৃতি। কিন্তু উভয় পদ্ধতিতেই পুরুষ দেহে দুটো ভিন্ন ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয়, ক) হয় X-ক্রোমোজোম বিশিষ্ট বা ক্রোমোজোম বিহীন অথবা খ) কিছু গ্যামেট X-ক্রোমোজোম এবং কিছু Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। এ ধরনের লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতিকে পুরুষ হেটোরোগ্যামেটি এর উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু অন্য জীব যেমন পাখীতে, লিঙ্গা নির্ধারণের ভিন্ন একটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় (চিত্র 5.12 গ)। এক্ষেত্রে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই প্রাণীতেই ক্রোমোজোমের মোট সংখ্যা সমান থাকে।

কিন্তু স্ত্রীদেহে যৌন ক্রোমোজোমের নিরিক্ষে দুটি ভিন্ন ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ স্ত্রী হেটোরোগ্যামেটি দেখা যায়। পূর্ববর্ণিত লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতি গুলোর চাইতে এটি স্পষ্ট ভাবে আলাদা। এক্ষেত্রে স্ত্রী পাখীতে দুটি ভিন্ন ধরনের যৌন ক্রোমোজোম থাকে এগুলোকে Z এবং W নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই জীব সমূহে স্ত্রী প্রাণীর দেহে অটোজোমের পাশাপাশি একটি Z এবং একটি W ক্রোমোজোম থাকে, যেখানে পুরুষ প্রানীর ক্ষেত্রে অটোজোমের পাশাপাশি একজোড়া Z ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকে।

5.6.1 মানুষের লিঙ্গা নির্ধারণ (Sex Determination in Humans)

এটা এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতিটি হল XY প্রকৃতির। মানবকোশে বর্তমান 23 জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া ক্রোমোজোমই পুরুষ এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে একেবারে অভিন্ন; এগুলো হল অটোজোম। মহিলাদের ক্ষেত্রে অটোজোমের পাশাপাশি একজোড়া X ক্রোমোজোম থাকে, যেখানে একটি X এবং একটি Y -ক্রোমোজোমের উপস্থিতি পুরুষ বৈশিষ্ট্য সমূহের নির্ধারক। পুরুষের দেহে স্পার্মাটোজেনেসিস কালে দুই ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয়। মোট উৎপাদিত শুক্রানুর 50 শতাংশ অটোজোমের পাশাপাশি X -ক্রোমোজোম এবং বাকী 50 শতাংশ শুক্রাণু অটোজোমের পাশাপাশি Y -ক্রোমোজোম বহন করে। আবার স্ত্রী প্রাণীর কেবলমাত্র এক ধরণের ডিম্বানু সৃষ্টি হয়, যা X -ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয়। ডিম্বানুটির X -ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শক্রাণু বা Y-ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রানুর দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কোন কারণে ডিম্বাণু X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়, তবে এর ফলে সৃষ্ট জাইগোট বৃদ্ধি পেয়ে কন্যা সন্তান (XX) এর সৃষ্টি করবে এবং যখন Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুটি নিষিক্ত হয়, তবে এর ফলশ্রুতিতে পুত্র সন্তান সৃষ্টি হবে। তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে শুক্রাণুর জিনগত সজ্জাক্রমই শিশুর লিঙ্গা নির্ধারণের জন্য দায়ী। এটিও সুস্পষ্ট যে প্রতিটি গর্ভসঞ্চারেই সবসময় পুত্রসন্তান অথবা কন্যা সন্তান হওয়ার 50 শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মহিলাদের দোষারোপ করা হয় এবং এই ভ্রান্তধারণার কারণে এদেরকে একঘরে করে রাখা হয় এবং এদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়।

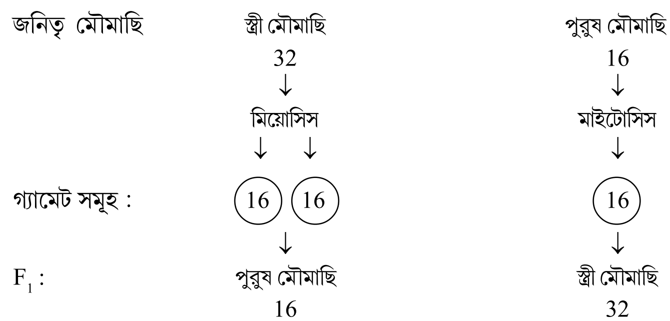

চিত্র: 5.13 মৌমাছিতে লিঙ্গা নির্ধারণ

5.6.2 মৌমাছিতে লিঙ্গা নির্ধারণ (Sex Determination in Honey Bee)

মৌমাছির ক্ষেত্রে লিঙ্গা নির্ধারণ বিষয়টি একটি একক মৌমাছি কত সংখ্যক ক্রোমোজোম সেট গ্রহন করে তার উপর নির্ভর করে। একটি ডিম্বাণু ও একটি শুক্রাণুর মিলনের ফলে যে অপত্যটি সৃষ্টি হয়, সেটি স্ত্রী মৌমাছি (রাণী বা শ্রমিক) এবং পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় একটি অনিষিক্ত ডিম্বানু থেকে পুরুষ মৌমাছির (ড্রোন) সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হল এই যে একটি স্ত্রী মৌমাছির দেহস্থিত ক্রোমোজোমের তুলনায় একটি পুরুষ মৌমাছির দেহে তার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রী মৌমাছি ডিপ্লয়েড এবং এরা 32 টি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয়। আবার পুরুষ মৌমাছি হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ 16টি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয়। এটিকে হ্যাপ্লোডিপ্লয়েড লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতি বলে এবং এই পদ্ধতিটির একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে পুরুষ মৌমাছি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন করে (চিত্র: 5.13), এদের কোন পিতৃজনিতৃ থাকে না

এবং তাই এদের থেকে কোন পুরুষ অপত্য সৃষ্টি হতে পারে না, কিন্তু এদের পিতৃজনিতৃর পিতৃজীব (grandfather) এবং এদের স্ত্রী জীব থেকে পুরুষ অপত্য জীবের সৃষ্টি হতে পারে।

পাখীতে লিঙ্গা নির্ধারণ পদ্ধতিটি কিভাবে ভিন্ন ধরনের হয় ? মুরগিছানার লিঙ্গা কি হবে তার জন্য কি শুক্রাণু বা ডিম্বাণু দায়ী ?

5.7 পরিব্যক্তি (Mutation)

পরিব্যক্তি হল এমন একটি ঘটনা যাতে DNA সজ্জায় পরিবর্তন বা অদলবদল ঘটে এবং ফলস্বরূপ একটি জীবের জিনোটাইপ এবং ফিনোটাইপেরও পরিবর্তন হয়। রিকম্বিনেশন ছাড়াও পরিব্যক্তি হল এমন আরও একটি ঘটনা যার ফলশ্রুতিতেই DNA তে প্রকরণের সৃষ্টি হয়। তোমরা অধ্যায় 6 এ অধ্যয়ন করবে যে - প্রতিটি DNA হেলিক্স অধিক মাত্রায় কুন্তলীত অবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি ক্রোমাটিডে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

সুতরাং DNA খন্ডকের বিয়োজন (deletion) বা সংযোজনের (insersion / duplication) এর ফলশ্রুতিতে ক্রোমোজোম সমূহে পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু জানা গেছে জিনগুলো ক্রোমোজোমে অবস্থান করে, তাই ক্রোমোজোমে সংঘটিত পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে এই ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতাগুলো সাধারণত ক্যান্সার কোশে পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া উপরোক্ত কারণগুলোর পাশাপাশি DNA এর একটি একক বেস জোড়ে পরিবর্তনের কারণেও পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। একে পয়েন্ট মিউটেশন (Point Mutation) বলে। এধরনের মিউটেশনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলঃ সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া। DNA এর বেসজোড়ের বিযুক্ত হওয়া এবং যুক্ত হওয়ার কারণে ফ্রেমশিফ্ট মিউটেশন ঘটে (অধ্যায় 6 দেখ)

এই পর্যায়ে পরিব্যক্তির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে এমন অনেক রসায়নিক ও ভৌত ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলো মিউটেশনকে উদ্দীপিত করে। এগুলোকে মিউটাজেন বলে। অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ জীবে মিউটেশান ঘটাতে পারে এটি একটি মিউটাজেন।

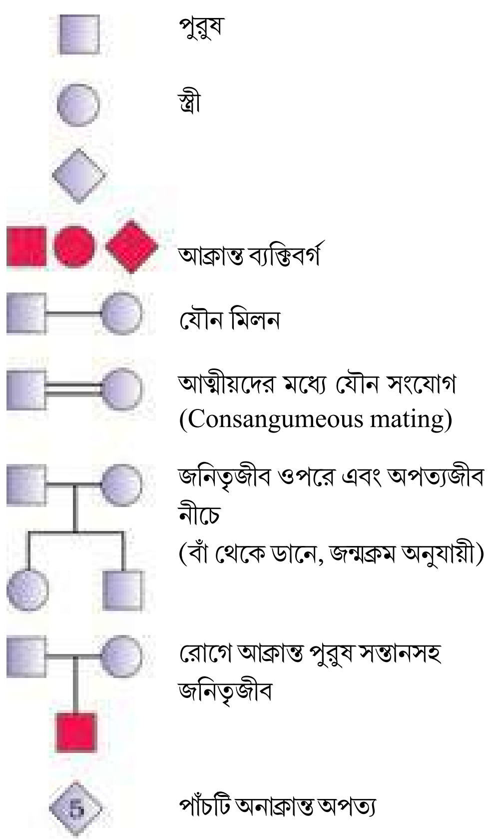

চিত্র: 5.13 মানুষের পেডিগ্রি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহ।

5.8 জিনঘটিত অস্বাভাবিকতা (Genetic Disorders)

5.8.1 পেডিগ্রি বিশ্লেষণ (Pedigree Analysis)

বহুকাল ধরেই মানব সমাজে জিনগত অস্বাভাবিকতা গুলোর বংশগত সঞ্চারণ ঘটে - এই ধারণাটি চলে আসছে। পরিবার সমূহে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের উপর ভিত্তি করেই এই ধারণা তৈরী হয়েছিল। মেন্ডেলের কাজের পুনরাবিস্কারের পর, মানব দেহে বিভিন্ন প্রলিক্ষণ সমূহের বংশানুসরণের ধরনের বিশ্লেষনের উপর চর্চা হয়েছিল। যেহেতু এটা স্পষ্ট যে নিয়ন্ত্রিত সংকরায়ণ যা মটরগাছ অথবা অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রলক্ষণের বংশানুসরন সম্পর্কে পারিবারিক ইতিহাস অধ্যয়ন এর একটি বিকল্প পথ হতে পারে। একটি পরিবারের কয়েক প্রজন্মে প্রলক্ষণসমূহের এই ধরণের বিশ্লেষণকে পেডিগ্রি বিশ্লেষণ (Pedigree Analysis) বলে। পেডিগ্রি বিশ্লেষণে কোন পরিবারের বংশলতিকাতে কয়েক প্রজন্মের নির্দিষ্ট প্রলক্ষণের বংশানুসরণ উপস্থাপিত হয়।

মানব সুপ্রজনন বিদ্যায়, পেডিগ্রি অধ্যয়ন একটি শক্তিশালী উপকরণ, যা একটি নির্দিষ্ট প্রলক্ষণের বংশানুসরণ, জিনগত অস্বাভাবিকতা অথবা রোগ অন্বেষণে, ব্যবহৃত হয়। পেডিগ্রি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ চিহ্নগুলোর কিছু চিহ্ন চিত্র 5.13 তে দেখানো হয়েছে।

এই অধ্যায়ে তোমরা যা পড়ে সে অনুযায়ী যেকোনো জীবে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই ক্রোমোজোমস্থিত DNA তে উপস্থিত একটি জিন বা অন্যান্যজিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। DNA জিনগত বার্তা বহন করে। তাই এটি কোনরূপ পরিবর্তন বা অদল বদল ছাড়া এক জনু থেকে অন্য জনুতে সঞ্চারিত হয়। তবে DNA তে এই পরিবর্তন বা অদল বদল ঘটনাচক্রেই ঘটে। জিনগত বস্তুতে এই ধরণের কোন পরিবর্তন বা অদল বদলকে মিউটেশন (Mutation) বলে। একটি দেখা গেছে যে মানুষের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জিনগত অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির বিষয়টি পরিবর্তিত অথবা অদলবদল হওয়া জিন বা ক্রোমোজোমের বংশানুসরণের সাথে সম্পর্কিত।

5.8.2 মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতা (Mendelian Disorders)

জিনগত অস্বাভাবিকতাসমূহকে ব্যাপক অর্থে দুটি ক্যাটাগরীতে ভাগ করা যেতে পারে - মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতাসমূহ এবং ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতাসমূহ। মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতাগুলো প্রধাণত: একক জিন সংঘটিত অদল বদল বা পরিবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অস্বাভাবিকতাগুলো বংশানুসরণের নীতি যা আমরা অধ্যয়ন করেছি, সেই নীতিগুলো মেনে অপত্য জীবে সঞ্চারিত হয়। একটি পরিবারে এই ধরনের মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতা সমূহের বংশানুসরণের ধরণ পেডিগ্রি বিশ্লেষণ দ্বারা সনাক্ত করা যেতে পারে। যে সব মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতাগুলো খুব বেশি এবং ব্যপকভাবে ঘটতে দেখা যায়, সেগুলো হল হিমোফিলিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সিকলসেল অ্যানিমিয়া, বর্ণান্ধতা, ফিনাইল, কিটোনুরিয়া, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে এ ধরনের মেন্ডেলীয় অস্বাভাবিকতাগুলো প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন হতে পারে। পেডিগ্রি বিশ্লেষণ দ্বারা সহজেই কেউ প্রলক্ষণটি

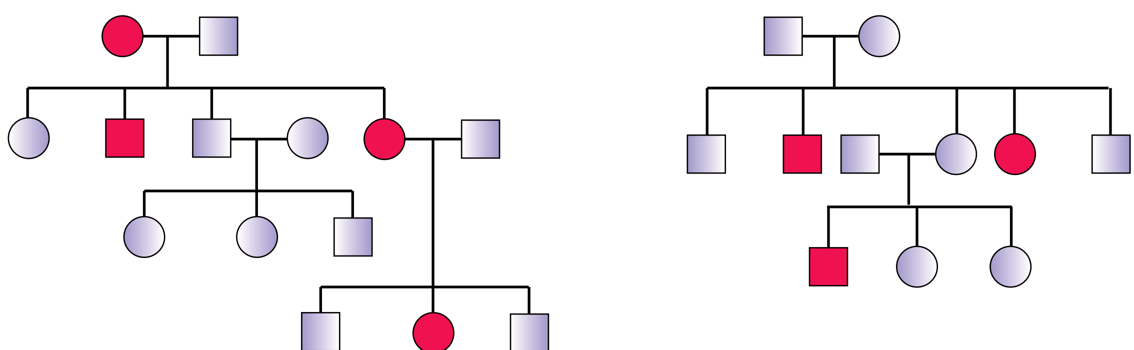

চিত্র : 5.14 নমুনা পেডিগ্রির বিশ্লেষণ
(ক) অটোজোমীয় প্রকটধর্মী প্রলক্ষণ (উদাহরণ: মায়োটোনিক ডিস্ট্রোফী (খ) অটোজোমীয় প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণ (উদাহরণ: সিকেল্ সেল অ্যানিমিয়া)।

প্রকট নাকি প্রচ্ছন্ন তা বুঝতে পারে। প্রলক্ষণটি যৌন ক্রোমোজোমের সাথেও যুক্ত থাকতে পারে যেমনটি হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটা সুস্পষ্ট যে এই X -সংযোজিত (X-Linked) প্রচ্ছন্ন ধর্মী প্রলক্ষণটির বাহক জনিত স্ত্রী জীব থেকে পুরুষ অপত্য জীবে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন প্রলক্ষণসমূহের বংশানুসরণ বোঝাতে চিত্র 5.14 এ একটি নমুনা পেডিগ্রি দেখানো হয়েছে। তোমার শিক্ষক মহাশয়ের সাথে আলোচনা কর এবং অটোজোম ও যৌন ক্রোমোজোম উভয়ের যুক্ত এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য পেডিগ্রিসমূহের নক্সা তৈরি কর।

বর্ণান্ধতা (Colour Blindness) : এটি একটি লিঙ্গাসংযোজিত প্রচ্ছন্নধর্মী অস্বাভাবিকতা, যা চোখের লাল অথবা সবুজ বর্ণ সনাক্তকারী কোন (cone) কোশের ত্রুটিজনিত কারণে ঘটে। এর ফলে ব্যক্তি লাল এবং সবুজ বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ হয়। এই অস্বাভাবিকতা ক্রোমোজোমে উপস্থিত কিছু জিনের পরিব্যক্তির কারণে ঘটে। এই ধরনের অস্বাভাবিকতা 8 শতাংশ পুরুষ এবং মাত্র 0.4 শতাংশ মহিলার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এর কারণ হলো এই, যে জিন সমূহ লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী যেগুলো X ক্রোমোজোমেই উপস্থিত থাকে। পুরুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি X ক্রোমোজোম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোম রয়েছে। একজন মহিলা যে এই জিন বহন করছে, তার পুত্র সন্তানটি বর্ণান্ধ হওয়ার 50 শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে জিনটি প্রচ্ছন্নধর্মী হওয়ায় মাতা বাহক হলেও নিজে বর্ণান্ধ হয় না। তার মানে এই যে, এই জিনটির প্রভাব মায়ের দেহে ঐ জিনের সমকক্ষ প্রকটধর্মী স্বাভাবিক জিনটি দ্বারা অবদমিত হয়। স্বাভাবিকভাবে একটি কন্যাসন্তান বর্ণান্ধ হবে না, যদি না তার মা এই বর্ণান্ধতার জিনটির বাহক এবং তার পিতা বর্ণান্ধ হয়।

হিমোফিলিয়া (Haemophillia) : এটি লিঙ্গা সংযোজিত প্রচ্ছন্নধর্মী রোগ, যা অনাক্রান্ত বাহক মহিলা থেকে তার কিছু পুরুষ অপত্য সন্তানে সঞ্চারিত হয় - তা নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হয়েছে। এই রোগে রক্ততঞ্চনের সাথে যুক্ত একটি একক প্রোটিন, যা প্রোটিন কাসকেডের একটি অংশ বিশেষ, তার গঠনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে একজন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সামান্য কাঁটাছেড়া থেকেই অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে। হিমোফিলিয়ার জন্য হেটারোজাইগাস মহিলা (বাহক) থেকে তার পুত্র সন্তানদের মধ্যে এই রোগের সঞ্চারণ ঘটতে পারে, কোনো মহিলার হিমোথিলয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল ঘটনা, কারণ এর জন্য এই মহিলার মাতাকে কমপক্ষে বাহক এবং পিতাকে অবশ্যই হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত হতে হবে (জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে বেঁচে থাকে না)। ক্যুইন ভিক্টোরিয়া হিমোফিলিয়া রোগের বাহক হওয়ার কারণে ক্যুইন ভিক্টোরিয়ার পারিবারিক পেডিগ্রিতে বেশ কিছু সংখ্যক হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি দেখা যায়।

সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া (Sickle Cell Anaemea) : এটি একটি অটোজোম সংযোজিত প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণ যা পিতামাতা থেকে সন্তানে সঞ্চারিত হতে পারে, যখন উভয়েই এই জিনের বাহক

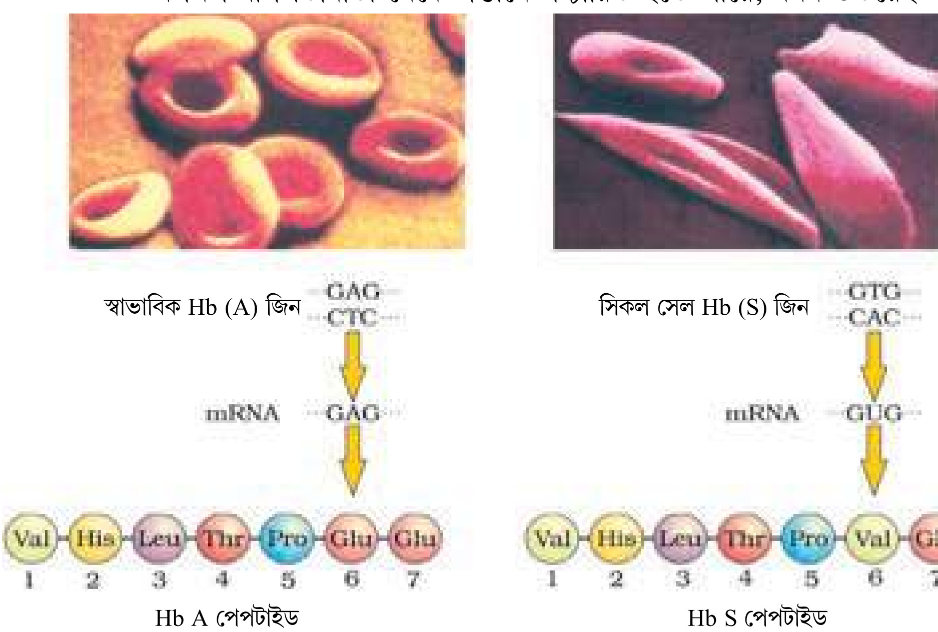

চিত্র : 5.15 হিমোগ্লোবিনের β শৃঙ্খলের সংশ্লিষ্ট অংশের লেহিত রক্ত কণিকা এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড সংগঠনের মাইক্রোগ্রাফ : (ক) একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে নেওয়া। (খ) একজন সিকল সেল অ্যানিমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নেওয়া।

(হেটারোজাইগাস) হয়। এই রোগটি একটি একক অ্যালীলজোড় (Hb^A এবং Hb^S) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনটি সম্ভাব্য জিনোটাইপের মধ্যে কেবলমাত্র Hb^S এর জন্য হোমাজাইগাস ($Hb^S Hb^S$) ব্যক্তিতে রোগটির প্রকাশ ঘটে। মিউট্যান্ট জিনটি অপত্য সন্তানে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা 50 শতাংশ হওয়ায় হেটারোজাইগাস ($Hb^S Hb^S$) ব্যক্তিদের আপাত দৃষ্টিতে অনাক্রান্ত দেখালেও এরা এই রোগটির বাহক হয় অর্থাৎ এদের দেহে সিকেল সেল প্রশক্ষণটি উপস্থিত থাকে (চিত্র : 5.15)। হিমোগ্লোবিন অণুর B গ্লোবিন শৃঙ্খলের ষষ্ঠ স্থানে উপস্থিত গ্লুটামিক অ্যাসিড ভ্যালিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার কারণে এই জিনগত অস্বাভাবিকতা ঘটতে দেখা যায়।

বিটা গ্লোবিন জিনের ষষ্ঠ কোডনে একটি বেস-এর প্রতিস্থাপনের কারণে GAG, GUG তে পরিণত হয়ে যায়। এর ফলেই গ্লোবিন প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রতিস্থাপন ঘটে। অক্সিজেনের নিম্ন আংশিক চাপে মিউট্যান্ট হিমোগ্লোবিন অণুর পলিমার গঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে লোহিত রক্ত কণিকার দ্বিঅবতল চাকতি আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে কাস্তের মত লম্বাটে আকৃতি ধারণ করে (চিত্র : 5.15 এ দেখানো হয়েছে)।

ফিনাইল কিটোন্যুরিয়া : এই জন্মগত বিপাকীয় ত্রুটিটিও অটোজোম সংযোজিত প্রচ্ছন্নধর্মী প্রলক্ষণ হিসাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিতে সেই উৎসেচকটি থাকে না, যেটি অ্যামাইনো অ্যাসিড ফিনাইল অ্যালানিনকে টাইরোসিনে রূপান্তরিত করে। যার ফলে ফিনাইল অ্যালানিন জমা হয় এবং ফিনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড ও অন্যান্য উপজাত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এগুলো মস্তিষ্কে জমা হওয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য ঘটে। এই পদার্থগুলো খুব কম পরিমাণে বৃক্কে শোষিত হওয়ায় এগুলো বৃক্কের মাধ্যমেও রচিত হয়।

থ্যালাস্যামিয়া : এটিও একটি অটোজোম সংযোজিত প্রচ্ছন্নধর্মী রক্ত সম্বন্ধীয় রোগ, যা জনিতৃ জীব অর্থাৎ পিতামাতা থেকে তাদের অপত্য জীবে সঞ্চারিত হয়, যখন পিতামাতা উভয়ই ঐ জিনটির জন্য অনাক্রান্ত বাহক হয় (অথবা হেটারোজাইগাস)। এই অস্বাভাবিকতা জিন মিউটেশান বা ডিলিশান এর কারণে সৃষ্টি হতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন তৈরিতে অংশগ্রহণকারী গ্লোবিন শৃঙ্খলগুলোর (a এবং b শৃঙ্খল) মধ্যে একটির সংশ্লেষণের হার কমিয়ে দেয়। এই কারণে অস্বাভাবিক ধরনের হিমোগ্লোবিন অণু সৃষ্টি হয়, এবং যার ফলে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়, যা হল এই রোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হিমোগ্লোবিন অণুর কোন্ শৃঙ্খলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে থ্যালাস্যামিয়ার শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। a থ্যালাসোমিয়াতে a গ্লোবিন শৃঙ্খলের উৎপাদন ব্যহত হয়, যেখানে b -থ্যালাস্যামিয়ায় b গ্লোবিন শৃঙ্খলের উৎপাদন ব্যহত হয়। a থ্যালাস্যামিয়া প্রত্যেক জনিতৃ জীবের 16 নং ক্রোমোজোমে উপস্থিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত দুটি জিন (HBA 1 এবং HBA 2) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই চারটি জিনের একটি বা তার বেশি জিনের মিউটেশান অথবা ডিলিশান এর কারণে এটি ঘটতে দেখা যায়। এদের মধ্যে যত বেশি জিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তত কম পরিমাণ গ্লোবিন অণু উৎপন্ন হবে। আবার b থ্যালাসোমিয়ায় প্রত্যেক জনিতৃ জীবের 11 নং ক্রোমোজোমে উপস্থিত একটি একক জিন HBB দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং এটি একটি অথবা উভয় জিনের মিউটেশানের ফলে ঘটে থাকে। থ্যালাসেমিয়া এবং সিকল সেল অ্যানিমিয়ার যে বিষয়ে পরস্পর থেকে আলাদা তা হল প্রথমটিতে খুব কম পরিমাণে গ্লোবিন অণু সংশ্লেষিত হওয়ায় এটি একটি পরিমাণগত সমস্যা। পাশাপাশি দ্বিতীয়টিতে সঠিকভাবে কাজ করে না এমন গ্লোবিন অণু সংশ্লোষিত হওয়ায় এটি একটি গুণগত সমস্যা।

5.8.3 ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতা (Chromojomal Disorder)

ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতা সমূহ অপরদিকে একটি অথবা বহু ক্রোমোজোমের অনুপস্থিতি অথবা আধিক্য অথবা অস্বাভাবিক সজ্জাক্রমের কারণে ঘটে থাকে। কোশবিভাজন চক্র চলাকালীন সময়ে ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে এবং একে অ্যানিউপ্লয়েডি বলে। উদাহরণস্বরূপ একটি অতিরিক্ত 21 নং ক্রোমোজোম লাভ করলে এর ফলশ্রুতিতে ডাউন সিন্ড্রোম সৃষ্টি হয়। একইভাবে মহিলাদের একটি X-ক্রোমোজোমের ঘাটতি

চিত্র : 5.16 ডাউন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তির চিত্র এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্রোমোজোমের চিত্ররূপ।

থাকার কারণে টার্নার সিন্ড্রোম দেখা দেয়। কোনো জীবের কোশ বিভাজনের টেলোফেজ দশার পর সাইটোকাইনেসিস না হলে, তার পুরো ক্রোমোজোম সেটেই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং এই ঘটনাটি পলিপ্লয়েডী নামে পরিচিত। এই অবস্থাটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়।

একটি স্বাভাবিক মানব কোশে মোট 46 (23 জোড়া) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। এগুলোর মধ্যে 22 জোড়া অটোজোম এবং একজোড়া হল যৌন ক্রোমোজোম। বিরল হলেও কখনো কখনো কোনো ব্যক্তিতে হয় কোনো ক্রোমোজোমের অতিরিক্ত একটি কপির সংযোজন ঘটতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তিতে যে কোনো ক্রোমোজোমের অতিরিক্ত একটি কপির সংযোজন ঘটতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তিতে যে কোনো ক্রোমোজোম জোড়ের একটি ক্রোমোজোমের ঘাটতি থাকতে পারে। এই অবস্থাগুলোকে যথাক্রমে একটি ক্রোমোজোমের ট্রাইসোমী অথবা মোনোজোমী বলে। এইরূপ কোনো একটি অবস্থা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ডাউনস সিন্ড্রোম, টার্নার সিন্ড্রোম, ক্লাইফেল্টার সিন্ড্রোম হল ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতার সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এমন কিছু উদাহরণ।

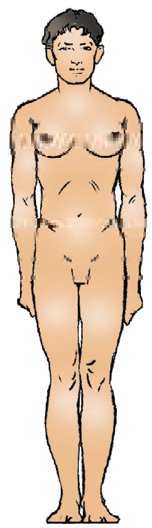

(ক)
স্ত্রী দেহের বৈশিষ্ট্য
সমন্বিত দীর্ঘ দেহ

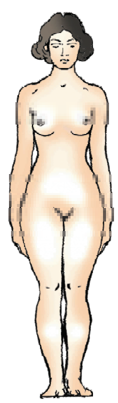

(খ)
খর্ব দেহ এবং অপূর্ণ
বিকশিত স্ত্রী বৈশিষ্ট্য

চিত্র : 5.17 মানুষে যৌনক্রোমোজোম সংগঠনের কারণে সৃষ্ট জিনগত অস্বাভাবিকতার চিত্ররূপ উপস্থাপন।

ডাউন সিন্ড্রোম : এই জিনগত অস্বাভাবিকতার কারণ হল দেহে একটি অতিরিক্ত 21তম ক্রোমোজোমে উপস্থিতি (21 নং ক্রোমোজোমের ট্রাইসোমী)। Langdon Down 1866 সালে সর্বপ্রথম এই অস্বাভাবিকতাটির বর্ণনা দেন। আক্রান্ত ব্যক্তি খর্বদেহী, ছোট গোলাকৃতি মস্তক বিশিষ্ট, গভীর খাঁজযুক্ত জিহ্বাবিশিষ্ট হয় এবং এদের মুখ আংশিকভাবে খোলা অবস্থায় থাকে (চিত্র : 5.16)। এদের হাতের তালু ছড়ানো/বড় এবং বিশেষ ভাঁজবিশিষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক, সাইকোমোটর এবং মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ক্লাইনফেল্টার লিন্ড্রোম : এই জিনগত অস্বাভাবিকতাটিও একটি অতিরিক্ত X ক্রোমোজোমের উপস্থিতির জন্য হয় এবং ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্যারিওটাইপ 47, XXY হয়। এ ধরনের ব্যক্তিতে সামগ্রিকভাবে পুরুষালী বিকাশ ঘটে তবে মহিলাসুলভ বিকাশেরও (স্তনের বিকাশ অর্থাৎ গাইনেকোম্যাস্টিয়া) প্রকাশ ঘটে (চিত্র 5.17 ক) এ ধরনের ব্যক্তিরা বন্ধ্যা হয়।

টার্নারস সিন্ড্রোম : দুটি X-ক্রোমোজোমের মধ্যে একটির অনুপস্থিতির কারণে মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের একটি অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ক্রোমোজোমীয় বিন্যাস 45 + XO হয়। এদের ডিম্বাশয়গুলো অপরিণত হওয়ার পাশাপাশি গৌণযৌন লক্ষণসমূহ সহ অন্যান্য আরও কিছু বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকার কারণে এরূপ মহিলারা বন্ধ্যা হয় (চিত্র 5.17 খ)।

সারসংক্ষেপ

সুপ্রজননবিদ্যা হল জীববিদ্যার সেই শাখা যা বংশানুসরণের নীতিসমূহ এবং এগুলোর অনুশীলন বিষয়ে চর্চা করে। জনিতৃ জীব এবং অপত্য জীবের মধ্যে বহিরাকৃতিগত এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের সাদৃশ্যের বিষয়টি বহু জীববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মেন্ডেলই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিয়মানুগভাবে এই ঘটনাটির বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। মটর গাছে বিপরীত বৈশিষ্ট্যসমূহের বংশানুসরণের ধরন অধ্যয়ন করতে গিয়ে মেন্ডেল বংশানুসরণের নীতিসমূহের প্রস্তাব করেন, যেগুলোকে আজকের দিনে 'মেন্ডেল বংশগতির সূত্রাবলি' বলা হয়। তিনি বলেছেন যে, বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টরগুলো (পরবর্তীকালে জিন নামে পরিচিত) জোড় হিসাবে থাকতে দেখা যায় এবং এগুলোকে অ্যালীল বলে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে প্রথম অপত্য জনু, দ্বিতীয় অপত্য জনু এবং এমন বিভিন্ন জনুর অপত্যসমূহ একটি নির্দিষ্ট ধরন মেনে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর সাপেক্ষে প্রকট হয়। প্রকট বৈশিষ্ট্য সমূহের তখনও বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন ফ্যাক্টরগুলো হেটারোজাইগাস অবস্থায়ও থাকে (প্রকটতার সূত্র)। প্রচ্ছন্নধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ কেবলমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। হেটারোজাইগাস অবস্থায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের কখনোই মিশ্রণ ঘটেনা, অর্থাৎ এরা কখনোই একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না। একটি প্রচ্ছন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের হেটারোজাইগাস অবস্থায় বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, হোমোজাইগাস অবস্থায় আসলে আবার এই বৈশিষ্ট্যটির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। সুতরাং গ্যামেট সৃষ্টির সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পৃথকীকরণ ঘটে (পৃথকীভভবন সূত্র)।

সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকৃত প্রকটতা প্রদর্শন করে না। কিছু বৈশিষ্ট্য অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং কিছু সহ-প্রকটতা প্রদর্শন করে। যখন মেন্ডেল একই সাথে দুটি বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের বিষয়টি অধ্যয়ন করেছিলেন, তখন এটা দেখা গিয়েছিল যে, ফ্যাক্টরগুলো স্বাধীনভাবে আলাদা হয় এবং সম্ভাব্য সব প্রকার বিন্যাসে একটি অপরটির সাথে মিলিত হয় (স্বাধীন সঞ্চারন সূত্র)। গ্যামেট সমূহের বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণ তাত্ত্বিকভাবে একটি বর্গাকার সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বর্গাকার সারণীকে পানেট বর্গ (Punnet square) বলে। ক্রোমোজোমস্থিত ফ্যাক্টরসমূহ (বর্তমানে জিন নামে পরিচিত) যেগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে এদেরকে জিনোটাইপ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বাহ্যিক প্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে। জিনগুলো যে ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে এই বিষয়টি জানার পর মেন্ডেলের সূত্রাবলি মিয়োসিসকালে ক্রোমোজোমের পৃথকীভবনসূত্র এবং ক্রোমোজোমের স্বাধীন সঞ্চারন এর মধ্যে একটি ভাল যোগসূত্র স্থাপন করা গিয়েছিল। মেন্ডেলের সূত্রাবলি বংশানুসরণের ক্রোমোজোমীয় তত্ব হিসাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পরবর্তী সময় দেখা গেছে মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারন সূত্রটি একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত এমন সব জিনগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। এই জীনগুলোকে 'লিঙ্কড জিন' বলে। ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থানরত জিনগুলো একই সাথে সঞ্চারিত হয় এবং পুনঃসংযুক্তির (recombination) কারণে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত জিন সমূহেরও স্বাধীন সঞ্চরন ঘটে। তাই লিঙ্কেজ ম্যাপ একটি ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জিন সমূহের বিন্যাসের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হয়। বহু জিন স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গের সাথেও সংযোজিত এবং এগুলিকে লিঙ্গ সংযোজিত বা সেক্স লিঙ্কড বলে। এটি দেখা গেছে যে, দুটি লিঙ্গের (পুরুষ ও স্ত্রী) ক্ষেত্রেই একটি ক্রোমোজোম সেট অভিন্ন হয় এবং অপর ক্রোমোজোম সেটটি লিঙ্গাভেদে ভিন্ন ধরনের হয়। দুই লিঙ্গের জীবেই যে ভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোম সেট রয়েছে সেগুলোকে যৌন ক্রোমোজোম বলে। অবশিষ্ট ক্রোমোজোম সেটটিকে বলে অটোজোম। মানুষের ক্ষেত্রে একজন স্বাভাবিক মহিলার দেহের প্রতিটি কোশে 22 জোড়া এবং একজোড়া যৌন ক্রোমোজোম (XX) রয়েছে। একজন পুরুষের প্রতিটি কোশে 23 জোড়া অটোজোম এবং XY রূপে এক জোড়ো যৌন ক্রোমোজোম বর্তমান। মোরগ (পুরুষ) এবং মুরগী (স্ত্রী) তে যৌন ক্রোমোজোম হল যথাক্রমে (zz) এবং (zw)।

জিনগত বস্তুর পরিবর্তনরূপে মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পয়েন্ট মিউটেশান হল DNA তে একটি একক বেস জোড়ার পরিবর্তন। হিমোগ্লোবিনের β শৃঙ্খলের কোডিং এর জন্য দায়ী জিন এ একটি বেসের পরিবর্তনের ফলে সিকল সেল অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয়। একটি পরিবারের বংশ তালিকা তৈরি করে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে এমন মিউটেশনগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কিছু মিউটেশনে

পুরো ক্রোমোজোম সেট এরই পরিবর্তন (পলিপ্লয়েডী) অথবা ক্রোমোজোম সংখ্যার সাবসেটের পরিবর্তন (অ্যানিউপ্লয়েডি ঘটে)। এটি জিনগত অস্বাভাবিকতার মিউটেশন জনিত ভিত্তি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। 21 নং ক্রোমোজোমের ট্রাইজোমির কারণে ডাউন সিনড্রোম দেখা দেয় যেখানে 21 নং ক্রোমোজোমের একটি অতিরিক্ত কপি থাকার কারণে কোশের মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা 47 হয়ে যায়। টার্নার সিনড্রোমে একটি X ক্রোমোজোমের ঘাটতি থাকে এবং যৌন ক্রোমোজোম সেটটি XO রূপে থাকে। ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোমে যৌন ক্রোমোজোমের সেটটি XXY হয় কোশের ক্যারিওটাইপ। বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলো সহজেই অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. মেন্ডেলের পরীক্ষার জন্য মটরগাছ নির্বাচন করার সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
2. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর :
   ক) প্রকটতা এবং প্রচ্ছন্নতা।
   খ) হোমোজাইগাস এবং হেটোরোজাইগাস।
   গ) এক সংকর এবং দ্বি সংকর।
3. একটি ডিপ্লয়েড জীব চারটি লোকাসের জন্য হেটারোজাইগাস। এক্ষেত্রে কত ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হতে পারে।
4. এক সংকর জননের সাহায্যে প্রকটতার সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
5. টেস্ট ক্রস এর সংজ্ঞা লিখ এবং এর একটি ছক প্রস্তুত কর।
6. পানেট বর্গ ব্যবহার করে একটি একক লোকাসের জন্য একটি হোমোজাইগাস স্ত্রী জীব এবং একটি হেটারোজাইগাস পুরুষ জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানোর পর প্রথম অপত্য জনুতে ফেনোটাইপ গত বৈশিষ্ট্যের যে বিস্তৃতি দেখা যাবে তা বের কর।
7. হলুদ বীজ বিশিষ্ট দীর্ঘ উদ্ভিদ (Tt Yy) এর সাথে সবুজ বীজ বিশিষ্ট দীর্ঘ উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটানো হলে অপত্য জীবে ফেনোটাইপগত কি অনুপাত পাওয়া যেতে পারে বলে আশা কর।
   ক) দীর্ঘ এবং সবুজ
   খ) খর্ব এবং সবুজ
8. দুটি হেটারোজাইগাস জনিতৃ জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হল। যদি দুটি লোকাস লিঙ্গাড থাকে তবে একটি দ্বিসংকর জননের জন্য F_1 জনুতে ফেনোটাইপগত বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃতি কিরূপ হবে?
9. সুপ্রজননবিদ্যায় T. H. Morgan এর অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
10. পেডিগ্রি বিশ্লেষণ কি? কিভাবে এই ধরনের বিশ্লেষণ উপযোগী হতে পারে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
11. মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গা নির্ধারণ কিভাবে ঘটে?
12. একটি শিশুর রক্তের শ্রেণি হল ‘O’। যদি শিশুটির পিতার রক্তের শ্রেণি ‘A’ এবং মাতার রক্তের শ্রেণি ‘B’ হয়, তবে পিতা-মাতার জিনোটাইপ এবং অন্য সন্তানদের সম্ভাব্য জিনোটাইপ বের কর।
13. নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলো উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।
   ক) সহ প্রকটতা
   খ) অসম্পূর্ণ প্রকটতা
14. পয়েন্ট মিউটেশন কি? একটি উদাহরণ দাও।
15. কে বংশানুসরণের ক্রোমোজোমীয় তত্ব প্রস্তাব করেছিলেন?
16. যে কোন দুটি অটোজোমীয় বংশগত অস্বাভাবিকতা উল্লেখ কর এবং তাদের লক্ষণসমূহ লিখ।

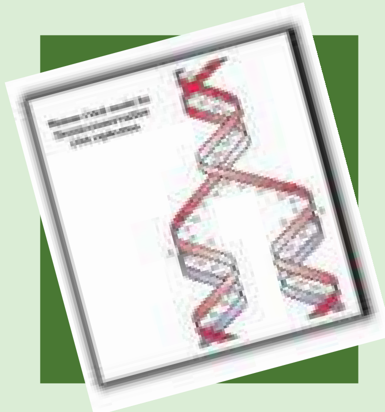

অধ্যায় 6

বংশগতির আনবিক ভিত্তি

MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE

6.1 DNA (The DNA)

6.2 জিনগত বস্তুর অনুসন্ধান (The search for Genetic Material)

6.3 RNA জগৎ (RNA world)

6.4 প্রতিলিপিকরণ (Replication)

6.5 ট্রান্সক্রিপশন (Transcription)

6.6 জেনেটিক কোড (Genetic Code)

6.7 ট্রান্সলেশন (Translation)

6.8 জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Gene Expression)

6.9 হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (Human Genome Project)

6.10 DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DND Finger printing)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তোমরা বংশানুসরণের ধরন সমূহ এবং এই জাতীয় ধরনগুলোর জিনগত ভিত্তি সম্পর্কে জেনেছ। মেন্ডেলের সময়কালে বংশানুসরণের ধরন নিয়ন্ত্রণকারী ঐ ‘ফ্যাক্টর’ (factors)গুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরবর্তী একশ বছর ধরে সাধারণ্যে গৃহীত জিনগত বস্তুর প্রকৃতি কী তা অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই ধারণায় উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে অন্তত বেশির ভাগ জীবের জিনগত বস্তু হল DNA-ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। একাদশ শ্রেণিতেই তোমরা শিখেছ যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো হল নিউক্লিওটাইড সমূহের পলিমার।

সজীব বস্তুতে পাওয়া যায় এমন দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড হল ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) এবং রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)। বেশিরভাগ সজীব বস্তুতে DNA জিনগত বস্তু হিসাবে কাজ করে। যদিও কিছু ভাইরাসের জিনগত বস্তু RNA, তবে প্রধানত এটি বার্তাবাহক রূপে কাজ করে। এর পাশাপাশি RNA অতিরিক্ত ভূমিকাও পালন করে। এটি (RNA) অ্যাডাপটার (adaptor), গাঠনিক একক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি অনুঘটনকারী অণুরূপে কাজ করে। একাদশ শ্রেণিতে তোমরা ইতিমধ্যেই নিউক্লিওটাইড সমূহের গঠন এবং এই মনোমার এককগুলো কীভাবে যুক্ত হয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড পলিমারগুলো গঠন করে তা শিখেছ। এই অধ্যায়ে আমরা DNA এর গঠন, এর প্রতিলিপিকরণ (রেপ্লিকেশন), DNA থেকে RNA তৈরির প্রক্রিয়া (ট্রান্সক্রিপশান), জেনেটিক কোড যা প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর সজ্জাক্রম নির্ধারণ করে, প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (ট্রান্সলেশন) এবং এদের নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি।

গত দশকে মানুষের জিনোম এর সম্পূর্ণ নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রম নির্ধারণের ফলে জিনোমিক্স (Genomics) এ একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে মানুষের জিনোম এর সিকুয়েন্সিং (Sequencing) এবং এর ফলশ্রুতি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

চলো আমরা প্রথমে জীবদেহের সবচেয়ে মজাদার মৌল অর্থাৎ DNA এর গঠন বোঝার মধ্য দিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করি। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা বুঝতে পারব সে DNA সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত জিনগত বস্তু কেন এবং এর সাথে RNA এর সম্পর্ক কী?

6.1 ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (The DNA) ঃ

DNA ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড সমূহের একটি দীর্ঘ পলিমার। DNA এর দৈর্ঘ্য সাধারণত এতে উপস্থিত নিউক্লিওটাইড সমূহের (অথবা একজোড়া নিউক্লিওটাইডকে বেস যুগ্ম রূপে বোঝানো হয়) সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি একটি জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বটে। উদাহরণস্বরূপ ϕX174 নামক ব্যাকটিরিওফাজে 5386 টি নিউক্লিওটাইড রয়েছে। ল্যামডা (Lambda) নামক ব্যাটিরিওফাজে 48502 টি বেসযুগ্ম (BP), ইশ্চেরিশিয়া কোলাই *(Escherichia coli)* তে 4.6×10^6 বেসযুগ্ম রয়েছে। মানুষের DNA এর হ্যাপ্লয়েড পরিমাণ হল 3.3×10^9 বেসযুগ্ম। চলো আমরা এমন একটি দীর্ঘ পলিমারের গঠন আলোচনা করি।

6.1.1 পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের গঠন (Structure of polynucleotide) ঃ

চলো আমরা একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের (DNA অথবা RNA) রাসায়নিক গঠনটি মনে করার চেষ্টা করি। একটি নিউক্লিওটাইড তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই উপাদানগুলো হল একটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার, একটি পেন্টোজ শর্করা (RNA এর ক্ষেত্রে রাইবোজ শর্করা এবং DNA এর ক্ষেত্রে ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা) এবং একটি ফসফেট গ্রুপ। নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারগুলো দুই প্রকারের হয় — পিউরিন (অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন) এবং পিরিমিডিন (সাইটোসিন, ইউরাসিল এবংথাইমিন)। DNA এবং RNA উভয় নিউক্লিক অ্যাসিডেই সাইটোসিন বর্তমান যেখানে থাইমিন শুধুমাত্র DNA তে বর্তমান। RNA তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে। একটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার পেন্টোজ শর্করার প্রথম কার্বনে উপস্থিত OH গ্রুপের সাথে একটি N- গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওসাইড গঠন করে। যেমন - অ্যাডিনেসিন বা ডিঅক্সি-অ্যাডিনোসিন, গুয়ানোসিন বা ডি অক্সিগুয়ানোসিন, সাইটিডিন বা ডিঅক্সিসাইটিডিন এবং ইউরিডিন অথবা ডিঅক্সিথাইমিডিন। যখন একটি ফসফেট গ্রুপ একটি নিউক্লিওসাইডের পঞ্চম কার্বনে উপস্থিত OH গ্রুপের সাথে ফসফোএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয় তখন একটি অনুরূপ নিউক্লিওটাইড (অথবা উপস্থিত শর্করার উপর ভিত্তি করে ডি অক্সি-নিউক্লিওটাইড) গঠিত হয়। দুটি নিউক্লিওটাইড 3' -5' ফসফোডায়েস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি ডাইনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

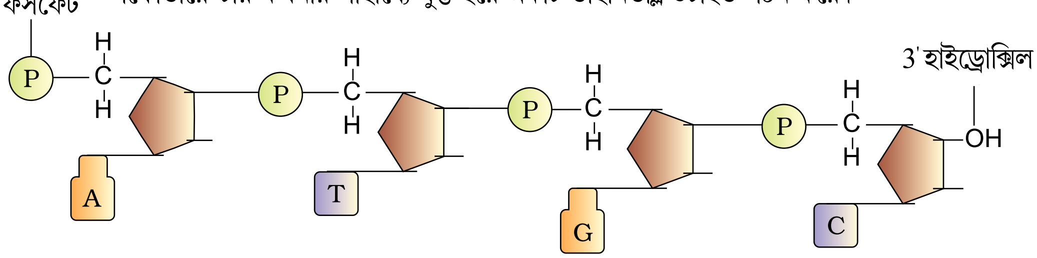

চিত্র 6.1 একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল

এভাবে গঠিত একটি পলিমার এর একটি প্রান্তে শর্করার পঞ্চম কার্বন প্রান্তে একটি ফসফেট গ্রুপ থাকে এবং এই প্রান্তকে পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের 5′ প্রান্ত বলে। একইভাবে পলিমারটির অপরপ্রান্তে শর্করার তৃতীয় কার্বন একটি মুক্ত OH গ্রুপ বর্তমান থাকে এবং পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের এই প্রান্তটিকে 3′ প্রান্ত বলে। শর্করা ও ফসফেট দ্বারা পলিনিউক্লিওটাইডের শিরদাঁড়াটি (back bone) গঠিত হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারগুলো পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের শিরদাঁড়া থেকে উদ্গত শর্করার সাথে যুক্ত থাকে (চিত্র 6.1)

RNA অনুতে প্রতিটি নিউক্লিওটাইডের রাইবোজ শর্করার দ্বিতীয় কার্বনে একটি অতিরিক্ত OH গ্রুপ থাকে। এছাড়াও RNA তে থাইমিন (5-মিথাইল ইউরাসিল—থাইমিনের অপর একটি রাসায়নিক নাম) এর পরিবর্তে ইউরাসিল পাওয়া যায়।

1869 সালে ফ্রেডরিক মেইসচার (Friedrich Meischer) কোশের নিউক্লিয়াসে অম্লীয় বস্তুরূপে DNA এর উপস্থিতি সর্বপ্রথম সনাক্ত করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন "নিউক্লিন" (Nuclin)। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্য এরূপ একটি দীর্ঘ পলিমারকে অবিকৃত অবস্থায় পৃথক করা এবং DNA এর গঠনের ব্যাখ্যা দীর্ঘকাল ধরে অধরা ছিল। 1953 সালে মরিস উইলকিনস (Maurice Wilkins) এবং রোজালিন্ড ফ্যাঙ্কলিন (Rosalind Franklin) দ্বারা প্রস্তুত X-raydiffraction data এর উপর ভিত্তি করে জেমস ওয়াটসন (James Watson) ও ফ্র্যান্সিস ক্রিক (Franchis Crick) DNA এর গঠনের একটি অত্যন্ত সরল এবং বিখ্যাত দ্বিতন্ত্রী হেলিক্স মডেল (Double Helix Model) এর প্রস্তাব করেন। তাদের প্রস্তাবিত DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিক্স মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের দুটি তন্তুর মধ্যেকার বেস পেয়ারিং বা বেস যুগ্ম গঠন। তবে DNA এর গঠন সংক্রান্ত এই প্রস্তাবটি এরউইন চারগফ (Erulin Chargaff) এর পর্যবেক্ষণের উপরও ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চারগফ যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তা হল এই যে একটি দ্বিতন্ত্রী DNA এর ক্ষেত্রে অ্যাডিনিন ও থাইমিনের মধ্যেকার অনুপাত এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিনের মধ্যেকার অনুপাত ধ্রুবক হয় ও এর মান হয় 1।

বেস যুগ্ম গঠন হল পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের অত্যন্ত স্বতন্ত্র একটি ধর্ম। বেসযুগ্মস্থিত বেসগুলো একে অপরের পরিপূরক হয় এবং সেই কারণে যদি DNA এর একটি তন্তুর বেস সজ্জাক্রম জানা যায় তবে অন্য তন্তুটির বেস সজ্জাক্রম কীরূপ হবে তা অনুমান করা যায়। আবার যদি একটি DNA অণুর (ধরি এটি একটি জনিতৃ DNA) প্রতিটি তন্তু একটি নতুন তন্তু সংশ্লেষণের জন্য টেমপ্লেট তন্তু হিসেবে কাজ করে তবে উৎপন্ন দুটি দ্বিতন্ত্রী DNA (ধরি এগুলো হল অপত্য DNA) জনিতৃ DNA এর অনুরূপ হবে। এই কারণে DNA এর গঠনের জিনগত তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছিল।

DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিকেল গঠনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ—

(i) এটি দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত যেখানে শর্করা-ফসফেট দ্বারা এর শিরদাঁড়া গঠিত হয় এবং নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারগুলো ভেতরের দিকে অভিক্ষিপ্ত থাকে।

(ii) দ্বিতন্ত্রী DNA এর তন্তুদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ একটি তন্তু 3′-5′ অভিমুখে থাকলে, অপরতন্তুটি 3′-5′ অভিমুখে থাকে।

(iii) দুটি তন্তুর নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনীর (H-bonds) সাহায্যে জোড় বেঁধে বেসযুগ্ম গঠন করে। একটি তন্তুস্থিত অ্যাডিনিন ক্ষার ও বিপরীত তন্তুর থাইমিন ক্ষারের মধ্যে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠিত হয় এবং বিপরীতভাবেও তাই ঘটে। একইভাবে একটি তন্তুর গুয়ানিন অপর তন্তুর সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে। ফলস্বরূপ, প্রতিটি পিউরিন বেসের বিপরীতে একটি পিরিমিডিন বেস থাকে। এর ফলে DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিক্সটির দুটি তন্তুর মাঝে প্রায় অভিন্ন দূরত্ব তৈরি হয় (চিত্র 6.2)।

(iv) DNA দুটি তন্তু দক্ষিণাবর্ত (Right handed) ফ্যাশনে কুন্ডলিত থাকে। DNA হেলিক্সটির প্রতিটি সম্পূর্ণ পাকের দৈর্ঘ্য 3.4 nm (এক nm হল 1 মিটারের 1 বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 10^{-9}) এবং সম্পূর্ণ পাকে মোটামোটি 10 টি বেসযুগ্ম অবস্থান করে।

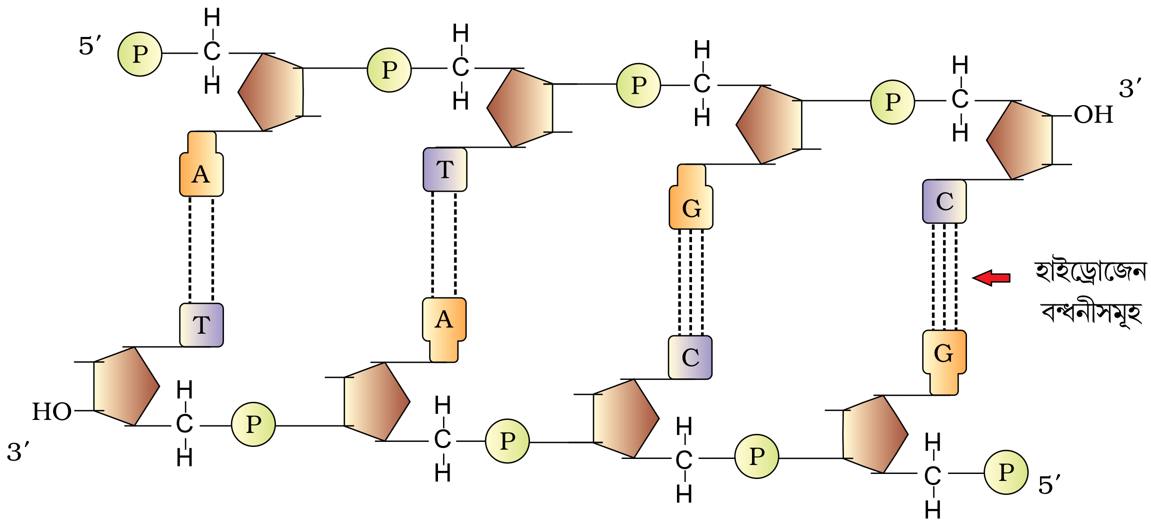

চিত্র 6.2 দ্বিতন্ত্রী পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল

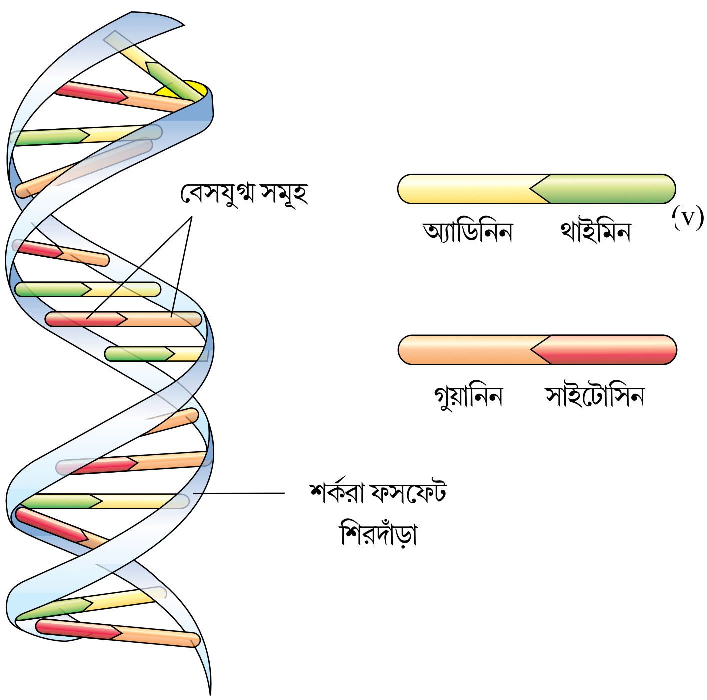

চিত্র 6.3 DNA দ্বিতন্ত্রী হেলিক্স

কাজেই একটি হেলিক্সের প্রতিটি বেসযুগ্মের মধ্যেকার দূরত্ব হয় প্রায় 0.34 nm ।

দ্বিতন্ত্রী হেলিক্সে একটি বেস-যুগ্মের তল অপরটির উপর স্তূপীকৃত থাকে। এটি হাইড্রোজেন বন্ধনী ছাড়াও DNA এর হেলিক্যাল গঠনকে স্থিতিশীলতা প্রদান করে (চিত্র 6.3)

পিউরিন ও পিরিমিডিনের গঠনের তুলনা করো। DNA গঠনকারী পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের মধ্যেকার দূরত্ব কেন প্রায় ধ্রুবক থাকে তা বের করতে পারবে কী?

DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিকেল গঠনের প্রস্তাব এবং এর জিনগত তাৎপর্যের সরল ব্যাখ্যা বৈপ্লবিক ছিল। এর অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সিস ক্রিক আনবিক জীববিদ্যায় সেন্ট্রাল ডগমা নামকএকটি তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জিনগত বার্তা DNA থেকে RNA হয়ে প্রোটিনে (DNA→RNA→ প্রোটিন) প্রবাহিত হয়।

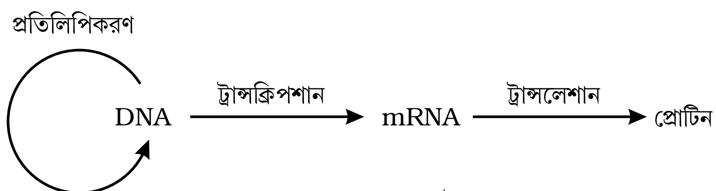

সেন্ট্রাল ডগমা

কিছু কিছু ভাইরাসে জিনগত বার্তার প্রবহন বিপরীত অভিমুখে ঘটে অর্থাৎ RNA থেকে DNA তে জিনগত বার্তাও প্রবাহিত হয়। তোমরা এই প্রক্রিয়াটির একটি সহজ-সরল নাম দিতে পার কি?

6.1.2 DNA হেলিক্স এর প্যাকেজিং (Packaging of DNA helix)

পরপর সজ্জিত দুটি বেসযুগ্মের মধ্যেকার দূরত্ব 0.34 nm (0.34×10^{-9} m) ধরে নিয়ে যদি একটি আদর্শ স্তন্যপায়ী কোশে উপস্থিত দ্বিতন্ত্রী DNA এর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় (বেসযুগ্মের মোট সংখ্যাকে দুটি পর পর সজ্জিত বেসযুগ্মের মধ্যেকার দূরত্ব দিয়ে গুণ করলে যা পাওয়া যায় তা হল — 6.6×10^{-9} bp x 0.34×10^{-9} m/bp) তবে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় 2.2 মিটার যা একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের ব্যাস (প্রায় 10^{-6} m) অপেক্ষা অনেকটাই বেশি। কীভাবে এরূপ পলিমারটি একটি কোশের ভেতরে সজ্জিত থাকে?

যদি E. coli কোশের DNA এর দৈর্ঘ্য 1.36 mm হয়, তবে তোমরা E. coli কোশে উপস্থিত বেসযুগ্মের সংখ্যা গণনা করতে পারবে কী?

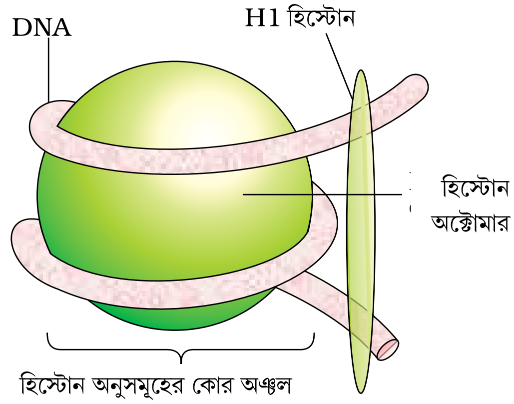

চিত্র 6.4 (ক) নিউক্লিওজোম

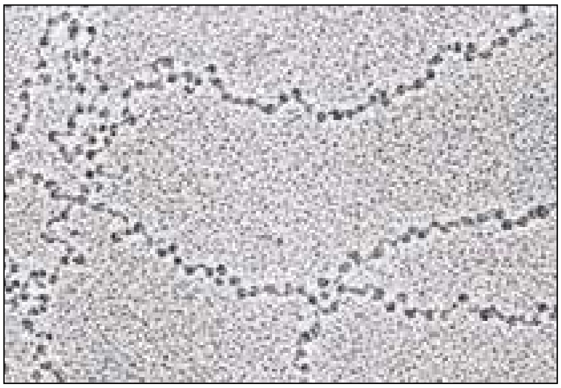

চিত্র 6.4 (খ) ইলেকট্রন আনুবীক্ষণিক চিত্র - পুঁতির মালা

প্রোক্যারিওটিক জীবে, যেমন E. coli, যদিও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে না, তবুও এদের DNA সমগ্র কোশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে না। DNA (ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট হওয়ায়) কিছু প্রোটিন (যেগুলো ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট) এর সাথে যে অঞ্চলে যুক্ত হয় তাকে ‘নিউক্লিওয়েড’ (Nucleoid) বলে। নিউক্লিওয়েড-এ DNA, প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে বড়ো লুপের আকারে সংগঠিত থাকে।

ইউক্যারিওটিক কোশে এই সংগঠন অধিকতর জটিল প্রকৃতির হয়। এই কোশে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট ক্ষারীয় প্রোটিনের একটি সেট থাকে এবং একে হিস্টোন (Histone) বলে। আধানবিশিষ্ট পার্শ্বশৃঙ্খল সমন্বিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে একটি প্রোটিন আধান লাভ করে। হিস্টোনগুলো লাইসিন ও আর্জিনিন নামক ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ হয়। উভয় অ্যামাইনো অ্যাসিডই তাদের পার্শ্বশৃঙ্খলে ধনাত্মক আধান বহন করে। হিস্টোনগুলো সংগঠিত হয়ে আট অনুবিশিষ্ট একটি একক গঠন করে এবং একে হিস্টোন অক্টামার বলে। ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট DNA ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হিস্টোন অক্টামার আবৃত করে যে গঠনটি সৃষ্টি করে তাকে নিউক্লিওজোম বলে (চিত্র 6.4 ক)। একটি আদর্শ নিউক্লিওজোম DNA হেলিক্স এর 200 বেস যুগ্ম সমন্বিত হয়। নিউক্লিওজোম নিউক্লিয়াসস্থিত একটি গঠনের পুনরাবৃত্তিমূলক যে একক তৈরি করে তাকে ক্রোমাটিন বলে। নিউক্লিয়াসে দৃশ্য সুতার মতো রঞ্জিত (বর্ণযুক্ত) দেহাংশগুলোই হল ক্রোমাটিন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ক্রোমাটিনস্থিত নিউক্লিওজোমগুলোকে পুঁতির মালার মতো (Beads on String) গঠনবিশিষ্ট দেখায় (চিত্র 6.4 খ)।

তাত্ত্বিকভাবে একটি স্তন্যপায়ী কোশে উপস্থিত এরূপ পুঁতির (Beads) সংখ্যা কত হবে বলে তুমি মনে কর?

ক্রোমাটিনে পুঁতির মালার গঠনটি গাঁটবন্দী বা প্যাকেজড হয়ে ক্রোমাটিন তন্তুসমূহ তৈরি করে যেগুলো কোশ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় আরও কুন্ডলীতে ও ঘনীভূত হয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে। উচ্চস্তরে ক্রোমাটিনের প্যাকেজিং এর জন্য অতিরিক্ত প্রোটিন সেট এর প্রয়োজন হয় যাদের সামগ্রিকভাবে

নন হিস্টোন ক্রোমোজোমাল প্রোটিন (NHC) রূপে গণ্য করা হয়। একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসে ক্রোমাটিনের কিছু অঞ্চল শিথিলভাবে গাঁটবন্দী (Packed) থাকে (এবং হালকা রঞ্জকে রঞ্জিত থাকে) এবং এদের ইউক্রোমাটিন (Euchromatin) বলে। ক্রোমাটিনের যে অঞ্চল অধিকতর নিবিড়ভবে গাঁটবন্দী (APacked) এবং গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় তাদের ইউক্রোমাটিন বলে। ইউক্রোমাটিনকে ট্রান্সক্রিপশানগত দিক থেকে সক্রিয় ক্রোমাটিন বলে। অপরদিকে হেটারোক্রোমাটিন নিষ্ক্রি য় হয়।

6.2 জিনগত বস্তুর অনুসন্ধান (The Search for genetic material)

এমনকি যদিও মেইসচার দ্বারা নিউক্লিনের আবিষ্কার এবং মেন্ডেলের বংশানুসরণের নীতি সমূহের প্রস্তাব প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল তবুও DNA যে বংশগতি বস্তু হিসাবে কাজ করে তা আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। 1926 সালের মধ্যে জিনগত বস্তুর বংশানুসরণ পদ্ধতি নির্ধারণ বিষয়ক অনুসন্ধান আনবিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। গ্রেগর মেন্ডেল, ওয়ালটার সাটন, থমাস হান্ট মরগান এবং অসংখ্য অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পূর্বেকার আবিষ্কারগুলো থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, বেশিরভাগ কোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করে। কিন্তু সেই প্রশ্নটির উত্তর তখনও মেলেনি যে, কোন অনুটি প্রকৃতপক্ষে জিনগত বস্তু।

রূপান্তরভবনের নীতি (Transforming Principle)

1928 সালে ফ্রেডেরিক গ্রীফিথ (Frederick Griffith) স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি *(Streptococcus pneumoniae)* [যে ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী] কে নিয়ে একগুচ্ছ পরীক্ষা করেন এবং ব্যাকটেরিয়ায় সংঘটিত অভূতপূর্ব রূপান্তরভবন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গ্রীফিথের পরীক্ষাগুলো চলাকালে একটি সজীববস্তু (ব্যাকটিরিয়া) আকৃতিগত দিক থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল।

যখন একটি কালচার প্লেটে স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি (নিউমোক্কাস) নামক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঘটানো হয় তখন এদের মধ্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া মসৃণ, উজ্জ্বল ব্যাকটেরিয়া কলোনি (S) এবং আবার কিছু ব্যাকটিরিয়া অমসৃণ ব্যাকটেরিয়া কলোনি (R) সৃষ্টি করে। এর কারণ হল এই যে, S স্ট্রেন ব্যাকটেরিয়াদের ঘিরে একটি মিউকাস (পলিস্যাক্যারাইড) আবরণী থাকে, অপরদিকে R স্ট্রেন ব্যাকটেরিয়ায় এরূপ কোনো আবরণী থাকে না। এই কারণে S স্ট্রেন (ভিরুলেন্ট) দ্বারা সংক্রামিত ইঁদুর নিউমোনিয়ার সংক্রমণজনিত কারণে মারা যায়। অপরদিকে R স্ট্রেন দ্বারা সংক্রমিত ইঁদুরে নিউমোনিয়া রোগ দেখা দেয় না।

S স্ট্রেন → ইনজেকশানের মাধ্যমে ইঁদুরের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল → ইঁদুরগুলো মারা গিয়েছিল

R স্ট্রেন → ইনজেকশানের মাধ্যমে ইঁদুরের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল → ইঁদুরগুলো বেঁচে রইল

গ্রীফিথ তাপ প্রয়োগ করে ইঁদুরের স্ট্রেনগুলোকে মারতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, তাপ প্রয়োগে মৃত S স্ট্রেন ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ইনজেকশানের মাধ্যমে ইঁদুরগুলোর দেহে ঢুকিয়ে দিলে এরা ইঁদুরগুলোকে মারতে পারে না।

S স্ট্রেন (তাপ প্রয়োগ মৃত) → ইনজেকশানের মাধ্যমে ইঁদুরগুলোতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল → ইঁদুরগুলো বেঁচে রইল

S স্ট্রেন (তাপ প্রয়োগ মৃত) + R স্ট্রেন (জীবিত) → ইনজেকশানের মাধ্যমে ইঁদুরগুলোর দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল → ইঁদুরগুলো মারা গেলো

তিনি তাপ প্রয়োগে মৃত S স্ট্রেন এবং সজীব R স্ট্রেন বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মিশিয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইঁদুরগুলোর দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখেছিলেন যে ইঁদুরগুলো মারা গিয়েছিল। এছাড়া তিনি মৃত ইঁদুরগুলোর দেহ থেকে সজীব S স্ট্রেনবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াগুলো ফিরে পেয়েছিলেন।

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, R স্ট্রেন বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াগুলো তাপ প্রয়োগে মৃত S স্ট্রেন বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কোনো না কোনোভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাপ প্রয়োগে মৃত S স্ট্রেনবিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়া থেকে কিছু 'ট্রান্সফরমিং প্রিন্সিপাল' S স্ট্রেন বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং এর ফলে R স্ট্রেন বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া একটি মসৃণ পলিস্যাকারাইড আবরক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল ও ভিরুলেন্ট স্ট্রেন এ পরিণত হয়েছিল। এটি অবশ্যই জিনগত বস্তুর স্থানান্তরণের কারণে ঘটেছিল। তবে, তার পরীক্ষা থেকে জিনগত বস্তুর জৈব রাসায়নিক প্রকৃতি কিরূপ তা সংজ্ঞায়িত করা যায়নি। 'ট্রান্সফরমিং প্রিন্সিপাল'এর জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য (Biochemical Characteriation of Transforming Principle)

অসওয়াল্ড অ্যাভেরি (Oswald Avery), কলিন ম্যাকলিওড (Colin Macleod) এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্টি (Maclyn Macarty) (1933-44), এর কাজের পূর্ব পর্যন্ত প্রোটিনকেই জিনবস্তু ভাবা হয়েছিল। গ্রীফিথের পরীক্ষায় যে ট্রান্সফরমিং প্রকৃতি এর কথা বলা হয়েছিল তার জৈব রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এই তিন বিজ্ঞানী একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

তাঁরা তাপ প্রয়োগে মৃত S স্ট্রেনবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে সংগৃহীত জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর (প্রোটিন, DNA, RNA ইদ্যাদি) কোনটি সজীব 'R' ব্যাকটিরিয়া কোশগুলোকে 'S' ব্যাকটেরিয়া কোশে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল তা দেখার জন্য এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর বিশুদ্ধিকরণ করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে 'S' ব্যাকটেরিয়া থেকে নিষ্কাশিত DNA এককভাবে 'R' ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরণ ঘটিয়েছিল।

তাঁরা এটাও আবিষ্কার করেছিলেন যে, প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকসমূহ (প্রোটিয়েজেস) ও RNA পরিপাককারী উৎসচেকসমূহ (RNA ase) দ্বারা রূপান্তরভবন প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয় না। সুতরাং এটা বলা যায় যে, রূপান্তরভবনকারী বস্তুটি প্রোটিন বা RNA ছিলনা। DNA ase উৎসেচক প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছিল যে, এটি রূপান্তরভবনে বাধাদান করে। এর ফলে এটা বোঝা যায় যে, DNA ই রূপান্তরভবন ঘটিয়েছিল। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে DNA হল বংশগতি বস্তু, কিন্তু জীব বিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হননি।

DNAs এবং DNA ase এর মধ্যে কোনো পার্থক্যের কথা তোমরা ভাবতে পার কি?

6.2.1 জিনগত বস্তু DNA (The Genetic Material is DNA)

আলফ্রেড হার্সে (Alfred Hershey) এবং মার্থা চেজ (Martha Chase) (1952) এর পরীক্ষা সমূহ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে DNA ই হল জিনগত বস্তু। তাঁরা সেই ভাইরাসগুলো নিয়ে কাজ করেছিলেন যেগুলো ব্যাকটেরিয়া কোশে সংক্রমণ ঘটায়। এই ভাইরাসগুলোকে ব্যাকটেরিওফাজ বলে।

ব্যাকটিরিওফাজটি ব্যাকটেরিয়া কোশের গাত্রে আবদ্ধ হয় এবং এরপর এর জিনগত বস্তু ব্যাকটেরিয়া কোশে প্রবেশ করে। ব্যাকটেরিয়া কোশটি ভাইরাসের জিনগত বস্তুকে তার নিজস্ব উপাদান হিসাবে ভেবে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে বহু ভাইরাস সৃষ্টি করে। ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া কোশে প্রবিষ্ট বস্তুটি প্রোটিন না DNA তা আবিষ্কার করার জন্যই হার্সে ও চেজ তাদের পরীক্ষাগুলো করেছিলেন।

তাঁরা তেজস্ক্রিয় ফসফরাস সমন্বিত একটি ধাত্রে কিছু ভাইরাস এবং তেজস্ক্রিয় সালফার সমন্বিত ধাত্রে অন্য কিছু ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। যে ভাইরাসগুলোকে তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল সেগুলোতে তেজস্ক্রিয় DNA ছিল কিন্তু তেজস্ক্রিয় প্রোটিন ছিল না কারণ DNA তে ফসফরাস থাকে, প্রোটিনে ফসফরাস থাকে না। একইভাবে, যে ভাইরাসগুলোকে তেজস্ক্রিয় সালফারের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল সেগুলো তেজস্ক্রিয় প্রোটিন সমন্বিত ছিল, কিন্তু এতে তেজস্ক্রিয় DNA ছিল না কারণ DNA তে সালফার অনুপস্থিত।

তেজস্ক্রিয় ফাজগুলো E. Coli ব্যাকটেরিয়া গাত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। এরপর সংক্রমণ ঘটানোর প্রক্রিয়াটি চলতে থাকলে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ব্লেন্ডার এ মন্থন করার দ্বারা এদের থেকে ভাইরাসের আবরকগুলোকে অপসারণ করা হয়েছিল, ভাইরাসগুলোকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ঘূর্ণনের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথক করা হয়েছিল।

যেসব ব্যাকটেরিয়া তেজস্ক্রিয় DNA সমন্বিত ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় তদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, DNA ই হল সেই বস্তু যা ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে এসেছিল। যেসব ব্যাকটেরিয়া তেজস্ক্রিয় প্রোটিন সমন্বিত ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় তাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় না।

এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রোটিন ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করেনি। তাই DNA ই হল জিনগত বস্তু যা ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে সঞ্চারিত হয় (চিত্র 6.5)

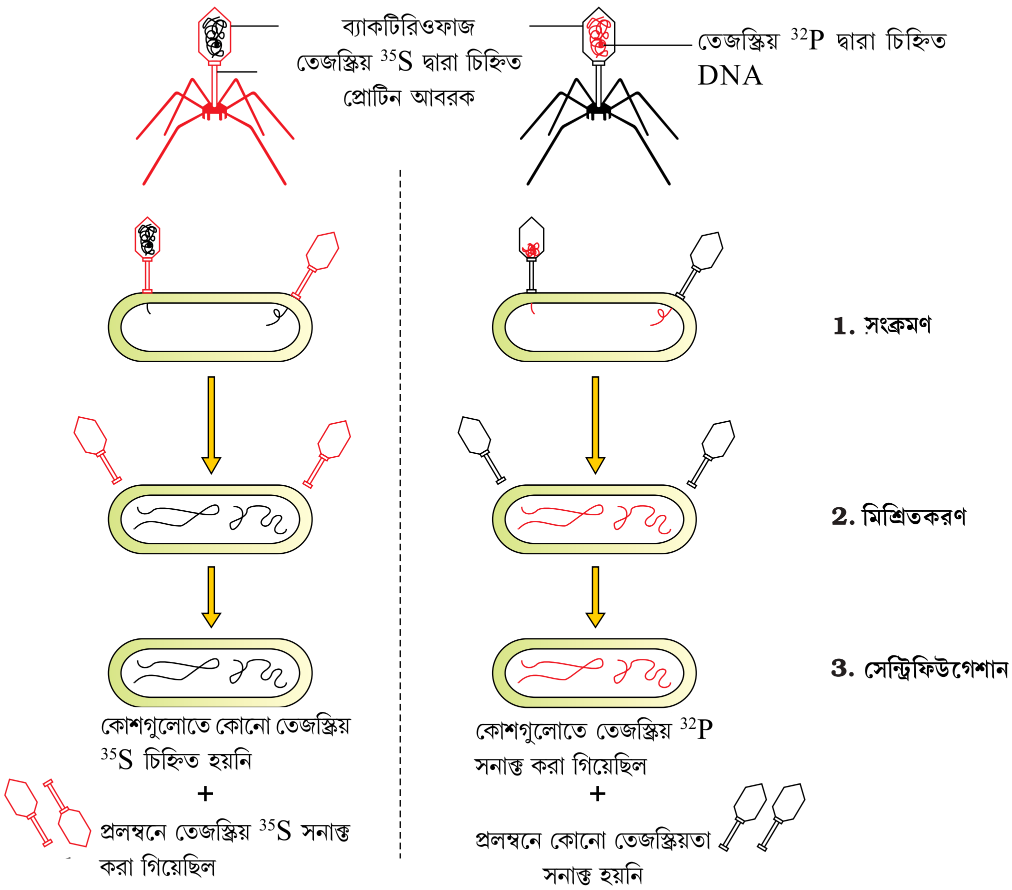

চিত্র 6.5 হার্সে-চেজ পরীক্ষা

6.2.2 জিনগত বস্তুর ধর্ম (DNA বনাম RNA) Properties of genetic material (DNA Versus RNA)

পূর্বের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, হার্সে-চেজ পরীক্ষার পর DNA এবং প্রোটিনের মধ্যে কোনটি জিনগতবস্তু সে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেছিল এবং একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে উঠেছিল যে DNA জিনগতবস্তু হিসাবে কাজ করে। তবে পরবর্তী সময়ে এটি স্পষ্ট হয়েছিল যে

কিছু ভাইরাসের জিনগত বস্তু হল RNA (উদাহরণস্বরূপ টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, QB ব্যাকটিরিওফাজ ইত্যাদি)। এখন কিছু প্রশ্নেরউত্তর দাও যেমন কেন DNA কে মুখ্য জিনগত বস্তু বলা হয় যেখানে RNA কে সক্রিয়ভাবে বার্তাবাহক এবং অ্যাডাপটার এর কার্য সম্পাদন করতে দেখা যায় যা আমরা দুটি নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর মধ্যেকার রাসায়নিক গঠনগত পার্থক্য থেকে বুঝতে পারি।

তোমরা কি DNA এবং RNA র মধ্যেকার দুটি রাসায়নিক গঠনগত পার্থক্য মনে করতে পারো? কোনো অনুকে যদি জিনগত বস্তু হিসাবে কাজ করতে হয় তবে একে নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে ঃ

i) একে নিজস্ব প্রতিলিপি তৈরিতে সক্ষম হতে হবে (প্রতিলিপিকরণ)

ii) একে রাসায়নিকগতভাবে এবং গঠনগতভাবে স্থিতিশীল হতে হবে।

iii) এতে ধীরগতিতে পরিবর্তন সমূহ (মিউটেশন) ঘটার সুযোগ থাকতে হবে, যা বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয়।

iv) এটি নিজেকে মেন্ডেলীয় বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হতে হবে।

যদি কেউ বেস যুগ্মকরণ এবং পরিপূরকতার নীতিকে মাথায় রেখে প্রতিটি চাহিদাকে একটির পর একটি পরীক্ষা করে তবে দেখা যাবে যে, উভয় নিউক্লিক অ্যাসিডেরই (DNA এবং RNA) নিজেদের প্রতিলিপি গঠন করার ক্ষমতা রয়েছে। সজীববস্তুর দেহস্থিত অন্য অনুসমূহ যেমন প্রোটিন জিনগত বস্তুরূপে কাজ করার জন্য যে প্রথম মাণদণ্ডটি রয়েছে সেটিই পূরণ করতে পারে না।

জিনগত বস্তুকে এতটাই স্থিতিশীল হতে হবে যাতে জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা, বয়স এবং সজীববস্তুর শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনে এর কোনো পরিবর্তন না ঘটে। জিনগত বস্তুর ধর্মগুলোর মধ্যে একটি হল এর স্থিতিশীলতা যা গ্রীফিথের 'ট্রান্সফরমিং প্রিন্সিপাল' এ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। গ্রীফিথের পরীক্ষায় এটা দেখা গিয়েছিল যে, তাপ প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া মারা গেলেও তা জিনগত বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে পারেনি। DNA এর পরিপ্রেক্ষিতে এটি এখন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, DNA এর তন্তুদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় তাপ প্রয়োগে তন্তুদের পরস্পর থেকে পৃথক করা গেলেও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এরা পরস্পর কাছাকাছি চলে আসেও জুড়ে যায়।

এছাড়া RNA এর প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে উপস্থিত2´-OH গ্রুপটি হল একটি সক্রিয় গ্রুপ এবং এই গ্রুপটির উপস্থিতিরজন্য RNA পরিবর্তন প্রবণ হয় ও সহজে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। RNA কে এখন অনুঘটক রূপেও গণ্য করা হয় এবং তাই এটি সক্রিয় হয়। এই কারণে DNA, RNA র তুলনায় রাসায়নিক দিক থেকে কম সক্রিয় এবং গঠনগত দিক থেকে অধিক স্থিতিশীল হয়। দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে DNA, RNA অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী জিনগত বস্তু।

বস্তুতপক্ষে, DNA তে ইউরাসিলের পরিবর্তে থাইমিনের উপস্থিতিও DNA কে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদান করে। (এ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য DNA এর ত্রুটি সারাই প্রক্রিয়াটি বোঝার প্রয়োজন এবং উপরের শ্রেণিতে তোমরা এই প্রক্রিয়াগুলো অধ্যয়ন করবে।

DNA, RNA উভয়ই পরিব্যক্তিতে সক্ষম। বস্তুত, RNA অস্থিতিশীল হওয়ায় এর পরিব্যক্তি দ্রুতহারে ঘটে। অতএব যেসব ভাইরাসের RNA ভাইরাস রয়েছে এবং যাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হয় সেই ভাইরাসগুলোর মিউটেশন বা পরিব্যক্তি ঘটে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে বিবর্তন ঘটে।

RNA সরাসরি প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য সংকেত বহন করতে পারে এবং তাই সহজেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করতে পারে। তবে DNA কে প্রোটিন সংশ্লেষ করার জন্য RNA এর উপর নির্ভর করতে হয়। RNA কে ঘিরে প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো উদ্ভূত হয়েছে। উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, DNA এবং RNA উভয়ই জিনগত বস্তু রূপে কাজ করে।

কিন্তু DNA তুলনামূলকভাবে অধিক স্থিতিশীল হওয়ায় জিনগত বার্তা সঞ্চয়ের জন্য উপযোগী হয়। তবে জিনগত বস্তুর সঞ্চারণের ক্ষেত্রে RNA তুলনামূলক অধিক উপযোগী।

6.3 RNA -এর সংসার (RNA World)

পূর্বের আলোচনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেটি হল — প্রথম জিনগত বস্তু কোনটি ? যে অধ্যায়ে রাসায়নিক বিবর্তন বর্ণনা করা হয়েছে সেই অধ্যায়ে এটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। তবে আমরা এখানে এই সম্পর্কিত ঘটনাবলি ও বিষয় সংকেত সমূহের কিছুটার উপর আলোকপাত করবো।

RNA ছিল প্রথম জিনগত বস্তু। প্রয়োজনীয় জীবন প্রক্রিয়াগুলো (যেমন বিপাক ট্রান্সলেশান, স্প্লাইসিং ইত্যাদি) RNA কে ঘিরে যে আবর্তিত হয় তার এখন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। RNA একটি জিনগত বস্তু এবং এর পাশাপাশি অনুঘটক (সজীব কোশে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যেগুলো RNA অনুঘটকের উপস্থিতিতে ঘটে, প্রোটিন ধর্মী উৎসেচকের উপস্থিতিতে ঘটে না) রূপেও কাজ করে। কিন্তু RNA অনুঘটক হওয়ায় এটি অধিক সক্রিয় ছিল এবং তাই এটি অস্থিতিশীল ছিল। তাই বলা যায় যে, রাসায়নিক পরিমার্জনের ফলে RNA থেকে DNA উদ্ভূত হয়েছে এবং এর ফলে DNA তুলনামূলকভাবে অধিক স্থিতিশীল হয়েছে। DNA দ্বিতন্ত্রী গঠন বিশিষ্ট এবং তন্তুদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় ত্রুটি সারাইয়ের ফলে উদ্ভূত পরিবর্তনসমূহকে আরো বেশি প্রতিরোধ করতে পারে।

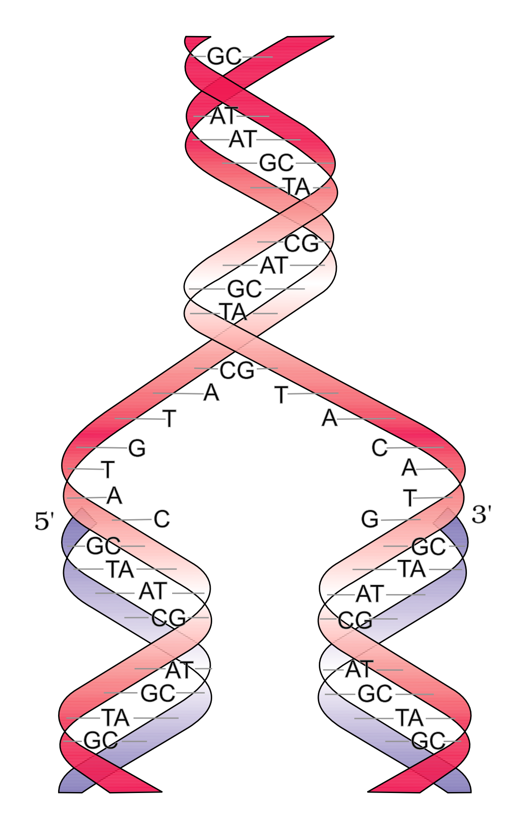

চিত্র 6.6 অর্ধসংরক্ষণশীল প্রতিলিপিকরণের জন্য ওয়াটসন-ক্রিক মডেল

6.4 প্রতিলিপিকরণ (Replication)

DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিফ্যাল গঠনের প্রস্তাব করার পরপরই ওয়াটসন ও ক্রিক DNA এর প্রতিলিপিকরণের একটি নক্সার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁদের মূল বিবৃতি নেওয়া উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

"নির্দিষ্ট বেসযুগ্মকরণ সম্পর্কে জানার পর তৎক্ষণাৎ জিনগত বস্তুর জন্য সম্ভাব্য প্রতিলিপিকরণ পদ্ধতির সুপারিশ করা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।" (ওয়াটসন এবং ক্রিক 1953)।

ওয়াটসন ও ক্রিক প্রস্তাবিত নক্সা থেকে এটা বোঝা গিয়েছিল যে নতুন পরিপূরকতন্তু তৈরির জন্য DNA এর তন্তুদ্বয়কে পরস্পর থেকে আলাদা হতে হবে এবংএরা টেমপ্লেট তন্তু রূপে কাজ করবে। DNA এর প্রতিলিপিকরণ শেষ হওয়ার পর প্রতিটি DNA অণুর দুটি তন্তুর মধ্যে একটি তন্তু জনিতৃতন্তু এবং অপরটি নতুন সংশ্লেষিত তন্তু হবে। এই নক্সাটিকে DNA এর অর্ধসংরক্ষণশীল প্রতিলিপিকরণ বলে (চিত্র 6.6)।

6.4.1 পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ (The experimental proof) এটি এখন প্রমাণিত হয়েছে যে DNA এর প্রতিলিপিকরণ অর্ধ সংরক্ষণশীল হয়। এটি প্রথমে ইশ্চেরিশিয়া কোলি ব্যাকটেরিয়ায় দেখানো হয়েছিল এবং ক্রমশ উন্নত জীবেও দেখানো হয়েছিল, যেমন উদ্ভিদ কোশসমূহ ও মানুষের কোশ সমূহ

1958 সালে ম্যাথিউ মেসেলসন এবং ফ্রাঙ্কলিন স্টাল নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করেছিলেন।

i) তাঁরা নাইট্রোজেনের একমাত্র উৎস হিসাবে গৃহীত $^{15}NH_4Cl$ (^{15}N হল নাইট্রোজেনের ভারী আইসোটোপ) সমন্বিত ধাত্রে বহু জনু ধরে E. Coli এর বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। এই পরীক্ষার ফল এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, নতুন যে DNA সংশ্লেষিত হয়েছিল (এর পাশাপাশি অন্য নাইট্রোজেন সমন্বিত যৌগগুলোতেও) তাতে ^{15}N অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সিজিয়াম ক্লোরাইড (CsCl) এর ঘনত্বের অবক্রমে সেন্ট্রিফিউগেশানের মাধ্যমে এই ভারী DNA অনুটিকে স্বাভাবিক DNA অনুর থেকে পৃথক করা যেতে পারে। (এটা মনে রাখতে হবে যে ^{15}N কোনো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নয় এবং একে একমাত্র ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে ^{14}N থেকে পৃথক করা যেতে পারে।)

ii) এরপর এরা স্বাভাবিক $^{14}NH_4Cl$ সমন্বিত ধাত্রে কোশগুলোকে স্থানান্তরিত করেন এবং কোশের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোশগুলোর নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন এবং যে DNA গুলো দ্বিতন্ত্রী হেলিক্যাল গঠন বিশিষ্ট ছিল সেই DNA গুলো নিষ্কাশন করেন। DNA এর ঘনত্ব পরিমাপের জন্য সিজিয়াম ক্লোরাইড (CsCl) নতিমাত্রায় বিভিন্ন নমুনাগুলোকে স্বাধীনভাবে পৃথক করা হয়েছিল (চিত্র 6.7)

তোমরা কি অপকেন্দ্রিক বল কী তা মনে করতে পারো এবং ভাবতে পারো কেন উচ্চ ভর/ঘনত্ব বিশিষ্ট একটি অনু তুলনামূলকভাবে দ্রুত অধঃক্ষিপ্ত হয়? চিত্র 6.7 এ এর ফলাফল দেখানো হয়েছে।

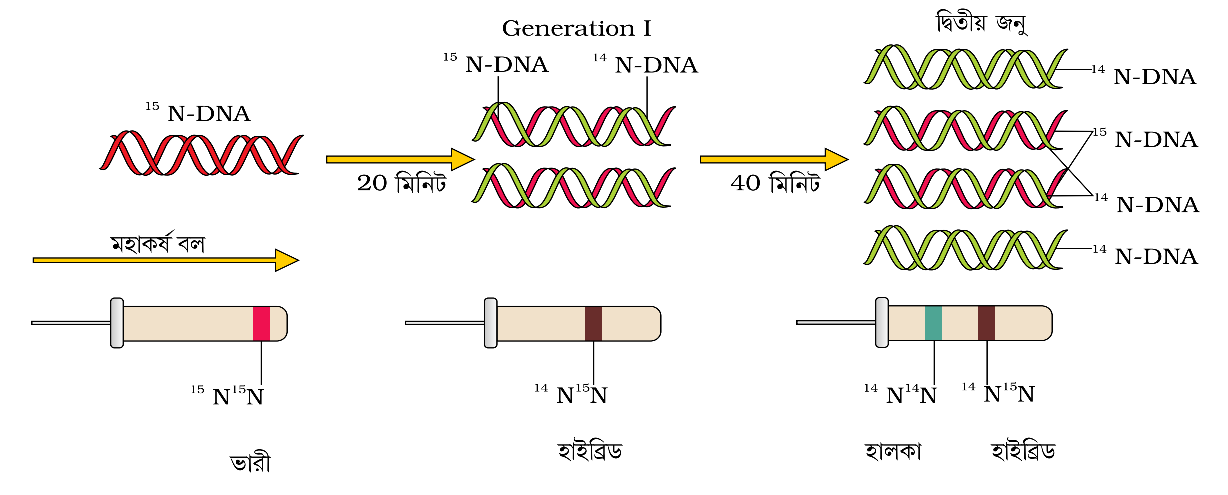

চিত্র 6.7 মেসেলসন এবং স্টীল এর পরীক্ষা

iii) তাই DNA কে ^{15}N মাধ্যম থেকে ^{14}N মাধ্যমে স্থানান্তরণের এক জুন পর (অর্থাৎ 20 মিনিট পর E. Coli ব্যাকটেরিয়া 20 মিনিটে একবার বিভাজিত হয়) পালন মাধ্যম থেকে নিষ্কাশিত DNA হাইব্রিড প্রকৃতির বা অর্ন্তবর্তী ঘনত্ব সম্পন্ন হয়। অপর এক জুন পর (অর্থাৎ 40 মিনিট পর, দ্বিতীয় জনু) পালন মাধ্যম থেকে নিষ্কাশিত DNA সমপরিমাণ এই হাইব্রিড DNA এবং হালকা DNA সমন্বিত হয়।

যদি E. Coli ব্যাকটেরিয়াকে 80 মিনিট ধরে বৃদ্ধি ঘটানো হয় তবে হালকা ঘনত্ব ও হাইব্রিড ঘনত্বের DNA এর অনুপাত কত হবে?

ক্রোমোজোমে নতুনভাবে সংশ্লেষিত DNA এর বিস্তৃতি চিহ্নিত করার জন্য তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন ব্যবহার করে (faba beans) এর উপর (Vicia faba) বিজ্ঞানী টেলর এবং তাঁর সহকর্মীরা 1958 সালে প্রায় একই ধরনের পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন। এই পরীক্ষাগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ক্রোমোজোমস্থিত DNA এর অর্ধসংরক্ষণশীল পদ্ধতিতেও প্রতিলিপিকরণ ঘটে।

6.4.2 কার্যপ্রণালী এবং উৎসেচকসমূহ (The Machinery and the Enzymes)

সজীব কোশসমূহে, যেমন E. Coli, প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য একগুচ্ছ অনুঘটক (উৎসেচক সমূহ) এর প্রয়োজন হয়। উৎসেচকগুলোর মধ্যে মুখ্য উৎসেচকটিকে DNA নির্ভর DNA পলিমারেজ বলে, কারণ এটি ডি-অক্সিনিউক্লিওটাইডগুলোর পলিমার গঠনকে অনুঘটন করার জন্য একটি DNA টেমপ্লেট ব্যবহার করে। এই উৎসেচকগুলো অধিক কার্যকরী উৎসেচক কারণ এদের অত্যন্ত কম সময়ে বিশাল সংখ্যক নিউক্লিওটাইডের পলিমার গঠনের জন্য অনুঘটকের কাজ করতে হয়। E. Coli ব্যাকটেরিয়ায় বেস যুগ্মের সংখ্যা হল কেবলমাত্র 4.6×10^6 bp (একে 6.6×10^9 bp সমন্বিত ডিপ্লয়েড মানুষের সাথে তুলনা কর)। E. Coli ব্যাকটেরিয়ায় প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে 18 মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ গড় পলিমার গঠনের হার প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 2000 bp। এই পলিমারেজ উৎসেচকগুলোকে কেবলমাত্র দ্রুতহারে কাজ করলেই হবে না, এদের অনুঘটনের কাজটিও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে হবে। প্রতিলিপিকরণকালে কোনো ত্রুটি ঘটলে এর ফলস্বরূপ পরিব্যক্তি ঘটবে। এছাড়া শক্তি ব্যবহারের দিক থেকেও এটি অত্যন্ত শক্তিব্যয়কারী প্রক্রিয়া। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেটগুলো দুটি কাজ করে। সাবস্ট্রেট হিসাবে কাজ করা ছাড়াও এরা পলিমার গঠনকারী বিক্রিয়া চালানোর জন্য (ডি অক্সিনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেটগুলোর প্রান্তীয় ফসফেটদ্বয় হল উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট, যে রূপ ATP র ক্ষেত্রে থাকে) শক্তির যোগান দেয়।

DNA নির্ভর DNA পলিমারেজ উৎসেচক ছাড়াও নিখুঁতভাবে প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য আরো বহু উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। একটি দীর্ঘ DNA অনুর ক্ষেত্রে যেহেতু এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি তন্তুকে পৃথক করা যায় না (অত্যন্ত উচ্চশক্তি চাহিদার জন্য) তাই DNA হেলিক্সের ছোটো খোলা অংশে প্রতিলিপিকরণ ঘটে এবং এই অংশটিকে রেপ্লিকেশন ফর্ক (Replication fork) বলে। DNA নির্ভর DNA পলিমারেজ উৎসেচকটি কেবলমাত্র একটি অভিমুখে পলিমার গঠন প্রক্রিয়াটিতে অনুঘটকের কাজ করে অর্থাৎ $5' \rightarrow 3'$। এরফলে রেপ্লিকেশান ফর্কে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। কাজেই একটি তন্তুতে ($5' \rightarrow 3'$ টেমপ্লেট তন্তু), প্রতিলিপিকরণ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে, পাশাপাশি অপর তন্তুটির উপর ($5' \rightarrow 3'$ টেমপ্লেট তন্তু) প্রতিলিপিকরণ বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লেষিত DNA খন্ডকগুলো পরে DNA লাইগেজ উৎসেচকের সহায়তায় যুক্ত হয় (চিত্র 6.8)।

DNA পলিমারেজ উৎসেচকগুলো নিজে থেকেই প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারেনা। এছাড়া DNA এর প্রতিলিপিকরণ DNA এর যে কোনো স্থানে এলোমেলোভাবেও শুরু হয় না। E. Coli ব্যাকটেরিয়ার DNA এর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রতিলিপিকরণের সূচনা ঘটে। এই ধরনের অঞ্চলগুলোকে প্রতিলিপিকরণের সূচনাস্থান (Origin of replication) বলে)।

রিকম্বিনেন্ট DNA গঠনকালে যদি একটি DNA খন্ডকের প্রতিলিপিকরণের প্রয়োজন হয় তখন প্রতিলিপিকরণের সূচনাকারী স্থানের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় একটি ভেক্টরের প্রয়োজন হয়। ভেক্টরগুলো থেকে প্রতিলিপিকরণের সূচনাকারী স্থানটি লাভ করা যায়।

এছাড়া প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াটি বিস্তৃতভাবে বোঝাও সম্ভবপর হয়নি। ইউক্যারিওটিক জীবে কোশচক্রের 'S' দশায় DNA এর প্রতিলিপিকরণ ঘটে। DNA এর প্রতিলিপিকরণ এবং কোশচক্র অত্যন্ত সমন্বয়িত থাকা উচিত। DNA এর প্রতিলিপিকরণের পর কোশ বিভাজন না ঘটলে এর ফলশ্রুতিতে পলিপ্লয়েডি ঘটে (একটি ক্রোমোজোমঘটিত অস্বাভাবিকতা)। উচ্চ শ্রেণিতে তোমরা এই স্থানে সংঘটিত ঘটনাগুলোর উৎপত্তি ও প্রক্রিয়াগুলোর বিস্তৃত প্রকৃতি জানবে।

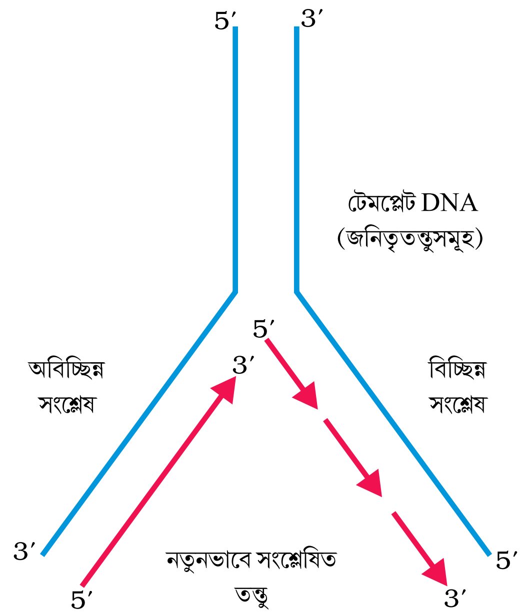

চিত্র 6.8 রেপ্লিকেশান ফর্ক

6.5 ট্রান্সক্রিপশান (Trans Cription)

DNA এর একটি তন্তু থেকে জিনগত বার্তা RNA তে প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশান বলে। এক্ষেত্রেও পরিপূরকতার নীতি (Principle of complementarity) দ্বারাই ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। তবে ব্যতিক্রম হল এই যে, এক্ষেত্রে অ্যাডিনিন থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিলের সাথে যুক্ত হয়ে বেস যুগ্ম গঠন করে। তবে প্রতিলিপিকরণ প্রক্রিয়াটি একবার শুরু হলে জীবের সম্পূর্ণ DNA এর দ্বিত্বকরণ ঘটে, যেখানে ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র DNA এর একটি খন্ডক এবং দুটি তন্তুর মধ্যে কেবলমাত্র একটি তন্তু থেকে RNA গঠিত হয়। এটি DNA এর সেই সীমানাটিকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে যা ট্রান্সক্রিপশানে অংশগ্রহণকারী DNA এর নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং DNA এর কোন্ তন্তুটির ট্রান্সক্রিপশান ঘটবে তা চিহ্নিত করে।

ট্রান্সক্রিপশানকালে কেন DNA এর উভয় তন্তুই অংশগ্রহণ করে না তার একটি সজর সরল উত্তর রয়েছে। প্রথমতঃ যদি DNA এর উভয় তন্তুই টেমপ্লেট তন্তুরূপে কাজ করে তবে দুটি ভিন্ন সজ্জাক্রম বিশিষ্ট RNA এর এর সৃষ্টি হবে (এটা মনে রেখো যে, পরিপূরকতা বলতে সমরূপতা বোঝায় না) এবং এরফলে যদি এরা প্রোটিনগুলোর সংকেত বহন করে তবে প্রোটিনগুলোতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাই DNA এর একটি খন্ডণ দুটি ভিন্ন ধরনের প্রোটিনের সংকেত বহন করবে এবং এটি জিনগত বার্তা পরিবহণ ব্যবস্থাকে জটিল করে তুলবে। দ্বিতীয়ত, যদি দুটি RNA এর অণু একই সাথে উৎপন্ন হয় তবে এরা একে অপরের পরিপূরক হবে এবং এর ফলে একটি দ্বিতন্ত্রী RNA গঠিত হবে। এতে RNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষ বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ায় RNA সৃষ্টি নিরর্থক হয়ে উঠবে।

6.5.1 ট্রান্সক্রিপশান একক (Transcription Unit)

DNA স্থিত ট্রান্সক্রিপশান এককটি মুখ্যত তিনটি অঞ্চল সমন্বিত হয়।

(i) একটি প্রমোটার অঞ্চল (A Promoter)

(ii) গাঠনিক জিন (The structural gene)

(iii) একটি সমাপ্তি অঞ্চল (A Terminator)

ট্রান্সক্রিপশান এককের গাঠনিক জিনমধ্যস্থ DNA এর দুটি তন্তুকে সংজ্ঞায়িত করার একটি প্রচলিত নিয়ম রয়েছে। যেহেতু DNA এর দুটি তন্তু পরস্পর বিপরীতমুখী হয় এবং DNA নির্ভর RNA পলিমারেজ ও কেবলমাত্র একটি অভিমুখেই নিউক্লিওটাইডের পলিমার গঠনে অনুঘটকের কাজ করে অর্থাৎ $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে, তাই DNA এর যে তন্তুটি $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে থাকে সেটি টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করে এবং এই তন্তুটিকে টেমপ্লেট তন্তুও বলে। DNA এর অপর তন্তুটি $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে থাকে এবং এর সজ্জাক্রম RNA এর মতো হয় (ব্যতিক্রম ইউরাসিলের স্থানে থাইমিন থাকে) সেটি ট্রান্সক্রিপশান কালে স্থানচ্যুত হয়। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হল এই যে, এই তন্তুটিকে (যে তন্তুটি কোনো কিছুরই সংকেত বহন করে না) কোডিং তন্তু বলে। ট্রান্সক্রিপশান একককে সংজ্ঞায়িত করার সময় সব উল্লিখিত স্থানগুলো, যেগুলো ট্রান্সক্রিপশান এককের অংশ সেগুলো কোডিং তন্তু দ্বারা গঠিত হয়। এই স্থানটিকে ব্যাখ্যা করতে ট্রান্সক্রিপশান এককের একটি কাল্পনিক সজ্জাক্রম নিম্নে দেখানো হল।

3′-ATGCATGCATGCATGCATGCATGC-5′ টেমপ্লেট তন্তু

5′-TACGTACGTACGTACGTACGTACG-3′ কোডিং তন্তু

উপরের DNA তন্তু থেকে সংশ্লেষিত RNA সজ্জাক্রমটি তোমরা লিখতে পারবে কি?

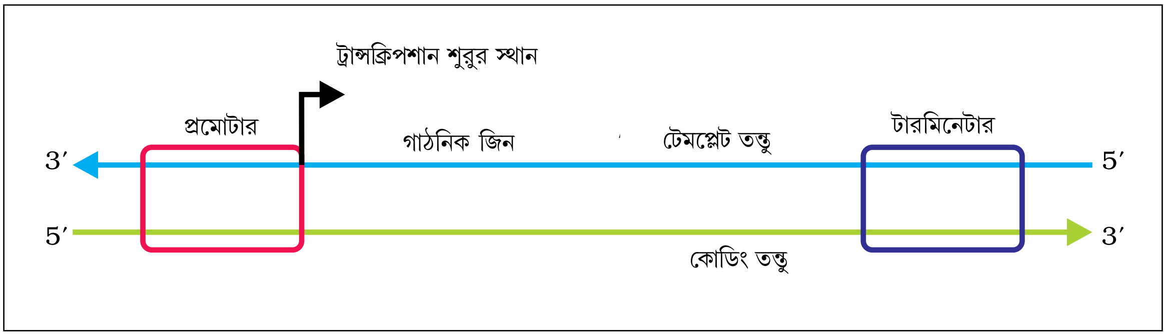

চিত্র 6.9 একটি ট্রান্সক্রিপশান এককের গঠনের নক্সা

একটি ট্রান্সক্রিপশান এককে প্রমোটার এবং টারমিনেটার অঞ্চলের মাঝে গাঠনিক জিনটি অবস্থান করে। প্রমোটার অঞ্চলটি গাঠনিক জিনের (কোডিং তন্তুর মেরু প্রবণতার সাপেক্ষে এটি উল্লেখ করা হয়েছে) 5' প্রান্তের দিকে (আপস্ট্রিম) অবস্থান করে। এই DNA সজ্জাক্রমটিতে RNA পলিমারেজ এর সংযুক্তি স্থান রয়েছে এবং এটি হল একটি ট্রান্সক্রিপশান এককে প্রোমোটারের উপস্থিতি যা কোডিং তন্তু এবং টেমপ্লেট তন্তুকেও সংজ্ঞায়িত করে। টারমিনেটার অঞ্চলের সাথে প্রমোটারের স্থান পরিবর্তন হলে কোডিং তন্তু ও টেমপ্লেট তন্তুর সংজ্ঞাও উল্টো হয়ে যেতে পারে। টারমিনেটার অঞ্চলটি কোডিং তন্তুর $3'$ প্রান্তের দিকে (ডাউনস্ট্রিম) অবস্থান করে এবং এটি সাধারণত ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার প্রান্তসীমাকে নির্দেশ করে (চিত্র 6.9)। এছাড়া কিছু অতিরিক্ত ট্রান্সক্রিপশান নিয়ন্ত্রণকারী সজ্জাক্রম প্রমোটার অঞ্চল থেকে আরও কিছুটা দূরে আপস্ট্রিম বা ডাউনস্ট্রিমে থাকতে পারে। জিনের প্রকাশ (Gene Expression) নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বলার সময় এই সজ্জাক্রমগুলোর কিছু ধর্ম আলোচনা করা হবে।

6.5.2 ট্রান্সক্রিপশান একক এবং জিন (Transcription Unit and the Gene)

জিনকে বংশগতির কার্যকরী একক রূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যদিও এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে জিনগুলো DNA তে অবস্থান করে তবুও DNA সজ্জাক্রমের মাধ্যমে একটি জিন আক্ষরিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন।

tRNA বা rRNA অণুর সংশ্লেষের বার্তা বহনকারী DNA সজ্জাক্রমটিকেও একটি জিনরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে একটি পলিপেপটাইড সংশ্লেষের সংকেতবহনকারী DNA এর একটি খন্ডক রূপে একটি সিস্ট্রনকে সংজ্ঞায়িত করলে, একটি ট্রান্সক্রিপশান এককস্থিত গাঠনিক জিনটিকে মনোসিস্ট্রোনিক (প্রধানত ইউক্যারিওটিক জীবে) বা পলিসিস্ট্রোনিক (প্রধানত ব্যাকটেরিয়া বা প্রোক্যারিওটিক জীবে) বলা যেতে পারে। ইউক্যারিওটিক জীবে মনোসিস্ট্রোনিক গাঠনিক জিনগুলোতে খন্ডিত কোডিং সজ্জাক্রম রয়েছে অর্থাৎ ইউক্যারিওটিক জীবে জিনগুলো খন্ডিত থাকে। কোডিং সজ্জাক্রম বা প্রকাশিত সজ্জাক্রমগুলোকে এক্সন রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এক্সন বলতে সেই সজ্জাক্রমগুলোকে বোঝায় যেগুলো পরিণত বা প্রক্রিয়াজাত RNA তে দেখা যায়। এক্সনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ইনট্রন সজ্জাক্রম থাকে। ইন্ট্রন বা দুটি এক্সনের মধ্যবর্তী সজ্জাক্রমগুলোকে পরিণত বা প্রক্রিয়াজাত RNA তে দেখা যায়। খন্ডিত জিন ব্যবস্থা (Split gene arrangement) একটি DNA খন্ডকরূপে একটি জিনের সংজ্ঞাকে আরও জটিল করে তোলে।

একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ, একটি গাঠনিক জিনের প্রমোটার এবং নিয়ন্ত্রণকারী সজ্জাক্রম দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তাই মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণকারী সজ্জাক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী জিনরূপেও সংজ্ঞায়িত করা হয়, যদিও এই সজ্জাক্রমগুলো কোনো RNA বা প্রোটিনের সংকেত বহন করে না।

6.5.3 RNA এর প্রকারভেদ এবং ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়া (Types of RNA and the process of Transcription)

ব্যকটেরিয়াতে, প্রধান তিন ধরনের RNA দেখা যায়, এগুলো হল mRNA (বার্তাবহ অর্থাৎ মেসেঞ্জার RNA), tRNA (ট্রান্সফার RNA) এবং rRNA (রাইবোজোমাল RNA) একটি কোশে প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য এসব RNA গুলোর প্রয়োজন হয়। প্রোটিন সংশ্লেষকালে mRNA টেমপ্লেট হিসাবে কাজ করে, tRNA প্রোটিন সংশ্লেষ স্থানে অ্যামাইনো অ্যাসিড আনয়ন করে এবং rRNA গাঠনিক ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাকটেরিয়াতে সব ধরনের RNA সংশ্লেষে অনুঘটকের কাজ করার জন্য একটি মাত্র DNA নির্ভর RNA পলিমারেজ রয়েছে। RNA পলিমারেজ ইৎসেচকটি প্রমোটার অঞ্চলে যুক্ত হয় এবং ট্রান্সক্রিপশানের সূচনা (প্রারম্ভিক দশা) করে। এই উৎসেচকটি নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেটগুলোকে সাবস্ট্রেট হিসাবে ব্যবহার করে এবং পরিপূরকতার নীতি অনুসরণ করে, একটি টেমপ্লেট নির্ভর ফ্যাশনে নিউক্লিওটাইডগুলোর পলিমার অর্থাৎ RNA তন্তু গঠন করে।

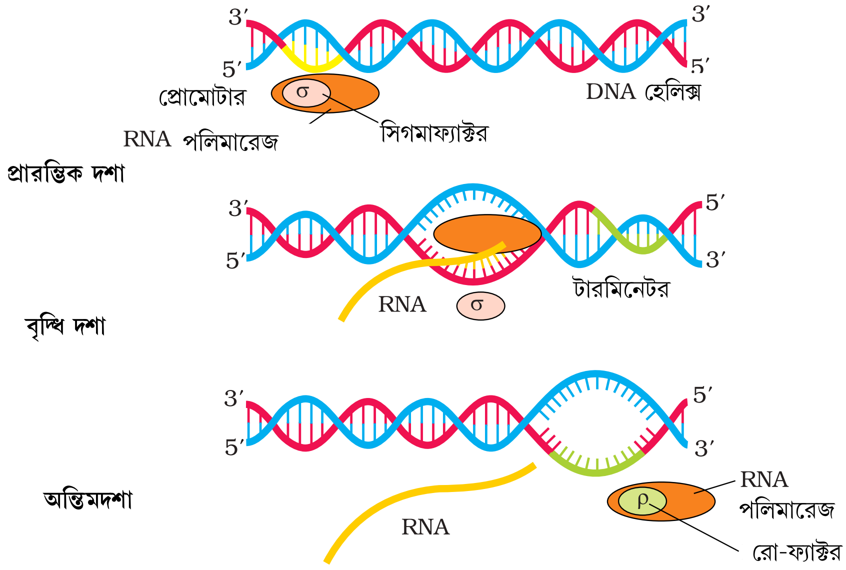

চিত্র 6.10 ব্যাকটিরিয়াতে ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়া

কোনো না কোনোভাবে এই উৎসেচকটি DNA এর দ্বিতন্ত্রী গঠনটি খুলতে এবং বৃদ্ধি দশা চালাতে ও সাহায্য করে। কেবলমাত্র RNA এর একটি ক্ষুদ্র খন্ডক উৎসেচকের সাথে যুক্ত অবস্থায় থেকে যায়। যে মুহূর্তে পলিমারেজ উৎসেচকটি DNA এর টারমিনেটার অঞ্চলে পৌঁছায়, জায়মান RNA খন্ডকটি খসে পড়ে যায় এবং RNA এর পলিমারেজ উৎসেচকটিও আলাদা হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে ট্রান্সক্রিপশানের সমাপ্তি ঘটে।

এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি চিন্তার উদ্রেক ঘটায় সেটি হল কীভাবে RNA পলিমারেজ উৎসেচক ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার তিনটিধাপ অর্থাৎ প্রারম্ভিক দশা (initiation) বৃদ্ধি দশা (elongation) এবং সমাপ্তি দশা (termination) এর সবকয়টিতে অনুঘটকের কাজ করতে সমর্থ হয়। কেবলমাত্র RNA পলিমারেজ উৎসেচকই ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি দশায় অনুঘটকের কাজ করতে পারে। এই উৎসেচকটি অস্থায়ীভাবে প্রাথমিক ফ্যাক্টর অর্থাৎ ইনিসিয়েশান ফ্যাক্টর (σ) এবং অন্তিম ফ্যাক্টর অর্থাৎ টারমিনেশান ফ্যাক্টর (ρ) এর সাথে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার সূচনা এবং সমাপ্তি ঘটায়। এই ফ্যাক্টরগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার সূচনা বা সমাপ্তির জন্য RNA পলিমারেজ উৎসেচক-নির্দিষ্টতার পরিবর্তন ঘটে (চিত্র 6.10)

ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু mRNA এর সক্রিয় হওয়ার জন্য তার কোনো ধরনের প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এবং যেহেতু একই অঞ্চলে ট্রান্সক্রিপশান ও ট্রান্সলেশান উভয় প্রক্রিয়াই সংঘটিত হয় (ব্যাকটেরিয়া কোশে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে পৃথকীকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই), কাজেই ব্যাকটেরিয়া কোশে ট্রান্সক্রিপশান ও ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়াদ্বয় মিলিতভাবে ঘটতে পারে। ইউক্যারিওটিক কোশে আরও দুটি অতিরিক্ত জটিল গঠন দেখা যায় —

i) নিউক্লিয়াসে কমপক্ষে 3 টি RNA পলিমারেজ উৎসেচক থাকে (কোশীয় অঙ্গাণুতে উপস্থিত RNA পলিমারেজ উৎসেচক ছাড়াও) এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শ্রম বিভাজন দেখা যায়। RNA পলিমারেজ

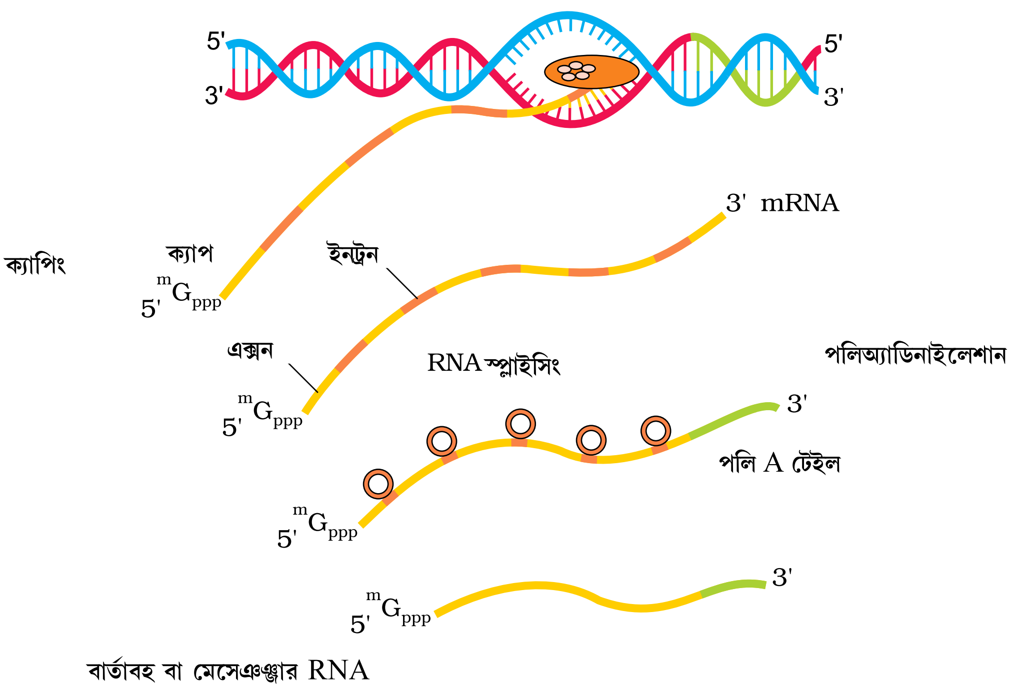

চিত্র 6.11 ইউক্যারিওটিক জীবে ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়া

I রাইবোজোমাল RNA অর্থাৎ rRNA (28s, 18s এবং 5.8s) এবং RNA পলিমারেজ III tRNA, 5srRNA এবং snRNAs (Small nuclear RNA, অর্থাৎ ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস RNA) এর সংশ্লেষ ঘটায়। RNA পলিমারেজ II mRNA বা মেসেঞ্জার RNA এর আদি রূপটি অর্থাৎ হেটারোজেনাস নিউক্লিয়ার RNA (hnRNA) এর সংশ্লেষ ঘটায়।

ii) দ্বিতীয় জটিলতাটি হল এই যে, ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন প্রাথমিক RNA (Primary transcript) তে ইনট্রন ও এক্সন উভয়ই বর্তমান থাকে এবং তাই এটি অকার্যকরী হয়। তাই এই RNA এর স্প্লাইসিং ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ায় ইনট্রন অংশগুলোর অপসারণ ঘটে এবং এক্সনগুলো একটি নির্দিষ্ট ক্রমে যুক্ত হয়। hrRNA এর অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণ ঘটে এবং এদের ক্যাপিং (Capping) ও টেইলিং (tailing) বলে। ক্যাপিং এ একটি অস্বাভাবিক নিউক্লিওটাইড (মিথাইলগুয়ানোসিন ট্রাই ফসফেট) hnRNA এর 5' প্রান্তে যুক্ত হয়। টেইলিং এ অ্যাডিলাইলেট অবশেষগুলো (200-300) একটি টেমপ্লেট নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে hnRNA এর 3' প্রান্তে যুক্ত হয়। এটি হল সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াজাত বা পরিবর্তিত hnRNA এবং এখন এটিকে mRNA বলা হয়। এরপর এই mRNA টি ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়ার জন্য নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে পরিবাহিত হয় (চিত্র 6.11)।

এই ধরনের জটিলতার তাৎপর্য এখন আমরা বুঝতে শুরু করেছি। খন্ডিত-জিন সজ্জাক্রম (Split-gene arrangements) টি সম্ভবত জিনোমের আদি বৈশিষ্ট্যটিকে উপস্থাপন করে। ইনট্রনসমূহের উপস্থিতি হল অনাদিকালের স্মারক এবং স্প্লাইসিং প্রক্রিয়াটি RNA বিশ্ব (RNA World) এর আধিপত্যকে উপস্থাপন করে। বর্তমান দিনে, সজীববস্তুতে সংঘটিত RNA এবং RNA নির্ভর প্রক্রিয়াগুলোর বোধগম্যতা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে।

6.6 জেনেটিক কোড (Genetic Code)

প্রতিলিপিকরণ (replication) এবং ট্রান্সক্রিপশান কালে অপর একটিনিউক্লিক অ্যাসিড তৈরির জন্য একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুলিপি তৈরি হয়েছিল। তাই পরিপূরকতার ভিত্তিতে (On the basis of complementarity) এই প্রক্রিয়াগুলোকে সহজেই বোঝা যায়। ট্রান্সলোকেশন প্রক্রিয়ার জন্য একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার গঠন করতে নিউক্লিওটাইডের পলিমার থেকে জিনগত বার্তার স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়। নিউক্লিওটাইডসমূহ ও অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে যেমন কোনো পরিপূরকতার অস্তিত্ব নেই তেমনি তত্ত্বগত দিক থেকেও এমনটা ভাবা যায় না। তবে এই মতের স্বপক্ষে এমন বহু প্রমাণ রয়েছে যে প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তনের জন্য নিউক্লিক অ্যাসিড (জিনগত বস্তু) এর পরিবর্তন দায়ী। এর ফলশ্রুতিতেই জেনেটিক কোড প্রস্তাবিত হয় যার নির্দেশে প্রোটিন সংশ্লেষকালে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম নির্ধারিত হয়।

যদি জিনগত বস্তুর জৈব রাসায়নিক প্রকৃতিএবং DNA এর গঠন নির্ধারণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয় তবে জেনেটিক কোডের প্রস্তাব এবং এর পাঠোদ্ধার অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রকৃত অর্থে এর জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। এই বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে — পদার্থবিদ, জৈব রসায়নবিদ, প্রাণরসায়নবিদ এবং জিনতত্ত্ববিদ। পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো (George Gamow) ই সর্বপ্রথম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, যেহেতু নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে 4 টি বেস রয়েছে এবং যদি তাদের 20 টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করতে হয় তবে কোডকে নাইট্রোজেন বেস এর সংশ্রিণে গঠিত হতে হবে। তিনি এই প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, 20 টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সব কয়টি সংকেত বহন করার জন্য প্রতিটি কোডকে তিনটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত হতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত সাহসী প্রস্তাব ছিল কারণ 4^3 (4 x 4 x 4) এর বিন্যাস ও সমাবেশ 64 টি কোডন সৃষ্টি করবে অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কোডনের সৃষ্টি হবে।

কোডন যে একটি ট্রিপ্লেট বা ত্রয়ী সজ্জাক্রম তার স্বপক্ষে প্রমাণ যোগাড় করা একটি অধিকতর কঠিন কাজ।

হর গোবিন্দ খোরানা প্রবর্তিত রাসায়নিক পদ্ধতিটি ছিল নাইট্রোজেন বেসের সংজ্ঞায়িত সংমিশ্রণ (হোমোপলিমার এবং সহ পলিমার) সহ RNA অনুর সংশ্লেষের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রেখেছিল। প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য মার্শাল নিরেনবার্গ (Marshall Nirenberg) এর কোশমুক্ত পরিবেশ অবশেষে কোডের পাঠোদ্ধারে সহায়তা করেছিল। সেভেরো অকোহা (Severo Ochoa) উৎসেচক (পলিনিউক্লিওটাইট ফসফোরাইলেজ) একটি টেমপ্লেট নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে (উৎসেচকের সাহায্যে RNA এর সংশ্লেষ)। সংজ্ঞায়িত সজ্জাক্রম সহ RNA পলিমার সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। অবশেষে জেনেটিক কোডের জন্য একটি চেকার-বোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে যা সারণি 6.1 এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 6.1 বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য কোডন সমূহ

প্রথম অবস্থান	দ্বিতীয় অবস্থান: U	দ্বিতীয় অবস্থান: C	দ্বিতীয় অবস্থান: A	দ্বিতীয় অবস্থান: G	তৃতীয় অবস্থান
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA Stop	UGA Stop	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG Stop	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G

জেনেটিক কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ—

i) কোডন ত্রয়ী সজ্জাক্রম বিশিষ্ট, 61 টি কোডন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে এবং তিনটি কোডন কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে না, তাই এরা সমাপ্তি কোডন রূপে কাজ করে।

ii) কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত একাধিক কোডন বহন করে এবং তাই জেনেটিক কোডকে ডিজেনারেট (degenerate) বলে।

iii) m-RNA স্থিত কোডনগুলোকে লাগাতর পড়ে যেতে হয়। কোডনগুলোর মধ্যে কোন বিরতি থাকে না।

iv) জেনেটিক কোড প্রায় সার্বজনীন হয় (Universal); উদাহরণস্বরূপ ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সব ধরনের জীবে UUU কোডন ফিনাইল অ্যালানিনের (Phe) সংকেত বহন করে। এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম মাইটোকনড্রিয়ায় পাওয়া যায় এমন কোডগুলোতে, ও কিছু প্রোটোজোয়ায় দেখা যায়।

v) AUG কোডন দুই ধরনের কাজ করে। এটি মিথিওনিনের (met) সংকেত বহন করে এবং প্রারম্ভিক কোডন হিসাবেও কাজ করে।

vi) UAA, UAG, UGA হল সমাপ্তি কোডন (termination codon)। m-RNA স্থিত নিউক্লিওটাইড সমূহের সজ্জাক্রম নিম্নরূপ হলে এগুলো যে ক্রমে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করবে তা উল্লেখ কর (এর জন্য চেকার বোর্ডের সাহায্য নাও) ঃ

-AUG UUU UUC UUC UUU UUU UUC-

এখন বিপরীতভাবে চেষ্টা কর। নিম্নলিখিতটি হল m-RNA র সংকেত অনুযায়ী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম। এর উপরভিত্তি করে m-RNA তে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম কিরূপ হবে তা লিখ।

Met-Phe-Phe-Phe-Phe-Phe

বিপরীতভাবে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম লিখতে গিয়ে তোমরা কী কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছো?

জেনেটিক কোডের যে দুটি ধর্ম তোমরা শিখেছো সেই দুটি ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে কি?

6.6.1 পরিব্যক্তি এবং জেনেটিক কোড (Mutation and Genetic Code)

পরিব্যক্তি অধ্যয়নের মাধ্যমে জিন এবং DNA এর মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে তোমরা পরিব্যক্তি এবং এর প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছো। একটি DNA খন্ডকে বৃহৎ ডিলিশান এবং পুনর্বিন্যাস এর প্রভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

এর ফলে একটি জিনের কিছু অংশ অপসারিত হতে পারে বা জিনটির সাথে কিছু অংশ যুক্ত হতে পারে এবং এর ফলে এর কাজের পরিবর্তন ঘটে। এখানে পয়েন্ট মিউটেশনের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করা হবে। পয়েন্ট মিউটেশানের একটি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল β গ্লোবিল শৃঙ্খল তৈরির জন্য দায়ী জিনের একটি বেসযুগ্মের পরিবর্তন। এই মিউটেশানের ফলে β গ্লোবিন শৃঙ্খলে গ্লুটামিক অ্যাসিডটি ভ্যালিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই কারণে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে সিক্ল্ সেল অ্যানিমিয়া বলে। পয়েন্ট মিউটেশানের প্রভাব, যার ফলে গাঠনিক জিনে নাইট্রোজেন বেসের সংযোজন ঘটে বা ওই জিন থেকে নাইট্রোজেন বেসের অপসারণ ঘটে তা নিম্নলিখিত সরল উদাহরণগুলোর সাহায্যে ভালোভাবে বোঝা যায়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলো নিয়ে গঠিত একটি বিবৃতির কথা চিন্তা কর যেখানে প্রতিটি শব্দ জেনেটিক কোডের মতো তিনটি অক্ষর সমন্বিত।

RAM HAS RED CAP

যদি আমরা HAS এবং RED এর মাঝে B অক্ষরটিকে ঢুকিয়ে দিই এবং বিবৃতিটির পুনর্বিন্যাস করি এটি পড়তে নিম্নরূপ হবে।

RAM HAS BRE DCA P

একইভাবে, যদি আমরা একই স্থানে দুটি অক্ষরকে ঢুকিয়ে দিই, ধরি BI, তবে এখন এই বিবৃতিটিকে পড়লে তা নিম্নরূপ হবে।

RAM HAS BIR EDC AP

এখন আমরা যদি একই স্থানে তিনটি শব্দ একই সাথে ঢুকিয়ে দিই, ধরি BIG, তবে বিবৃতিটিকে পড়লে তা নিম্নরূপ হবে।

RAM HAS BIG RED CAP

এইবার প্রথমে উল্লিখিত বিবৃতিটি থেকে R, E এবং D অক্ষরগুলোকে একটির পর একটি এই হিসাবে অপসারণ করে একটি ত্রয়ী শব্দের তৈরির জন্য বিবৃতিটির পুনর্বিন্যাস করার জন্য এই কাজটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো যেতে পারে।

RAM HAS EDC AP

RAM HAS DCA P

RAM HAS CAP

উপরোক্ত কাজটি থেকে একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়। একটি বা দুটি নাইট্রোজেন বেসের সংযোজন বা অপসারণ জিনের যে স্থানে এই সংযোজন বা অপসারণ ঘটেছে সেই স্থান থেকে জিনের পঠন কাঠামোর (Reading frame) পরিবর্তন ঘটায়।

তাই এই ধরনের পরিব্যক্তি বা মিউটেশানকে ফ্রেম শিফ্‌ট ইনসারশান (Frame Shift insertion) বাডিলিশান মিউটেশান (Deletion Mutation) বলে। নাইট্রোজেন বেস সজ্জাক্রমে তিন অথবা তিন এর গুণিতকের বেসসমূহের সংযোজন বা অপসারণ ঘটলে একটি অথবা বহু কোডনের সংযোজন বা অপসারণ ঘটে, তাই এক বা বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযোজন বা অপসারণ হয় এবং যে স্থানে এই অপসারণ বা সংযোজন ঘটেছে সেই স্থান থেকে শুরু করে নাইট্রোজেন বেসের পঠন কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে।

6.6.2 tRNA the Adapter Molecule

জেনেটিক কোড প্রস্তাবনার একেবারে শুরু থেকেই ফ্রান্সিস ক্রিক (Franchis Crick) এর কাছে এটি স্পষ্ট ছিল যে এই কোডের পঠন এবং একে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যও একটি পদ্ধতি অবশ্যই রয়েছে কারণ জেনেটিক কোডগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে পঠনের জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর এমন কোনো গঠনগত বিশেষত্ব নেই। তিনি একটি অ্যাডপটার অণুর উপস্থিতি ধরে নিয়েছিলেন যা একদিকে যেমন জেনেটিক কোড পঠনে সহায়ক হবে এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। জেনেটিক কোড প্রস্তাবনার পূর্বে tRNA, sRNA (Soluble RNA) নামে পরিচিত ছিল। তবে অ্যাডপটার অণু হিসাবে এর ভূমিকা বহু পরে জানা গিয়েছিল। tRNA এর একটি অ্যান্টিকোডন লুপ রয়েছে যাতে উপস্থিত বেসগুলো কোনো একটি কোডনের পরিপূরক হয় এবং এতে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রাহক প্রান্তও রয়েছে যার সাহায্যে tRNAটি অ্যামাইনো অ্যাসিড সমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য সুনির্দিষ্ট tRNA রয়েছে (চিত্র 6.12)। ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অপর একটি নির্দিষ্ট tRNA রয়েছে যাকে প্রারম্ভিক tRNA (initiatortRNA) বলে। সমাপ্তি কোডনের (Stop codon) সনাক্তকরণের জন্য কোনো tRNA থাকে না। চিত্র 6.12 তে tRNA এর গৌণ বা সেকেন্ডারি গঠনের চিত্র দেওয়া আছে যা লবঙ্গ পাতা বা ক্লোভার-লিফ (clover leaf) সদৃশ হয়, প্রকৃত গঠনে tRNA একটি সুসংহত অণু যা দেখতে উল্টানো L এর মতো হয়।

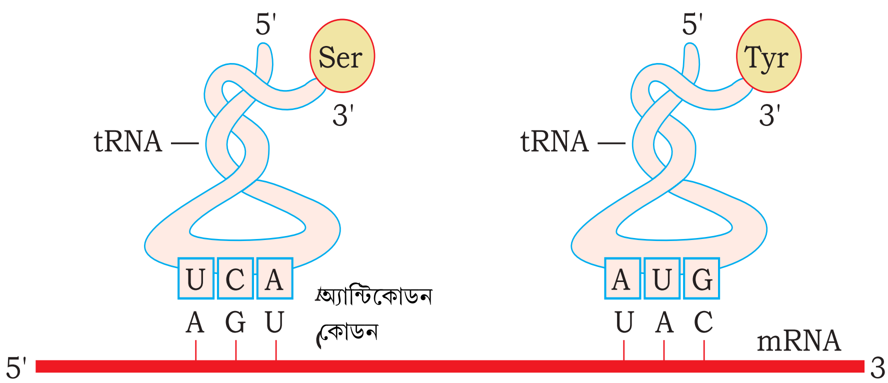

চিত্র 6.12 tRNA অ্যাডাপটার অণু

6.7 ট্রান্সলেশান (Translation)

ট্রান্সলেশান বলতে একটি পলিপেপটাইড তৈরির জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহের পলিমার গঠনের প্রক্রিয়া (পলিমারাইজেশন) কে বোঝায় (চিত্র 6.13)। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর বিন্যাস এবং সজ্জাক্রম m-RNA স্থিত বেস সমূহের সজ্জাক্রম দ্বারা নির্ধারিত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যে বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে পেপটাইড বন্ধনী বলে। একটি পেপটাইড বন্ধনী গঠনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই ট্রান্সলেশানের প্রথম দশাতেই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো ATP অনুর উপস্থিতিতে সক্রিয় হয় ও এরা এদের সাথে সম্পর্কিত (Cognate) tRNA এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে সাধারণত tRNA সক্রিয়করণ (Charging of tRNA) অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে tRNAএর অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশান (aminoacylation) বলে। এরূপ দুটি সক্রিয় (Charged) tRNA কে যদি যথেষ্ট কাছাকাছি আনা হয় তবে শক্তির সাহায্যে এদের মধ্যে পেপটাইড বন্ধনী গঠিত হবে। অনুঘটকের উপস্থিতি পেপটাইড বন্ধনী গঠনের হারকে ত্বরান্বিত করবে।

প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য দায়ী কোশীয় কারখানাটি হল রাইবোজোম। রাইবোজোম গাঠনিক RNA সমূহ (Structural RNA) এবং 80 টি (eighty) বিভিন্ন প্রোটিন সমন্বিত হয়। রাইবোজোম, এর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দুটি অধঃএকক রূপে অবস্থান করে। একটি বড় অধঃএকক এবং একটি ছোটো অধঃ একক। যখন রাইবোজোমের ছোটো অধঃএককটি একটি mRNA এর সংস্পর্শে আসে তখন mRNA থেকে এর প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। রাইবোজোমে পরবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যুক্ত হওয়ার জন্য এবং একটি পেপটাইড বন্ধনী গঠনের জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যাতে পরস্পর যথেষ্ট কাছাকাছি থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে রাইবোজোমের বড় অধঃএককটিতে দুটি অঞ্চল রয়েছে। একটি পেপটাইড বন্ধনী গঠনের জন্য রাইবোজোম একটি অনুঘটক (ব্যাকটিরিয়াতে 23SrRNA হল একটি উৎসেচক- রাইবোজাইম) রূপেও কাজ করে।

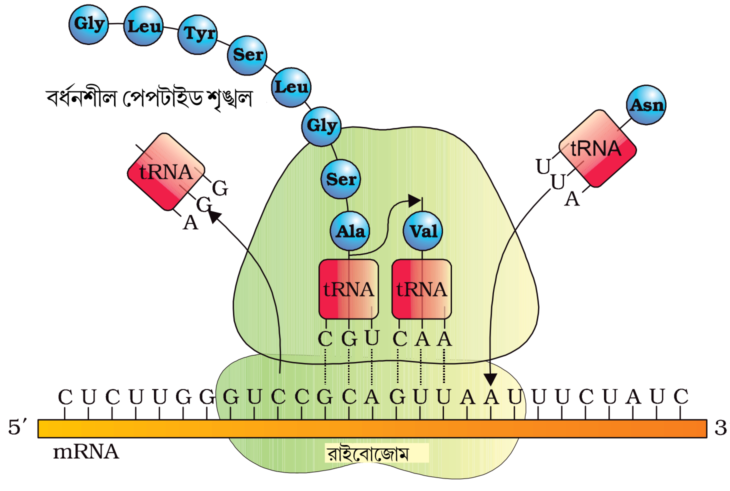

চিত্র 6.13 ট্রান্সলেশন

mRNA স্থিত ট্রান্সলেশান এককটি (Translational Unit) হল RNA এর এমন একটি সজ্জাক্রম যার একটি প্রান্তে প্রারম্ভিক কোডন (AUG) ও অপর প্রান্তে সমাপ্তি কোডন থাকে এবং যা পলিপেপটাইড তৈরির সংকেত বহন করে। একটি mRNA তে কিছু অতিরিক্ত সজ্জাক্রমও থাকে যাদের ট্রান্সলেশান হয় না এবং এগুলো আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন [Untranslated regions (UTR)] বলে। এই UTRগুলো mRNA এর 5' প্রান্ত (প্রারম্ভিক কোডনের পূর্বে) এবং 3′ প্রান্ত (সমাপ্তি কোডনের পরে) অর্থাৎ উভয় প্রান্তে অবস্থান করে। এগুলো কার্যকরীভাবে ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রয়োজন হয়। ট্রান্সলেশানের সূচনা দশা আরম্ভ হওয়ার জন্য রাইবোজোম mRNA স্থিত প্রারম্ভিক কোডন (Start codon-AUG) এর সাথে যুক্ত হয় এবং এই প্রারম্ভিক কোডনটিকে কেবলমাত্র প্রারম্ভিক tRNA (initiator tRNA) সনাক্ত করতে পারে। রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষের বৃদ্ধি দশার (Elangation phase) দিকে অগ্রসর হয়। এই দশা চলাকালে tRNA এর সাথে যুক্ত একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড সমন্বিত জোট tRNA স্থিত অ্যান্টিকোডনের সাথে পরিপূরক বেস যুগ্মগঠন করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে mRNA স্থিত যথাযথ কোডনের সঙ্গে যুক্ত হয়। রাইবোজোমটি mRNA এর দৈর্ঘ্য বরাবর কোডন থেকে কোডনে চলতে শুরু করে। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো একের পর এক যুক্ত হতে থাকে এবং DNA এর নির্দেশ ক্রমে এবং mRNA দ্বারা উপস্থাপিত হয়েপলিপেপাটাইড শৃঙ্খলের সংশ্লেষ ঘটায়। সব শেষে একটি রিলিজ ফ্যাক্টর সমাপ্তি কোডনের সাথে যুক্ত হয়, এর ফলে ট্রান্সলেশানের সমাপ্তি ঘটে এবং রাইবোজোম থেকে সম্পূর্ণ পলিপেপটাইডটি বেরিয়ে আসে।

6.8 জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Gene Expression)

জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ বলতে একটি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়কে বোঝায় যা বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত হতে পারে। যদি জিনের প্রকাশের ফলশ্রুতিতে একটি পলিপেপটাইড গঠিত হয় তবে এটিকে বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। ইউক্যারিওটিক জীবে, এই নিয়ন্ত্রন নিম্নলিখিত স্তর সমূহে প্রয়োগ করা যেতে পারে —

i) ট্রান্সক্রিপশান স্তর (প্রাথমিক ট্রান্সক্রিপ্ট গঠন)
ii) প্রক্রিয়াকরণ স্তর বা প্রসেসিং স্তর (স্প্লাইসিং এর নিয়ন্ত্রণ)
iii) নিউক্লিয়াস থেকেসাইটো প্লাজমে mRNAএর স্থানান্তরণ
iv) ট্রান্সলেশান স্তর।

একটি কোশে একটি নির্দিষ্ট কাজ বা একগুচ্ছ কাজ সম্পাদনের জন্য জিনের প্রকাশ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, E. coli ব্যাকটেরিয়াতে সংশ্লেষিত β গ্যালাক্টোসাইডেজ নামক উৎসেচকটি দ্বিশর্করা ল্যাকটোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটিয়ে গ্যালাকটোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাকটিরিয়া এদের (গ্যালকটোজ ও গ্লুকোজ) শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। তাই, যদি ব্যাকটেরিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ল্যাকটোজ না থাকে তবে সেক্ষেত্রে এদের β গ্যালাকটোসাইডেজ উৎসেচক সংশ্লেষের প্রয়োজন হয় না। তাই সহজ ভাষায় এটি হল একটি বিপাকীয়, শারীরবৃত্তীয় অথবা পরিবেশীয় অবস্থা যা জিন সমূহের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণকরে। বিভিন্ন প্রকার জিনগুচ্ছের (Sets of gene) প্রকাশের সমন্বয়িত নিয়ন্ত্রণের ফলেই ভ্রূণ বিকশিত ও বিভেদিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়।

ট্রান্সক্রিপশনের প্রারম্ভিক দশার হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মুখ্যত জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একটি ট্রান্সক্রিপশান এককে প্রদত্ত প্রমোটারে RNAপলিমারেজ এর ক্রিয়াকলাপ আবার আনুষঙ্গিক প্রোটিন সমূহের সঙ্গে এর আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ট্রান্সক্রিপশান এককের প্রারম্ভিক স্থানের সনাক্তকরণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এই নিয়ন্ত্রক প্রোটিনগুলো ধনাত্মক (সক্রিয়ক) এবং ঋনাত্মক (প্রতিরোধক) উভয় রূপে কাজ করতে পারে। বহুক্ষেত্রে প্রোক্যারিওটিক DNA-এর প্রোমোটার অঞ্চলের লভ্যতা প্রোটিন সমূহের সঙ্গে DNAএর সজ্জাক্রমের আন্তঃক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই সজ্জাক্রমটিকে অপারেটর বলে। বেশির ভাগ ওপেরনে প্রোমোটার স্থান সংলগ্ন অপারেটর অঞ্চলটি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেটরের সজ্জাক্রমটি একটি রিপ্রেসার প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়। প্রতিটি ওপেরনে একটি নির্দিষ্ট অপারেটর এবং নির্দিষ্ট রিপ্রেসর আছে। উদাহরণ স্বরূপ ল্যাক অপারেটর কেবলমাত্র ল্যাক ওপেরনেই থাকে এবং এটি কেবল মাত্র ল্যাক রিপ্রেসর এর সঙ্গেই আন্তঃক্রিয়া করে।

6.8.1 ল্যাক ওপেরন (The *Lac* Operon)

সুপ্রজননবিদ Francois Jacob ও জৈব রসায়নবিদ Jacque Monod এর মধ্যে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার ফলশ্রুতিতেই ল্যাক ওপেরন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এরাই সর্বপ্রথম একটি ট্রান্সক্রিপশান স্তরে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। একটি ল্যাক ওপেরনে (এখানে Lac বলতে ল্যাকটোজকে বোঝানো হয়েছে) একটি বহু সিস্ট্রন বিশিষ্ট (Poly cistronic) গাঠনিক জিন (Structural gene) একটি সাধারণ প্রমোটার (Promoter) এবং নিয়ন্ত্রক জিন (regulatory gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাকটেরিয়া কোশে এই রূপ বিন্যাস প্রায়ই দেখা যায় এবং একে ওপেরন (Operon) বলে। এইরূপ কিছু ওপেরনের উদাহরণ হল — ল্যাক ওপেরন (Lac Operon), ট্রিপ ওপেরন (trp operon), অ্যারা ওপেরন (ara operon), হিস ওপেরন (his Operon), ভ্যাল ওপেরন (Val Operon) ইত্যাদি।

ল্যাক ওপেরন (Lac Operon) একটি নিয়ন্ত্রক জিন (i জিন- এক্ষেত্রে i পরিভাষাটি inducer কে বোঝায় না, এটি প্রকৃতপক্ষে inhibitor শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে) এবং 3 (three) টি গাঠনিক জিন (z, y বং a) নিয়ে গঠিত। ল্যাক ওপেরনের i জিনটি রিপ্রেসর প্রোটিনের সংকেত বহন করে। Z জিন β গ্যালাকটোসাইডেজ (β gal) উৎসেচকের সংকেত বহন করে যা প্রাথমিকভাবে দ্বিশর্করা ল্যাকটোজের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে এটিকে ল্যাকটোজের মনোমারিক (monomeric) একক গ্যালাকটোজ এবং গ্লুকোজে পরিণত করে। y জিন পারমিয়েজ উৎসেচকের সংকেত বহন করে যা কোশে β গ্যালাকটোসাইডেজ উৎসচেকের ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়। α জিনটি ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ উৎসেচকের সংকেত বহন করে। তাই ল্যাকটোজ বিপাকের জন্য ল্যাক ওপেরন স্থিত তিনটি জিনের প্রভাবে উৎপন্ন সব বস্তুর প্রয়োজন হয়। অন্য অধিকাংশ ওপেরনের ক্ষেত্রে ও একই অথবা এর সাথে সম্পর্কিত বিপাকীয় পথগুলো চালানোর জন্য ওপেরন স্থিত জিন গুলোর একত্রে কাজ করা প্রয়োজন (চিত্র 6.14)

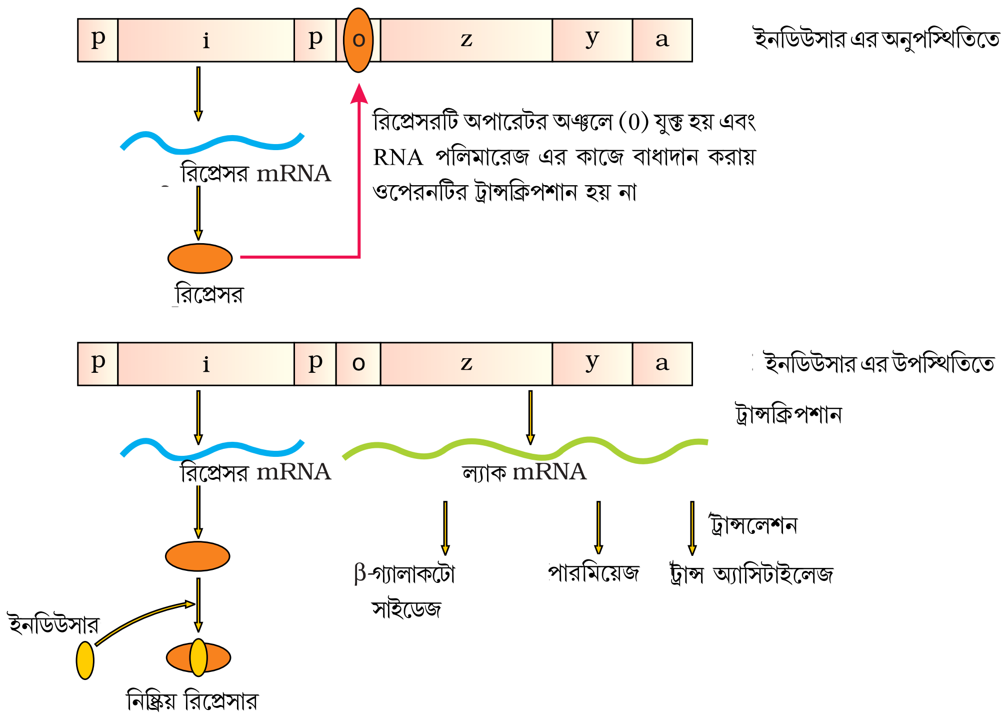

চিত্র 6.14 ল্যাক ওপেরন

β গ্যালাকটোসাইডেজ উৎসেচকের সাবস্ট্রেটটি হল ল্যাকটোজ এবং এটি ওপেনের চালু হওয়া (Switching on) এবং বন্ধ হওয়া (Switching off) নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এক্ষেত্রে ল্যাকটোজকে ইনডিউসার (inducer) বলা হয়। গ্লুকোজের মত পছন্দসই কার্বন উৎসের অনুপস্থিতিতে যদি ব্যাকটেরিয়ার পালন মাধ্যমে ল্যাকটোজ দেওয়া হয় তবে পারমিয়েজ (Permease) উৎসেচকের ক্রিয়ার মাধ্যমে ল্যাকটোজ ব্যাকটেরিয়া কোশে প্রবেশ করে (মনে রেখো কোশে সর্বদাই খুব অল্প মাত্রায় হলেও ল্যাকওপেরনকে সক্রিয় থাকতে হবে না হলে কোশে ল্যাকটোজ প্রবেশ করতে পারবে না)। এরপর ল্যাকটোজ ওপেরনকে নিম্নলিখিতভাবে উদ্দীপিত করে।

ওপেরনে রিপ্রেসার প্রোটিনটি i জিন থেকে সংশ্লেষিত হয় (All the time constitutively - সর্বদাই গঠনগতভাবে মৌলিক প্রকৃতির)।

রিপ্রেসার প্রোটিনটি ওপেরনের অপারেটার অঞ্চলে যুক্ত হয় এবং RNA পলিমারেজ উৎসেচকের কাজে বাধাদান করে এবং এরফলে ওপেরনটির ট্রান্সক্রিপশন ঘটে না। ল্যাকটোজ অথবা অ্যালোল্যাকটোজের মত ইনডিউসার (inducer) উপস্থিতিতে রিপ্রেসার প্রোটিনটি ইনডিউসারের সহিত আন্তঃক্রিয়ার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর ফলে RNA পলিমারেজটি প্রোমোটার অঞ্চলে যুক্ত হতে পারে এবং ট্রান্সক্রিপশান শুরু হয় (চিত্র 6.14)। আবশ্যিকভাবে ল্যাকওপেরনের নিয়ন্ত্রণকে কোনো উৎসেচকের সাবস্ট্রেটের দ্বারা সেই উৎসেচক সংশ্লেষের নিয়ন্ত্রণ হিসাবেও দেখা যেতে পারে।

মনে রেখো ল্যাকটোজ ওপেরনের জন্য গ্লুকোজ অথবা গ্যালাকটোজ ইডিউসার হিসাবে কাজ করতে পারে না। তোমরা কি ভাবতে পার ল্যাকটোজের উপস্থিতিতে ল্যাক ওপেরনটি কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে? রিপ্রেসারের দ্বারা ল্যাকওপেরনের নিয়ন্ত্রণকে ঋণাত্মক নিয়ন্ত্রণ (negative regulation) হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ল্যাক ওপেরন ধনাত্মক নিয়ন্ত্রণের (Positive regulation) নিয়ন্ত্রণাধীনও হয় কিন্তু এই স্তরে এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই।

6.9 হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (Human Geneme Project)

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে তোমরা শিখেছো যে DNA স্থিত বেস এর সজ্জাক্রম প্রদত্ত জীবের জিনগত বার্তা নির্ধারণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো জীবের বা একক জীবের জিনগত গঠন DNA সজ্জা ক্রমেই নিহিত থাকে। যদি দুটি একক জীবে পার্থক্য থাকে তবে এদের DNA সজ্জাক্রমের অন্তত কিছু স্থানে হলেও পার্থক্য / ভিন্নতা থাকবে। এই ধরাণাগুলোর ফলশ্রুতিতে মানুষের জিনোমের সম্পূর্ণ DNA সজ্জাক্রমটি খুঁজে বের করার কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল। জিনগত প্রযুক্তি কৌশল সমূহের (genetic engineering techniques) বিকাশের ফলে DNA এর যেকোনো একটি খন্ডককে পৃথক করা ও এর ক্লোন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল এবং DNA সজ্জাক্রম নির্ধারণের জন্য একটি সরল ও দ্রুত কাজ করার উপযোগী কৌশল সহজলভ্য হওয়ায় 1990 সালে হিউম্যান জিনোম সিকোয়েন্সিং এর জন্য একটি অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প শুরু হয়েছিল।

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টটি (HGP) ছিল একটি বৃহৎ প্রকল্প। যদি আমরা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে তোমরা এই প্রকল্পের ব্যাপকতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুমান করতে পারবে ঃ

হিউম্যান জিনোমে প্রায় $3x10^9$ বেস যুগ্ম (bp) রয়েছে এবংযদি প্রতি বেস যুগ্মের সিকোয়েন্সির করার খরচ 3US $ বা 3 মার্কিন ডলার হয় (শুরুর দিকে আনুমানিক খরচ), তবে এই প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য আনুমানিক 9 বিলিয়ন US ডলার খরচ হবে। উপরন্তু যদি প্রাপ্ত সজ্জাক্রম সমূহকে টাইপ করে বই হিসাবে প্রকাশ করা হয় এবং বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় 1000 টি বর্ণ থাকে এবং প্রতিটি বইয়ে 1000 টি পৃষ্ঠা থাকে,তবে একটি একক মানব কোশ থেকে প্রাপ্ত DNAসজ্জাক্রমের তথ্য সঞ্চয় করতে এমন 3300টি বইয়ের প্রয়োজন হবে। এই বিশাল সংখ্যক প্রত্যাশিত তথ্য (Data) সৃষ্টি, তথ্য সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধার এবং তথ্যের বিশ্লেষণের জন্য উচ্চ গতিসম্পন্ন গনকযন্ত্র (Computational devices) ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে। জীববিদ্যার একটি নতুন ক্ষেত্র অর্থাৎ বায়োইনফরমেটিক্স এর দ্রুত বিকাশের সঙ্গে HGP ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিল।

HGP এর উদ্দেশ্য (Goals of HGP)

HGP এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিম্নে দেওয়া হল —

i) মানব DNA স্থিত প্রায় 20000 - 25,000 জিনের সবগুলোর সনাক্তকরণ করা।

ii) মানব DNA গঠনকারী প্রায় 3 বিলিয়ন রাসায়নিক বেস যুগ্মের সজ্জাক্রম নির্ধারণ করা।

iii) Database এ এই তথ্য সঞ্চয় করা।

iv) তথ্য বিশ্লেষণের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।

v) এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি সমূহকে শিল্প কলকারখানার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা।

vi) এই প্রকল্প থেকে উঠে আসতে পারে এমন নৈতিক, আইনগত এবং সামাজিক বিষয়গুলোকে (ELSI) বিচার বিশ্লেষণ করা।

হিউম্যান জিনোম প্রকল্পটি ছিল একটি 13 বছরের প্রকল্প যা আমেরিকার শক্তি দপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (U.S. Department of Energy and the National Institute of Health) থেকে সহায়তা লাভ করেছিল। HGP এর শুরুর দিকের বছরগুলোতে Wellcome Trust (U.K.) HGP -এর মুখ্য অংশীদার ছিল এবং পরবর্তীতে জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন ও অন্যান্য দেশের থেকেও বেশ কিছু সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। 2003 সালে এই প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছিল। একক জীবের মধ্যে DNA প্রকরণের প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের দেহে ক্ষতি সাধনকারী হাজার রোগ ব্যাধির সনাক্তকরণ, নিরাময় এবং কিছুদিনের জন্য রোগগুলো প্রতিরোধ করতে নতুন পথ দেখাতে পারে।

মানব জীববিদ্যা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সংকেত প্রদান করা ছাড়াও মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবসমূহের DNA সজ্জাক্রম সম্পর্কে জ্ঞান তাদের স্বাভাবিক সক্ষমতা বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এবং এই জ্ঞান স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষিক্ষেত্র, শক্তি উৎপাদন, পরিবেশীয় সমস্যার উপসমে উদ্ভুত সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইস্ট, *Caenorhabditis elegans* (একটি স্বাধীনজীবী রোগ সৃষ্টি করে না এমন নিমাটোড), ড্রসোফিলা, (ফলমাছি), উদ্ভিদ (ধান এবং Arabidopsis) ইত্যাদির মতো মানুষ নয় এমন বহু নমুনা জীবসমূহের DNA এর সিকোয়েন্সিং ও করা হয়েছে।

পদ্ধতি সমূহ (Methodologies) ঃ

এই পদ্ধতির দুটি মুখ্য দিক রয়েছে। এর মধ্যে একটি দিক সেইসব জিনগুলোর সনাক্তকরণের উপর আলোকপাত করেছে যেগুলো RNA হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে [এগুলোকে Expressed Sequence Tags (ESTs) বলা হয়) অন্যটিতে সহজ উপায়ে সম্পূর্ণ জিনোম সেটের সজ্জাক্রম উদ্দেশ্যহীনভাবে বের করা হয়েছে যা সংকেত বহনকারী এবং সংকেত বহন করে না এমন সজ্জাক্রম সমন্বিত ছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই সজ্জাক্রমের বিভিন্ন অঞ্চলকে কার্যানুসারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (যে পরিভাষাটিকে Sequence Annotation বলে)। DNA সিকোয়েন্সিং এর জন্য একটিকোশ থেকে সম্পূর্ণ DNA কে পৃথক করা হয় ও যথেচ্ছভাবে অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের কিছু DNAখন্ডকে পরিণত করাহয় (মনে রেখো DNAএকটি অত্যন্ত দীর্ঘ পলিমার এবং অত্যন্ত দীর্ঘ DNA খন্ডকের সিকোয়েন্সিং করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে) এবং বিশেষ ভেক্টর ব্যবহার করে উপযুক্ত পোষকে এর ক্লোন করা হয়। এই ক্লোনিং এর ফলে প্রতিটি DNA খন্ডকের বিবর্ধন (amplification) ঘটে। এর ফলে পরবর্তীকালে খুব সহজে DNA খন্ডকের সিকোয়েন্সিং করা যেতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় সচরাচর ব্যবহৃত পোষক সমূহ হল — ব্যাকটেরিয়া ও ইস্ট এবং ভেক্টরগুলোকে BAC (Bacterial artificial chromosome) এবং YAC (Yeast artificial Charomosome) বলে।

অটোমেটেড DNA সিকোয়েন্সার (automated DNA Sequencer) ব্যবহার করে DNA খন্ডকগুলোকে সিকোয়েন্সিং করা হয়েছিল এবং এই অটোমেটেড DNA সিকোয়েন্সারটি Fredrick Sanger দ্বারা প্রবর্তিত একটি পদ্ধতির নীতির উপর কাজ করে (মনে রেখো প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম নির্ধারণের পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব ও বিজ্ঞানী Sanger এর)।

এই সজ্জাক্রমগুলোকে এরপর DNA তে স্থিত কিছু অধিক্রমণযোগ্য (Overlapping) অঞ্চলের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিন্যাস করা হয়। এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সিং এর জন্য অধিক্রমণযোগ্য খন্ডক সৃষ্টির প্রয়োজন। মানুষের পক্ষে এই সজ্জাক্রমগুলো সাজানো সম্ভব নয়। তাই বিশেষিত কম্পিউটার ভিত্তিক কর্মসূচির উদ্ভাবন করা হয়েছিল (চিত্র 6.15)। এই সজ্জাক্রমগুলোকে পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমে সজ্জাক্রম কীরূপ হবে তা ঠিক করা হয়েছিল। 2006 সালের May মাসের মধ্যে কেবলমাত্র ক্রোমোজোম 1 এর সিকোয়েন্সিং এরকাজ শেষ হয়েছিল। (এটি ছিল মানুষের 24 টি ক্রোমোজোম অর্থাৎ 22 টি অটোজোম এবং X ও Y , যার সিকোয়েন্সিং এর কাজ চলছে।

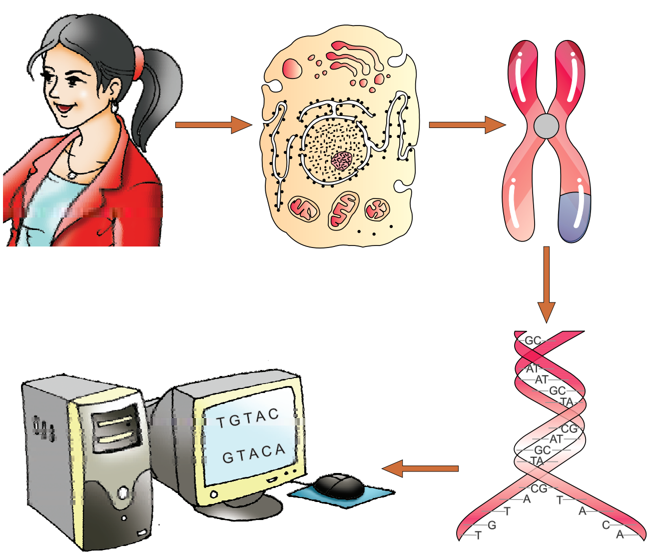

চিত্র 6.15 হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের চিত্ররূপ উপস্থাপন

অপর যে কাজটি সম্পূর্ণ করা চ্যালেঞ্জের ছিল সেটি হল জিনোমের উপর ভৌত ম্যাপ (Physical map) ও জিনগত ম্যাপ (Genetic map) তৈরি করা। এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচকের সনাক্তকরণ স্থান বা recognition site এর বহুরূপতা এবং মাইক্রোস্যাটেলাইট (microsatellites) নামে পরিচিত কিছু পুনরাবৃত্তি মূলক DNA সজ্জাক্রমের উপর তথ্য ব্যবহার করে এটি তৈরি হয়েছিল। (পুনরাবৃত্তিমূলক DNA সজ্জাক্রমে বহুরূপতার একটি প্রয়োগ পরবর্তী অনুচ্ছেদ DNA finger printing এ ব্যাখ্যা করা হবে)।

6.9.1 মানুষের জিনোমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features of Human Genome)

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সমূহের মধ্যে কিছু হল নিম্নরূপ ঃ

i) হিউম্যান জিনোম 3164.7 মিলিয়ন বেস যুগ্ম সমন্বিত হয়।

ii) প্রতিটি জিন গড়ে 3000 বেস সমন্বিত হয় কিন্তু এদের আকারে ব্যাপক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে পরিচিত সর্ববৃহৎ মানব জিনটি হল ডিসট্রোফিন (dystrophin) যাতে 2.4 মিলিয়ন বেস রয়েছে।

iii) মোট জিনসংখ্যা আনুমানিক 30,000 ধরা হয়েছে যা পূর্বে অনুমেয় 80,000 থেকে 1,40,000 জিনের তুলনায় অনেকটাই কম। সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় সব (99.9%) নিউক্লিওটাইড বেসসমূহের সজ্জাক্রম একই হয়।

iv) আবিষ্কৃত জিনসমূহের 50 শতাংশেরও বেশি জিনের কাজ এখনও জানা হয়নি।

v) জিনোমের 2 শতাংশেরও কম অংশ প্রোটিনের সংকেত বহন করে।

vi) পুনরাবৃত্তিমূলক সজ্জাক্রম (Repeated Sequences) সমূহ মানব জিনোমের অতিবৃহৎ অংশ গঠন করে।

vii) পুনরাবৃত্তিমূলক সজ্জাক্রমগুলো হল DNA সজ্জাক্রমস্থিত সেই অংশসমূহ যেগুলোর বহুবার এবং কখনও কখনও একশ থেকে হাজার বারও পুনরাবৃত্তি ঘটে। এটা মনে করা হয় যে, এগুলো সরাসরি বার্তা পরিবহনের সাথে সম্পর্কিত কোনো কার্য করে না কিন্তু এরা ক্রোমোজোম গঠন, গতিশীলতা এবং বিবর্তনের উপর আলোকপাত করে।

viii) ক্রোমোজোম 1এ সবচেয়ে বেশি জিন (2968) থেকে এবং Y ক্রোমোজোমে জিনসংখ্যা সবচেয়ে কম থাকে (231)।

ix) বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমে প্রায় 1.4 মিলিয়ন অঞ্চল সনাক্ত করেছেন যেখানে DNA তে একক বেসের পার্থক্য দেখা যায়। [SNPs- Single nucleotide polymorphism যার উচ্চারণ-স্নিপ (Snip)] এই তথ্য মানুষের ক্রোমোজোমস্থিত যে অঞ্চলসমূহ রোগ সৃষ্টির সাথে সজ্জাক্রম ও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস সন্ধানে সহায়ক সেই অঞ্চলগুলোকে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করে।

6.9.2 প্রয়োগ এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ (Application and Future challenges)

DNA সজ্জাক্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ জ্ঞান আগামী দশকগুলোতে গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করবে যা আমাদের গঠনতন্ত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে। এই বিশাল কাজে বিশ্বব্যাপী সরকারি এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার হাজার হাজার বিজ্ঞানীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার প্রয়োজন। হিউম্যান জিনোম সজ্জাক্রমের সবচেয়ে বড় প্রভাবটি হল এই যে, এটি জীববিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করতে সক্ষম হতে পারে। অতীতে গবেষকরা একই সময় একটি বা অল্প কিছু সংখ্যক জিনের অধ্যয়ন করতেন। সম্পূর্ণ জিনোম সজ্জাক্রম ও অত্যাধুনিক নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা পদ্ধতিগতভাবে ও বিস্তৃত পরিসরে এই বিষয়ে প্রশ্নাবলী উত্থাপন করতে পারি।

এবং এগুলো একটি জিনোমস্থিত সব জিন অধ্যয়ন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট কলা অথবা অঙ্গ অথবা টিউমার এর সব ট্রান্সক্রিপ্ট অথবা জীবনের রসায়ন সুসংহত করার জন্য কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত নেটওয়ার্কে হাজার হাজার জিন ও প্রোটিন একসাথে কাজ করে।

6.10 DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং (DNA Finger printing)

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বলা হয়েছে যে মানুষের ক্রোমোজস্থিত বেস সজ্জাক্রমের 99.9 শতাংশ একইরকম হয়। যদি মানুষের জিনোমে $3x10^9$ বেসযুগ্মের উপস্থিতি রয়েছে বলে ধরা হয় তবে কতগুলো বেসের সজ্জাক্রমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? DNA সজ্জাক্রমে এইপার্থক্য সমূহ প্রতিটি একক জীবকে তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। যদি কেউ দুটি একক জীবের মধ্যে অথবা একটি পপুলেশনে জীবসমূহের মধ্যে জিনগত পার্থক্য খুঁজে বের করতে চায়, তবে প্রতিক্ষেত্রে DNA এর সিকোয়েন্সিং করা একটি কঠিন ও ব্যয়বহুল কাজ হবে। কল্পনা করো যে, $3x10^9$ বেস যুগ্ম সমন্বিত দুটি সেটের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করছো। যে কোনো দুটি একক জীবের DNA সজ্জাক্রমের মধ্যে তুলনা করার একটি অত্যন্ত দ্রুত উপায় হল DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং।

DNA সজ্জাক্রমে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে পার্থক্য রয়েছে তা সনাক্তকরণের সাথে DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং যুক্ত এবং এই অঞ্চলগুলোকে পুনরাবৃত্তিমূলক DNA (repetitive DNA) বলে কারণ এই সজ্জাক্রমগুলোতে DNA এর একটি ক্ষুদ্র অংশের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ঘনত্বের নতিমাত্রা নির্ভর সেন্ট্রিফিউগেশন (Density gradient centrifugation) কালে এই পুনরাবৃত্তিমূলক DNA গুলো সম্পূর্ণ জিনোমিক DNA থেকে বিভিন্ন চূড়া রূপে পৃথকীকৃত হয়। সম্পূর্ণ জিনোমিক DNA টি বৃহৎ চূড়া (Major peak) তৈরি করে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র চূড়াসমূহ স্যাটেলাইট DNA কে (Satellite DNA) নির্দেশকরে। নাইট্রোজেন বেসের গঠন (A:T সমৃদ্ধ অথবা G:C সমৃদ্ধ), DNA খন্ডকের দৈর্ঘ্য, পুনরাবৃত্তিমূলক এককের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইট DNA কে মাইক্রো স্যাটেলাইট, মিনি স্যাটেলাইট ইত্যাদির মতো বহু ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। এই সজ্জাক্রমগুলো সাধারণত কোনো প্রোটিনের সংকেত বহন করে না কিন্তু এগুলো হিউম্যান জিনোমের একটি বিশাল অংশ গঠন করে। এই সজ্জাক্রমগুলো উচ্চমাত্রায় বহুরূপতা প্রদর্শন করে এবং DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর ভিত্তি গঠন করে। যেহেতু একটি একক জীবের প্রতিটি কলা থেকে প্রাপ্ত DNA (যেমন রক্ত, চুলের ফলিফল, ত্বক, হাড়, লালারস, শুক্রানু ইত্যাদি) একই মাত্রার সমরূপতা দেখায়, তাই ফরেনসিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো অত্যন্ত উপযোগী সনাক্তকারী উপকরণ হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও যেহেতু DNA স্থিত বহুরূপতাসমূহ পিতামাতা থেকে সন্তানসন্তিতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, তাই বিতর্কিত ক্ষেত্রে পিতৃত্ব নির্ধারণের ভিত্তিই হল DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং।

যেহেতু DNA সজ্জাক্রমে বহুরূপতা মানব জিনোমের জিনগত ম্যাপ তৈরি করার পাশাপাশি DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর ভিত্তিস্বরূপ, তাই DNA বহুরূপতা অর্থ বলতে আমরা কী বুঝি তা সহজ পরিভাষায় আমাদের জানা আবশ্যক। বহুরূপতার (জিনগত স্তরে প্রকরণ) সৃষ্টি মিউটেশানের কারণেই ঘটে। (তোমরা মনে করে দেখো, মিউটেশানের বিভিন্ন ধরন এবং এদের প্রভাব সম্পর্কে তোমরা পঞ্চম অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে ইতিমধ্যেই অধ্যয়ন করেছো)। একটি একক জীবে নতুন পরিব্যক্তিসমূহ দেহকোশগুলোতে বা জার্মকোশগুলোতে (যে কোশসমূহ যৌনজননকারী জীবে গ্যামেট সৃষ্টি করে) উৎপন্ন হতে পারে। যে ব্যক্তি থেকে মিউটেশান পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে, সেই ব্যক্তির সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা যদি একটি জার্মকোশ মিউটেশনের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে এই মিউটেশানটি জনসংখ্যার অন্য সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে (যৌন জননের মাধ্যমে)।

যদি মানুষের পপুলেশানে 0.01 এর অধিক ফ্রিকোয়েন্সি সম্পন্ন একাধিক ভ্যারিয়েন্ট (অ্যালিল) একটি লোকাসে অবস্থান করে তবে অ্যালিল (অধ্যায় 5 এ বর্ণিত অ্যালিলের সংজ্ঞা আবার মনে করার চেষ্টা কর) সজ্জাক্রমের প্রকরণকে প্রথাগতভাবে একটি DNA বহুরূপতা রূপে বর্ণনা করাহয়।সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যদি কোনো পপুলেশানে একটি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত মিউটেশান অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিলক্ষিত হয়, তবে একে DNA বহুরূপতা বলে। এরূপ প্রকরণের সম্ভাবনা সংকেত বহন করে না এমন DNA সজ্জাক্রমসমূহে ঘটা পরিব্যক্তিসমূহের একক জীবের জনন ক্ষমতার উপর কোনো তাৎক্ষণিক প্রভাব নাও ফেলতে পারে। এইসব মিউটেশানগুলো জনু থেকে জনুতে সঞ্চিত হতে থাকে এবং প্রকরণ/বহুরূপতার একটি ভিত্তি তৈরি করে। বহু বিভিন্ন ধরনের বহুরূপতা পরিলক্ষিত হয় যা একটি নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন থেকে শুরু করে অত্যন্ত বৃহৎ মাত্রার পরিবর্তনও হতে পারে। বিবর্তন এবং প্রজাতিকরণের জন্য এরূপ বহুরূপতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এ বিষয়ে তোমরা উপরের শ্রেণিতে বিশদভাবে পড়বে।

Alec Jeffreys DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং কৌশলটি প্রাথমিকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি প্রোব (Probe) হিসাবে একটি স্যাটেলাইট DNA কে ব্যবহার করেছিলেন যা অতি উচ্চমাত্রায় বহুরূপতা দেখায়, একে Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) বলা হয়। পূর্বে উল্লেখিত এই কৌশলটিতে তেজস্ক্রিয় চিহ্নিত VNTR কে প্রোব হিসাবে ব্যবহার করে Southern blot hybridisation করা হয়। এর ধাপগুলো হল —

i) DNA এর পৃথকীকরণ।

ii) রেস্ট্রিকশান এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা DNA এর ভাঙনের ফলে ছোট-বড় DNA খন্ডকের সৃষ্টি হয়।

iii) ইলেকট্রোফোরেসিস এর মাধ্যমে DNA খন্ডগুলোর পৃথকীকরণ।

vi) পৃথকীকৃত DNA খন্ডকগুলোকে নাইট্রোসেলুলোজ অথবা নাইলনের মতো কৃত্রিম পর্দায় স্থান্তরণ (Blotting)।

v) VNTR চিহ্নিত প্রোব ব্যবহারের মাধ্যমে হাইব্রিড DNA খন্ডক গঠন।

vi) অটোরেডিওগ্রাফির সাহায্যে হাইব্রিড DNA খন্ডক সমূহের সনাক্তকরণ। চিত্র 6.16 এ DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর একটি রৈখিক উপস্থাপন দেখানো হয়েছে।

VNTR সজ্জাক্রমটি স্যাটেলাইট DNA এর এমন একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যাকে মিনি স্যাটেলাইট (mini satellite) বলে। একটি ক্ষুদ্র DNA সজ্জাক্রমের বহুসংখ্যক প্রতিলিপি টেনডেম (tendem) রূপে সজ্জিত থাকে। একটি একক জীবের ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে প্রতিলিপির সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক সজ্জাক্রমের সংখ্যা অতি উচ্চ মাত্রায় বহুরূপতা প্রদর্শন করে। এর ফলস্বরূপ, এই VNTR এর আকারে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যা 0.1-20kb পর্যন্ত হতে পারে। এই কারণে, VNTR এর সঙ্গে হাইব্রিডাইজেশানের পরে, অটোরেডিওগ্রামে বিভিন্ন আকারের বহুসংখ্যক ব্যান্ড পাওয়া যায়। এই ব্যান্ডগুলো একটি একক DNA এর জন্য বিশেষ চারিত্রিক ধরন প্রদান করে (চিত্র 6.16)। এটি একমাত্র সমযমজ [Monozygotgic (identical) twin] ছাড়া একটি পপুলেশানে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে এই কৌশলের সংবেদনশীলতা বাড়ানো যায় (PCR - এই বিষয়ে তোমরা অধ্যায় 11 এ পড়বে)। তাই DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং বিশ্লেষণ করার জন্য একটি একক কোশ থেকে প্রাপ্ত DNA যথেষ্ট।

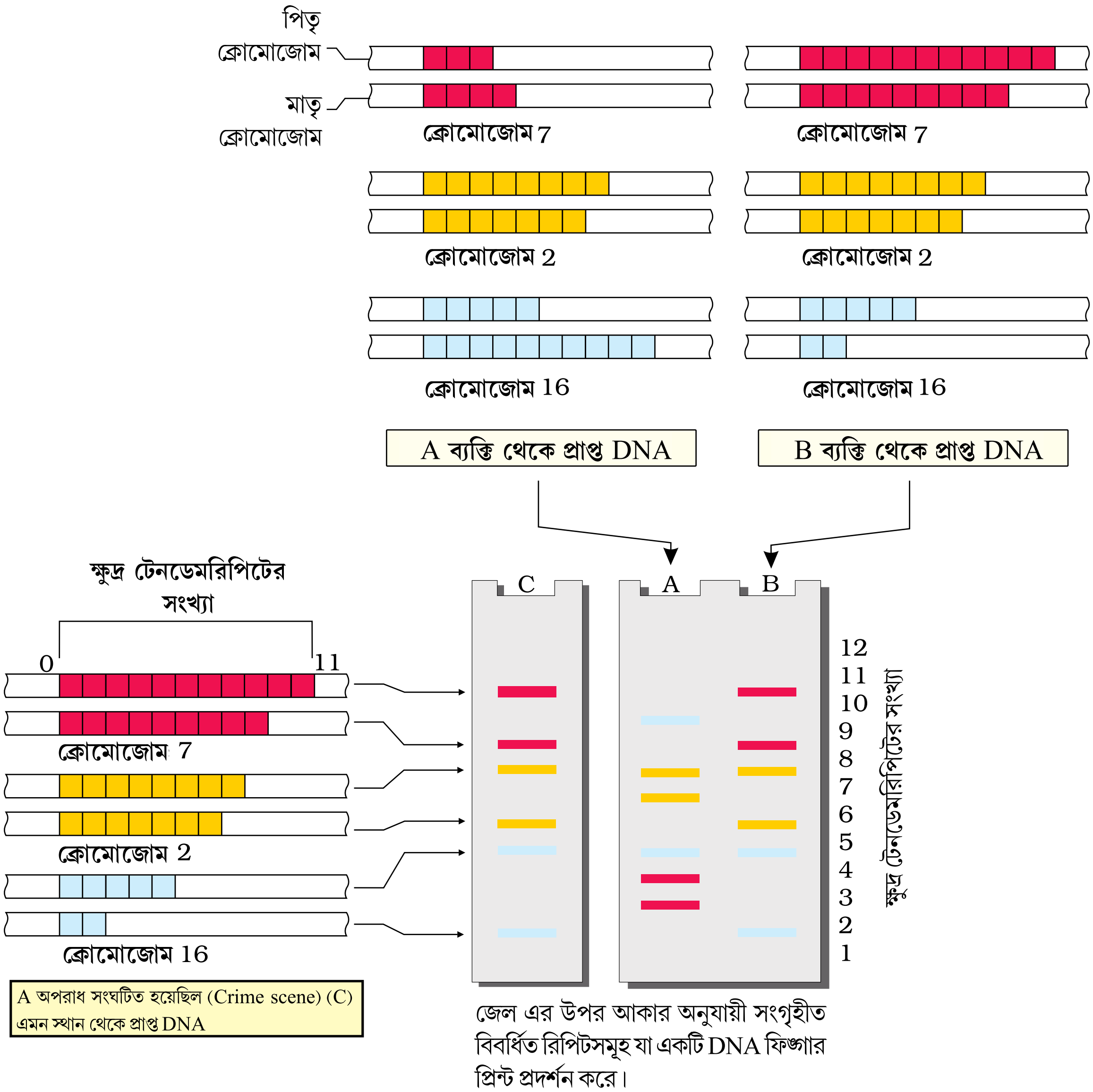

চিত্র 6.16 DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর রৈখিক উপস্থাপনার VNTR এর বিভিন্ন প্রতিলিপি সংখ্যা সমন্বিত কিছু ক্রোমোজোম দেখানো হয়েছে। বোধগম্যতার জন্য জেল (gel) এ উপস্থিত প্রতিটি ব্যান্ডের উৎস চিহ্নিতকরণের জন্য বিভিন্ন রং-এর নক্সা ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ক্রোমোজোমের দুটি অ্যালিল ও (পিতা ও মাতার অ্যালিল) VNTR এর বিভিন্ন প্রতিলিপি সংখ্যা সমন্বিত হয়। এটা স্পষ্ট যে, অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এমন স্থান (Crime Scene) থেকে প্রাপ্ত DNA এর ব্যান্ডিং প্যাটার্ন B ব্যক্তিরDNA প্যাটার্ন সদৃশ হয়, A ব্যক্তির DNA প্যাটার্নের সদৃশ হয় না।

ফরেনসিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ ছাড়াও এর অধিকতর বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে যেমন পপুলেশান এবং জিনগত বৈচিত্র্য নির্ধারণে DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর প্রয়োগ হয়। অধুনা DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট তৈরিতে বহু বিভিন্ন প্রোব ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ

নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো হল নিউক্লিওটাইড সমূহের দীর্ঘ পলিমার। যেখানে DNA জিনগত বার্তা সঞ্চয় করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই RNA তখন এই বার্তার স্থানান্তরণ ও প্রকাশে সাহায্য করে। যদিও DNA ও RNA উভয়ই জিনগত বস্তু হিসাবে কাজ করে কিন্তু DNA রাসায়নিক ও গঠনগতভাবে অধিকতর স্থিতিশীল হওয়ায় জিনগত বস্তু হিসেবে তুলনামূলক ভাবে অধিক উপযোগী। তবে সর্বপ্রথম RNA এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং RNA থেকে DNA উদ্ভূত হয়েছিল, DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিক্যাল গঠনের বৈশিষ্ট্যটি হল পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি DNA তন্তুর বেসসমূহের মধ্যে গঠিত হাইড্রোজেন বন্ধনী। বেস সমূহের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠনের নিয়মটি হল এই যে অ্যাডিনিন দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে থাইমিনের সঙ্গে এবং গুয়ানিন তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে সাইটোসিনের সঙ্গে জোড় গঠন করে। এর ফলে DNA এর একটি তন্তু অপরতন্তুটির পরিপূরক হয়। DNA এর প্রতিলিপিকরণ অর্ধ সংরক্ষণশীল (Semi Conservative) পদ্ধতিতে ঘটে এবং এই প্রক্রিয়াটি পরিপূরক H বন্ধনীর দ্বারা পরিচালিত হয়। DNA এর একটি খন্ডক যা RNA তৈরির সংকেতবহন করে, একে অতি সহজ পরিভাষায় জিন বলা যেতে পারে। ট্রান্সক্রিপশান কালেও DNA এর একটি তন্তু টেমপ্লেট হিসাবে কাজ করে এবং পরিপূরক RNA সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। ব্যাকটেরিয়াতে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন m-RNA টি সক্রিয় হয় এবং তাই সরাসরি সংশ্লেষিত হতে পারে ইউক্যারিওটিক জীবদের ক্ষেত্রে জিনটি খন্ডিত (Split) হয়, সংকেত বহনকারী সজ্জাক্রমগুলোর অর্থাৎ এক্সনগুলোর কাজ সংকেত বহন করে না এমন সজ্জাক্রম অর্থাৎ ইনট্রন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্প্লাইসিং (Splicing) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইনট্রনগুলোর অপসারণ ঘটে এবং এক্সনগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে কার্যকরী RNA গঠন করে। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করার জন্য বার্তাবহ RNA বা ম্যাসেঞ্জার RNA (m-RNA) গঠনকারী বেস সজ্জাক্রমগুলোর তিনটি বেস এক সাথে নিয়ে (ট্রিপলেট/ত্রয়ী সজ্জাক্রম বিশিষ্ট জেনেটিক কোড তৈরি করার জন্য) পাঠ করা হয়। t-RNA যা একটি 'অ্যাডাপটার' অনু রূপে কাজ করে, এটি জেনেটিক কোডকে পরিপূরকতার নীতির উপর ভিত্তি করে আবার পাঠ করে। প্রোটিন সংশ্লেষকালে প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট t-RNA রয়েছে। t-RNA টি এরএকটি প্রান্তে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অ্যান্টিকোডনের সাহায্যে m-RNA স্থিত কোডসমূহের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠনের মাধ্যমে জোড় গঠন করে। রাইবোজোমগুলো হল ট্রান্সলেশান (প্রোটিন সংশ্লেষের স্থান) এবং এগুলো r-RNA এর সঙ্গে যুক্ত হয় ও অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর সংযুক্তির জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এক প্রকারের m-RNA পেপটাইড বন্ধনী গঠনের জন্য অনুঘটকরূপে কাজ করে যাকে RNA উৎসেচক (রাইবোজাইম) রূপে গণ্য করা হয়।

ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়াটি RNA কে ঘিরে উদ্ভুত হয়েছিল যা এটি নির্দেশ করে যে জীবনের সূচনাও RNA কে ঘিরে হয়েছিল। যেহেতু ট্রান্সক্রিপশান এবং ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়াগুলো শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে অতি ব্যয়বহুল তাই এদের সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের ধাপ। ব্যাকটিরিয়া কোশে একাধিক জিন একসাথে সজ্জিত হয় এবং যে একএকরূপে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ওপেরন বলা হয়। ব্যাকটেরিয়া কোশে উপস্থিত ওপেরনের আদি রূপটি হল ল্যাক ওপেরন যা ল্যাকটোজ বিপাকের জন্য দায়ী জিনসমূহের সংকেত বহন করে। ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায় এমন মাধ্যমে ল্যাকটোজের পরিমাণ দ্বারা ওপেরনটি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এই নিয়ন্ত্রণকে সাবস্ট্রেট দ্বারা উৎসেচক সংশ্লেষে নিয়ন্ত্রণ হিসাবেও দেখা যেতে পারে।

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টটি একটি মেগা প্রজেক্ট বা বৃহৎ প্রকল্প যার লক্ষ্য ছিল মানব জিনোমস্থিত প্রতিটি বেসকে চিহ্নিত করা। এই প্রকল্প থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ অনেক নতুন ক্ষেত্র এবং পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং হল এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে DNA স্তরে একটি পপুলেশনের একক জীবসমূহের মধ্যে প্রকরণ খুঁজে বের করা যায়। DNA সজ্জাক্রমের বহুরূপতা নীতির উপর ভিত্তি করে এটি কাজ করে। ফরেন্সিক বিজ্ঞান জিনগত জৈববৈচিত্র্য এবং বিবর্তন সমন্ধীয় জীববিদ্যার ক্ষেত্রগুলোতে এর ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে।

অনুশীলনী

1. নিম্নলিখিতগুলোকে নাইট্রোজেন বেস ও নিউক্লিওসাইড রূপে শ্রেণিবন্ধ কর ঃ—
অ্যাডিনিন, সাইটিডিন, থাইমিন, গুয়ানোসিন,ইউরাসিল এবং সাইটোসিন।
2. যদি একটি দ্বিতন্ত্রী DNA তে 20% সাইটোসিন থাকে তবে সেই DNA তে অ্যাডিনিনের শতকরা হার নির্ণয় কর।
3. যদি DNA এর একটি তন্তুর সজ্জাক্রম নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয় ঃ—
5′-ATGCATGCATGCATGCATGCATGCATGC-3′ তবে 5' → 3' অভিমুখে এর পরিপূরক সজ্জাক্রমটি কী হবে তা লিখ।
4. যদি একটি ট্রান্সক্রিপশান এককে কোডিং তন্তুর সজ্জাক্রম নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয় 5′-ATGCATGCATGCATGCATGCATGCATGC-3′ তবে m-RNA এর সজ্জাক্রমটি কী হবে তা লিখ।
5. DNA এর দ্বিতন্ত্রী হেলিক্স এর কোন্ ধর্মটির জন্য ওয়াটসন এবং ক্রিক DNA অর্ধসংরক্ষণশীল প্রতিলিপিকরণ পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন।
6. টেমপ্লেট এর (DNA অথবা RNA) রাসায়নিক প্রকৃতি এবং এর থেকে সংশ্লেষিত নিউক্লিক অ্যাসিড সমূহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড পলিমারেজ উৎসেচকের তালিকা প্রস্তুত কর।
7. DNA যে জিনগত বস্তু তা প্রমাণ করার জন্য হার্সে এবং চেজ যে পরীক্ষা করেছিলেন সেই পরীক্ষায় DNA এবং প্রোটিন এর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নিরূপন করেছিলেন?
8. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ—
ক) পুনরাবৃত্তিমূলক DNA ও স্যাটেলাইট DNA
খ) m-RNA ও t-RNA
গ) টেমপ্লেট তন্তু ও কোডিং তন্তু
9. ট্রান্সলেশান কালে রাইবোজোমের দুটি অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা লিখ।
10. E. Coli বৃদ্ধি পায় এমন একটিপালন মাধ্যমে ল্যাকটোজ যোগ করা হলে এটি ল্যাক ওপেরনকে উদ্দীপিত করে। তবে পালন মাধ্যমে ল্যাকটোজ যোগ করার কিছু সময় পর ল্যাক ওপেরন বন্ধ হয়ে যায় কেন?
11. নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলোর কাজ (একটি অথবা দুটি বাক্যে) ব্যাখ্যা করো।
ক) প্রমোটার
খ) t-RNA
গ) এক্সন
12. হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টটিকে কেন একটি মেগা প্রজেক্ট বা বৃহৎ প্রকল্প বলা হয়?
13. DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর প্রয়োগ লিখ।
14. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও —
ক) ট্রান্সক্রিপশান
খ) বহুরূপতা
গ) ট্রান্সলেশান
ঘ) বায়োইনফরমেটিক্স

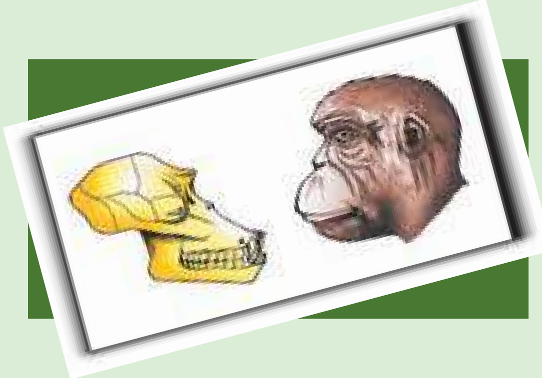

অধ্যায় -7

বিবর্তন

EVOLUTION

7.1 জীবনের উৎপত্তি (Origin of Life)
7.2 সজীব গঠনের বিবর্তন-একটি তত্ত্ব (Evolution of Life Forms - A Theory)
7.3 বিবর্তনের প্রমাণসমূহ কী কী ? (What are the Evidences for Evolution?)
7.4 অভিযোজনজনিত বিকিরণ কী? (What is Adaptive Radiation?)
7.5 জীবজ বিবর্তন (Biological Evolution)
7.6 বিবর্তনের পদ্ধতি (Mechanism of Evolution)
7.7 হার্ডি-উইনবার্গ নীতি (Hardy - Weinberg Principle)
7.8 বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (A Brief Account of Evolution)
7.9 মানুষের উৎপত্তি এবং বিবর্তন (Origin and Evolution of Man)

পৃথিবীতে উপস্থিত সজীব গঠনসমূহের ইতিহাস অধ্যয়নই হল বিবর্তন সম্বন্ধীয় জীববিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তন কী? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ফ্লোরা ও ফণাতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহকে বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই জীবনের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি অর্থাৎ পৃথিবী, নক্ষত্র এবং প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের বিবর্তনের বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সব ভাষান্তরিত এবং কাল্পনিক গল্পগুলোও জানতে হবে। এটি হল জীবনের উৎপত্তি এবং জীবনের গঠনসমূহের বিবর্তন বা পৃথিবীর বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী গ্রহের জীববৈচিত্র্য এবং মহাবিশ্বের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প।

7.1 জীবনের উৎপত্তি (Origin of Life)

যখন আমরা রাতের পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকাই, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে অতীতের দিকে তাকাই। মহাজাগতিক বস্তুসমূহের বা নক্ষত্রদের দূরত্ব আলোকবর্ষ এককে পরিমান করা হয়। আজ আমরা বস্তু হিসাবে নক্ষত্রগুলোকে দেখতে পাই, যেগুলো পৃথিবীর স্বাপেক্ষে ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে আলোর বিচ্ছুরণ শুরু করেছিল এবং এই আলোকরশ্মি এখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। তবে যখন আমরা আমাদের নিকটস্থ চারপাশের বস্তুগুলোকে দেখি তখন বস্তুগুলো তৎক্ষণাৎই আমাদের নিকট দৃশ্যমান হয়, কারণ বস্তুগুলো বর্তমান সময়েই বিদ্যমান। তাই যখন আমরা নক্ষত্রদের দিকে তাকাই তখন স্পষ্টতই আমরা অতীতেই উঁকি দিই।

মহাবিশ্বের ইতিহাসে জীবনের উৎপত্তিকে একটি স্বতন্ত্র ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি অসীম। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে মহাবিশ্বে পৃথিবীর অবস্থান একটি বিন্দুবৎ। মহাবিশ্ব অতি প্রাচীন প্রায় 20 বিলিয়ন বছর পুরানো। ছায়াপথের বিশাল গুচ্ছসমূহ ব্রহ্মাণ্ড (universe) গঠন করে।

ছায়াপথগুলো নক্ষত্রসমূহ এবং গ্যাস ও ধূলোর মেঘপুঞ্জ সমন্বয়ে গঠিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের আকারকে বিবেচনা করে এটা বলা যায় যে, পৃথিবী একটি বিন্দুবৎ গঠন। **Big Bang** তত্ত্বটি আমাদের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আক্ষরিক পরিভাষায় এই তত্ত্বটি একটি অকল্পনীয় একক বৃহৎ বিস্ফোরণের কথাই বলে। এরফলে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার ঘটেছিল এবং তাই এর উষ্ণতা হ্রাস পেয়েছিল। এর কিছু সময় পরেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস তৈরি হয়েছিল। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে এই গ্যাসগুলো ঘনীভূত হয়েছিল এবং বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াপথগুলো গঠন করেছিল। আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের (Milky way galaxy) সৌরমণ্ডলে পৃথিবী গ্রহের উৎপত্তি প্রায় 4.5 বিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পৃথিবী সৃষ্টির পর প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবীতে কোনো বায়ুমণ্ডল ছিল না। পৃথিবীপৃষ্ঠকে আবৃত করে রাখা গলিত পদার্থ থেকে জলীয় বাষ্প, মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়েছিল। সূর্য থেকে আগত অতিবেগুণি রশ্মিসমূহ জলকে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে পরিণত করেছিল এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা হাইড্রোজেন মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। জল, CO_2 এবং অন্যান্য যৌগ তৈরি করার জন্য অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ওজোন স্তরটি গঠিত হয়েছিল। পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার পর জলীয়বাষ্প বৃষ্টি রূপে পতিত হয়ে সমস্ত খানাখন্দগুলোকে পূর্ণ করেছিল এবং এভাবে মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবী সৃষ্টির 500 মিলিয়ন বছর পরে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ প্রায় 4 বিলিয়ন বছর পূর্বে জীবনের আবির্ভাব ঘটে।

জীবনের আগমন কি বহির্বিশ্ব থেকে হয়েছিল? কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, জীবনের আবির্ভাব বহির্বিশ্ব থেকে হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদরা ভেবেছিলেন যে, জীবনের এককসমূহ যাদের **স্পোর** বলে সেগুলো পৃথিবীসহ বিভিন্ন গ্রহে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিছু কিছু জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের কাছে প্যানস্পার্মিয়া (Panspermia) এখনও একটি সমাদৃত ধারণা। বহুকাল পর্যন্ত এটাও বিশ্বাস করা হত যে, খড়, মাটি প্রভৃতির মত ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পচনশীল বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছিল। এটি ছিল স্বত:স্ফুর্ত উদ্ভব তত্ত্ব (Spontaneous generation)। লুই পাস্তুর সতর্কভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে এটা প্রদর্শন করেছিলেন যে, কেলবমাত্র পূর্বে যে বিদ্যমান জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পূর্ব থেকে জীবাণুমুক্ত করা (Pre-sterilised) ফ্লাস্কে মৃত ইস্ট থেকে জীবের সৃষ্টি হয়নি, যেখানে বায়ুতে উন্মুক্ত রাখা অপর একটি ফ্লাস্কে 'মৃত ইস্ট' থেকে নতুন সজীব বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল। স্বতস্ফুর্ত উদ্ভব তত্ত্বটি চিরতরে বাতিল হয়ে গেল। তবে এই তত্ত্ব থেকে পৃথিবীতে প্রথম সজীব গঠনের আবির্ভাব কীভাবে ঘটেছিল তার উত্তরটি পাওয়া যায়নি।

রাশিয়ান বিজ্ঞানী ওপারিন এবং ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী হ্যাল্ডেন প্রস্তাব করেছিলেন যে পূর্বে বিদ্যমান জড় জৈব অনুসমূহ (উদাহরণ RNA, প্রোটিন ইত্যাদি) থেকেই প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং রাসায়নিক বিবর্তনের পরেই জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল অর্থাৎ রাসায়নিক বিবর্তন বলতে অজৈব উপাদানসমূহ থেকে বিভিন্ন ধরনের জৈব অণুর সৃষ্টিকে বোঝায়। তখন পৃথিবীর অবস্থা ছিল এইরূপ— উচ্চ তাপমাত্রা, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ঝড় এবং CH_4, NH_3 ইত্যাদি সমন্বিত বিজারিত বায়ুমণ্ডল। 1953 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী এস এল মিলার (S L Miller) একটি পরীক্ষাগারে একই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন (চিত্র 7.1)। তিনি 800^0C তাপমাত্রায় CH_4, H_2, NH_3 এবং জলীয়বাষ্প সমন্বিত একটি বন্ধ ফ্লাস্কে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করেন। পরীক্ষা শেষে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। একই রকমের পরীক্ষা সম্পাদন করে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন যে, এই পরীক্ষায় শর্করা, নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার, রঞ্জক পদার্থ এবং ফ্যাটের সৃষ্টি হয়। উল্কাপিণ্ডস্থিত বস্তুসমূহের বিশ্লেষণেও একই যৌগসমূহের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই ঘটনা এটি নির্দেশ করে যে, মহাশূন্যে অন্য কোথাও একই পদ্ধতি ঘটে চলেছে। এই সীমিত সংখ্যক প্রমাণের উপস্থিতিতে জীবের উৎপত্তির এই অনুমিত ইতিহাসের প্রথম অংশটি অর্থাৎ রাসায়নিক বিবর্তন অল্পবিস্তর গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

এ বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই যে, কীভাবে জীবনের স্ব-প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম এমন বিপাকীয় বটিকা (Capsule) গুলোর আবির্ভাব ঘটেছিল। জীবনের প্রথম অকোশীয় ধরনটি 3 বিলিয়ন বছর পূর্বে আবির্ভূত হতে পারে। এগুলো ছিল বৃহদাকার অণুসমূহ (RNA, প্রোটিন, পলিস্যাকারইড ইত্যাদি)।

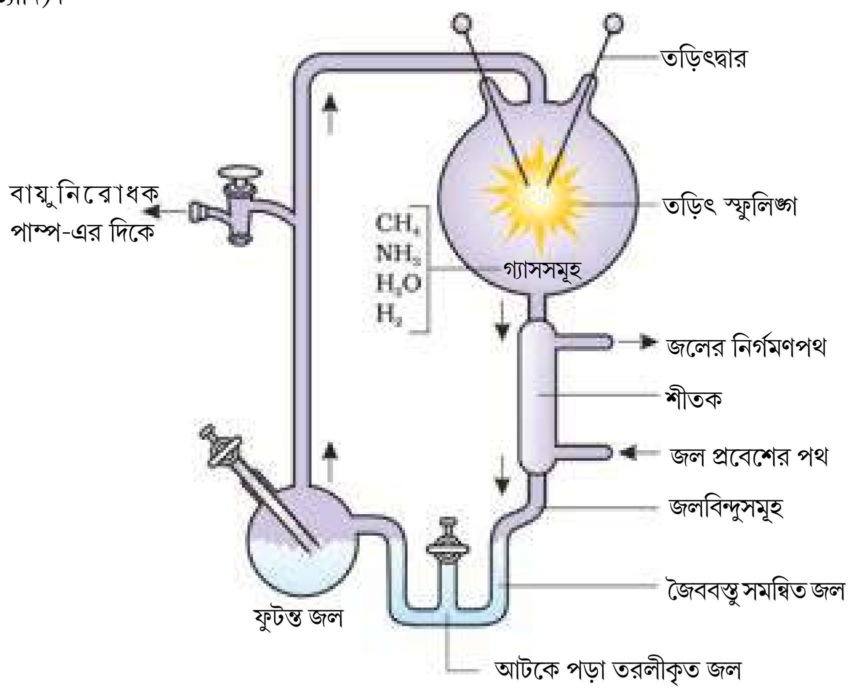

চিত্র 7.1 মিলারের পরীক্ষার চিত্ররূপ উপস্থাপন

এই বটিকাগুলো সম্ভবত প্রজননের মাধ্যমে নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল। জীবের প্রথম কোশীয় গঠনের উৎপত্তি সম্ভবত 2000 মিলিয়ন বছরের পূর্ব পর্যন্ত হয়নি। এইসব গঠনগুলো সম্ভবত এককোশীয় ছিল। সবরকম সজীব গঠনের উৎপত্তি কেবলমাত্র জলীয় পরিবেশেই হয়েছিল। জীবন সৃষ্টির এই ধরনটি অর্থাৎ জীবনের প্রথম গঠনটি বিবর্তনজনিত শক্তির (evolutionary forces) মাধ্যমে অজীবীয় অণুসমূহ থেকে ধীরে ধীরে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই তত্ত্বটি অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তবে একবার গঠিত হওয়ার পর, কীভাবে জীবনের প্রথম কোশীয় গঠনসমূহ আজকের জটিল জৈব বৈচিত্রপূর্ণ জীবে বিবর্তিত হতে পারে তা হল একটি মজাদার গল্প যা আমরা নীচে আলোচনা করবো।

7.2 সজীব গঠনের বিবর্তন- একটি তত্ত্ব (Evolution of Life Forms– A Theory)

প্রচলিত ধর্মীয় সাহিত্য থেকে আমরা বিশেষ সৃষ্টিবাদ নামক তত্ত্বটি সম্পর্কে জানতে পারি। এই তত্ত্বটির তিনটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত: আজ আমরা সজীববস্তুগুলোকে (প্রজাতি এবং ধরন) যেরূপ দেখতে পাই এদের সবগুলোই এই রূপেই সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: সৃষ্টির কাল থেকেই জীবের জীববৈচিত্র্য সর্বদা একইরকম ছিল এবং ভবিষ্যতেও একই থাকবে। তৃতীয়ত: পৃথিবীর বয়স প্রায় 4000 বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারণাগুলো তীব্র আপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল। এইচ এম এস বিগেল (H M S Beagle) নামক জাহাজে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র ভ্রমণকালের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে চার্লস ডারউইন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান সজীব গঠনসমূহ শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই নয়, লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে বিদ্যমান সজীব গঠনসমূহের সঙ্গেও ভিন্নমাত্রায় সমরূপতা দেখায়। এরকম অনেক সজীব

গঠনের অস্তিত্ব আজ আর নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে শুধুমাত্র জীবনের ধরনের আবির্ভাবের কারণেই বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সজীব গঠনসমূহের বিলুপ্তি ঘটেছিল। সজীব গঠনসমূহের ক্রমিক বিবর্তন ঘটে। যে-কোনো পপুলেশান বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহে কিছু অন্তর্নিহিত প্রকরণ থাকে। ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহ যেগুলো কোনো জীবকে প্রাকৃতিক পরিবেশে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে (জলবায়ু, খাদ্য, ভৌত প্রভাবকসমূহ ইত্যাদি) সেইসব জীবদের এধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষেত্রে কম অন্তর্নিহিত প্রকরণ ক্ষমতা বিশিষ্ট (Less-endowed) জীবদের সঙ্গো বর্হিপ্রজনন ঘটানো হয়। কোনো একক জীব বা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা (fitness) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ডারউইনের মতে যোগ্যতা শব্দ দ্বারা সর্বোপরি এবং একমাত্র কোনো প্রাণীর সফলভাবে প্রজনন করার ক্ষমতাকে বোঝায়। তাই যে সমস্ত জীবরা একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে তুলনামূলকভাবে বেশি যোগ্য এরা অন্য প্রাণীদের তুলনায় বেশিসংখ্যক অপত্যের জন্ম দেয়। সুতরাং এইসব জীবরা পরিবেশে অধিকসংখ্যায় বেঁচে থাকবে এবং তাই প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হবে। ডারউইন একে প্রাকৃতিক নির্বাচন রূপে আখ্যায়িত করেন এবং এটি বিবর্তনের একটি পদ্ধতিকে বোঝায়। চলো আমরা অ্যালফ্রেড ওয়ালস (Alfred Wallace) নামে একজন প্রকৃতিবিদ এর কথা স্মরণ করি, যিনি মলে দ্বীপপুঞ্জে (Malay Archipelago) প্রায় একই সময় কাজ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। স্পষ্টতই সময়ের সাথে সাথে এই নতুন ধরনের জীবসমূহ স্বীকৃতির পাওয়ার যোগ্য হল। পৃথিবীতে বিদ্যমান সব সজীব গঠনের মধ্যে সমরূপতা রয়েছে এবং এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে [(ইপোক, পিরিয়ড এবং এরা) Epochs, periods and eras] এইসব পূর্বপুরুষরা বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের সাথে পৃথিবীতে জীববিদ্যার ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হল এই যে, পৃথিবী বহু প্রাচীন, পূর্বে ভাবা হত যে এটি হাজার বছর পুরানো কিন্তু তা ঠিক নয়, পৃথিবী লক্ষ লক্ষ বছর পুরানো।

7.3 বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণগুলো কী কী ? (What ae the Evidences for Evolution?)

বস্তুতপক্ষে পৃথিবীতে সজীবগঠনসমূহের বিবর্তনের স্বপক্ষে ঘটা প্রমাণগুলো অনেক দিক থেকে এসেছে। জীবাশ্ম হল— সজীব গঠনের কঠিন অংশের অবশিষ্টাংশ যেগুলো পাথরে পাওয়া যায়। এই পাথরগুলো থেকে পলল তৈরি হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রস্থচ্ছেদ পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসে পললগুলোর একটির উপর অপরটির সজ্জাক্রমকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন সময়ের পাথর থেকে সৃষ্ট এবং এই পললসমূহ বিভিন্ন সজীব গঠনের জীবাশ্ম সমন্বিত হয় যে জীবগুলো সম্ভবত ঐ নির্দিষ্ট পলল সৃষ্টিকালে মারা গিয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ আধুনিক জীবসমূহের সমরূপ (চিত্র 7.2)। এগুলো বিলুপ্ত জীবদের প্রতিনিধি ছিল (উদাহরণ ডাইনোসোর)। বিভিন্ন পলল স্তরে জীবাশ্মের অধ্যয়ন সেই ভূতাত্ত্বিক সময়কালকে নির্দেশ করে যে সময়ে ঐ সমস্ত জীবদের অস্তিত্ব ছিল। অধ্যয়নের ফলে এটি দেখা গেছে যে সময়ের সঙ্গো সঙ্গো সজীব গঠনসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে এবং কিছু নির্দিষ্ট সজীব গঠন নির্দিষ্ট ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই নতুন সজীব গঠনসমূহ পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসবগুলোকে জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ বলে। *তোমাদের কী মনে আছে কীভাবে আমরা জীবাশ্মের বয়স গণনা করেছিলাম? তোমরা কী রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির নীতিসমূহ মনে করতে পারো?*

বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলও (Ernst Heckel) বিবর্তনের স্বপক্ষে **ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণসমূহের** প্রস্তাব করেছিলেন। সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ গঠনের সাধারণ পর্যায়ে পরিলক্ষিত কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো পরিণত প্রাণীতে থাকে না, সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই হেকেল এই প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মানুষ সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণে মস্তকের ঠিক পিছন দিকে একসারি লুপ্তপ্রায় ফুলকাছিদ্র গঠিত হয় কিন্তু এই অঙ্গাটি কেবলমাত্র মৎস শ্রেণির প্রাণীতেই কার্যকরী

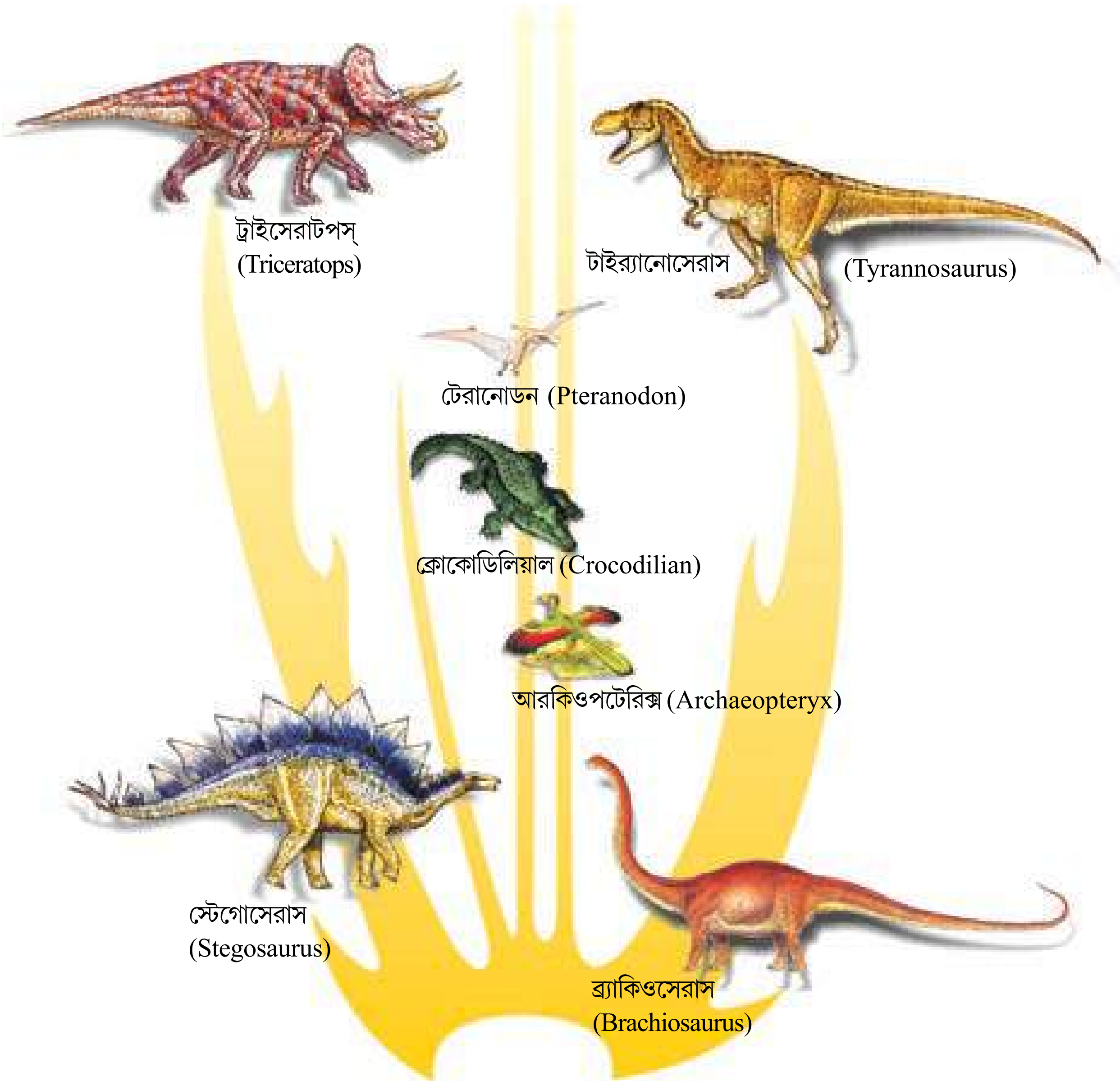

চিত্র 7.2 ডাইনোসোর এবং তাদের প্রতিরূপ কুমীর ও পাখীর মতো আধুনিককালের জীবিত প্রাণীদের একটি বংশলতিকা

থাকে এবং অন্য কোনো পরিণত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে দেখা যায় না। তবে কার্ল আর্নষ্ট ভন বিয়ার এই বিষয়টির উপর সতর্কভাবে গবেষণাকার্য সম্পাদন করেন এবং এর পরই এই প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে ভ্রূণগুলো কখনোই অন্যান্য প্রাণীসমূহে পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্য দিয়ে বাহিত হয় না।

তুলনামূলক শারীরস্থান এবং অঙ্গাসংস্থান অধ্যয়ন থেকে এটি দেখা যায় যে বর্তমান এবং বহুবছর পূর্বে বিদ্যমান জীবসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এই ধরনের সাদৃশ্যগুলো সাধারণ পূর্বপুরুষগুলোতে দেখা যায় নাকি দেখা যায় না তা উপলব্ধি করার জন্য এদের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিমি, বাদুর, চিতা এবং মানুষ (সব স্তন্যপায়ী প্রাণীরা) এর অগ্রপদে হাড়ের বিন্যাসে সাদৃশ্য রয়েছে (চিত্র 7.3খ)। এই অগ্রপদগুলো বিভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করলেও এদের শারীরস্থানিক গঠন একইরকম এবং এদের প্রত্যেকের অগ্রপদে হিউমেরাস, রেডিয়াস,

আলনা, কারপাল, মেটাকারপাল এবং ফেলেঞ্জেস অস্থিসমূহ রয়েছে। তাই এইসব প্রাণীতে একই গঠনগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে অভিযোজিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন দিকে বিকশিত হয়েছে। একে **অপসারী বিবর্তন** বলে এবং এই গঠনগুলোকে **সমসংস্থ গঠন** বলে। বিভিন্ন প্রাণীতে এই সমসংস্থ অঙ্গের উপস্থিতি এটাই নির্দেশ করে যে, এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সমসংস্থ অঙ্গের অন্যান্য উদাহরণগুলো হল মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বাগানবিলাস অর্থাৎ বোগেনভিলিয়ার কণ্টক এবং কুমড়োর আকর্ষ হল সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ (চিত্র 7.3ক)। অপসারী অভিযোজনই হল সমসংস্থ অঙ্গগঠনের ভিত্তি, অন্যদিকে সমবৃত্তীয় অঙ্গগুলো এর ঠিক বিপরীত ধরনের হয়। প্রজাপতি ও পাখীর ডানা দেখতে একইরকমের হয়। এই অঙ্গগুলোর শারীরস্থানিক গঠন এক নয় যদিও এরা একই কার্য সম্পাদন করে। তাই অভিসারী বিবর্তনের ফলেই সমবৃত্তীয় অঙ্গসমূহের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমূহ একইধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য উদ্ভূত হয়েছে এবং তাই এদের মধ্যে কার্যগত সাদৃশ্য দেখা যায়। সমবৃত্তীয় অঙ্গের অন্য আরোও উদাহরণ হল অক্টোপাস এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চোখ অথবা পেঙ্গুইন এবং ডলফিনের ফ্লিপার। কেউ এটি বলতে পারে যে, একই স্থানে বসবাস করার ফলশ্রুতিতেই বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে একই ধরনের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও এরা কেবলমাত্র একই ধরনের কাজ করে : মিষ্টিআলু (মূলের পরিবর্তিত রূপ) এবং আলু (কাণ্ডের পরিবর্তিত রূপ) সমবৃত্তীয় অঙ্গের অপর একটি উদাহরণ।

একই পথ অনুসরণ করে বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবসমূহের মধ্যে একটি প্রদত্ত কাজ সম্পাদনে প্রোটিন ও জিনের সাদৃশ্য থেকে এ সূত্র পাওয়া যায় যে এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবসমূহের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যরূপে এই জৈব রাসায়নিক সমরূপতা একই পূর্বপুরুষ থেকে এদের উৎপত্তিকে নির্দেশ করে।

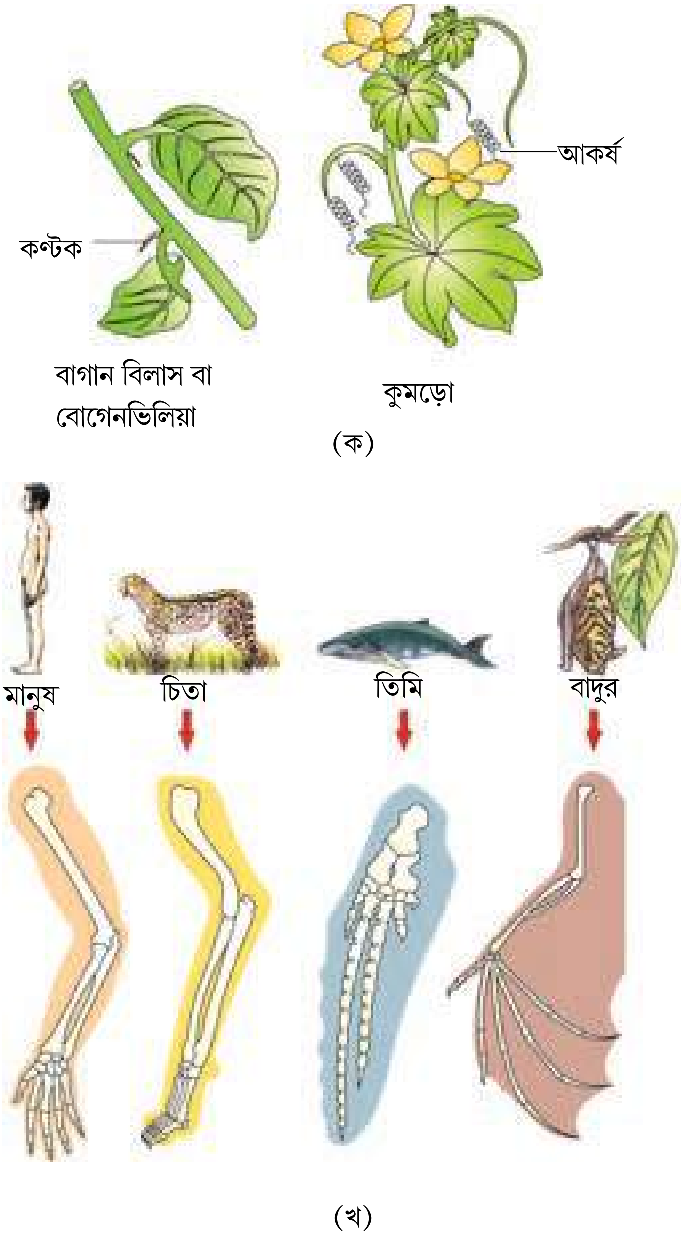

চিত্র 7.3 সমসংস্থ অঙ্গাসমূহের উদাহরণ (ক) উদ্ভিদ এবং (খ) প্রাণী

মানুষ কৃষিকাজ, উদ্যানবিদ্যা, খেলাধুলা অথবা নিরাপত্তা বিষয়ক কাজে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নির্বাচন করে এদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়েছে। মানুষ বহু বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে ছিল এবং জমিতে শস্য উদ্ভিদের চাষ করে ফসল তুলেছিল। এই নিবিড় প্রজনন কর্মসূচির ফলে কিছু ব্রিডের সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলো অন্যান্য ব্রিড থেকে আলাদা (যেমন কুকুর) কিন্তু তবুও এরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। এটি একটি বিতর্কের বিষয় যে, মানুষ যদি একশত বছরের মধ্যে নতুন ব্রিড সৃষ্টি করতে পারে, তবে প্রকৃতি কি লক্ষ লক্ষ বছরে নতুন ব্রিড সৃষ্টি করতে পারবে না?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের স্বপক্ষে অপর একটি মজাদার পর্যবেক্ষণ ইংল্যাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়েছে। 1850 সালে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে শিল্প কলকারখানা স্থাপনের পূর্বে যে মথগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল তাতে এটি পর্যবেক্ষণ করা গেছে বৃক্ষে বসবাসকারী সাদা ডানাবিশিষ্ট মথের সংখ্যা গাঢ় বর্ণের ডানাবিশিষ্ট বা মেলানিন রঞ্জকবিশিষ্ট মথের সংখ্যার চেয়ে তুলনামূলক বেশি ছিল। তবে 1920 সালে অর্থাৎ শিল্প কলকারখানা স্থাপনের পর এই একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মথগুলোর মধ্যে ঐ অঞ্চলে গাঢ় বর্ণের ডানাবিশিষ্ট মথের সংখ্যা অধিকতর ছিল অর্থাৎ সাদা বর্ণের ডানাবিশিষ্ট মথ ও গাঢ় বর্ণের ডানা বিশিষ্ট মথের অনুপাত সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গিয়েছিল। এই পারিপার্শ্বিক

(ক) (খ)

চিত্র 7.4 একটি বৃক্ষের শাখায় অবস্থানকারী একটি সাদা বর্ণের ডানাবিশিষ্ট মথ এবং একটি গাঢ় বর্ণের ডানাবিশিষ্ট মথ (মেলানিনযুক্ত) দেখানো হয়েছে। (ক) দূষণমুক্ত অঞ্চলে (খ) দূষিত অঞ্চলে।

অবস্থায় সাদা ডানাবিশিষ্ট মথেরা এদের শিকারী প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না কিন্তু গাঢ় বর্ণের ডানাবিশিষ্ট বা মেলানিন রঞ্জক বিশিষ্ট মথেরা টিকে যাবে। শিল্প কলকারখানা স্থাপনের পূর্বে গাছের কান্ডসমূহ সাদাবর্ণের প্রচুর লাইকেন দ্বারা প্রায় ঢাকা ছিল- এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাদা ডানাবিশিষ্ট মথগুলো বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু গাঢ় বর্ণের ডানাবিশিষ্ট মথসমূহকে এদের শিকারি প্রাণীরা তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলত। *তোমরা কি জান যে লাইকেন শিল্প দূষণের নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত হতে পারে?* লাইকেন দূষণযুক্ত অঞ্চলে জন্মায় না। তাই যেসব মথ অন্যরূপ ধারন করতে পারতো (camouflage) তাদের লুকিয়ে রাখতে পারতো, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ব্যবহার করে যারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারত তারাই টিকে গিয়েছিল (চিত্র 7.4)। এই উপলব্ধিকে যে ঘটনা দ্বারা সমর্থন করা যায় তা হল যে সমস্ত অঞ্চলে শিল্প কলকারখানা ছিল না উদাহরণস্বরূপ গ্রাম্য অঞ্চলে সেখানে মেলানিনযুক্ত মথের সংখ্যা কম ছিল। এর থেকে এটি দেখা যায় যে একটি মিশ্র জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশানে যারা অধিকতর অভিযোজিত হতে পারে, এরাই টিকে থাকে এবং এদের পপুলেশানের আকার বৃদ্ধি করে। এটি মনে রেখো কোনো ভ্যারিয়েন্টই সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায় না।

একইভাবে শুধুমাত্র আগাছানাশক, কীটনাশক প্রভৃতির অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই এইসব প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্যারাইটিসমূহ প্রকৃতিতে নির্বাচিত হয়েছে। ইউক্যারিওটিক জীবে/কোশে কোনো জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে আমরা এদের প্রতিরোধ করার জন্য যে অ্যান্টিবায়োটিক অথবা ড্রাগ ব্যবহার করি এদের ক্ষেত্রেও ঘটনাটি সত্য। তাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জীবসমূহ/কোশসমূহে মাস বা বছরের মধ্যেই উদ্ভূত হয় এবং এরজন্য কয়েক শতক লাগে না। এগুলো হল নৃতাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বিবর্তনের কিছু উদাহরণ। আমরা এটাও বলতে পারি যে, নিশ্চিতবাদ এর আলোকে বিবর্তন একটি প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া। এটি প্রকৃতিতে হঠাৎ করে ঘটা কোনো ঘটনা বা কোনো জীবে হঠাৎ করে ঘটা মিউটেশানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়া (Stochastic Process)।

7.4 অভিযোজিত বিকিরণ কী ? (What is Adaptive Radiation)

ডারউইন তাঁর ভ্রমণকালে গ্যালাপাগোস দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জীবসমূহের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্য লক্ষ করেছিলেন। বিশেষ কৌতূহলবশত ছোটো কালোবর্ণের পাখিগুলো তাঁকে বিস্ময়ান্বিত করে দিয়েছিল যেগুলোকে পরবর্তী সময়ে ডারউইন ফিঞ্চেস (Darwin's Finches) বলা হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একই দ্বীপে এই পাখীগুলোর (Finches) বহু ভ্যারাইটি রয়েছে। তিনি অনুমান করেছিলেন যে, সব ভ্যারাইটিগুলো ঐ দ্বীপের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই আদি

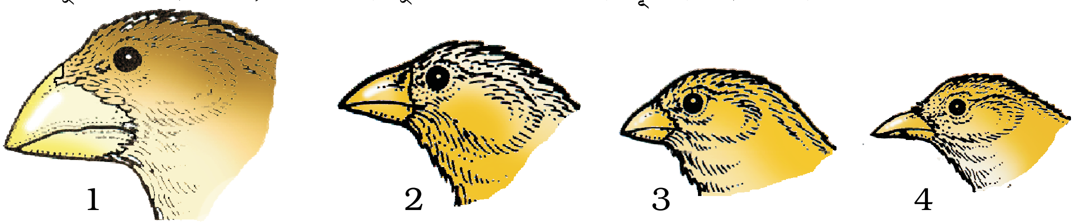

চিত্র 7.5 ডারউইন গ্যালাপাগোস দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের চঞ্চুবিশিষ্ট যেসব পাখী (finches) *দেখতে পেয়েছিলেন।*

বীজ ভক্ষণকারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পাখী থেকে পরিবর্তিত চঞ্চুবিশিষ্ট অন্য বহু ধরনের পাখীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং এরফলে এরা কীটপতঙ্গভোগী এবং শাকাশী উভয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়েছে (চিত্র 7.5)। একটি প্রদত্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু হয় এবং আক্ষরিকভাবে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলে (বাসস্থানসমূহ) বিকিরিত হয় এবং একে

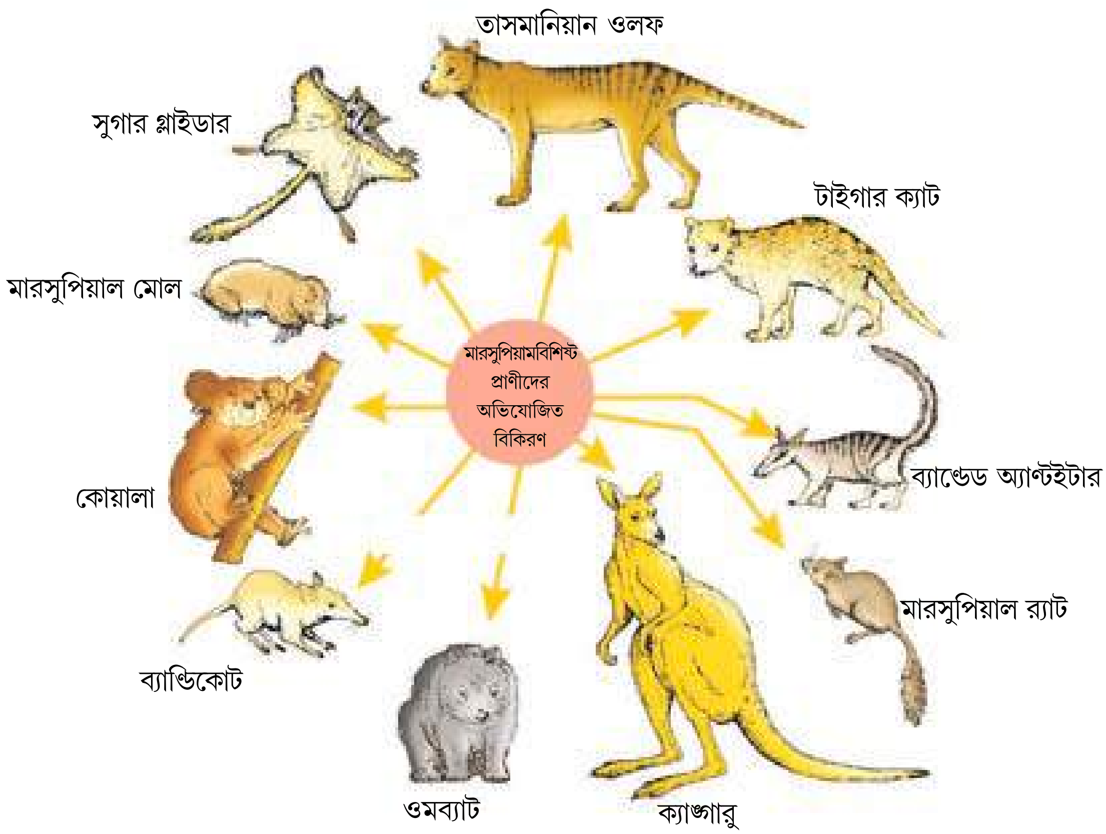

চিত্র 7.6 অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়ামবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীদের অভিযোজিত বিকিরণ

চিত্র 7.7 অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়াম বিশিষ্ট এবং অমরাবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীদের অপসারি বিবর্তন দেখানো হয়েছে।

অভিযোজিত বিকিরণ বলে। এই ঘটনাটির সর্বোৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ হল ডারউইনের পাখীসমূহ (Darwin's finches), এই ঘটনার অন্য আরেকটি উদাহরণ হল অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়াম বিশিষ্ট জীব (Australian marsupials)। বেশ কিছু মারসুপিয়াম বিশিষ্ট প্রাণী যারা একটি অপরটি থেকে আলাদা তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল কিন্তু এরা সবাই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশীয় দ্বীপপুঞ্জেই বাস করতো (চিত্র 7.6)। যখন একটি বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে (বিভিন্ন বাসস্থানকে বোঝায়) একাধিক অভিযোজিত বিকিরণ ঘটতে দেখা যায় তখন একে, কেউ অভিসারী বিবর্তন বলতে পারে। অস্ট্রেলিয়াস্থিত অমরাবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও অভিযোজিত বিকিরণ প্রদর্শন করে এবং এর ফলে এমন অমরাবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটে যাদের প্রত্যেকেই একই পরিবেশে বসবাসকারী মারসুপিয়ামবিশিষ্ট প্রাণীদের মতো হয় (উদাহরণ: প্লাসেন্টাল উলফ এবং টাসমেনিয়ান উলফ-মারসুপিয়াম বিশিষ্ট)। (চিত্র 7.7)।

7.5 জীবজ বিবর্তন (Biological Evolution)

প্রকৃত অর্থে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তন তখনই শুরু হয়েছিল যখন পৃথিবীতে বিপাকীয় সক্ষমতার দিক থেকে ভিন্ন ধরনের জীবনের কোশীয় গঠনসমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল।

প্রাকৃতিক নির্বাচন হল বিবর্তন সম্পর্কীয় ডারউইন তত্ত্বের মূলবিষয়। নতুন সজীব গঠনের আবির্ভাবের হার জীবের জীবনচক্র বা জীবনকালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেসব অণুজীব দ্রুত বিভাজিত হয় সেগুলো বহুবিভাজনে সক্ষম হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ অপত্যজীব সৃষ্টি করে। প্রদত্ত মাধ্যমে বর্ধনশীল ব্যাকটেরিয়া কলোনীর (যেমন A) খাদ্য উপাদান ব্যবহারের সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রকরণ ঘটে। এই মাধ্যমের উপাদানের কোনো পরিবর্তন ব্যাকটিরিয়া গোষ্ঠীর (যেমন B) সেই অংশকেই সামনে নিয়ে আসবে যারা নতুন পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট সময় পর এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যাকটেরিয়াগোষ্ঠীর বৃদ্ধি অন্য ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি হয় এবং এরা নতুন প্রজাতি রূপে আবির্ভূত হয়। এই ঘটনাটি কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটবে। যেহেতু মাছ এবং পাখির জীবনকাল কয়েক বছর তাই এদের ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে। এখানে আমরা এটি বলতে পারি যে, নতুন পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষেত্রে 'A' ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীর তুলনায় 'B' ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীর যোগ্যতা অধিকতর হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন যোগ্যতম বৈশিষ্ট্যের জন্যই হয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তথাকথিত যোগ্যতা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরই নির্ভর করে। তাই প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হওয়া এবং উদ্ভূত হওয়ার জন্য একটি জিনগত ভিত্তি অবশ্যই থাকবে। একই ঘটনাকে অন্যভাবে বলা যায় যে কিছু জীব প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অধিকতর অভিযোজিত হয়। জীবের অভিযোজন ক্ষমতা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় এবং এর একটি জিনগত ভিত্তি রয়েছে। অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা এবং প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সর্বশেষ পরিণতি হল যোগ্যতা (fitness)।

শাখান্বিত অবরোহণ (Branching descent) এবং **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)** হল বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইন তত্ত্বের দুটি মূলধারণা (চিত্র7.7 এবং 7.8)।

এমনকি ডারউইনের পূর্বে ফ্রান্সের একজন প্রকৃতিবিদ ল্যামার্ক বলেছিলেন যে, অঙ্গাসমূহের ব্যবহার ও অব্যবহারের মাধ্যমে সজীব গঠনসমূহের বিবর্তন ঘটেছিল। তিনি জিরাফের উদাহরণ দিয়েছিলেন যেখানে জিরাফগুলো খাদ্যের জন্য উঁচু গাছের পাতা সংগ্রহের নিমিত্তে অভিযোজিত হয়ে দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত জিরাফে পরিণত হয়েছে। বহু বছর ধরে জিরাফের লম্বা গ্রীবার এই অর্জিত বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী প্রজন্মে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত জিরাফের আবির্ভাব ঘটেছিল। উল্লেখ্য বিবর্তন সংক্রান্ত এই ধারণাটিকে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

বিবর্তন কি একটি প্রক্রিয়া নাকি একটি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি? আজ আমরা যে পৃথিবীকে দেখছি, তা জড় হোক বা সজীব হোক তাই হল কেবলমাত্র বিবর্তনের সফলতার নিদর্শন। যখন আমরা পৃথিবীর কাহিনী বর্ণনা করি তখন আমরা বিবর্তনকে একটি প্রক্রিয়া রূপে বিবৃত করি। অন্যদিকে যখন আমরা পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির কাহিনি বিবৃত করি তখন আমরা বিবর্তনকে একটি প্রক্রিয়ার ফলাফলরূপে বিবেচনা করি এবং এই প্রক্রিয়াটি হল প্রাকৃতিক নির্বাচন। এখনও পর্যন্ত আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই যে বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনকে প্রক্রিয়া হিসাবে নাকি অজ্ঞাত প্রক্রিয়াসমূহের অন্তিম ফলশ্রুতি হিসাবে বিবেচনা করবো।

সম্ভবত জনসংখ্যার উপর থমাস মালথাসের কাজটি ডারউইনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তথ্যমূলক পর্যবেক্ষণ হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমিত, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনের ওঠানামার কথা বাদ দিলে জনসংখ্যা বা পপুলেশন আকারগত দিক থেকে সুস্থিত হয়। একটি পপুলেশনের জীবদের দেখতে একইরকম হলেও এদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য (প্রকৃতপক্ষে দুটি একক জীব কখনই একরকম হয় না) পরিলক্ষিত হয়, বেশিরভাগ প্রকরণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় ইত্যাদি। ঘটনাটি হল তাত্ত্বিকভাবে কোনো পপুলেশনের প্রত্যেক জীব যদি সর্বাধিক হারে (এই ঘটনাটি একটি বর্ধনশীল ব্যাকটেরিয়া পপুলেশনে দেখা যেতে পারে) প্রজনন করে তবে পপুলেশনের আকার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে এবং এটা সত্য যে, বাস্তবে পপুলেশনের আকার সীমিত থাকে এর অর্থ হল পপুলেশনের অন্তর্গত জীবরা সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কেবলমাত্র কিছু জীবই টিকে থাকতে পেরেছিল এবং যেসব জীব সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি তাদের ঠিকমত বেড়ে না ওঠার কারণেই ঐসব জীবসমূহ বেড়ে উঠতে পেরেছিল। ডারউইনের অভিনবত্ব এবং দীপ্তিময় অন্তর্দৃষ্টি ছিল এইরূপ : তিনি জোরালোভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেসব প্রকরণগুলোর বংশানুসরণ ঘটে এবং যেগুলো কিছু জীবকে অন্যদের তুলনায় সম্পদ ব্যবহারে অধিকতর উপযোগী করে তোলে (বাসস্থানে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে অভিযোজিত) শুধু যে সমস্ত প্রকরণযুক্ত জীবরাই পরিবেশে প্রজনন করতে পারে এবং অধিক অপত্য সৃষ্টি করে। তাই কিছু সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকা জীবসমূহ বহু প্রজন্ম ধরে অধিকতর অপত্য জীবের সৃষ্টি করবে ও পপুলেশনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাবে এবং এরফলে নতুন সজীব গঠনের উদ্ভব ঘটতে দেখা যাবে।

7.6 বিবর্তনের পদ্ধতি (Mechanism of Evolution)

এই প্রকরণের উৎস কি এবং কীভাবে প্রজাতিকরণ ঘটে? মেন্ডেল জীবের বহি:লক্ষণ বা ফিনোটাইপের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বংশানুসৃত 'ফ্যাক্টর'গুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেও ডারউইন এই পর্যবেক্ষণগুলোকে হয় উপেক্ষা করেছিলেন অথবা এই বিষয়টিতে নীরব থেকেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হুগো দ্য ভ্রিস, ইভনিং প্রাইমরোজকে নিয়ে তাঁর কাজের উপর ভিত্তি করে মিউটেশান সম্পর্কিত ধারণার প্রবর্তন করেন — তা হল আকস্মিকভাবে একটি পপুলেশন উদ্ভূত বিশাল পরিবর্তন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, ডারউইন যে ক্ষুদ্র প্রকরণগুলোর (বংশানুক্রমে সঞ্চারিত) কথা বলেছিলেন সেগুলো থেকে

নয়, মিউটেশানের ফলেই বিবর্তন ঘটে। মিউটেশান এলোমেলো এবং কোনো নির্দিষ্ট দিকে ঘটেনা কিন্তু ডারউইনের মতো প্রকরণসমূহ ক্ষুদ্র হয় এবং এগুলো নির্দিষ্ট দিকে ঘটে। ডারউইনের মতে বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে ঘটে যেখানে হুগো দ্য ভ্রিসের মতে মিউটেশানের কারণেই প্রজাতিকরণ ঘটে এবং তাই একে **সলটেশান (Saltation)** (একক ধাপ বৃহৎ মিউটেশান) বলা হয়। পরবর্তী সময়ে পপুলেশন জেনেটিক্স এর অধ্যয়ন থেকে এবিষয়ে কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়েছিল।

7.7 হার্ডি-উইনবার্গ নীতি (Hardy-Weinberg Principle)

একটি প্রদত্ত পপুলেশনে একটি জিনের অ্যালিলসমূহ বা জিনটির লোকাসের উপস্থিতির ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজে বের করা যেতে পারে। জিনের এই ফ্রিকোয়েন্সি সম্ভবত স্থির থাকে এবং এমনকি জনুর পর জনু ধরে এটি একই রকম থাকবে। হার্ডি উইনবার্গ নীতি এটিকে বীজগাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার দ্বারা বিবৃত করে।

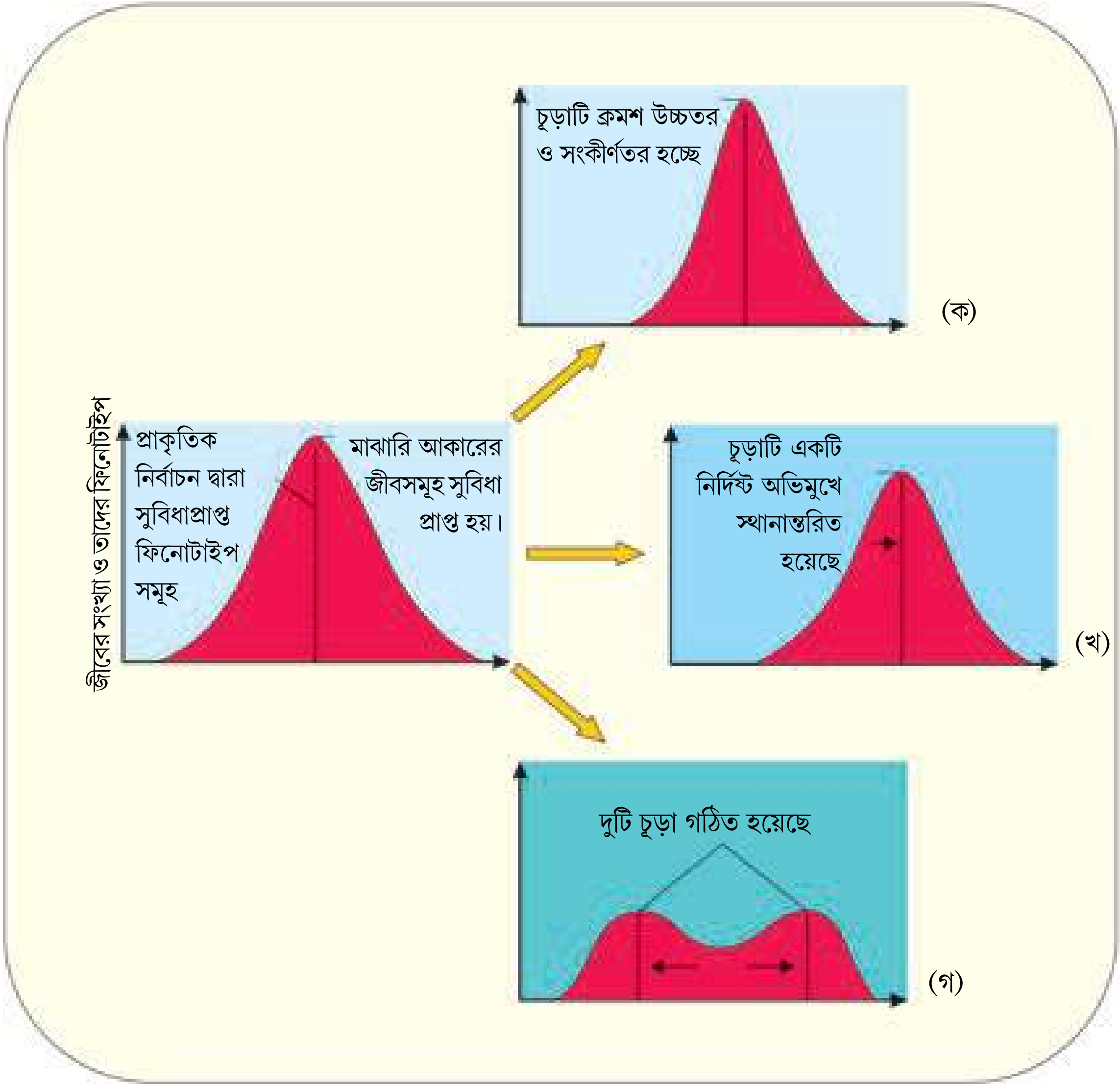

চিত্র 7.8 বিভিন্ন প্রলক্ষণের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়াশীলতার চিত্ররূপ উপস্থাপন (ক) স্থিতিশীল বা স্টেবিলাইজিং (খ) অভিমুখী বা ডিরেকশনাল এবং (গ) সংহতিনাশক বা ডিসরাপটিভ

এই নীতি অনুসারে একটি পপুলেশানে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সুস্থিত থাকে এবং জনু থেকে জনুতে এটি ধ্রুবক থাকে। জিনপুল (একটি পপুলেশনে মোট জিনের সংখ্যা এবং এদের অ্যালিলসমূহ) সর্বদা ধ্রুবক থাকে। এই ঘটনাটিকে জিনগত সাম্যাবস্থা (Genetic equilibrium) বলে। সব অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির যোগফল হল 1। উদাহরণস্বরূপ, একক ফ্রিকোয়েন্সিসমূহকে p, q ইত্যাদি নাম দেওয়া যেতে পারে। একটি ডিপ্লয়েড জীবে p এবং q দ্বারা অ্যালিল A এবং অ্যালিল a এর ফ্রিকোয়েন্সি বোঝানো হয়। একটি পপুলেশানে AA জিনোটাইপবিশিষ্ট কোনো একক জীবের ফ্রিকোয়েন্সিকে সাধারণত p^2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটিকে অন্যভাবে সহজ করে বলা যেতে পারে অর্থাৎ একটি ডিপ্লয়েড জীবের উভয় ক্রোমোজোমে উপস্থিত p ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট অ্যালিল A এর আবির্ভাবের সম্ভাবনা হল দুটি সম্ভাব্য p ফ্রিকোয়েন্সির গুণফল অর্থাৎ p^2। অনুরূপভাবে, aa এবং Aa এর ফ্রিকোয়েন্সি হল যথাক্রমে q^2 এবং 2pq। তাই $p^2+2pq+q^2=1$ হয়। এই সমীকরণটি হল $(p+q)^2$ এই দ্বিপদরাশির সম্প্রসারণ। ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করলে যদি এর মান প্রত্যাশিত মানের থেকে ভিন্ন হয়, তবে এই পার্থক্যই (অভিমুখ) বিবর্তনজনিত পরিবর্তনের মাত্রাকে নির্দেশ করে। জিনগত সাম্যাবস্থা বা হার্ডি উইনবার্গ সাম্যাবস্থায় ব্যাঘাত ঘটলে অর্থাৎ কোনো পপুলেশানে অ্যালিলসমূহের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনকে তখন বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ফলাফলরূপে ব্যাখ্যা করা যাবে।

আমরা জানি, যে পাঁচটি প্রভাবক হার্ডি-উইনবার্গ সাম্যাবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবকগুলো হল-জিন স্থানান্তর (gene migration) অথবা জিনপ্রবাহ (gene flow), জেনেটিক ড্রিফ্ট (genetic drift), পরিব্যক্তি (mutation), জিনগত পুন:সংযুক্তি (genetic recombination), প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) যখন কোনো পপুলেশানের একটি অংশ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে নতুন পপুলেশান গঠন করে তখন মূল বা আদি পপুলেশান এবং এর পাশাপাশি নতুন পপুলেশানে জিন ফ্রিকোয়েন্সি এর পরিবর্তন ঘটে। যে নতুন জিন/অ্যালিলসমূহ নতুন পপুলেশানটিতে যুক্ত হবে সেগুলো আদি বা মূল পপুলেশান থেকে হারিয়ে যাবে। জিনের এই স্থানান্তরণ যদি বহুবার ঘটে তখনই তাকে জিনপ্রবাহ বলা হবে। যদি একই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে তখন একে জেনেটিক ড্রিফট বলে। কখনও কখনও নতুন নমুনা পপুলেশানে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন এতটাই ভিন্ন হয় যে এরা ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়। মূল পপুলেশান থেকে বিচ্যুত পপুলেশান ফাউণ্ডার এবং এর প্রভাবকে ফাউণ্ডার এফেক্ট বলে।

অণুজীবদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল এটি প্রদর্শন করে যে পূর্বে বিদ্যমান অনুকূল পরিব্যক্তিসমূহ নির্বাচিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে নতুন ফিনোটাইপের উদ্ভব ঘটতে দেখা যাবে। কিছু জনু ধরে এই ঘটনাটি ঘটলে নতুন প্রজাতির (Speciation) সৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত প্রকরণসমূহ প্রজাতিটিকে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে টিকে থাকতে প্রজননে সক্ষম করে এবং এরফলে প্রচুর সংখ্যক অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে মিউটেশানের কারণে সৃষ্ট প্রকরণ বা গ্যামেট উৎপাদনকালে পুন:সংযোজনের কারণে সৃষ্ট প্রকরণ বা জিনপ্রবাহ বা জেনেটিক ড্রিফটের ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে জিন ও অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটে। জননগত সাফল্য বৃদ্ধির সহায়তায় প্রাকৃতিক নির্বাচন একে এমন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে যাকে ভিন্ন জনগোষ্ঠী বলে মনে হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন জনগোষ্ঠীতে স্টেবিলাইজেশান (যেখানে বেশিরভাগ জীব গড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে) ডিরেকশনাল পরিবর্তন (যেখানে বেশিরভাগ জীবই গড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে) অথবা ডিসরাপশান (বেশিরভাগ জীব বণ্টন বক্ররেখার উভয় প্রান্তে অবস্থান করে এবং প্রান্তীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে) ঘটায় (চিত্র 7.8)।

7.8 বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (A brief account of Evolution) :

পৃথিবীতে প্রায় 2000 মিলিয়ন বছর পূর্বে [million of years ago (mya)] জীবের প্রথম কোশীয় গঠনের আবির্ভাব হয়েছিল। বৃহদাকার ম্যাক্রো অনুসমূহের অকোশীয় সংগঠন থেকে কীভাবে পর্দাময়

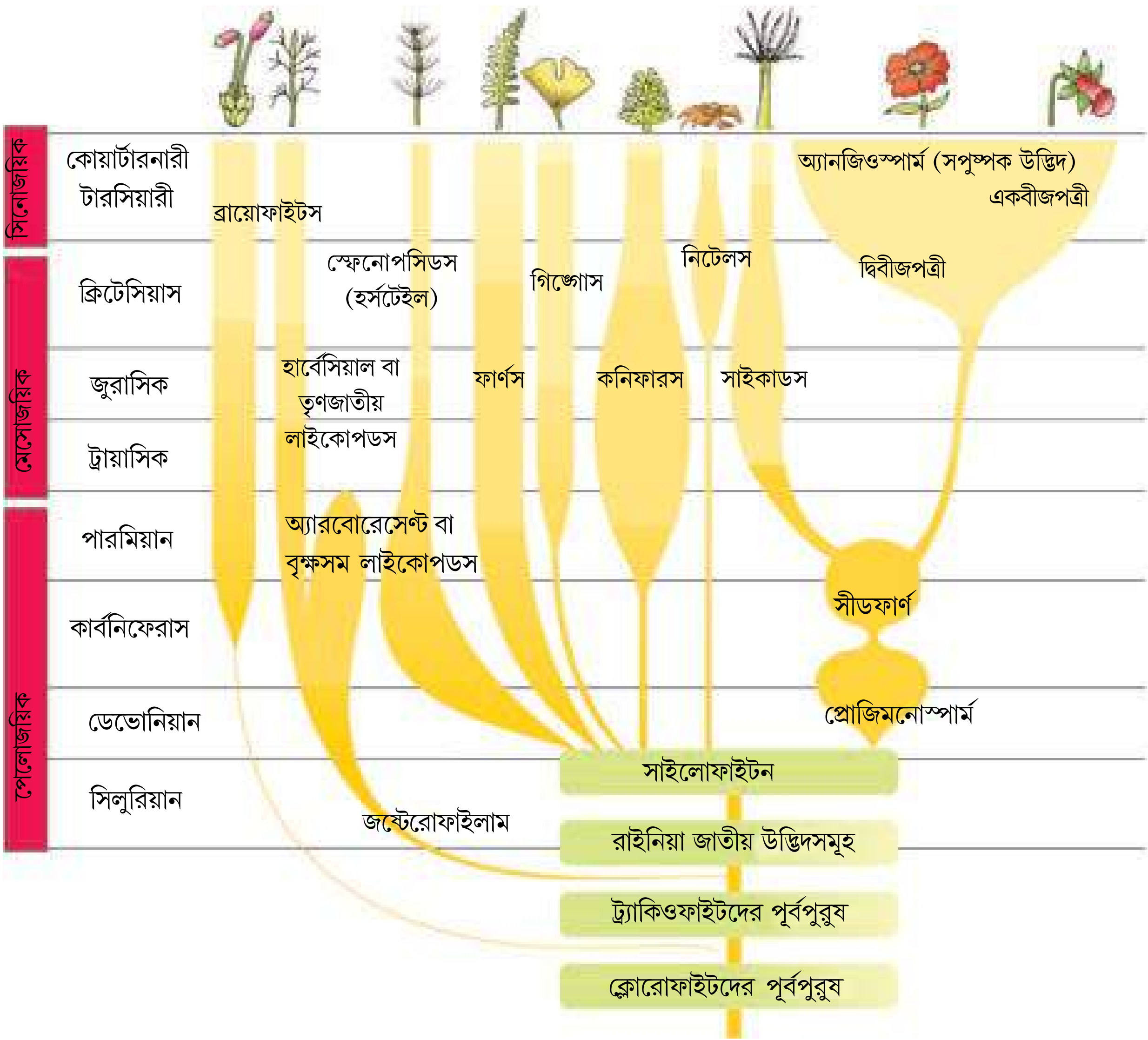

চিত্র 7.9 ভূতাত্ত্বিক সময়কালের মাধ্যমে উদ্ভিদের গঠনসমূহের বিবর্তনের একটি রেখাচিত্র

আবরণ বিশিষ্ট কোশের উদ্ভব ঘটেছিল সেই পদ্ধতিটি এখনও জানা যায় নি। এদের মধ্যে কিছু কোশের O_2 নির্গমের ক্ষমতা ছিল। এই বিক্রিয়াটি সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়ার অনুরূপ হতে পারে যেখানে যথাযথ আলোকগ্রাহী রঞ্জক দ্বারা আবদ্ধ এবং পরিবাহিত সৌরশক্তির সাহায্যে জল বিশিষ্ট হয়। এককোশী জীবসমূহ ধীরে ধীরে বহুকোশী গঠনে পরিণত হয়েছিল। প্রায় 500 মিলিয়ন বছর পূর্বে অমেরুণ্ডী প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তখন এরা সক্রিয় ছিল। সম্ভবত 350 মিলিয়ন বছর পূর্বের কাছাকাছি সময়ে চোয়াল বিহীন মাছের উদ্ভব ঘটেছিল। 320 মিলিয়ন বছর পূর্বের কাছাকাছি সময়ে সম্ভবত সামুদ্রিক আগাছা ও কিছু উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের এটা বলা হয়েছে যে, স্থলভূমিতে উদ্ভূত প্রথম জীবসমূহ ছিল উদ্ভিদ। যখন প্রাণীসমূহ স্থলভাগে উদ্ভূত হয়েছিল তখন উদ্ভিদরা স্থলভাগে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। শক্তিশালী এবং শক্ত পাখনাবিশিষ্ট মাছ স্থলভাগে চলাচল করতে এবং জলে ফিরে যেতে পারত। এটি প্রায় 350 মিলিয়ন বছর পূর্বের ঘটনা। 1938 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটনাচক্রে কোলেকান্থ (Coelacanth) নামে যে মাছটি ধরা পড়েছিল সেটিকে বিলুপ্ত মনে করা হয়েছিল। যে

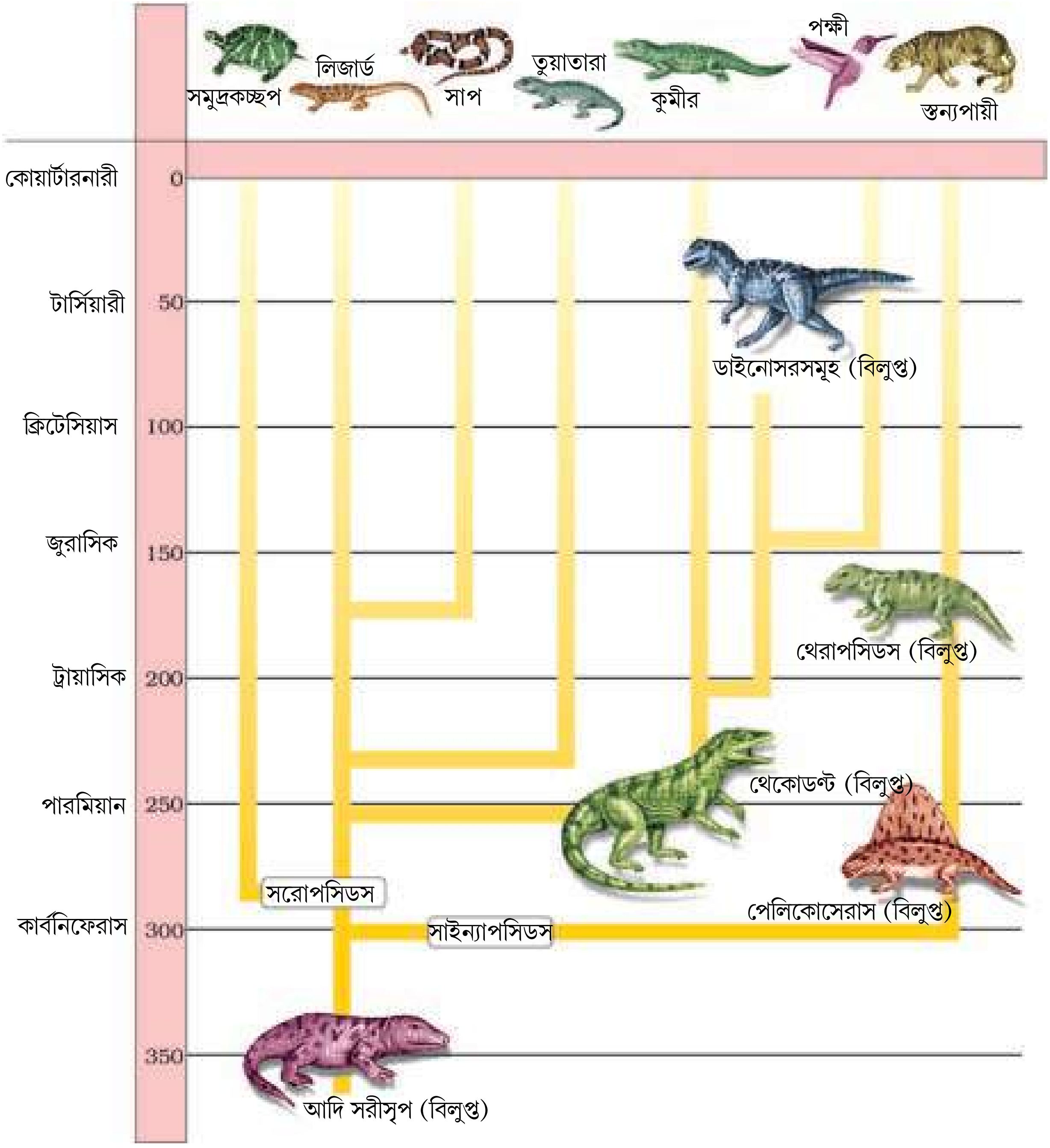

চিত্র 7.10 ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালের মাধ্যমে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তনের ইতিহাস উপস্থাপন

প্রাণীগুলো থেকে উভচরের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের লোবফিন (lobefins) বলে এবং এরা জল ও স্থল উভয় স্থানে বসবাস করত। আমাদের কাছে এদের কোনো নমুনা সংরক্ষিত নেই। তবে এরাই আধুনিক ব্যাঙ এবং স্যালামেন্ডারদের (salamanders) পূর্বপুরুষ ছিল। এই উভচর প্রাণীদের থেকেই সরীসৃপদের উদ্ভব ঘটেছিল। সরীসৃপরা পুরু খোলক বিশিষ্ট ডিম পাড়ে, যেগুলো উভচরদের ডিমের মতো সূর্যের আলোকে শুকিয়ে যায় না। আমরা এখন আবার ঐ সরীসৃপদের কেবলমাত্র আধুনিক উত্তরসূরী অর্থাৎ সামুদ্রিক কচ্ছপ (turtles), কচ্ছপ (tortoises) এবং কুমীর (crocodiles) দের দেখতে পাই। পরবর্তী

200 মিলিয়ন বছর বা তার পরে পৃথিবীতে বিভিন্ন আকার ও আকৃতিবিশিষ্ট সরীসপৃদের প্রাধান্য ছিল। দৈত্যাকার ফার্ণও (Giant ferns) (টেরিডোফাইটা) সেই সময়ে বর্তমান ছিল, কিন্তু পরে এরা সকলেই মাটিতে চাপা পড়ার পর ধীরে ধীরে কয়লার সঞ্চয়ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। সম্ভবত 200 মিলিয়ন বছর পূর্বে স্থলভূমিতে বসবাসকারী কিছু সরীসৃপ জলে ফিরে গিয়ে মাছের ন্যায় সরীসৃপে (উদাহরণ, *Ichthyosaurs*) বিবর্তিত হয়েছিল। অবশ্যই স্থলে বসবাসকারী সরীসৃপগুলো ছিল ডাইনোসোর। এদের মধ্যে *Tyrannosaurus rex* ছিল অতিকায় যা প্রায় 20 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল এবং এদের প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর ছুঁড়ির ন্যায় দাঁত ছিল। প্রায় 65 মিলিয়ন বছর পূর্বে ডাইনোসোররা আকস্মিকভাবে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। ডাইনোসোরের অবলুপ্তির সঠিক কারণটি আমাদের জানা নেই। কারো কারো মতে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলেই এদের মৃত্যু ঘটেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এদের বেশিরভাগই পক্ষীশ্রেণির প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃত সত্যটি এই দুটি তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে। এই সময়কালের ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট সরীসৃপরা আজও বেঁচে আছে।

প্রথম স্তন্যপায়ীগুলো ছিল ছুঁচোর(shrew) ন্যায় প্রাণী। এদের জীবাশ্মগুলো ছোটো আকারের ছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা জরায়ুজ হয় এবং এদের শিশু ভ্রূণটি মায়ের দেহের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অন্তত বিপদ বুঝতে পারা এবং বিপদ এড়ানোর ক্ষেত্রে অধিকতর বুদ্ধিমান ছিল। সরীসৃপের সংখ্যা কমে যাওয়ার পর স্তন্যপায়ীরা পৃথিবী জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোড়া, হিপ্পোপটেমাস, ভাল্লুক, খরগোস ইত্যাদি প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত স্তন্যপায়ীরা বর্তমান ছিল। মহাদেশীয় সঞ্চরণের কারণে যখন দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হল তখন উত্তর আমেরিকার প্রাণীকূল দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল। একই মহাদেশীয় সঞ্চরণের ফলশ্রুতিতে অস্ট্রেলিয়ার থলিযুক্ত (pouched mammal) স্তন্যপায়ীরা টিকে গিয়েছিল কারণ এদের অন্য কোনো স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়নি।

আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সম্পূর্ণভাবে জলে বসবাস করে। এমন কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ হল— তিমি, ডলফিন, সিল (seal), সমুদ্র গরু (sea cow), ঘোড়া, হাতি, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীদের বিবর্তনের বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। তোমরা উপরের শ্রেণিতে এগুলো সম্পর্কে জানবে। তবে বিবর্তনের সবচেয়ে সফল গল্পটি হল ভাষাগত দিক থেকে দক্ষ এবং আত্মসচেতন মানুষের বিবর্তন।

জীবনের ধরনসমূহের বিবর্তনের একটি স্থূল রেখাচিত্র ভূ-তাত্ত্বিক মানদণ্ডে তাদের সময়কাল চিত্র 7.9 এবং চিত্র 7.10-এ দেখানো হয়েছে।

7.9 মানুষের উৎপত্তি এবং বিবর্তন (Origin and Evolution of Man)

প্রায় 15 মিলিয়ন বছর পূর্বে *Dryopithecus* এবং *Ramapithecus* নামক প্রাইমেটদের অস্তিত্ব ছিল। এদের দেহ লোমে আবৃত ছিল এবং এরা গরিলা এবং শিম্পাঞ্জির মতো হাঁটাচলা করতো। *Ramapithecus* দেখতে অধিকতর মনুষ্য সৃদশ্য ছিল, অন্যদিকে *Dryopithecus* দেখতে এপ (ape) সদৃশ ছিল। ইথিওপিয়া এবং তানজানিয়ায় মানব অস্থি-সদৃশ অস্থির কিছু জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে (চিত্র 7.11)। এই জীবাশ্মগুলোতে মানব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থেকে এটা বিশ্বাস করা যায় যে, প্রায় 3-4 মিলিয়ন বছর পূর্বে, পূর্ব আফ্রিকায় মনুষ্য সদৃশ প্রাইমেটরা চলাচল করতো। এরা সম্ভবত 4 ফুটের বেশি দীর্ঘ ছিল না কিন্তু এরা সোজা হয়ে হাঁটতো। দুই মিলিয়ন বছর পূর্বে পূর্ব আফ্রিকার তৃণভূমিতে সম্ভবত *Australopithecines* বসবাস করতো। তথ্য প্রমাণ থেকে এটা পাওয়া যায় যে, এরা পাথরের তৈরি অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করলেও মূলত ফল ভক্ষণ করতো। আবিষ্কৃত অস্থিগুলোর মধ্যে কিছু অস্থি ভিন্ন ধরনের ছিল। এই জীবটি ছিল হোমিনিড (hominid) অর্থাৎ প্রথম মনুষ্য সদৃশ জীব এবং একে *Homo habilis* বলা হত। এদের মস্তিষ্কের আয়তন 650-800cc এর মধ্যে ছিল। সম্ভবত এরা মাংস খেত না। 1891 সালে জাভায় আবিষ্কৃত জীবাশ্মসমূহ থেকে এটা জানা যায় যে, পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ প্রায় 1.5 মিলিয়ন বছর পূর্বে *Homo erectus* উদ্ভূত হয়েছিল। *Homo erectus* এর বৃহদাকার

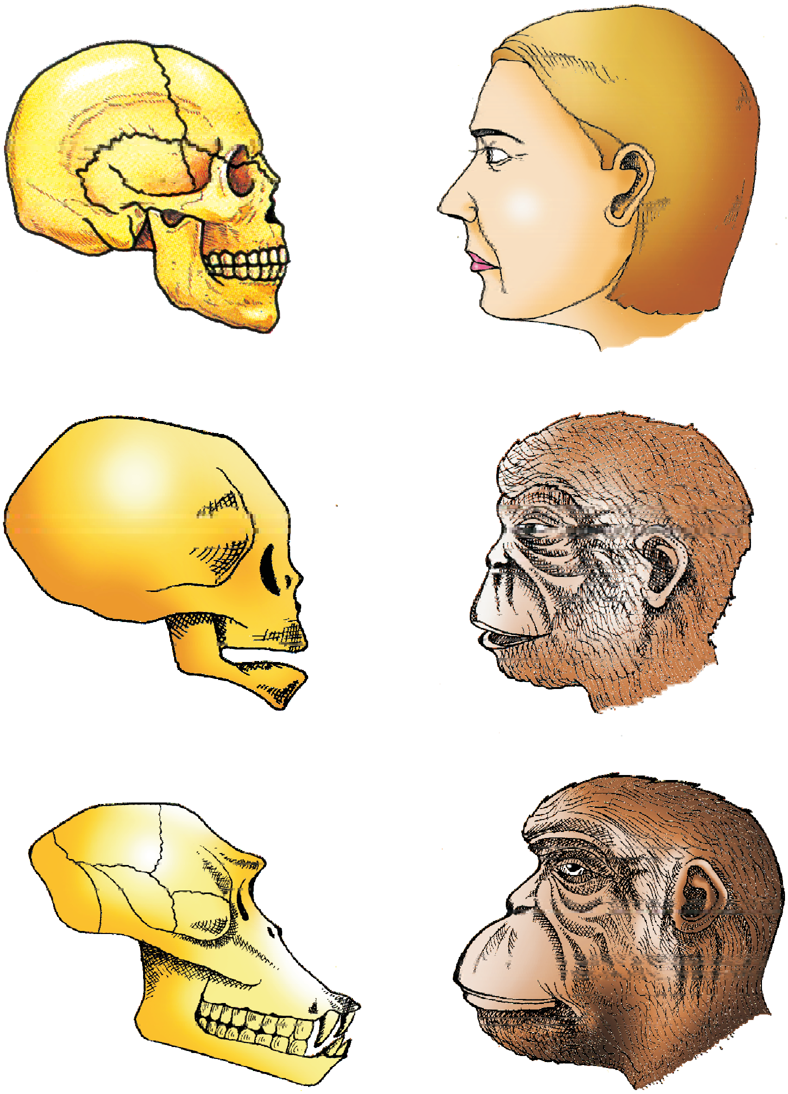

চিত্র 7.11 প্রাপ্ত বয়স্ক আধুনিক মানুষ, শিশু শিম্পাঞ্জী এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিম্পাঞ্জীর করোটির একটি তুলনা। শিশু শিম্পাঞ্জীর করোটি প্রাপ্তবয়স্ক শিম্পাঞ্জীর করোটির তুলনায় অধিকতর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের করোটির মত হয়।

মস্তিষ্কের আকার ছিল প্রায় 900cc। *Homo erectus* রা সম্ভবত মাংস খেত। নিয়ানডারথাল (Neanderthal) মানুষের মস্তিষ্কটির আকার ছিল প্রায় 1400cc এবং এরা পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে 1,00,000–40,000 বছরের মধ্যে বসবাস করতো। এরা এদের দেহকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পশুর চামড়া ব্যবহার করতো এবং মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতো। আফ্রিকায় *Homo sapiens* দের উদ্ভব ঘটেছিল ও এরা বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তারলাভ করেছিল এবং স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল। 75,000–10,000 বছর পূর্বে তুষার যুগের সময় আধুনিক মানুষ *Homo sapiens* দের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রায় 18,000 বছর পূর্বে প্রাক্-ঐতিহাসিক গুহাচিত্রের প্রকাশ ঘটে। মধ্যপ্রদেশের রেইসেন জেলায় পাথর নির্মিত আশ্রয়স্থল ভীমবেটকা প্রাক-ঐতিহাসিক মানুষের দ্বারা চিত্রিত এমন একটি গুহা চিত্র দেখা যেতে পারে। প্রায় 10,000 বছর পূর্বে কৃষিকাজ শুরু হয় এবং মানুষ বসতিস্থাপন করতে শুরু করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনাগুলো মানব সভ্যতার বিকাশ ও অবনমনের ইতিহাসের অংশবিশেষ।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তিকে বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশেষত পৃথিবীর উৎপত্তির প্রেক্ষাপটকে জানতে হবে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন অর্থাৎ জৈব অণু সৃষ্টির পরই পৃথিবীতে জীবনের প্রথম কোশীয় গঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল। জীবনের প্রথম আবির্ভাবের পরবর্তী ঘটনাবলি হল অনুমান নির্ভর গল্প যা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা জৈব বিবর্তনের ধারনার উপর নির্ভরশীল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে জীবনের গঠন বৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয়ে চলছে। এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, পপুলেশানে সৃষ্ট প্রকরণগুলোর ফলেই ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন জীবের উদ্ভব ঘটে। বাসস্থানের খণ্ডীকরণ (Habitat fragmentation) এবং জেনেটিক ড্রিফট (genetic drift) এর মতো অন্যান্য ঘটনাবলি এই প্রকরণসমূহকে আরোও জোরালোভাবে নতুন প্রজাতির আবির্ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং এর ফলস্বরূপ বিবর্তন ঘটে। শাখান্বিত অবরোহন (Branching descent) এর ধারনার সাহায্যে হোমোলজি ব্যাখ্যা করা যায়। তুলনামূলক শারীরস্থানে জীবাশ্মসমূহ এবং তুলনামূলক জৈব রসায়ন এর অধ্যয়ন বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়। প্রতিটি প্রজাতির বিবর্তনের গল্পগুলোর মধ্যে আধুনিক মানুষের বিবর্তনের গল্পটি সবচেয়ে মজাদার এবং মানুষের মস্তিষ্ক ও ভাষার বিবর্তন মানুষের বিবর্তনের সাথে সমান্তরালভাবে ঘটেছে।

অনুশীলনী

1. ডারউইনের নির্বাচন তত্ত্বের আলোকে ব্যাকটিরিয়ায় পরিলক্ষিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষমতা ব্যাখ্যা কর।
2. সংবাদপত্র এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে বিবর্তন বিষয়ক কোনো নতুন জীবাশ্মের আবিষ্কার অথবা এবিষয়ক বিতর্কসমূহ খুঁজে বের কর।
3. প্রজাতি পরিভাষাটির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা কর।
4. মানুষের বিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা কর (সংকেত: মস্তিষ্কের আকার এবং কাজ, কঙ্কালের গঠন, পছন্দসই খাদ্য ইত্যাদি)।
5. মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীতে আত্মসচেতনতা রয়েছে কিনা তা জানার জন্য ইন্টারনেট এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলো খুঁজে দেখো।
6. আধুনিককালের 10টি প্রাণীর নাম লিপিবদ্ধ করো এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে এদেরকে এদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রাচীন জীবাশ্মের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে উভয়ের নাম উল্লেখ কর।
7. বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের চিত্র আঁকার অভ্যাস করো।
8. অভিযোজিত বিকিরণ (adaptive radiation) এর একটি উদাহরণ বিবৃত কর।
9. মানুষের বিবর্তনকে আমরা কি অভিযোজিত বিকিরণ বলতে পারি।
10. বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে যেমন, তোমরা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অথবা ইন্টারনেট এবং তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা ক্রমে যে-কোনো একটি প্রাণী যেমন ঘোড়ার বিবর্তনের পর্যায়গুলো খুঁজে বের করো।

একক - VIII

মানব কল্যাণে জীববিদ্যা

অধ্যায়- 8
মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগ
(Human Health and Disease)
অধ্যায়- 9
খাদ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধনের কৌশলসমূহ
(Strategies for Enhancement in Food Production)
অধ্যায়- 10
মানব কল্যাণে অণুজীব
(Microbes in Human Welfare)

জীববিদ্যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের একেবারে একটি নতুন বিধিবদ্ধ শাখা। জীববিদ্যার তুলনায় পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যার উন্নতি অনেকটা দ্রুত হয়েছিল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগ জীববিদ্যার তুলনায় অনেক বেশি দেখা যায়। তবে বিংশ শতাব্দী এবং সুনির্দিষ্টভাবে একবিংশ শতাব্দীতে জীববিদ্যার জ্ঞানের উপযোগীতাকে মানবকল্যাণে আরোও উন্নতি সাধনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বা কৃষিক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক, সংশ্লেষিত উদ্ভিজ ঔষধিসমূহ এবং চেতনানাশকের আবিষ্কার একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং অন্যদিকে মানুষের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। চাষাবাদ, খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং রোগ নির্ণয় মানব সমাজে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই এককের নিম্নবর্ণিত তিনটি অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এম এস স্বামীনাথন
(1925)

মনকামবু সমবাসিভন স্বামীনাথন (Monkambu Sambasivan Swaminathan) 1925 সালের আগস্ট মাসে তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনম-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ বিদ্যায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ভারতে এবং বিদেশে বহু প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে তিনি কাজ করেছিলেন এবং সুপ্রজনন বিদ্যা ও উদ্ভিদ প্রজননে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

ভারতের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে (IARI), সাইটো জেনেটিক এবং বিকিরণ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠায় স্বামীনাথন এবং তার সহকর্মীরা সুগন্ধি বাসমতি সহ ধানের স্বল্পকালীন উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটিসমূহ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ক্রপ ক্যাফেটেরিয়া (crop cafeteria), শস্য রোপণের সময়সূচি, জিনগত উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধির ধারণা তৈরির জন্যও পরিচিত ছিলেন।

স্বামীনাথন নরম্যান বরলভ এর সাথে মিলিতভাবে কাজে শুরু করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ভারতে গমের মেক্সিকান ভ্যারাইটির চাষাবাদ শুরু করার মাধ্যমে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) এর সূচনা করেন। তাঁর এই কাজটি যথার্থ স্বীকৃতি এবং প্রশংসা পেয়েছিল। তিনি 'ল্যাব-টু-ল্যাণ্ড' (Lab-to-Land), খাদ্য নিরাপত্তা এবং অন্যান্য আরও বহু পরিবেশ সম্পর্কিত কর্মসূচিরও উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি পদ্মভূষণ এবং বহু অন্য সম্মানমূলক পুরষ্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছিলেন ও ইনস্টিটিউশন অব অ্যাক্সিলেনস (Institution of excellence) এর ফেলোশীপ (Fellowship) লাভ করেছিলেন।

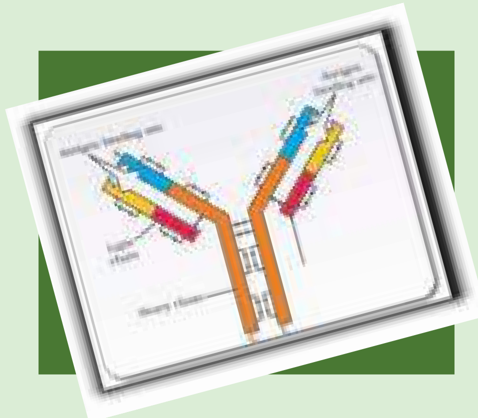

অধ্যায় 8

মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগ
HUMAN HEALTH AND DISEASE

8.1 মানুষের সাধারণ রোগসমূহ (Common Diseases in Humans)

8.2 অনাক্রম্যতা (Immunity)

8.3 এইডস্ (AIDS)

8.4 ক্যান্সার (Cancer)

8.5 ড্রাগসমূহ এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার (Drugs and Alcohol Abuse)

বহুকাল ধরে স্বাস্থ্য বলতে দেহ ও মনের সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে নির্দিষ্ট কিছু তরলের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। হিপোক্রিটস-এর মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রও এইমত পোষণ করত। এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, সব কালো পিত্তরস (Black bile) সমন্বিত ব্যক্তিরা উগ্র (hot) ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় এবং তারা জ্বরে ভোগে। বিশুদ্ধ প্রতিফলিত চিন্তা দ্বারাই এই ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছিল। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) দ্বারা রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কার এবং থার্মোমিটার ব্যবহারের মাধ্যমে কালো পিত্ত সমন্বিত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক দেহ তাপমাত্রার প্রদর্শন স্বাস্থ্যের 'Good humor' তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণিত করেছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে জীববিদ্যার অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে মন স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্ত:ক্ষরা তন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের অনাক্রম্যতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং অনাক্রম্যতন্ত্রই হল সেই তন্ত্র যা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। তাই, মন এবং মানসিক অবস্থা উভয়ই আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। নিম্নলিখিত যে বিষয়গুলো দ্বারা স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয় সেগুলো হল—

i) জিনগত অস্বাভাবিকতা (Genetic disorders)- একটি শিশু যে সকল অভাবজনিত লক্ষণ ও ত্রুটি নিয়ে জন্মায় এবং জন্মলগ্ন থেকে যে সমস্ত তঅস্বাভাবিকতা বা ত্রুটি পিতামাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায় ।

ii) সংক্রমণ (Infections) এবং

iii) খাদ্য ও পানীয় যা আমরা গ্রহণ করি, বিশ্রাম ও শারীরিক ব্যায়াম যা আমরা দেহকে সুস্থ রাখার জন্য করি এবং যে অভ্যাসগুলো আমাদের আছে বা নেই—সবই জীবনশৈলীর অন্তর্গত।

'স্বাস্থ্য' এই পরিভাষাটি প্রত্যেকে প্রায়শই ব্যবহার করে। আমরা কীভাবে একে সংজ্ঞায়িত করবো? স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র 'রোগমুক্ত অবস্থা' বা শারীরিকভাবে 'সক্ষম থাকাকেই' বোঝায় না। স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা বলতে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ভালো থাকাকে বোঝায়। যখন মানুষ সুস্থ থাকে তখন তারা কাজে অনেক বেশি দক্ষ হয়। এটি উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে। স্বাস্থ্য মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ায় এবং শিশু ও মায়ের মৃত্যু কমায়।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সুষম খাদ্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং নিয়মিত শরীর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণাতীত কাল থেকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষে যোগাভ্যাসের চর্চা হচ্ছে। সুস্বাস্থ্য অর্জন করার জন্য রোগসমূহ এবং দেহের বিভিন্ন কাজে এদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া, সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টীকাকরণ (অনাক্রম্যকরণ) করা, বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা, ভেক্টরসমূহের নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য এবং পানীয় জলের উৎসের স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন।

যখন দেহের একটি বা এর অধিক অঙ্গাসমূহ বা তন্ত্রের কার্যকারিতা বিরূপভাবে প্রভাবিত হয় তখন দেহে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় এবং আমরা বলি যে, আমরা সুস্থ নই অর্থাৎ আমরা রোগাক্রান্ত। রোগসমূহকে বিস্তৃতভাবে সংক্রামক এবং অসংক্রামক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত রোগ এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে সহজেই সংক্রমিত হয় তাদের সংক্রামক রোগ বলে। সংক্রামক রোগগুলো সচরাচর বেশি হয় এবং আমরা প্রত্যেকেই এগুলোর দ্বারা অথবা অন্য রোগের দ্বারা মাঝে মাঝে আক্রান্ত হই। সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে AIDS এর মতো কিছু রোগ প্রাণঘাতী হয়। অ-সংক্রামকরোগগুলোর মধ্যে ক্যান্সার রোগটি মানুষের মৃত্যুর একটি মুখ্য কারণ। ড্রাগ এবং অ্যালকোহল অপব্যবহারের ফলেও স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

8.1 মানুষের সাধারণ রোগসমূহ (Common diseases in Human)

ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, হেলমিন্থস ইত্যাদি গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিশাল সংখ্যক জীব মানুষের রোগের কারণ হতে পারে। এরূপ রোগ সৃষ্টিকারী জীবদের প্যাথোজেন বলে। যেহেতু বেশিরভাগ পরজীবী পোষকের দেহের ভেতরে (পোষকের দেহের উপর) বসবাস করে এবং এদের ক্ষতিসাধন করে, তাই এদেরকে প্যাথোজেন বলে। প্যাথোজেনসমূহ বিভিন্ন উপায়ে আমাদের দেহে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় এবং আমাদের স্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে বাধাদান করে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমাদের দেহে অঙ্গা সংস্থানিক এবং কার্যগত ক্ষতিসাধিত হয়। প্যাথোজেনকে বেঁচে থাকার জন্য পোষক দেহে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজিত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পৌষ্টিকনালীতে প্রবিষ্ট প্যাথোজেনগুলো পাকস্থলীতে নিম্ন pH-এ টিকে থাকার জন্য এবং এদের উপর বিভিন্ন পাচক উৎসেচকের ক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য অবশ্যই একটি উপায় অবলম্বন করে। এখানে প্যাথোজেনিক জীবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কিছু সদস্য এবং এদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই রোগগুলোর প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

Salmonella typhi হল একটি প্যাথোজেনিক ব্যাকটিরিয়া যা মানবদেহে টাইফয়েড জ্বর সৃষ্টি করে। এই প্যাথোজেনগুলো সাধারণত এদের দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য ও জল এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তের মাধ্যমে অন্যান্য অঙ্গাসমূহে পৌঁছায়। লাগাতর জ্বর (39^0C থেকে 40^0C), দুর্বলতা, পেটব্যাথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য এগুলো হলো এই রোগের লক্ষণ। গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে অন্ত্রে ছিদ্র সৃষ্টি হয় এবং রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। টাইফয়েড জ্বর হয়েছে কিনা তা ওয়াইডাল পরীক্ষা (Widal test) এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যেতে পারে। চিকিৎসাক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল মেরি ম্যালন (Mary Mallon)

যিনি টাইফয়েড মেরি (Typhoid mary) নামে পরিচিত। পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন রাঁধুনি এবং টাইফয়েড রোগের বাহক যিনি বহু বছর ধরে তাঁর তৈরি খাবারের মাধ্যমে টাইফয়েড রোগ অনবরত ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

Streptococcus pneumoniae এবং *Haemophilus influenzae* এর মতো ব্যাকটিরিয়াগুলো মানব দেহে নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী যেগুলো ফুসফুসের বায়ুথলিগুলোর (বায়ুপূর্ণ) সংক্রমণ ঘটায়। এই সংক্রমণের ফলে বায়ুথলিগুলো তরলে পূর্ণ হয়ে যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে শ্বাসকার্যে গুরুত্বর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো হল জ্বর, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, কাশি এবং মাথাব্যথা। গুরুতর অবস্থায় ঠোঁট এবং আঙুলের নখগুলো ধূসর থেকে নীলাভ বর্ণ ধারণ করতে পারে। একজন সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির সঙ্গে নির্গত ক্ষুদ্র জলকণা/অ্যারোসোল প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের ফলে অথবা এক সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত গ্লাস এবং বাসনপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমণ ঘটে। ডিসেন্ট্রি, প্লেগ, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি হল মানুষের আরোও কিছু ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ।

মানবদেহে বহু ভাইরাসও রোগ সৃষ্টি করে। রাইনো ভাইরাস হল এমন একটি গোষ্ঠীর ভাইরাস যেগুলো মানবদেহে অত্যন্ত সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে একটি রোগ অর্থাৎ **সাধারণ সর্দিকাশি (Common cold)** সৃষ্টি করে। এই ভাইরাসগুলো নাক এবং শ্বসন পথের সংক্রমণ ঘটায় কিন্তু ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটায় না। সাধারণ সর্দিকাশির লক্ষণগুলো হল— নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং জল পড়া, গলাব্যাথা, স্বরভঙ্গ, কাশি, মাথাব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি এবং এই লক্ষণগুলো সাধারণত 3-7 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সংক্রমিত ব্যক্তির কাশি অথবা হাঁচির সঙ্গে নির্গত জলকণা সরাসরি প্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত হয় বা কলম, বই, কাপ, দরজার কড়া, কম্পিউটারের কী-বোর্ড অথবা মাউস ইত্যাদির মতো সংক্রামিত বস্তুসমূহের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমণ ঘটায় ।

মানুষের কিছু কিছু রোগ প্রোটোজোয়া ঘটিতও হয়। তোমরা অবশ্যই **ম্যালেরিয়া রোগ** সম্পর্কে শুনে থাকবে, এটি এমন একটি রোগ যে রোগের সাথে মানুষ বহু বছর ধরে লড়ে আসছে। প্লাজমোডিয়াম নামক একটি ক্ষুদ্র প্রোটোজোয়া এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। প্লাজমোডিয়ামে বিভিন্ন প্রজাতি *(P. vivax, P. malariae, P. falciparum)* বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী। এই ম্যালেরিয়া রোগগুলোর মধ্যে *Plasmodium falciparum* এর কারণে সৃষ্ট ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হল সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ এবং এমনকি এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

চলো, আমরা একনজরে প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রটি দেখি (চিত্র 8.1)। সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকীর দংশনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট (সংক্রামক রূপ) রূপে প্লাজমোডিয়াম **(Plasmodium)** মানবদেহে প্রবেশ করে। প্রাথমিক অবস্থায় পরজীবীগুলো যকৃৎ কোশসমূহের অভ্যন্তরে বিভাজিত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং এরপর লোহিত রক্তকণিকাগুলোকে আক্রমণ করে ও এর ফলে লোহিত রক্তকণিকার বিদারণ ঘটে। লোহিত রক্তকণিকাসমূহের বিদারণ এদের থেকে হিমোজোয়িন (Haemozoin) নামক এক ধরনের বিষাক্ত বস্তু (toxic substance) নি:সৃত হয়, যার ফলে তিন থেকে চারদিন অন্তর অন্তর দেহ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে ও তীব্র জ্বর আসে। যখন একটি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকী একজন সংক্রমিত ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন এই পরজীবীগুলো মশকীর দেহে প্রবেশ করে এবং পরজীবীর পরবর্তী বিকাশ দশাগুলো চলতে থাকে। মশকীর দেহে পরজীবীগুলো সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্পোরোজয়েট গঠন করে যেগুলো মশকীর লালাগ্রন্থিতে সঞ্চিত থাকে। যখন এই মশকীগুলো কোনো একজন ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন এই স্পোরোজয়েটগুলো তার দেহে প্রবেশ করে এবং উপরিউক্ত ঘটনাবলীর সূত্রপাত ঘটায়। মজার বিষয় হল এই যে, ম্যালেরিয়া পরজীবীটির জীবনচক্র সম্পূর্ণ করার জন্য দুটি পোষকের প্রয়োজন হয় এবং এগুলো হলো— মানুষ এবং মশা (চিত্র 8.1); স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া পরজীবীটির ভেক্টর (সঞ্চরণকারী মাধ্যম)ও বটে।

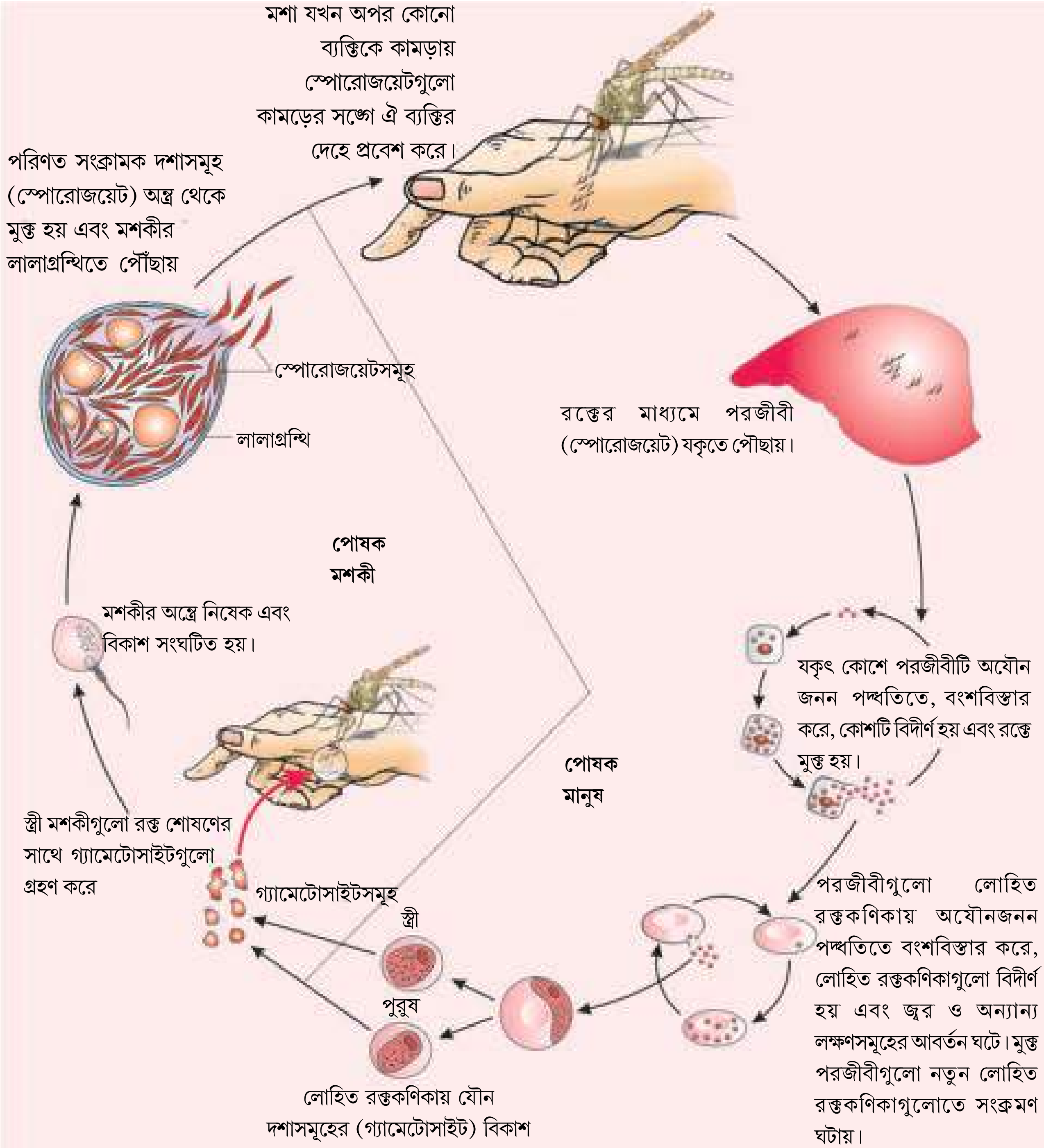

চিত্র 8.1 প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ

Entamoeba histolytica হল মানুষের বৃহদন্ত্রস্থিত প্রোটোজোয়া গোষ্ঠীভুক্ত একটি পরজীবী যা আমাশয় বা অ্যামিবায়োসিস (amoebic dysentery) সৃষ্টি করে। এই রোগের লক্ষণগুলো হল- কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটব্যথা ও খিঁচুনি, মলের সাথে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ও তঞ্চিত রক্ত নির্গত হওয়া। এক্ষেত্রে মাছি যান্ত্রিকবাহক রূপে কাজ করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির মল থেকে পরজীবীকে খাদ্য ও খাদ্য সামগ্রীতে

ছড়িয়ে দিয়ে এগুলোকে দূষিত করে। মল জাতীয় পদার্থের দ্বারা দূষিত পানীয় জল এবং খাদ্য হল সংক্রমণের মূল উৎস।

সচরাচর গোলকৃমি নামে পরিচিত *Ascaris* এবং ফাইলেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী কৃমি *Wuchereria* হল হেলমিন্থ গোষ্ঠীভুক্ত কিছু প্রাণী যারা মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে। *Ascaris* নামক আন্ত্রিক পরজীবী প্রাণীটি অ্যাসক্যারিয়াসিস (**Ascariasis**) রোগ সৃষ্টি করে। এই সকল রোগের লক্ষণগুলো হল আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, পেশিতে ব্যথা, জ্বর, রক্তাল্পতা এবং আন্ত্রিকনালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি । আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সঙ্গে পরজীবীর ডিমগুলো নির্গত হয় যা মাটি, জল, উদ্ভিদ ইত্যাদিকে দূষিত করে। দূষিত জল, সবজি, ফল ইত্যাদির মাধ্যমে একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই সংক্রমণ ঘটে।

ফাইলেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী কৃমি *Wuchereria (W. bancrofti* এবং *W. malayi)* সাধারণত নিম্ন প্রত্যঙ্গের লসিকাবাহে বহুবছর ধরে বসবাস করে ও ধীরে ধীরে ঐ অঙ্গাসমূহের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে যে রোগটি হয় তাকে **এলিফ্যানটিয়াসিস (Elephantiasis)** অথবা **ফাইলেরিয়াসিস (Filariasis)** বলে (চিত্র 8.2)। প্রায়শই জননেন্দ্রিয়গুলো আক্রান্ত হয় এবং এরফলস্বরূপ সার্বিক অঙ্গাবিকৃতি ঘটে। এই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহ বা প্যাথোজেনসমূহ রোগের বাহক স্ত্রী মশকীর দংশনের মাধ্যমে কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে বাহিত হয়।

চিত্র 8.2 এলিফিয়েন্টাসিস এর কারণে নিম্নাঙ্গাগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটিতে প্রদাহ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

Microsporum, Trichophyton এবং *Epidermophyton* গণের অন্তর্গত বহু ছত্রাক মানুষে সচরাচর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এমন সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে একটি সংক্রামক রোগ **দাদ বা রিং ওয়ার্মের** জন্য দায়ী। ত্বক, নখ এবং মাথার খুলির উপরিত্বক (scalp) (চিত্র 8.3) এর মতো দেহের বিভিন্ন অংশে শুষ্ক, আঁশযুক্ত ক্ষত চিহ্নের আবির্ভাব এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই ক্ষতগুলোতে তীব্র চুলকানি হয়। তাপ ও আর্দ্রতা এই ছত্রাকগুলোর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং এর ফলস্বরূপ এগুলো কুঁচকি বা পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানের মতো ত্বকের ভাঁজগুলোতে বেড়ে উঠে। দাদ সাধারণত মাটি থেকে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির তোয়ালে, কাপড় অথবা এমনকি চিরুনির মাধ্যমেও কোনো সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।

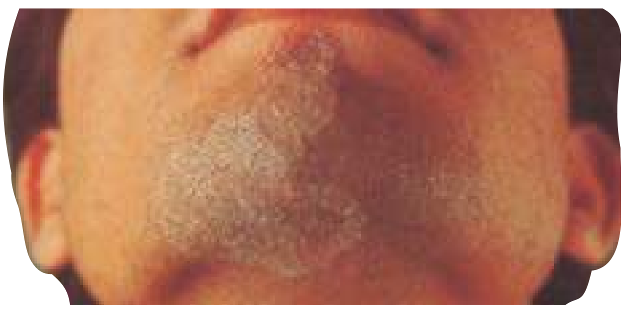

চিত্র 8.3 ত্বকে রিংওয়ার্ম আক্রান্ত স্থান চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে

বহু সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তিগত এবং জনস্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায়গুলো হল— দেহ পরিষ্কার রাখা, পরিষ্কার পানীয় জল, খাদ্য, শাকসব্জি, ফল গ্রহণ করা। জনস্বাস্থ্যবিধি বলতে বর্জ্য এবং মলমূত্রের যথাযথ নিষ্পত্তি, নিয়মিতভাবে জলাশয়, পুকুর, ভূ-গর্ভস্থ মলাধার এবং জলাধারগুলো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা এবং কোনো অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশনকালে আদর্শ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাকে বোঝায়। টাইফয়েড, অ্যামিবায়োসিস এবং অ্যাসক্যারিয়াসিস এর মতো যেসব রোগে সংক্রমিত জীবাণুগুলো খাদ্য ও জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সেইসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলা আবশ্যক। নিউমোনিয়া এবং সাধারণ সর্দিকাশির মতো বায়ুবাহিত রোগসমূহের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো সহ সংক্রামিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা এবং তাদের জিনিসপত্রের ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়াসিস এর মতো রোগসমূহ, যেগুলো বাহক পতঙ্গের মাধ্যমে,

বাহিত হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটি হল ভেক্টর এবং তাদের প্রজনন স্থানের নিয়ন্ত্রণ অথবা ধ্বংস সাধন। জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং তার চারপাশে জল জমতে না দেওয়া, বাড়িতে ব্যবহৃত কুলারসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা, মশারি ব্যবহার করা, পুকুরে মশার লার্ভা ভক্ষণকারী *Gambusia*-এর মতো মাছ ছেড়ে দেওয়া, খাল, নালা নর্দমাযুক্ত অঞ্চল এবং জলাজমি ইত্যাদিতে কীটনাশক স্প্রে করা ইত্যাদির মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে। এছাড়া ঘরে মশার প্রবেস রোধ করার জন্য দরজা এবং জানালায় তারের জাল ব্যবহার করা উচিত। সাম্প্রতিককালে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষত ডেঙ্গু (dengue) চিকনগুনিয়ার (chikungunya) মতো ভেক্টরবাহিত এডিস মশকী রোগসমূহ ছড়িয়ে পড়ার কথা মাথায় রেখে এধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীববিদ্যায় অগ্রগতি ঘটার ফলে কার্যকরীভাবে আমরা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছি। টীকা ব্যবহার এবং অনাক্রম্যকরণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে আমরা গুটি বসন্তের মতো একটি মারণরোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সমর্থ হয়েছি। অন্যান্য বহু সংক্রামক রোগসমূহ যেমন পোলিও, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া এবং টিটেনাস রোগ টীকাকরণের মাধ্যমে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। জৈব প্রযুক্তির (এ সম্পর্কে অধ্যায় 12 -এ তোমরা আরোও বিশদভাবে পড়বে) মাধ্যমে আরোও নতুন নতুন এবং নিরাপদ টীকাসমূহ তৈরির কাজ চলছে। অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ঔষধের আবিষ্কারের ফলেও আমরা কার্যকরীভাবে সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় সক্ষম হয়েছি।

8.2 অনাক্রম্যতা (Immunity)

প্রতিদিন আমরা বিশাল সংখ্যক সংক্রমণ সৃষ্টিকারী বস্তুর সংস্পর্শে আসি। তবে এইভাবে যতবার আমরা জীবাণুর সংস্পর্শে আসি তার মধ্যে কেবলমাত্র কিছু ক্ষেত্রেই রোগ সৃষ্টি হয়। কেন? এর কারণ হল এই যে, আমাদের দেহ বেশিরভাগ বহিরাগত সংক্রমণ সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। অনাক্রম্যতন্ত্রের সহায়তায় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে পোষকের লড়াই করার সামগ্রিক এই ক্ষমতাকে **অনাক্রম্যতা** বলে।

অনাক্রম্যতা দুই ধরনের হয় : i) সহজাত অনাক্রম্যতা (Innate immunity) (ii) অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity)

8.2.1 সহজাত অনাক্রম্যতা (Innate Immunity)

সহজাত অনাক্রম্যতা দেহের প্রতিরক্ষার এমন একটি ধরণ যা সুনির্দিষ্ট নয় এবং এটি জন্মলগ্ন থেকেই দেহে বর্তমান থাকে। আমাদের দেহে বহিরাগত বস্তুসমূহের প্রবেশ পথে বিভিন্ন ধরনের বাধাদায়কের উপস্থিতির মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। সহজাত অনাক্রম্যতায় চার ধরনের বাধাদায়ক দেখা যায়। এগুলো হল—

i) **শারীরিক বাধাদায়ক (Physical Barriers)** : আমাদের দেহে ত্বক হল একটি মুখ্য বাধাদায়ক যা দেহে অণুজীবের প্রবেশে বাধাদান করে। শ্বসনপথ, পৌষ্টিকনালীপথ এবং রেচন-জনন পথে এপিথেলিয়াম কলার প্রাকারে মিউকাস আচ্ছাদনও আমাদের দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুগুলোকে আবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

ii) **শারীরবৃত্তীয় বাধাদায়ক (Physiological barriers) :** পাকস্থলীস্থিত অ্যাসিড, মুখগহ্বরস্থিত লালারস, চোখের জল এই সবই অণুজীবদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

iii) **কোশীয় বাধাদায়ক (cellular barriers):** লিউকোসাইট (WBC) এর মতো আমাদের দেহে নির্দিষ্ট ধরনের শ্বেতরক্তকণিকা যেমন পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইট [Polymorpho-nuclear leukocytes (PMNL-neutrophils)] এবং মনোসাইটসমূহ ও রক্তস্থিত প্রাকৃতিক ঘাতক (এক ধরনের লিম্ফোসাইট) সেইসাথে কলার ম্যাক্রোফাজও অণুজীবসমূহকে আত্মসাৎ করে এবং ধ্বংস করে।

iv) **সাইটোকাইন বাধাদায়ক (Cytokine barriers):** ভাইরাস আক্রান্ত কোশগুলো ইন্টারফেরন নামক প্রোটিন ক্ষরণ করে যেগুলো পরবর্তীতে অনাক্রান্ত কোশগুলোকে ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

8.2.2 অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired Immunity)

অন্যদিকে, অর্জিত অনাক্রম্যতা প্যাথোজেন সুনির্দিষ্ট হয়। অর্জিত অনাক্রম্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মেমোরি বা স্মৃতিনির্ভর। এর অর্থ হল এই যে, আমাদের দেহ যখন প্রথমবারের মতো কোনো প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের দেহ যে সাড়া দেয়, তাকে প্রাথমিক অনাক্রম্য সাড়া (primary response) বলে এবং এটি কম তীব্রতা সম্পন্ন হয়। এরপর যতবারই আমাদের দেহ একই প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসে ততবারই দেহে অধিকতর তীব্রতা সম্পন্ন গৌণ অথবা অ্যানামন্যাস্টিক (anamnestic) সাড়ার সৃষ্টি হয়। এটি এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে যে, আমাদের দেহ রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সঙ্গে প্রথম মোকাবিলাটিকে মনে রেখেছে।

আমাদের রক্তে উপস্থিত দুটি বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট অর্থাৎ **B লিম্ফোসাইট** এবং **T লিম্ফোসাইটের** সাহায্যে প্রাথমিক এবং গৌণ অনাক্রম্য সাড়া সংঘটিত হয়।

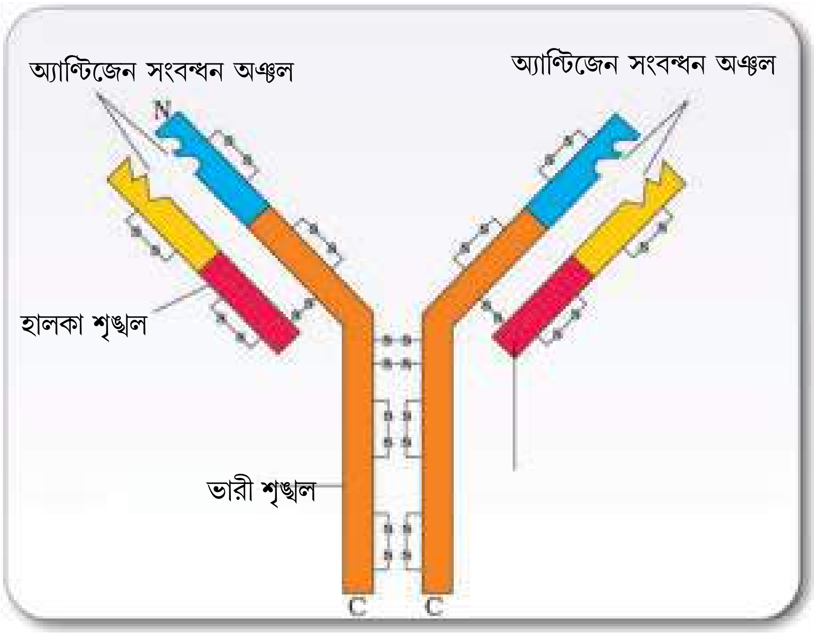

চিত্র 8.4 একটি অ্যান্টিবডি অণুর গঠন

আমাদের রক্ত প্যাথোজেনের উপস্থিতিতে সাড়া দিয়ে এবং ঐ প্যাথোজেনগুলোর সাথে লড়াই করার জন্য B লিম্ফোসাইট প্রোটিনের একটি সৈন্যদল (army of protein) গঠন করে। এই প্রোটিনগুলোকে অ্যান্টিবডি বলে। T লিম্ফোসাইট কোশগুলো নিজেরা কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি করে না কিন্তু B লিম্ফোসাইট কোশগুলোকে অ্যান্টিবডি তৈরিতে সাহায্য করে। প্রতিটি অ্যান্টিবডি অণু চারটি পেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ছোটো দুটি শৃঙ্খলকে **হালকা শৃঙ্খল (Light chain)** এবং দীর্ঘ শৃঙ্খল দুটিকে **ভারী শৃঙ্খল (Heavy chain)** বলে। এজন্য একটি অ্যান্টিবডিকে H_2L_2 রূপে প্রকাশ করা হয়। আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু অ্যান্টিবডি হল IgA, IgM, IgE, IgG. চিত্র 8.4 এ একটি অ্যান্টিবডির নক্সা দেওয়া হয়েছে। এই অ্যান্টিবডিগুলো রক্তে উপস্থিত থাকে বলে এই অনাক্রম্য সাড়াকে রসভিত্তিক **(Humoral Immune response)** অনাক্রম্য সাড়াও বলে। আমাদের দেহে যে দুই ধরনের অর্জিত অনাক্রম্য সাড়া দেখা যায় তাদের মধ্যে একটি হল রস ভিত্তিক অনাক্রম্য সাড়া এবং এটি অ্যান্টিবডি ভিত্তিক। দ্বিতীয় ধরণটিকে কোশভিত্তিক অনাক্রম্য সাড়া অথবা **কোশভিত্তিক অনাক্রম্যতা [Cell-mediated immunity (CMI)]** বলে। মানব দেহের কোনো অঙ্গ যেমন হৃৎপিণ্ড, চোখ, যকৃত, বৃক্ক যখন প্রায়শই সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে অক্ষম হয় তখন রোগীকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়টি হল অঙ্গপ্রতিস্থাপন। তখন একজন উপযুক্ত দাতার খোঁজ শুরু হয়। অঙ্গপ্রতিস্থাপনের জন্য যে-কোনো ব্যক্তি থেকে অঙ্গ নেওয়া যেতে

পারে না কেন? এক্ষেত্রে ডাক্তার কী পরীক্ষা করেন? যেহেতু অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য দাতা থেকে নেওয়া নির্দিষ্ট কলা কোশ বা অঙ্গ, অর্থাৎ গ্রাফ্ট প্রতিস্থাপনের পর তৎক্ষণাৎ বা পরে গ্রহীতার দ্বারা প্রত্যাঘাত হতে পারে তাই গ্রাফ্টগুলো যে-কোনো উৎস অর্থাৎ একটি প্রাণী, অন্য কোনো প্রাইমেট বা মানুষ থেকে নিয়ে গ্রহীতার দেহে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে না। যে-কোনো ধরনের গ্রাফ্ট/ট্রান্সপ্ল্যান্ট প্রতিস্থাপনের পূর্বে দাতা ও গ্রহীতার টিস্যু ম্যাচিং (tissue matching) এবং ব্লাডগ্রুপ ম্যাচিং (Blood group matching) করা আবশ্যক এবং এমনকি এই প্রতিস্থাপনের পরে রোগীকে সারাজীবন ধরে অনাক্রম্যতা অবদমনকারী (immuno-suppresants) ড্রাগ গ্রহণ করতে হবে। দেহ 'স্ব' এবং 'স্ব-বিরোধী' বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় এবং কোশ ভিত্তিক অনাক্রম্য সাড়া গ্রাফ্ট প্রত্যাখ্যানের জন্য দায়ী।

8.2.3 সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা (Active and Passive Immunity)

যখন পোষক দেহ অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসে তখন পোষক দেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। এই অ্যান্টিজেন সজীব বা মৃত জীবাণুরূপে বা অন্য প্রোটিনরূপে পোষকের সংস্পর্শে আসতে পারে। এই ধরনের অনাক্রম্যতাকে **সক্রিয় অনাক্রম্যতা** বলে। সক্রিয় অনাক্রম্যতা ধীরগতিতে গড়ে উঠে এবং সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে এটি অনেকটা সময় নেয়। অনাক্রম্যকরণকালে দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে অণুজীবের প্রবেশ করানোর ফলে বা স্বাভাবিক সংক্রমণকালে সংক্রামক অণুজীবগুলো দেহের ভেতরে প্রবেশ করলে সক্রিয় অনাক্রম্যতার সৃষ্টি করে। বিজাতীয় বস্তুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য যখন রেডিমেড (Ready made) অ্যান্টিবডিগুলো দেহে সরাসরি প্রবেশ করানো হয় তখন তাকে **নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা** বলে। তোমরা কি জান কেন মাতৃদুগ্ধ সদ্যজাত শিশুর জন্য অত্যন্ত অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়? দুগ্ধক্ষরণের শুরুর দিকে মাতৃদেহ থেকে যে হলুদাভ তরল অর্থাৎ **কলোস্ট্রাম (colostrum)** ক্ষরিত হয় তাতে সদ্যজাত শিশুকে সুরক্ষা প্রদানকারী প্রচুর অ্যান্টিবডি (IgA) থাকে। শিশু ভ্রূণটি (foetus) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়েও প্লাসেন্টার মাধ্যমে কিছু অ্যান্টিবডি লাভ করে। এগুলো হল নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার কিছু উদাহরণ।

8.2.4 টীকাকরণ এবং অনাক্রম্যকরণ (Vaccination and Immunisation)

অনাক্রম্যকরণ বা টীকাকরণ নীতি অনাক্রম্যতার মেমোরি (memory) বা স্মৃতি অংশের ধর্মের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। টীকাকরণের ক্ষেত্রে প্যাথোজেন এর অ্যান্টিজনিক প্রোটিনের প্রিপারেশান বা নিষ্ক্রিয়/দুর্বল প্যাথোজেনকে (vaccine) দেহে প্রবেশ করানো হয়। এই অ্যান্টিজেনগুলোর বিরুদ্ধে দেহে উৎপন্ন অ্যান্টিবডিগুলো প্রকৃত সংক্রমণকালে দেহে প্রবিষ্ট রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা প্যাথোজেনগুলোকে প্রশমিত করবে। টীকাগুলো (vaccines) দেহে B মেমোরি কোশ এবং T- মেমোরি কোশও তৈরি করে যেগুলো পরবর্তীকালে দেহে প্রবিষ্ট প্যাথোজেনগুলোকে দ্রুত সনাক্ত করে এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে দেহে আক্রমণকারী প্যাথোজেনগুলোকে বিনষ্ট করে। যদি কোনো ব্যক্তির দেহে কোনো প্রাণঘাতী জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে এবং যার জন্য দ্রুত অনাক্রম্য সাড়া সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেমন- টিটেনাসের ক্ষেত্রে সরাসরি ইনজেকশানের মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুত অ্যান্টিবডিগুলো অথবা অ্যান্টিটক্সিন (টক্সিন প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি সমন্বিত প্রিপারেশান) দেহে প্রবেশ করানো প্রয়োজন হয়। এমনকি সর্প দংশনের ক্ষেত্রেও রোগীর দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে যা প্রবেশ করানো হয় তা পূর্ব থেকে প্রস্তুত সাপের বিষ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি সমন্বিত হয়। এই ধরণের অনাক্রম্যকরণকে **নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যকরণ** বলে।

রিকম্বিন্যান্ট DNA প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যাকটিরিয়া অথবা ইস্ট প্যাথোজেনের অ্যান্টিজেনিক পলিপেপটাইডের উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং অনাক্রম্যকরণের জন্য ভ্যাকসিনের লভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ- ইস্ট থেকে প্রস্তুত হেপাটাইসিস B ভ্যাকসিন।

8.2.5 এলার্জি (Allergies)

কোনো নতুন জায়গায় গেলে তুমি হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই হাঁচি দিতে শুরু কর বা জোরে জোরে নি:শ্বাস ফেল এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করলে তোমার দেহে ওই উপসর্গগুলো আর দেখা যায় না। তোমাদের সঙ্গে কি কখনও এরকম হয়েছিল? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবেশে উপস্থিত কিছু বস্তুকণার প্রতি সংবেদনশীল হয়। পরাগরেণু, অতিক্ষুদ্র কীট ইত্যাদির প্রতি এলার্জির কারণ উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়াটি হতে পারে যা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পরিবেশে উপস্থিত কিছু নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি অনাক্রম্যতন্ত্রের এই মাত্রাতিরিক্ত সাড়াকে **এলার্জি** বলে। দেহ যেসব বস্তুর সংস্পর্শে এলে এরূপ অনাক্রম্য সাড়া সৃষ্টি হয় তাদের অ্যালার্জেনস (allergens) বলে। এই ধরনের অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে দেহে যে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি হয় সেগুলো IgE প্রকৃতির হয়। অ্যালার্জেনের কিছু সাধারণ উদাহরণ হল ধূলিকণায় উপস্থিত মাইটসমূহ, পরাগরেণু, প্রাণীদেহ থেকে খসে পড়া অংশসমূহ (dander) ইত্যাদি। এলার্জি প্রতিক্রিয়ার উপসর্গগুলো হল হাঁচি, চোখ দিয়ে জল পড়া, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা পড়া এবং শ্বাসকার্যে অসুবিধা হওয়া। মাস্ট কোশগুলো থেকে হিস্টামিন এবং সেরোটোনিনের মতো রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসৃত হওয়ার কারণে এলার্জি হয়। এলার্জির কারণ নির্ধারণ করার জন্য রোগীকে খুব অল্প পরিমাণে সম্ভাব্য অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে রাখা হয় অথবা তার দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াগুলো অধ্যয়ন করা হয়। অ্যান্টি-হিস্টামিন, অ্যাড্রিনালিন এবং স্টেরয়েড এর মতো কিছু ঔষধের ব্যবহার এলার্জির উপসর্গগুলো দ্রুত কমিয়ে দেয়। কোনো না কোনোভাবে আধুনিক জীবন যাত্রার ফলশ্রুতিতে দেহের অনাক্রম্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দেহ অ্যালার্জেনসমূহের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে — ভারতের মেট্রো শহরগুলোতে বেশিরভাগ শিশু পরিবেশের প্রতি তাদের সংবেদনশীলতার কারণে এলার্জি এবং হাঁপানি (Asthma) রোগে ভুগছে। শৈশবে সুরক্ষিত পরিবেশ প্রদানের কারণেই এরকম হতে পারে।

8.2.6 স্ব-অনাক্রম্যতা (Auto Immunity)

নিজের দেহের কোশ থেকে বিজাতীয় বস্তুকে (যেমন-প্যাথোজেন) পৃথক করে চিনতে পারার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে স্মৃতিভিত্তিক অর্জিত অনাক্রম্যতার উদ্ভব ঘটেছে। যদিও এখন পর্যন্ত এর ভিত্তি আমাদের বোধগম্য হয়নি তবুও এই ক্ষমতার দুটি অনুসিদ্ধান্ত আমাদের বুঝতে হবে। প্রথমটি হল- উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীরা বহিরাগত অণুসমূহের পাশাপাশি বহিরাগত জীবসমূহকেও পৃথকভাবে চিনতে পারে। বেশিরভাগ পরীক্ষামূলক অনাক্রম্যবিদ্যা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল- মাঝে মাঝে জিনগত বা অন্য অজানা কারণেও দেহ তার নিজের কোশগুলোকে আক্রমণ করে। এর ফলে দেহের ক্ষতি সাধিত হয় এবং একে স্ব-অনাক্রম্য (autoimmune) রোগ বলে। রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis) হল একটি স্ব-অনাক্রম্য রোগ এবং এই রোগে আমাদের সমাজের বহু লোক আক্রান্ত হয়েছে।

8.2.7 দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র (Immune System in the Body)

মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্র লিম্ফয়েড অঙ্গাসমূহ, কলাসমূহ এবং অ্যান্টিবডির মতো দ্রবণীয় অণু নিয়ে গঠিত। তোমরা পড়েছ, অনাক্রম্যতন্ত্র এই অর্থে অনন্য যে এটি বহিরাগত অ্যান্টিজেনদের চিহ্নিত করে, এগুলোর প্রতি সাড়া দেয় ও এদের মনে রাখে। অনাক্রম্যতন্ত্র এলার্জি প্রতিক্রিয়া, স্ব-অনাক্রম্য রোগসমূহ এবং অঙ্গাপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লিম্ফয়েড অঙ্গাসমূহ (Lyaphoid organs): এগুলো হল সেই অঙ্গা যেখানে লিম্ফোসাইট কোশসমূহের উৎপত্তি এবং/বা পরিণমন এবং সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গাগুলো হল অস্থিমজ্জা এবং থাইমাস গ্রন্থি যেখানে অপরিণত লিম্ফোসাইটগুলো বিভেদিত হয়ে অ্যান্টিজেন সংবেদী লিম্ফোসাইট কোশে পরিণত হয়। পরিণমনের পর লিম্ফোসাইট কোশগুলো প্লীহা (spleen), লসিকাগুটি (Lymph

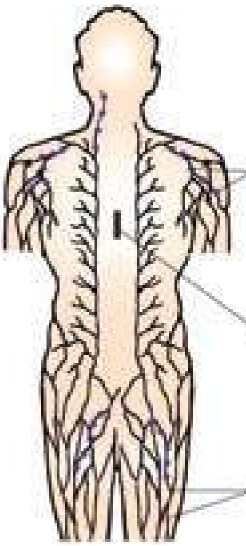

চিত্র 8.5 লসিকাগুটিসমূহের চিত্ররূপ উপস্থাপন

nodes), টন্সিল, ক্ষুদ্রান্ত্রের পিয়ারস প্যাচ এবং অ্যাপেনডিক্স এর মতো গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গাসমূহে পৌছায়। গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গাগুলোতে অ্যান্টিজেনের সঙ্গো লিম্ফোসাইটের আন্ত:ক্রিয়া ঘটে এবং এরপর লিম্ফোসাইটগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি করে কার্যকরী কোশে পরিণত হয়। মানুষের দেহে বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গোর অবস্থান চিত্র 8.5-এ দেখানো হয়েছে।

অস্থিমজ্জা হল মুখ্য লিম্ফয়েড অঙ্গা যেখানে লিম্ফোসাইট সহ সব রক্তকোশগুলো উৎপন্ন হয়। থাইমাস হল একটি খণ্ডবিশিষ্ট অঙ্গা যা হৃৎপিণ্ডের কাছে এবং বক্ষাস্থির নীচে অবস্থান করে। জন্মের সময় থাইমাসের আকৃতি অনেকটা বড় থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো এর আকার ছোটো হতে থাকে এবং বয়:সন্ধিকালে এর আকার হ্রাস পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট হয়ে যায়। অস্থিমজ্জা এবং থাইমাস উভয়েই T- লিম্ফোসাইটের বিকাশ এবং পরিণমনের জন্য কার্যকরী পরিবেশ (micro environment) প্রদান করে। প্লীহা বিন-আকৃতিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ অঙ্গা। এতে প্রধানত লিম্ফোসাইট এবং ফ্যাগোসাইট বা ভক্ষ্যধর্মী কোশসমূহ রয়েছে। এটি রক্তবাহিত অণুজীবগুলোকে আবদ্ধ করার মাধ্যমে রক্তের একটি ছাঁকনির রূপে কাজ করে। প্লীহাতে লোহিত রক্তকণিকার একটি বৃহৎ সঞ্চয় ভাণ্ডারও রয়েছে। লিম্ফনোড বা লসিকাগুটিগুলো ক্ষুদ্র নিরেট গঠনবিশিষ্ট হয় এবং এগুলো লসিকাতন্ত্র বরাবর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে। লসিকা গুটিগুলো লসিকা এবং দেহ তরলে প্রবেশ করতে পারে এমন অণুজীব বা অন্য অ্যান্টিজেনগুলোকে আটকে রাখার কাজ করে। লসিকা গুটিগুলোতে আবদ্ধ অ্যান্টিজেনসমূহ সেখানে উপস্থিত লিম্ফোসাইটগুলোর সক্রিয়করণের জন্য দায়ী এবং এগুলো অনাক্রম্য সাড়া সৃষ্টি করে।

আমাদের দেহস্থিত মুখ্য নালীপথসমূহের (শ্বসনপথ, পৌষ্টিকনালী এবং রেচন-জননালী সমূহ) প্রাকারের ভেতরেও লিম্ফয়েড কলা অবস্থান করে এবং একে **মিউকোসা সমন্বিত লিম্ফয়েড কলা [Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)]** বলে। এটি মানুষের দেহস্থিত লিম্ফয়েড কলার প্রায় 50 শতাংশ গঠন করে।

8.3 এইড্‌স (AIDS)

AIDS শব্দটির পুরো নাম হল **অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)**। এর অর্থ হল অনাক্রম্যতার ঘাটতি যা একজন ব্যক্তি তার জীবনকালে অর্জন করে এবং তাই, এটি কোনো বংশগত রোগ নয়। 'সিনড্রোম' শব্দটির অর্থ হল একগুচ্ছ লক্ষণ। 1981 সালে সর্বপ্রথম AIDS সম্পর্কে জানা গিয়েছিল এবং বিগত পঁচিশ বছরে অথবা তার পরেও এটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর কারণে 25 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের (HIV) সংক্রমণে AIDS হয়। HIV **রেট্রোভাইরাস (Retrovirus)** নামক একটি ভাইরাস গোষ্ঠীর সদস্য। এই ভাইরাসটির RNA জিনোমকে ঘিরে একটি আবরণ রয়েছে (চিত্র 8.6)। HIV-এর সংক্রমণ যে যে উপায়ে ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো হল— (ক) আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন সংসর্গের দ্বারা (খ) সংক্রমিত রক্ত এবং রক্তজাত বস্তুগুলো সঞ্চালনের মাধ্যমে (গ) সংক্রমিত সূঁচ ব্যবহারের মাধ্যমে যা শিরার মধ্য দিয়ে ড্রাগ গ্রহণ করে এরূপ ড্রাগ অপব্যবহারকারীদের মধ্যে দেখা যায়। (ঘ) এবং সংক্রমিত মায়ের দেহ থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে তার সন্তানের মধ্যে। যেসব ব্যক্তিদের একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি যারা শিরার মাধ্যমে ড্রাগ গ্রহণ করে, যেসকল ব্যক্তিদের বারবার রক্তসঞ্চালনের প্রয়োজন এবং যে সমস্ত শিশুরা HIV

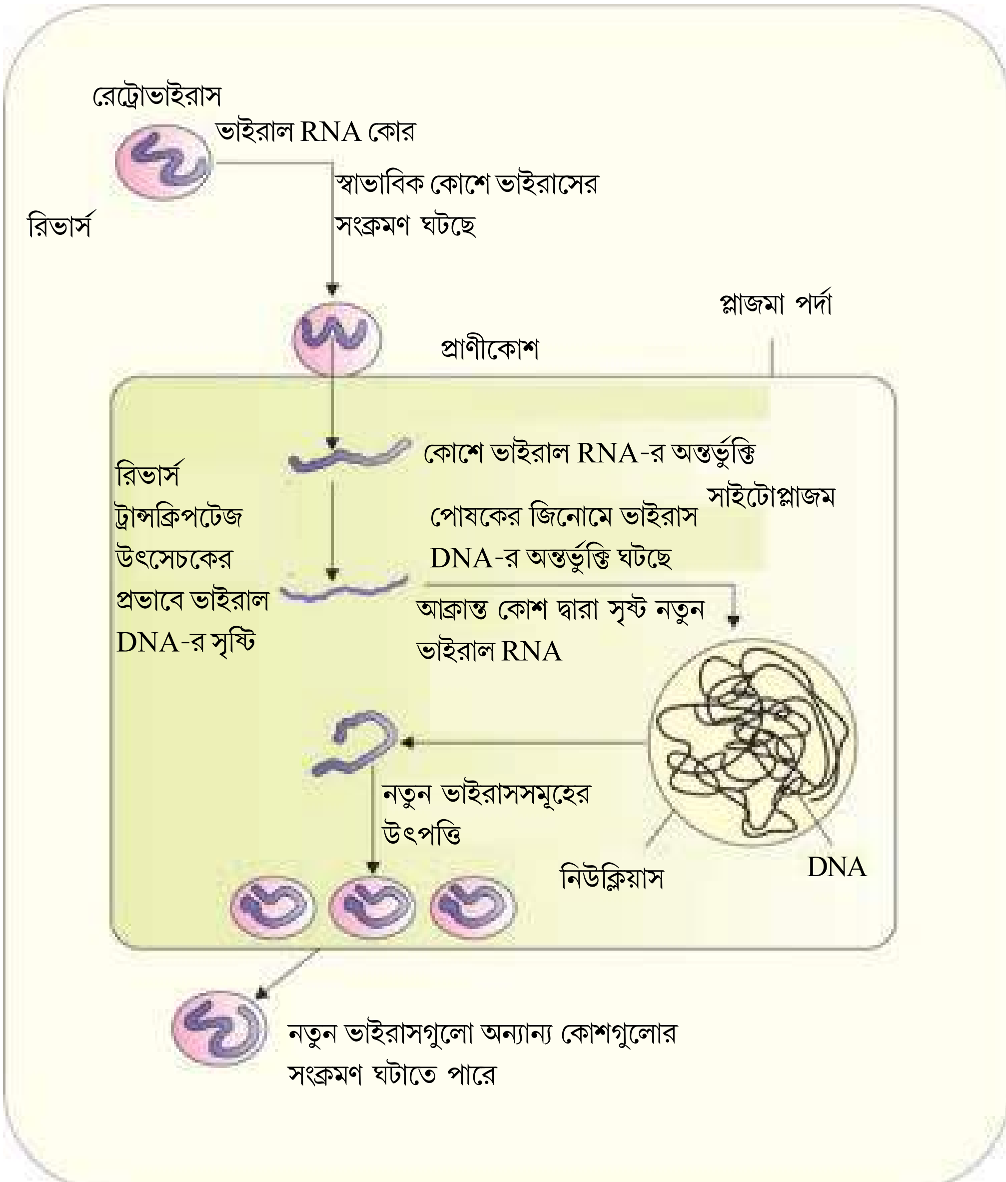

চিত্র 8.6 রেট্রোভাইরাসের প্রতিলিপিকরণ

আক্রান্ত মায়ের থেকে জন্মগ্রহণ করে— তাদের দেহে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। তোমরা কি জান- কোনো ব্যক্তির দেহে কখন বারবার রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়? এরূপ অবস্থাসমূহ খুঁজে বের কর এবং এর একটি তালিকা তৈরি কর। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, HIV/AIDS কেবলমাত্র ছোঁয়া বা শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় না, এটি কেবলমাত্র দেহ তরলের মাধ্যমেও ছড়ায়। তাই HIV আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিবার এবং সমাজ থেকে আলাদা করা উচিত নয় এবং এটি রোগীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। HIV এর সংক্রমনণ ঘটা এবং AIDS এর লক্ষণগুলোর বহি:প্রকাশের মধ্যে সর্বদাই একটি সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়সীমা কয়েকমাস থেকে বহু বছর পর্যন্ত (সাধারণত 5-10 বছর) হতে পারে।

একজন ব্যক্তির দেহে প্রবেশের পর ভাইরাস ম্যাক্রোফাজ এ প্রবেশ করে যেখানে ভাইরাসের RNA জিনোমটি রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ উৎসেচকের সহায়তায় ভাইরাস DNA গঠনের জন্য প্রতিলিপি

গঠন করে। এই ভাইরাস DNA পোষক কোশের DNA এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সংক্রমিত কোশগুলোকে ভাইরাস কণা তৈরিতে উদ্দীপিত করে (চিত্র 8.6) । ম্যাক্রোফাজগুলো অনবরত ভাইরাস তৈরি করতে থাকে এবং এইভাবে এটি HIV ভাইরাস তৈরির কারখানা রূপে কাজ করে। একইরকমভাবে, HIV ভাইরাস সাহায্যকারী T- লিম্ফোসাইট কোশে প্রবেশ করার পর প্রতিলিপি গঠন করে এবং অপত্য ভাইরাস সৃষ্টি করে। অপত্য ভাইরাসগুলো রক্তে নির্গত হয় এবং অন্যান্য সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইটগুলোকে আক্রমণ করে। এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটায় সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইটের (Helper T-lymphocyte) সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়ে আক্রান্ত ব্যক্তি দফায় দফায় জ্বর ও ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং তার দৈহিক ওজন হ্রাস পায়। সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে HIV আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যাকটিরিয়া বিশেষত মাইকো ব্যাকটিরিয়াম, ভাইরাস, ছত্রাক এবং এমনকি টোক্সোপ্লাজমার মত পরজীবীর সংক্রমণে ভুগতে শুরু করে যেগুলো ওই ব্যক্তির HIV সংক্রমণ না ঘটলে সহজেই এড়ানো যেত। রোগীর দেহে এতটাই অনাক্রম্যতার অভাব ঘটে যে সে নিজেকেও এই সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। AIDS সনাক্তকরণের জন্য বহুল ব্যবহৃত পরীক্ষাটি হল **এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনো সরবেন্ট অ্যাসে [Enzyme Linked Immuno Sorvant Assay (ELISA)]**। অ্যান্টি-রেট্রো-ভাইরাল (anti-retroviral) ঔষধের সাহায্যে AIDS রোগের চিকিৎসা কেবলমাত্র আংশিকভাবে কার্যকরী হয়। এগুলো শুধুমাত্র রোগীর জীবনকালকে বাড়াতে পারে কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

AIDS এর প্রতিরোধ :

যেহেতু AIDS রোগের নিরাময় হয় না, তাই এক্ষেত্রে প্রতিরোধই হল সর্বোত্তম উপায়। অধিকন্তু বেশিরভাগ সময়ই HIV সংক্রমণ সচেতন আচরণের কারণেই ছড়ায় এবং নিউমোনিয়া বা টাইফয়েডের মতো রোগসমূহ অসাবধানতাবশত যেভাবে ছড়ায় সেভাবে ছড়ায় না। অবশ্য দুর্বল তত্ত্বাবধানের কারণে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে রোগী, নবজাত শিশু (মা হতে)- এদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটতে পারে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে অজ্ঞতা এবং এটা সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে - "অজ্ঞতার কারণে মারা যাবেনা" (Don't die of ignorance')। আমাদের দেশে জাতীয় AIDS নিয়ন্ত্রণ সংস্থা [National AIDS Control Organisation (NACO)] এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাগুলো [Non-Goverment Organisation (NGOs)] মানুষকে AIDS সম্পর্কে সচেতন করতে বেশ কিছু কাজ করে চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) HIV সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছে। HIV সংক্রমণ রোধে নেওয়া কিছু পদক্ষেপগুলো হল- রক্তকে (ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত রক্ত) HIV সংক্রমণ মুক্ত রাখা, সরকারী এবং বেসরকারী হাসপাতালগুলো এবং ক্লিনিকে কেবলমাত্র নিষ্পত্তিযোগ্য (disposable) ও নিডল ও সিরিঞ্জ-এর ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, বিনামূল্যে কনডোম বিতরণ করা, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আনা, সুরক্ষিত যৌন মিলন নিশ্চিত করা এবং HIV সংক্রমণ ঘটতে পারে এমন জনগোষ্ঠীতে প্রতিনিয়িত HIV এর জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

কোনো ব্যক্তি HIV দ্বারা সংক্রামিত হল অথবা AIDS এ আক্রান্ত হলে তা গোপন করা উচিত নয় কারণ, তখন থেকেই এই সংক্রমণ বহু লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। HIV/AIDS আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় বরং এদের সাহায্য করা এবং এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ না সমাজ একে এমন একটি সমস্যা রূপে চিহ্নিত করতে পারছে যার সমাধান সামগ্রিকভাবেই করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত এই রোগটির ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে চলবে। এটি এমন একটি ব্যধি যা কেবলমাত্র সমাজ ও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর একত্রে কাজ করার মাধ্যমে মোকাবিলা করা যেতে পারে এবং এইভাবে এই রোগের বিস্তার রোধ করা যেতে পারে।

8.4 ক্যান্সার (Cancer)

মানুষের সবচেয়ে মারণাত্মক রোগগুলোর মধ্যে একটি হল **ক্যান্সার** এবং এই রোগটি সমগ্র বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। এক মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয় ক্যান্সারে ভুগছে এবং প্রতি বছর এই রোগীদের বিশাল একটি অংশ মারা যায়। জীববিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষেত্র হল ক্যান্সারের বিকাশ এবং কোশগুলোর অঙ্কোজেনিক রূপান্তরের পদ্ধতি এর চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের দেহে কোশের বৃদ্ধি এবং বিভেদীকরণ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিয়মিতভাবে ঘটে। ক্যান্সার কোশগুলোতে এই নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাসমূহ ভেঙ্গে যায়। স্বাভাবিক কোশগুলোর একটি ধর্ম হল **কন্টাক্ট ইনহিবিশান (Contact inhibition)** যার ফলে কোনো কোশ যখন অন্য কোশসমূহের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্যান্সার কোশগুলোর এই ধর্মটি নষ্ট হয়ে যায়। এরফলে ক্যান্সার আক্রান্ত কোশগুলো অনবরত বিভাজিত হয়ে কোশসমষ্টির সৃষ্টি করে, যাকে **টিউমার** বলে। টিউমার দুই ধরনের হয়— বিনাইন এবং ম্যালিগনেন্ট। **বিনাইন টিউমারগুলো** সাধারণত তাদের মূল অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে এবং শরীরের অন্যান্য অংশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে না এবং খুব সামান্যই ক্ষতিকর হয়। অপরদিকে **ম্যালিগনেন্ট টিউমারগুলো** হল একগুচ্ছ বর্ধনশীল কোশ যাদের নিউপ্লাস্টিক অথবা টিউমার কোশ বলে। এই কোশগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আশেপাশের সাধারণ কলাকোশগুলোকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে। এই কোশগুলো সক্রিয়ভাবে বিভাজিত হয় এবং বৃদ্ধি পায় বলে এরা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিদ্রব্য সমূহের জন্য স্বাভাবিক কোশের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং যার ফলে স্বাভাবিক কোশগুলোতে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। এই টিউমারগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন কোশগুলো রক্তবাহিত হয়ে দূরবর্তী যে স্থানেই পৌঁছায় না কেন সেখানেই জমা হয়ে নতুন টিউমার গঠন করতে শুরু করে। ম্যালিগনেন্ট টিউমারগুলোর এই ধর্মকে **মেটাস্টেসিস (Metastasis)** বলে যা এদের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ধর্ম।

ক্যান্সারের কারণসমূহ (Causes of Cancer) : দেহের স্বাভাবিক কোশসমূহ ভৌত রাসায়নিক বা জীবজ প্রতিলিপি দ্বারা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী নিওপ্লাস্টিক কোশে রূপান্তরিত হতে পারে। এই প্রতিনিধিগুলোকে (agents) **কারসিনোজেন** বলে। X- রশ্মি এবং গামা রশ্মির মতো আয়ণরূপে বাহিত (Ionised) বিকিরণগুলো এবং UV রশ্মির মতো আয়রণ রূপে বাহিত হয় না এমন (non-inoised) বিকিরণগুলো DNA-এর ক্ষতিসাধন করে। এরফলে স্বাভাবিক কোশ নিওপ্লাস্টিক কোশে রূপান্তরিত হয়। তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়ায় উপস্থিত রাসায়নিক কারসিনোজেন ফুসফুসের ক্যান্সারের মুখ্য কারণ। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাসমূহকে অঙ্কোজেনিস ভাইরাস বলে যেগুলোতে ভাইরাস অঙ্কোজিন নামক জিন রয়েছে। এছাড়াও স্বাভাবিক কোশসমূহে **কোশীয় অঙ্কোজিন (cellular oneogene)** বা **প্রোটো অঙ্কোজিন (Proto oncogene)** নামক বহু জিন সনাক্ত করা হয়েছে। এই জিনগুলো যখন কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় সক্রিয় হয় তখন এরা স্বাভাবিক কোশসমূহের অঙ্কোজেনিক রূপান্তর ঘটাতে পারে।

ক্যান্সার রোগের সনাক্তকরণ এবং রোগনির্ণয় (Cancer detection and diagnosis) :

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার রোগের সনাক্তকরণ আবশ্যক। কারণ এরফলে বহু ক্ষেত্রেই চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগটির নিরাময় সম্ভব। রক্ত ও কলাসমূহের বায়োপসি এবং কলাস্থানিক অধ্যয়ন (Histopathological study) এর উপর ভিত্তি করে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা হয় এবং লিউকোমিয়ার ক্ষেত্রে কোশের সংখ্যা বৃদ্ধি গণনার জন্য অস্থিমজ্জা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বায়োপসি পরীক্ষায় একজন প্যাথোলোজিস্ট (Pathologist) দেহ থেকে একটুকরো সন্দেহজনক কলা পাতলা করে কেটে নিয়ে রঞ্জিত করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গাসমূহের ক্যান্সার সনাক্তকরণের জন্য রেডিওগ্রাফি (X-রশ্মির ব্যবহার), CT (কম্পিউটেড টমোগ্রাফি) এবং MRI

(ম্যাগনেটিক রিসোনেন্স ইমেজিং) এর মতো রোগ নির্ণয় পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত উপযোগী হয়। কম্পিউটেড টমোগ্রাফি (Computed Tomography) X- রশ্মি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো বস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠনের ত্রিমাত্রিক দৃশ্য সৃষ্টি করে। MRI পদ্ধতিটি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং আয়ণরূপে বাহিত হয় না এমন বিকিরণ ব্যবহার করে সজীবকলার রোগবিদ্যাগত এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনসমূহ নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করে।

কিছু নির্দিষ্ট ক্যান্সার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ ক্যান্সার নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনসমূহের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল অ্যান্টিবডিগুলোকে ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনগুলোতে ক্যান্সারের সংবেদনশীলতা নির্ণয়ের জন্য আণবিক জীববিদ্যার কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তিতে নির্দিষ্ট ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এ ধরনের জিনগুলোর সনাক্তকরণ, ক্যান্সার প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। নির্দিষ্ট কার্সিনোজেনের প্রতি সংবেদনশীল (উদাহরণ ফুসফুস ক্যান্সার এর ক্ষেত্রে তামাকজাত বস্তুর ধোঁয়া) ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কার্সিনোজেনগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা (Treatment of Cancer) : ক্যান্সার চিকিৎসার সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো হল- শল্য চিকিৎসা, রেডিয়েশান থেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি। রেডিওথেরাপি পদ্ধতিতে টিউমার কোশের পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোশগুলোর কোনো ক্ষতি না করে টিউমার কোশগুলোকে বিকিরণের মাধ্যমে নষ্ট করা যায়। ক্যান্সার কোশগুলোকে বিনষ্ট করার জন্য বহু কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কিছু ড্রাগ কিছু নির্দিষ্ট টিউমারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করে। বেশিরভাগ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে চুলপড়া, রক্তাল্পতা প্রভৃতির মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শল্য চিকিৎসা, রেডিও থেরাপি এবং কেমোথেরাপির সমন্বয় ঘটিয়ে বেশিরভাগ ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয়।

এটা দেখা গেছে যে, টিউমার কোশসমূহকে অনাক্রম্যতন্ত্র দ্বারা সনাক্ত করা যায় না এবং এদের ধ্বংসও সম্ভব নয়। তাই ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের দেহে — ইন্টারফেরনের মতো কিছু বস্তু প্রয়োগ করা, যাদের জীবজ সাড়া পরিবর্তনকারী বস্তু বা বায়োলজিক্যাল রেসপন্স মোডিফায়ার বলে যেগুলো রোগীদের অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং টিউমারকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

8.5 ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার (Drug and alcohol abuses) :

সমীক্ষা এবং পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের ব্যবহার বিশেষত যুবক যুবতীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবিকভাবে এটি একটি চিন্তার বিষয়, যেহেতু এগুলো ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে মানবদেহের উপর বহু ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং পরিচালনার ফলে যুবক যুবতীরা এই ধরনের মারাত্মক আচরণসমূহের ধরন থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে এবং সুস্থ জীবনশৈলী অনুসরণ করে।

যে ড্রাগগুলোর সচরাচর অপব্যবহার হয় সেগুলো হল- ওপয়েড, ক্যানাবিনয়েডস এবং কোকো অ্যালকালয়েডস। এদের মধ্যে বেশিরভাগই সপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় এবং কিছু কিছু

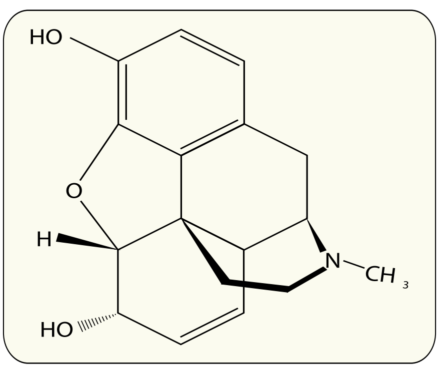

চিত্র 8.7 মরফিনের রাসায়নিক গঠন

চিত্র 8.8 আফিম গাছ

ড্রাগ ছত্রাক থেকেও পাওয়া যায়। ওপয়েড (Opoids) বলতে সেই ড্রাগগুলোকে বোঝায় যেগুলো আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং পাচননালীর গাত্রে উপস্থিত নির্দিষ্ট ওপয়েড গ্রাহকগুলোর সাথে যুক্ত হয়।

হেরোইন ড্রাগটিকে (চিত্র 8.7) সচরাচর স্ম্যাক (smack) বলে এবং এর রাসায়নিক নাম ডাইঅ্যাসিটাইল মরফিন যা সাদা বর্ণের গন্ধহীন, তেতো স্বাদবিশিষ্ট স্ফটিকাকার যৌগ। এটি মরফিনের অ্যাসিটাইলেশানের (চিত্র 8.8) ফলে উৎপন্ন হয় যা আফিম গাছের *(Papaver somniferum)* তরুক্ষীর থেকে নিষ্কাশন করা হয়। হেরোইন সাধারণত গন্ধ শুঁকে এবং ইনজেকশানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং এটি একটি অবসাদ সৃষ্টিকারী ড্রাগ এবং এটি দেহের ক্রিয়াশীলতা হ্রাস করে।

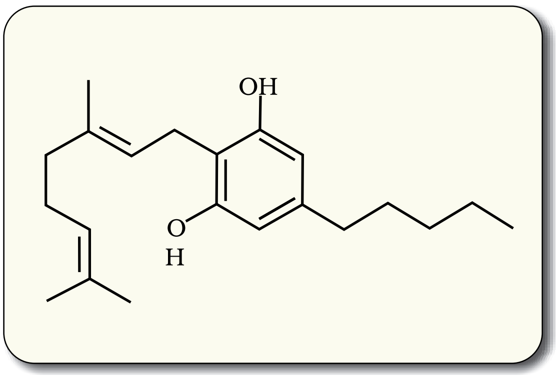

চিত্র 8.9 ক্যালাবিনয়েড অণুর গঠনগত কাঠামো

চিত্র 8.10 ক্যানাভিস স্যাটিভা উদ্ভিদের পাতা

ক্যানাবিনয়েড হল রাসায়নিক বস্তু (চিত্র 8.9) সমূহের একটি গ্রুপ প্রধানত মস্তিষ্কে উপস্থিত ক্যালাবিনয়েড গ্রাহকের সঙ্গে আন্ত:ক্রিয়া করে। *Cannabis sativa* (চিত্র 8.10) নামক উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস থেকে প্রাকৃতিক ক্যানাবিনয়েড পাওয়া যায়। ক্যানাবিস (Cannabis) উদ্ভিদের ফুলের উপরিঅংশ, পাতা এবং রেসিনকে বিভিন্ন সংমিশ্রণে ব্যবহার করে ম্যারিজুয়ানা, হাসিস, চরস এবং গাঁজা প্রস্তুত করা হয়। এই ড্রাগগুলো সাধারণত প্রশ্বাসের সঙ্গে এবং মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং এগুলো দেহের হৃদ-সংবহনতন্ত্রের উপর এদের প্রভাবের জন্য পরিচিত।

কোক অ্যালকালয়েড অথবা কোকেইন *Erythroxylum coca* উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়, যে উদ্ভিদটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, কোক অ্যালকালয়েড বা কোকেইন নিউরোট্রান্সমিটার ডোপামিনের পরিবহনে বাধা দেয়। কোকেইন যা সচরাচর **কোক বা ক্রেক** নামে পরিচিত এটি সাধারণত শুঁকে নেওয়া হয়। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে তীব্রভাবে উদ্দীপিত করে এবং এরফলে শক্তি বৃদ্ধি ও আনন্দের অনুভূতি জাগে। কোকেইন অতিমাত্রায় সেবনের ফলে হ্যালুসিনেশান (hallucination) সৃষ্টি হয়। হ্যালুসিনোজেনিক (Hallucinogenic) ধর্ম দেখা যায় এমন অতি পরিচিত অন্যান্য উদ্ভিদগুলো হল — অ্যাট্রোপা বেলেডোনা *(Atropa belladona)* এবং ধুতরা (চিত্র 8.11)। আজকাল কিছু ক্রিড়াবিদ, ক্যানাবিনয়েড শ্রেণির ড্রাগগুলোর অপব্যবহার করছে।

চিত্র 8.11 ধুতরা উদ্ভিদের শাখা

বারবিচুরেট, অ্যাম্ফিটামাইন, বেনজোডায়াজেপাইন এর মতো ড্রাগসমূহ এবং অন্য একই ধরনের ড্রাগসমূহ যেগুলো অবসাদ এবং অনিদ্রার মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য

করার জন্য সাধারণত ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোরও প্রায়শই অপব্যবহার হয়। মরফিন অতি সক্রিয় উত্তেজনা প্রশমনকারী এবং ব্যথাবেদনা উপশমকারী একটি ড্রাগ এবং এটি শল্য চিকিৎসা হয়েছে এমন রোগীদের জন্য খুবই উপযোগী। হ্যালুসিনোজেনিক ধর্ম রয়েছে এমন বহু উদ্ভিদের ফল ও বীজ হাজার হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে পরম্পরাগত ঔষধ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন এসব উদ্ভিদের ফল এবং বীজ ঔষধি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় অথবা এমন পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যা কোনো ব্যক্তির শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় অথবা মানসিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তখন একে ড্রাগের অপব্যবহার বলে।

ধূমপান ড্রাগ আসক্তির পথকেও সুগম করে। মানুষ 400 বছরেরও বেশি সময় ধরে তামাকের ব্যবহার করে আসছে। এটি ধূমপানের মাধ্যমে, চিবিয়ে অথবা নস্যির মতো ব্যবহার করা হয়। তামাকে নিকোটিন অ্যালক্যালয়েডসহ অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। নিকোটিন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে রক্ত প্রবাহ অ্যাড্রিনালিন ও নর-অ্যাড্রিনালিন-এর ক্ষরণ ঘটায়। এই অ্যাড্রিনালিন ও নর-অ্যাড্রিনালিন রক্তচাপ বাড়ায় এবং হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে। ধূমপানের ফলে ফুসফুস, মূত্রথলি এবং গলার ক্যান্সার ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসিমা, করোনারি হার্ট ডিজিস, গ্যাসট্রিক আলসার ইত্যাদি অধিক হারে ঘটে।

তামাকে সেবনের ফলে মুখগহ্বরের ক্যান্সারের ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে যায়। ধূমপান রক্তে কার্বন মনোঅক্সাইডের (CO) পরিমান বৃদ্ধি করে এবং হিমোগ্লোবিনের হিমের সঙ্গে যুক্ত অক্সিজেনের ঘনত্ব হ্রাস করে। এরফলে দেহে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটে।

যখন একজন ব্যক্তি সিগারেটের প্যাকেট কেনে তখন প্যাকেটের গায়ে ধূমপানের বিপক্ষে লেখা বিধিসম্মত সতর্কতাগুলো এবং ধূমপান কীভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই সংক্রান্ত তথ্যগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। তথাপি সমাজে যুবক এবং বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যে ধূমপান ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধূমপান এবং তামাক সেবনের ক্ষতিকারক প্রভাব ও এদের আসক্তি সৃষ্টিকারী প্রকৃতি জানার পর যুবক এবং বৃদ্ধ উভয়কেই এই অভ্যাসগুলো এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। যে-কোনো ধরনের আসক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য একজন ব্যক্তির পরামর্শ এবং চিকিৎসার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

8.5.1 বয়:সন্ধিকাল এবং ড্রাগ/অ্যালকোহলের অপব্যবহার (Adolescence and Drug/Alcohol Abuse) :

বয়:সন্ধি বলতে “একটি কাল” ও “একটি প্রক্রিয়াকে” বোঝায়, যে সময়কালে একটি শিশু সমাজে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তার মনোভাব এবং বিশ্বাসের দিক দিয়ে পরিণত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে 12-18 বছরের মধ্যবর্তী সময়কালকে বয়:সন্ধি কাল বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে বয়:সন্ধিকাল হল-শৈশব এবং পরিণত অবস্থার মধ্যে একটি যোগসূত্র। বয়:সন্ধিকালে বিভিন্ন জৈবিক এবং আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। তাই বয়:সন্ধিকাল কোনো ব্যক্তির মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অরক্ষিত সময়কাল।

কৌতূহল, রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ কাজের প্রতি আকর্ষণ এবং নতুন কিছু পরখ করার ইচ্ছার কারণেই তরুণ-তরুণীরা ড্রাগ ও অ্যালকোহল ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি শিশুর স্বভাবজাত কৌতূহল তাকে নতুন কিছু পরখ করে দেখতে অনুপ্রাণিত করে। ড্রাগ অথবা অ্যালকোহলের ব্যবহারের ফলে অনুভূত সুবিধাসমূহ বিষয়টিকে বা সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে। তাই ড্রাগ বা অ্যালকোহলের ব্যবহার প্রাথমিক অবস্থায় কৌতূহলবশত বা পরখ করার জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু পরবর্তী সময় শিশুটি সমস্যার সম্মুখীণ হওয়া এড়াতে ড্রাগ ব্যবহার করতে শুরু করে। সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে বা পরীক্ষায় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকার চাপ থেকে উৎপন্ন পীড়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অ্যালকোহল ও ড্রাগ ব্যবহার শুরু করার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই অনুভূতি রয়েছে যে, ধূমপান, ড্রাগ বা অ্যালকোহলের ব্যবহার করলে এরা চাপমুক্ত (cool) অথবা আধুনিকতার প্রতীক হবে এবং এদের মধ্যে এগুলোর ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠার পেছনে এটিও

একটি মূখ্য কারণ। দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র ইন্টারনেট ও এইসব ধারণার বিকাশে সাহায্য করে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কারণগুলো হল- অস্থায়ী পরিবার বা শিশুদের সহায়তাদান করে এমন পারিবারিক কাঠামোর অভাব এবং বন্ধু বান্ধবদের চাপ।

8.5.2 আসক্তি এবং নির্ভরতা (Addiction and Dependence) :

ড্রাগ ব্যবহারের উপকারী ভূমিকা রয়েছে— এই ধারণার কারণে এটি বার বার ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের একটি অন্তর্নিহিত আসক্তি ধর্ম রয়েছে যা কেউ বুঝতে পারে না। আসক্তি হল আনন্দচঞ্চল অবস্থা এবং ভালো থাকার একটি অস্থায়ী অনুভূতির মতো কিছু ফলাফলের সাথে জড়িত মনস্তাত্ত্বিক সংযুক্তি—যা ড্রাগ এবং অ্যালকোহল ব্যবহারের ফলে হয়ে থাকে। এই অনুভূতিগুলো মানুষকে প্রয়োজন ছাড়াও ড্রাগ ব্যবহারের প্রেরণা যোগায় এবং এমনকি এদের ব্যবহার আত্মঘাতীও হতে পারে। ড্রাগের পুন: পুন: ব্যবহার আমাদের দেহে উপস্থিত ড্রাগের নির্দিষ্ট গ্রাহকগুলোর সহিষ্ণুতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। এর ফলস্বরূপ এই গ্রাহকগুলো কেবলমাত্র উচ্চমাত্রার অ্যালকোহল বা ড্রাগে সাড়া দেয়, যা ড্রাগগুলোর গ্রহণের মাত্রা আরও বাড়ায় এবং এগুলোর প্রতি আসক্ত করে তোলে। তবে, এটা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই ড্রাগগুলোর কেবলমাত্র একবার ব্যবহারও এদের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে। তাই ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের আসক্তি সৃষ্টিকারী ক্ষমতা থাকায় ব্যবহারকারীরা দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পরে এবং এর ফলে এরা ড্রাগের নিয়মিত ব্যবহার (অপব্যবহার) শুরু করে, যেখান থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

কোনোরূপ পরিচালনা অথবা পরামর্শের অভাবে কোনো ব্যক্তি ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে পরে এবং এগুলোর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। ড্রাগের প্রতি নির্ভরতা শরীরের একটি প্রবৃত্তি এবং যদি কোনো ড্রাগাসক্ত ব্যক্তি হঠাৎ করে ড্রাগসেবন বন্ধ করে দেয় তখন একটি বিশেষ ও অসুখকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **withdrawl syndrome** বলে। এই withdrawl syndrome এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল- উদ্বেগ, কম্পনশীলতা, বমি বমি ভাব ও ঘর্মনি:সরণ এবং পুনরায় ড্রাগ ব্যবহার শুরু করলে এই লক্ষণগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, withdrawl symptoms গুলো তীব্র হতে পারে ও এমনকি প্রাণনাশের কারণও হয়ে ওঠে এবং এই ড্রাগাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকাও প্রয়োজন হতে পারে।

ড্রাগের উপর আসক্তির জন্য রোগী তার চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে সব সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করে, এরফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

8.5.3 ড্রাগ/অ্যালকোহলের অপব্যবহারের প্রভাব (Effects of Drug/Alcohol Abuse)

ড্রাগ এবং অ্যালকোহল অপব্যবহারের সরাসরি কুফলগুলো কোনো ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত আচরণ, অপরাধ প্রবণতা এবং হিংস্রতা রূপে প্রকাশ পায়। অতিমাত্রায় ড্রাগ সেবনের ফলে কোনো ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়ায় ব্যাঘাত, হৃদযন্ত্রবিকল হওয়া অথবা গুরুমস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং এর ফলে ঐ ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় চলে যেতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে। দুই বা ততোধিক ড্রাগের ক্ষেত্রে একত্রে সেবন অথবা অ্যালকোহল এবং ড্রাগ একইসাথে গ্রহণের ফলে দেহে সাধারণত এগুলোর মাত্রা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং এরফলে মৃত্যুও হতে পারে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ড্রাগ ও অ্যালকোহল অপব্যবহারের ফলে সচরাচর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এমন সতর্কতামূলক লক্ষণগুলো হল পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে অবনতি, কোনো কারণ ছাড়া স্কুল কলেজে অনুপস্থিত থাকা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পালনে আগ্রহের অভাব, পরিবার এবং বন্ধুদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, একা থাকা, অবসাদ, মারমুখী হয়ে ওঠা, অবাধ্য আচরণ করা, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটা, তার ব্যক্তিগত হবি (Hobby) এর ক্ষেত্রে আগ্রহের অভাব, ঘুমের সময় ও খাওয়ার অভ্যাসের পরিবর্তন, দৈহিক ওজন, ক্ষুধা ইত্যাদির পরিবর্তন।

ড্রাগ/অ্যালকোহল অপব্যবহারের কিছু সুদূরপ্রসারী প্রভাবও রয়েছে। যদি একজন ড্রাগ/অ্যালকোহল অপব্যবহারকারী ড্রাগ/অ্যালকোহল কেনার জন্য টাকা না পায় তখন সে চুরি করতে শুরু করে। এই কুফলগুলো কেবলমাত্র ড্রাগ ও অ্যালকোহল ব্যবহারকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটা সময় ড্রাগ/অ্যালকোহল আসক্ত ব্যক্তি তার পুরো পরিবার ও বন্ধুদের কাছে মানসিক ও আর্থিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যারা শিরাতে ইনজেকশানের মাধ্যমে ড্রাগ নেয় (সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে শিরার মাধ্যমে সরাসরি ইনজেকশান দেওয়া) তাদের মধ্যে AIDS ও হেপাটাইটিস B এর মতো জটিল সংক্রামক রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই রোগগুলোর জন্য দায়ী ভাইরাসগুলো সংক্রমিত সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। AIDS এবং হেপাটাইটিস B উভয় সংক্রমণই হল দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ এবং পরিশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উভয় রোগই যৌন মিলন অথবা সংক্রমিত রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বয়:সন্ধিকালে অ্যালকোহল ব্যবহারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও রয়েছে। এর প্রভাবে এরা পরিণত বয়সে অত্যধিক মদ্যপান করে। ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের ফলে স্নায়ুতন্ত্র এবং যকৃতের **(সিরোসিস)** ক্ষতি হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ড্রাগ ও অ্যালকোহলের ব্যবহারের কারণে গর্ভস্থ ভ্রূণের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে দেখা যায়।

ড্রাগের অপর একটি অপব্যবহার হল এই যে, কিছু খেলোয়াড় তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ড্রাগ ব্যবহার করে। খেলাধূলার সময় তারা পেশির শক্তি ও দেহের আয়তন এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব বৃদ্ধির জন্য নিদ্রা উৎপাদনকারী বেদনানাশক, অ্যানাবলিক স্টেরয়েড, ডাই ইউরেটিক্স এবং কিছু হরমোনের অপব্যবহার করে এবং এরফলে ক্রীড়া বিষয়ে এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের মধ্যে স্টেরয়েড ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হল পুরুষালী আচরণ/পুরুষের মতো বৈশিষ্ট্য, আক্রমণাত্মক মনোভাবের বৃদ্ধি, মেজাজের পরিবর্তন, অবসাদ, রজ:চক্রের অস্বাভাবিকতা, মুখমণ্ডল ও শরীরে অত্যধিক কেশোদ্গম, ক্লাইটোরিসের বৃদ্ধি, স্বরের গাম্ভীর্যতা ইত্যাদি। পুরুষদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল ব্রণ, আক্রমণাত্মক মনোভাবের বৃদ্ধি, মনোভাবের পরিবর্তন, অবসাদ, টেস্টিকল এর আকার হ্রাস পাওয়া, শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস, যকৃৎ ও বৃক্কের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, স্তনের বৃদ্ধি, অকালে টাক পড়া ও প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি। দীর্ঘসময় ধরে ড্রাগ ব্যবহারের ফলে এই প্রভাবগুলো স্থায়ী হতে পারে। বয়:সন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের মুখমণ্ডল ও দেহে অত্যধিক ব্রণের আবির্ভাব ঘটে এবং অপরিণত অবস্থার দীর্ঘাস্থির বৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহ বন্ধ হওয়ার ফলে এদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যহত হতে পারে।

8.5.4 প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ (Prevention and Control) :

'প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে অধিকতর ভালো', এই অতি প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি এক্ষেত্রেও সঠিক। এটাও সত্য যে, বয়:সন্ধিকালের চেয়ে অল্প বয়সে ধূমপান, ড্রাগ বা অ্যালকোহল গ্রহণের মতো অভ্যাসগুলো বেশি মাত্রায় গড়ে উঠে। তাই কিশোর-কিশোরীদের ড্রাগ অথবা অ্যালকোহল ব্যবহারের দিকে ঠেলে দেয় এমন পরিস্থিতিগুলো সনাক্ত করা এবং সময়ের মধ্যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবচেয়ে ভালো হবে। এক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যেসব পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সযত্নে এবং যথাযথ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিপালন করেন সেই সব সন্তানদের মধ্যে এইসব বস্তুসমূহের (অ্যালকোহল/ড্রাগ/তামাক) অপব্যবহারের ঝুঁকি অনেকটাই কম থাকে। কিছু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা যা নির্দিষ্টভাবেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অ্যালকোহল ও ড্রাগের অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করা হল :

i) **বন্ধুবান্ধবদের অবাঞ্ছিত চাপ এড়িয়ে চলা (Avoid undue peer pressure)** : প্রতিটি শিশুর নিজস্ব পছন্দ এবং ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা এবং পালন করা উচিত। একটি শিশুকে পড়াশুনা, খেলাধূলা বা অন্যান্য কর্মসূচীতে তার সর্বাধিক ক্ষমতার বাইরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়।

ii) **শিক্ষা ও পরামর্শ দান (Education and Counselling) :** একটি শিশুকে সমস্যা ও চাপ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এমনভাবে শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়া উচিত, যাতে সে হতাশা ও ব্যর্থতাকে জীবনের অংশ হিসাবে মেনে নিতে পারে। শিশুদের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে যদি বই পড়া, খেলাধূলা, গানবাজনা, যোগাভ্যাস এবং অন্যান্য অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কর্মসূচির মতো স্বাস্থ্যকর বিষয়গুলোতে পরিচালিত করা হয় তবে এটাও লাভজনক হবে।

iii) **পিতামাতা এবং সহপাঠীদের সাহায্য নেওয়া (Seeking help from parents and peers):** পিতামাতা ও সহপাঠীদের থেকে তাৎক্ষণিক সাহায্য চাওয়া উচিত যাতে তারা শিশুদের উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে পারে। এবিষয়ে ঘনিষ্ট ও বিশ্বাসী বন্ধুর সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। যথাযথ পরামর্শের সাহায্যে যুবক-যুবতীরা তাদের সমস্যাগুলোকে বুঝতে পারবে এবং এটি তাদের উদ্বেগের অনুভূতি এবং অপরাধবোধ ব্যক্ত করতে সাহায্য করবে।

iv) **বিপদ সংকেতগুলোকে সনাক্ত করা (Looking for danger signs) :** পিতামাতা ও শিক্ষকদের উপর উল্লেখিত বিপদ সংকেতগুলোকে অনুসন্ধান করা ও সনাক্ত করা প্রয়োজন। এমনকি বন্ধুরাও যদি কাউকে ড্রাগ ও অ্যালকোহল গ্রহণ করতে দেখে, তবে তার ভালোর জন্য বিষয়টিকে দ্বিধাহীনভাবে পিতামাতা অথবা শিক্ষকদের নজরে আনা উচিত। এইসময় মানসিক বা শারীরিক পীড়া ও এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে সনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা শুরু করতে সহায়তা করবে।

v) **পেশাদারী এবং চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া (Seeking professional and medical help):** যেসব যুবক যুবতীরা দুর্ভাগ্যবশত ড্রাগ/অ্যালকোহলের অপব্যবহারের পাকে পড়ে গেছে তাদের সহায়তার জন্য অনেক উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মনোবিদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কর্মসূচি এখন সহজলভ্য। আক্রান্ত ব্যক্তি পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির জোড়ে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য বলতে কেবলমাত্র নিরোগ থাকাকেই বোঝায় না। এটি হল শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ একটি অবস্থা। টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া, চর্মে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ, ম্যালেরিয়া এর মতো রোগগুলো এবং আরও অন্যান্য রোগ মানুষের দেহে রোগ-যন্ত্রণা সৃষ্টির মূখ্য কারণ। ভেক্টর বাহিত রোগগুলোর মধ্যে বিশেষত প্লাজমোডিয়াম ফেলসিপেরাম সংক্রমণ ঘটিত রোগটির যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে সেটি মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির পাশাপাশি বর্জ্য পদার্থের যথাযথ নিষ্পত্তি, পানীয় জলের পরিশোধন, মশার মতো ভেক্টরগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং অনাক্রম্যকরণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্য পরিষেবাসমূহ এই রোগগুলোর প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক হয়। আমাদের দেহ যখন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর (agents) সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের অনাক্রম্যতন্ত্র এই রোগসমূহের প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চর্ম, মিউকাস পর্দার মতো আমাদের দেহের সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো আমাদের অশ্রু, লালারস এবং ফ্যাগোসাইটিক কোশে উপস্থিত জীবাণু প্রতিরোধী বস্তুগুলো আমাদের দেহে প্যাথোজেনের প্রবেশে বাধা দেয়। প্যাথোজেনগুলো আমাদের দেহে সফলভাবে প্রবিষ্ট হলে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি (রসভিত্তিক অনাক্রম্য সাড়া) এবং কোশসমূহ (কোশনির্ভর অনাক্রম্য সাড়া) এই প্যাথোজেনগুলোকে মেরে ফেলে। অনাক্রম্যতন্ত্রে মেমোরি কোশ রয়েছে, যা অ্যান্টিজেনের গঠনকে মনে রাখতে পারে। আমাদের দেহ একই প্যাথোজেনের সংস্পর্শে বার বার এলে, দেহে দ্রুত এবং অতি তীব্র অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এটি টীকাকরণ এবং অনাক্রম্যকরণের মাধ্যমে সুরক্ষার ভিত্তি তৈরি করে। অন্যান্য রোগসমূহের মধ্যে AIDS এবং ক্যানসার এর কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটে। হিউম্যান

ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV) ঘটিত AIDS রোগটি প্রাণঘাতী হয় কিন্তু যদি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তবে এটিকে সহজে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদি প্রাথমিক অবস্থায় রোগের সনাক্তকরণ এবং যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তবে অনেক ক্যানসারই নিরাময়যোগ্য। পরবর্তী সময় যুবক-যুবতী এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার অপর একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। অ্যালকোহল ও ড্রাগের আসক্তির ধরনের কারণে এবং এদের ব্যবহারের ফলে অনুভূত সুবিধাসমূহ যেমন বন্ধুবান্ধবদের অবাঞ্ছিত চাপ থেকে মুক্তি এবং পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত চাপ থেকে মুক্তি পেতে কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহল বা ড্রাগ গ্রহণ শুরু করতে পারে। এভাবে ড্রাগ ও অ্যালকোহল গ্রহণ করার ফলে কোনো ব্যক্তি এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পরতে পারে। ড্রাগ ও অ্যালকোহলের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান উপযুক্ত পরামর্শ এবং পেশাদারী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের তাৎক্ষণিক সন্ধান পাওয়া গেলে কোনো ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে এগুলোর কুফল থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. কোন কোন জনস্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহারের জন্য তোমরা সুপারিশ করবে?
2. সংক্রামক রোগসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে জীববিদ্যার অধ্যয়ন কীভাবে আমাদের সহায়তা করে?
3. নিম্নলিখিত রোগগুলোর প্রতিটি রোগ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে?
   ক) অ্যামিবায়োসিস, খ) ম্যালেরিয়া, গ) অ্যাসক্যারিয়াসিস, ঘ) নিউমোনিয়া
4. জলবাহিত রোগসমূহের প্রতিরোধে তোমরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?
5. DNA টীকা প্রসঙ্গে 'একটি উপযুক্ত জিন (a suitable gene) বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করো।
6. প্রাথমিক ও গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গগুলোর নাম লেখো।
7. এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু সুপরিচিত সংক্ষিপ্তরূপ নিচে দেওয়া হয়েছে, এগুলোর প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ নাম লেখো ।
   ক) MALT খ) CMI গ) AIDS ঘ) NACO ঙ) HIV
8. নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো এবং প্রতিটির উদাহরণ দাও -
   ক) সহজাত এবং অর্জিত অনাক্রম্যতা
   খ) সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা
9. একটি অ্যান্টিবডি অণুর সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
10. কী কী বিভিন্ন উপায়ে হিউম্যান-ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে?
11. কোন পদ্ধতিতে AIDS ভাইরাসটি সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে অনাক্রম্যতন্ত্রের ঘাটতি সৃষ্টি করে?
12. ক্যানসার কোশ কীভাবে একটি স্বাভাবিক কোশ থেকে পৃথক হয়?
13. মেটাস্ট্যাসিস বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করো।
14. অ্যালকোহল বা ড্রাগ অপব্যবহারের ফলে যে ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো দেখা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
15. তোমরা কি মনে করো যে কোনো ব্যক্তিকে ড্রাগ/অ্যালকোহল গ্রহণ করতে তার বন্ধুরা প্রভাবিত করতে পারে? তোমাদের উত্তরটি যদি হ্যাঁ হয়, তবে কীভাবে কোনো ব্যক্তি নিজেকে এরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে?
16. কোনো ব্যক্তি একবার ড্রাগ/ অ্যালকোহল গ্রহণ করতে শুরু করলে, এই অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন কেন? এ বিষয়ে তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করো।
17. তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো যুবক যুবতীদের অ্যালকোহল বা ড্রাগ গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে এবং কীভাবে এগুলো এড়ানো যেতে পারে?

অধ্যায় 9

খাদ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধনের কৌশলসমূহ

(STRATEGIES FOR ENHANCEMENT IN FOOD PRODUCTION)

9.1 পশুপালন (Animal Husbandry)

9.2 উদ্ভিদ প্রজনন (Plant Breeding)

9.3 একক কোশ প্রোটিনসমূহ (Single Cell Proteins)

9.4 কলা পালন (Tissue Culture)

পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতিসাধন একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টাগুলোতে পশুপালন ও উদ্ভিদ প্রজননে প্রযুক্ত জীবজ নীতিসমূহের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণ স্থানান্তরণ প্রযুক্তি ও কলাপালন পদ্ধতির মতো বিভিন্ন নতুন পদ্ধতিসমূহ খাদ্য উৎপাদনের আরও উন্নতি সাধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে চলেছে।

9.1 পশুপালন (Animal Husbandry)

পশুপালন হল পশুসম্পদের বৃদ্ধি ও প্রজননের কৃষি বিষয়ক পদ্ধতি। তবে এর জন্য কৃষকদের খুবই দক্ষ হওয়া প্রয়োজন এবং এতে যতটা বিজ্ঞান রয়েছে ঠিক ততটাই শিল্পকলাও রয়েছে। মানুষের জন্য উপযোগী পশু সম্পদ যেমন মহিষ, গরু, শূকর, ঘোড়া, গবাদি পশু, ভেড়া, উট, ছাগল ইত্যাদির প্রতিপালন ও প্রজনন পশুপালনের অন্তর্গত। ব্যাপক অর্থে, পোলট্রি চাষ এবং মৎস্য চাষও পপুলেশনের অন্তর্গত। মাছ, মোলাস্কা বা কম্বোজ গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী (খোলসযুক্ত প্রাণী) এবং ক্রাস্টেসিয়া গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের (চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি) প্রতিপালন, সংগ্রহ, বিক্রয় ইত্যাদি মৎস্য চাষের অন্তর্ভুক্ত। দুধ, ডিম, মাংস, উল, সিল্ক, মধু ইত্যাদি দ্রব্যের জন্য স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষ মৌমাছি, রেশমমথ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছ, পাখি, শূকর, গবাদি পশু, ভেড়া এবং উটের মতো প্রাণীদের ব্যবহার করে আসছে।

এটি হিসাব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর পশুসম্পদের পশুপালনের 70 শতাংশের বেশি পশুসম্পদ ভারতবর্ষ ও চিনে রয়েছে। তবে এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে

পৃথিবীতে খামারজাত দ্রব্য উৎপাদনে এই পপুলেশনের কেবলমাত্র 25 শতাংশই ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতি একক ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা খুবই কম। তাই পশু সম্পদের গুণগতমান এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য পশুর প্রজনন এবং প্রতিপালনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিসমূহও প্রয়োগ করতে হবে।

9.1.1 খামার এবং খামারে প্রতিপালিত প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা (Management of Farms and Farm Animals)

খামার ব্যবস্থাপনার প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর তুলনায় পেশাগত কৌশলসমূহ আমাদের চাহিদামত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন পশু খামারগুলোতে যে ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিছু ব্যবস্থাপনা কৌশল নিয়ে চল আমরা আলোচনা করি।

9.1.1.1 দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা (Dairy Farm Management)

ডেয়ারি হল মানুষের প্রয়োজনে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত বস্তু উৎপাদনের জন্য গবাদি পশুদের ব্যবস্থাপনা। *তোমরা ডেয়ারিতে দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা কর এমন প্রাণীদের নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবে কি? একটি ডেয়ারি ফার্ম থেকে প্রাপ্ত দুধ থেকে কতো বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধজাত বস্তু তৈরি করা যেতে পারে? যে প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণমানের উন্নতিসাধন করা হয় সেগুলোই ডেয়ারি ফার্ম ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।* দুগ্ধের উৎপাদন প্রাথমিকভাবে খামারে প্রতিপালিত ব্রীডগুলোর গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন (অঞ্চলটির জলবায়ু অনুযায়ী) এবং একই সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাল ব্রীড নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবাদি পশুর উৎপাদনক্ষমতা বাস্তবায়িত করার জন্য গবাদি পশুদের ভালভাবে দেখাশোনা করতে হবে — এদের জন্য ভাল বাসস্থান তৈরি করতে হবে, পর্যাপ্ত জলের যোগান দিতে হবে এবং এদের রোগমুক্ত রাখতে হবে। গবাদি পশুদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাবার দিতে হবে — এক্ষেত্রে পশুখাদ্যের গুণমান এবং পরিমাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া দুগ্ধদোহন, দুগ্ধ সংরক্ষণ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থের পরিবহণের সময় যথাযথ পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির (গবাদি পশু ও পশুর পরিচর্যাকারী) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। আজকাল অবশ্য এই প্রক্রিয়াগুলোর বেশিরভাগই যন্ত্রচালিত হয়ে গেছে, যার ফলে উৎপাদিত বস্তু পরিচর্যাকারীদের সরাসরি সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। এসব পদ্ধতিগুলোর যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে অবশ্যই নিয়মিত তদারকির পাশাপাশি তথ্য নথিভুক্তকরণ প্রয়োজন। এটি বিভিন্ন সমস্যার শনাক্তকরণে এবং সমস্যার যতটা সম্ভব দ্রুত সমাধানেও সাহায্য করে। একজন পশু চিকিৎসকের নিয়মিত পরিদর্শন বাধ্যতামূলক হতে হবে।

যদি তোমরা ডেয়ারি রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করো এবং এর পরবর্তী ধাপ হিসাবে তোমার এলাকার একটি ডেয়ারি ফার্ম বা দুগ্ধ খামার পরিদর্শন করো এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো তবে তা তোমাদের কাছে সম্ভবত উৎসাহব্যাঞ্জকই হবে।

9.1.1.2 পোলট্রি খামারের ব্যবস্থাপনা (Poultry Farm Management)

পোলট্রি হল এক শ্রেণির গৃহপালিত মুরগী জাতীয় প্রাণী [পাখি (Fowl)]) যাদেরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বা এদের থেকে ডিম পাওয়ার জন্য প্রতিপালন করা হয়। পোলট্রি পাখি বলতে সাধারণত মুরগী ও হাঁস এবং মাঝে মাঝে টার্কি ও রাজহাঁসদেরও (geese) বোঝায়। পোলট্রি শব্দটি প্রায়শই কেবলমাত্র এসকল পাখিদের মাংস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু আরও সাধারণ অর্থে এর দ্বারা অন্য পাখিদের মাংসকেও বোঝায়।

ডেয়ারি ফার্ম বা দুগ্ধ খামারের মতই পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল রোগমুক্ত ও উপযুক্ত ব্রীড নির্বাচন, খামারের যথোপযুক্ত ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত খাদ্য ও জল এবং স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা।

তোমরা হয়তো টেলিভিশনের খবরে বা সংবাদপত্র পাঠের সময় 'বার্ড ফ্লু ভাইরাস' সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখে থাকবে বা পড়ে থাকবে যা সমস্ত দেশে ভীতি সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে ডিম ও মুরগীর মাংসের ব্যবহার মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আরও তথ্য খুঁজে বের করো এবং এক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার যথাযথ কারণ ছিল কিনা তা আলোচনা করো। যদি কিছু সংখ্যক মুরগীতে বার্ড ফ্লু-এর সংক্রমণ ঘটে তবে আমরা কীভাবে এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করতে পারবো?

9.1.2 প্রাণীর প্রজনন (Animal Breeding)

পশুপালনের একটি গুরত্বপূর্ণ দিক হল প্রাণীর প্রজনন। প্রাণী প্রজননের লক্ষ্য হল প্রাণীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপন্ন বস্তুর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির উন্নতিসাধন করা। *কী ধরনের বৈশিষ্ট্যবলি লাভের জন্য আমরা প্রাণীদের প্রজনন ঘটাই? বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের নির্বাচন কি ভিন্ন ভিন্ন হবে?*

'ব্রিড' পরিভাষাটি দ্বারা আমরা কী বুঝি? বংশানুক্রমিকভাবে সম্পর্কিত এবং সাধারণ চেহারা, বৈশিষ্ট্য, আকার, বহিরাবয়ব ইত্যাদির মতো বেশিরভাগ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি প্রাণী গোষ্ঠীকে একটি ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। *তোমার এলাকার ফার্মগুলোতে প্রতিপালিত গবাদি পশু ও পোলট্রির কিছু পরিচিত ব্রিডের নাম খুঁজে বের করো।*

যখন একই ব্রিডের প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়, তখন তাকে **ইনব্রিডিং (inbreeding)** বলে। অন্যদিকে, ভিন্ন ব্রিডের প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন ঘটালে, তাকে **আউটব্রিডিং (outbreeding)** বলে।

(ক)

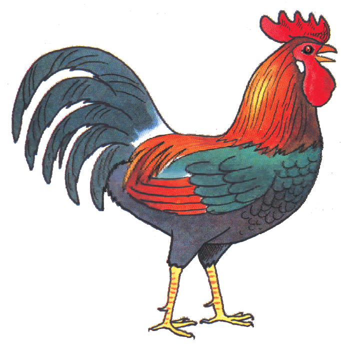

(খ)

চিত্র 9.1 গবাদি পশু ও মুরগীর উন্নত ব্রীডং
(ক) জার্সি (Jersey)
(খ) লেগহর্ণ (Leghorn)

অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding) ঃ ইনব্রিডিং বলতে 4-6 জনু ধরে একই ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত অধিকতর নিকট সম্পর্কিত একক জীবসমূহের মধ্যে প্রজননকে বোঝায়। প্রজননের কৌশলটি হল এই যে, এক্ষেত্রে একই ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট পুরুষ এবং উৎকৃষ্ট স্ত্রী প্রাণীদের শনাক্ত করা হয় এবং এই প্রাণী জোড়ার মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। এ ধরনের প্রজননের ফলে সৃষ্ট অপত্য প্রাণীদের গুণমানের মূল্যায়ন করা হয় এবং এদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট স্ত্রী প্রাণীদেরকে পরবর্তী প্রজননের জন্য শনাক্ত করা হয়। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে যে গরু বা মহিষটি প্রতিবার দুগ্ধক্ষরণকালে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ উৎপাদন করে সেটিই উৎকৃষ্ট স্ত্রী প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে, উৎকৃষ্ট পুরুষ প্রাণী বলতে সেই ষাঁড়টিকে বোঝায় যেটি অন্য পুরুষ ষাঁড়ের তুলনায় অধিকতর উৎকৃষ্ট অপত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

মেন্ডেল কীভাবে হোমোজাইগাস বিশুদ্ধ বংশধারা (homozygous pureline) সৃষ্টি করেছিলেন তা মনে করার চেষ্টা করো যা অধ্যায়-5 এ বর্ণনা করা হয়েছিল। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বংশধারা তৈরির জন্য সেই একই কৌশল ব্যবহৃত হয় যা মটর গাছের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বংশধারা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্তঃপ্রজননের ফলে হোমোজাইগাসটি অর্থাৎ হোমোজাইগাস জীবের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই আমরা যদি কোনো প্রাণীর একটি বিশুদ্ধ বংশধারা তৈরি করতে চাই তবে এর জন্য অন্তঃপ্রজনন আবশ্যক। যে সব ক্ষতিকারক প্রচ্ছন্ন জিণগুলো নির্বাচনের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল সেগুলোর বহিঃপ্রকাশে ইনব্রিডিং সাহায্য করে। এটি উৎকৃষ্ট জিনগুলোর পুঞ্জিভূতকরণে ও অপেক্ষাকৃত কম কাঙ্ক্ষিত জিনগুলোর অপসারণেও সাহায্য করে। তাই এই পথ অনুযায়ী, যেখানে প্রতিটি ধাপেই নির্বাচন ঘটে সেখানে অন্তঃপ্রজননশীল প্রাণীদের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তবে, ক্রমাগত অন্তঃপ্রজনন, বিশেষত নিকট সম্পর্কিত জীবের মধ্যে অন্তঃপ্রজনন সাধারণত প্রাণীর প্রজননক্ষমতা এবং এমনকি উৎপাদনক্ষমতাও হ্রাস করে, একে অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা (inbreeding depression) বলে। যখনই অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই প্রজননশীল পপুলেশনের নির্বাচিত প্রাণীদের সাথে একই ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত সম্পর্কবিহীন উৎকৃষ্ট

প্রাণীর প্রজনন করানো হয়। এটি সাধারণত প্রাণীদের প্রজননক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আউটব্রিডিং (Out-breeding) ঃ আউটব্রিডিং হল সম্পর্কবিহীন প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন যা একই ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত এমন জীবদের মধ্যে হতে পারে যাদের 4-6 জনু পর্যন্ত পূর্বপুরুষরা ভিন্ন ধরনের হয় (আউট ক্রসিং) বা ভিন্ন ব্রিডের অন্তর্গত জীবের মধ্যে (ক্রস-ব্রিডিং) বা ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে (আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ণ) ঘটাতে পারে।

আউটক্রসিং (Out-crossing) ঃ এটি হল একই ব্রিডের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রজননের পদ্ধতি, যেখানে উভয় প্রাণীর বংশতালিকাতেই 4-6 জনু পর্যন্ত কোনো পূর্বপুরুষ এক হতে পারবে না অর্থাৎ ভিন্ন হবে। এ ধরনের প্রজননের ফলে সৃষ্ট অপত্য জীবদের আউট ক্রস বলে। যে সব গবাদি পশুর দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা, মাংস উৎপাদনের নিরিখে বৃদ্ধির হার ইত্যাদি গড় পরিমাণের তুলনায় কম সেসব ক্ষেত্রে এটি সর্বোত্তম প্রাণী প্রজনন পদ্ধতি। কখনো কখনো একটি একক আউট ক্রস অন্তঃ প্রজননজনিত সমস্যা (inbreeding depression) কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ক্রস ব্রিডিং (Cross-breeding)ঃ এই পদ্ধতিতে একটি ব্রিডের উৎকৃষ্ট পুরুষ প্রাণীর সাথে অন্য ব্রিডের উৎকৃষ্ট স্ত্রী প্রাণীর প্রজনন ঘটানো হয়। ক্রস ব্রিডিং-এর ফলে দুটি ভিন্ন ব্রিডের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ ঘটানো সম্ভব হয়। অপত্য সংকর প্রাণীদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকল্প হিসাবে, একই ব্রিডের কয়েক ধরনের ইনব্রিডিং এবং নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সুস্থিত ব্রিড তৈরি করা যায়, যারা উপস্থিত ব্রিডের তুলনায় উন্নততর হতে পারে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বহু নতুন প্রাণী ব্রিড সৃষ্টি করা হয়েছে। Hisardale হল পাঞ্জাবের তৈরি ভেড়ার একটি নতুন ব্রিড যা বিকানিরি স্ত্রী ভেড়া (Bikaneri) ও মেরিনো পুরুষ ভেড়ার (Marino rams) মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ন (Interspecific hybridisation) ঃ এই প্রক্রিয়ায় সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অপত্য জীবে উভয় পিতামাতা থেকে আগত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সংমিশ্রমণ ঘটতে পারে এবং হয়তো সেগুলো যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুণমানসম্পন্ন হতে পারে, যেমন, মিউল (Mule) (চিত্র 9.2)। তোমরা কি জান কোন্ ধরনের সংকরায়ণের ফলে মিউল (Mule) সৃষ্টি হয়েছে?

কৃত্রিম গর্ভাধান (artificial insemination) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করা হয়। পশুদের প্রজননে সাহায্যকারী পশুপালকরা, পিতা হিসাবে নির্বাচিত পুরুষ প্রাণীটির শুক্ররস সংগ্রহ করে ও তা ইনজেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত স্ত্রী প্রাণীটির জনন নালীতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সংগৃহীত সিমেন/শুক্ররস তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা যেতে পারে বা হিমায়িত করে রাখা যেতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। হিমায়িত অবস্থায় সিমেন/শুক্ররস স্ত্রী প্রাণীটির আবাসস্থলেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এইভাবে চাহিদা অনুসারে প্রজনন ঘটানো যায়। কৃত্রিম গর্ভাধান আমাদেরকে স্বাভাবিক প্রজননজনিত বহু সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। তোমরা কি এ ধরনের কিছু সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করতে ও সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পার?

চিত্র 9.2 মিউল

প্রায়শই আবার কৃত্রিম গর্ভাধানের মাধ্যমে পরিণত পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো সত্ত্বেও সাফল্যের হার খুবই নগণ্য হয়। সংকর প্রাণীদের সফল উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়াতে অন্যান্য পদ্ধতিগুলোও ব্যবহৃত হয়। বহু ডিম্বাণু নিঃসরণ ভ্রূণ স্থানান্তরণ প্রযুক্তি অর্থাৎ Multiple Ovulation Embryo Transfer Technology (MOET) হল পশুসম্পদের উন্নতিকল্পে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে একটি। এই পদ্ধতিতে, একটি গাভীতে FSH-এর মতো কাজ করে এমন হরমোনগুলো প্রয়োগ করে ডিম্বথলির পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং বেশি বেশি ডিম্বাণু নি:সরণ অর্থাৎ সুপার ওভিউলেশনে উদ্দীপিত করা হয়। এর ফলে প্রাণীটি তার প্রতিটি ঋতুচক্রে 6-8 টি ডিম্বাণু উৎপন্ন করে।

উল্লেখ্য, গরুটি স্বাভাবিক অবস্থায় তার ঋতুচক্রে একটি ডিম্বাণু উৎপন্ন করে। এই গাভীটির সাথে একটি বাছাই করা ষাঁড়ের মিলন ঘটানো হয় বা কৃত্রিম গর্ভাধান করা হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলোকে 8-12 কোশীয় দশায় অস্ত্রোপচার ছাড়াই বের করে আনা হয় এবং ধাতৃ মায়ের (Surrogate Mother) জরায়ুতে সংস্থাপন করা হয়। ফলে জিনগত দিক থেকে মাতৃ প্রাণীটি অর্থাৎ যার জরায়ু থেকে নিষিক্ত ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই গাভীটি পরবর্তীতে সুপার ওভিউলেশনের জন্য উপলব্ধ হয়। এই প্রযুক্তিটি গবাদি পশু, ভেড়া, খরগোশ, মহিষ, স্ত্রী ঘোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। পশুখামারে স্বল্প সময়ে পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন স্ত্রী ব্রিডের সাথে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন (কম স্নেহযুক্ত চর্বিহীন মাংস) মাংস উৎপাদনকারী ষাঁড়ের সফল প্রজনন ঘটানো হয়।

9.1.3 মৌমাছি প্রতিপালন (Bee Keeping)

মৌমাছির প্রতিপালন বা এপিকালচার হল মধু উৎপাদনের জন্য মৌচাকের রক্ষণাবেক্ষণ করা। এটি একটি বহু পুরনো কুটির শিল্প হিসাবে চলে আসছে। মধু হল উচ্চ পুষ্টিমূল্যসম্পন্ন একটি খাদ্য এবং দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি ওষুধেও এর ব্যবহার রয়েছে। মৌমাছি মোমও উৎপন্ন করে, যা কসমেটিক্স ও বিভিন্ন ধরনের পলিশ করার দ্রব্য তৈরির মতো শিল্পক্ষেত্রগুলোতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। মধুর ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলেই ব্যাপকহারে মৌ চাষ করা হচ্ছে; ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারের শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে এটি একটি স্থায়ী রোজগার সৃষ্টিকারী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

মৌমাছির প্রতিপালন এখন যে কোনো জায়গায়ই করা যায় যেখানে মৌমাছির চারণভূমি হিসাবে কিছু বুনো ঝোপঝাড়, ফলের বাগান এবং শস্যক্ষেত্র রয়েছে। এমন বহু প্রজাতির মৌমাছি রয়েছে যেগুলোর প্রতিপালন করা যেতে পারে। এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত মৌমাছির প্রজাতিটি হল *Apis indica*। মৌচাক বাড়ির উঠোনে, বাড়ির বারান্দায় বা এমনকি ছাদের উপরেও তৈরি করা যেতে পারে। মৌমাছির প্রতিপালন শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া নয়।

মৌমাছির প্রতিপালন যদিও তুলনামূলকভাবে একটি সহজ পদ্ধতি তবুও এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং এমন বহু সংস্থা রয়েছে যেখানে মৌমাছির প্রতিপালন পদ্ধতি শেখানো হয়। সফলভাবে মৌমাছির প্রতিপালনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(i) মৌমাছির প্রকৃতি এবং স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান।

(ii) মৌচাকগুলো রাখার জন্য যথোপযুক্ত স্থানের নির্বাচন

(iii) মৌমাছির ঝাঁক (মৌমাছির দল) সংগ্রহ করা এবং মৌচাকে রাখা

(iv) বিভিন্ন ঋতুতে মৌচাকের দেখাশোনা এবং

(v) মধু ও মৌমোমের নিষ্কাশন ও সংগ্রহ। সূর্যমুখী, সরিষা, আপেল এবং ন্যাসপাতির মতো বহু শস্য প্রজাতির পরাগবাহক হল মৌমাছি (অধ্যয় 2 দেখ)। শস্যক্ষেত্রে পুষ্পোদ্গমকালে মৌমাছির প্রতিপালন পরাগযোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন বাড়ায়, যা ফসল উৎপাদন এবং মধু উৎপাদন উভয় দিক থেকেই লাভজনক হয়।

9.1.4 মৎস্যচাষ (Fisheries)

মৎস্যচাষ এমন একটি শিল্প যেখানে মাছ, খোলসযুক্ত প্রাণী বা অন্যান্য জলজ প্রাণীদের ধরা, এদের প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বিপনন করা হয়। আমাদের জনসংখ্যায় একটি বড় অংশই খাদ্যের জন্য মাছ, মৎস্যজাত বস্তু এবং চিংড়ি, কাঁকড়া, গলদাচিংড়ি, খাদ্যযোগ্য ঝিনুক ইত্যাদির মতো অন্যান্য জলজ প্রাণীদের উপর নির্ভরশীল। সচরাচর খুব বেশি দেখা যায় এমন কিছু স্বাদু জলের মাছ হল কাতলা (catla), রুই (Rohu) এবং সাধারণ কার্প। খাদ্যযোগ্য কিছু সামুদ্রিক মাছ হল ইলিশ (Hilsa)। সার্ডিন (Sardine), ম্যাকরেল (Mackerel) এবং পমফ্রেট (Pomfret)। তোমার এলাকায় সচরাচর কোন্ কোন্ মাছগুলো খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা খুঁজে বের করো।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে মৎস্যচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বিশেষত সমুদ্র উপকূলবর্তী রাজ্যগুলোতে মৎস্যচাষ লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী এবং কৃষকদের রোজগার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। অনেকের জন্যই মৎস্যচাষ তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস। মৎস্যচাষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাকোয়াকালচার এবং পিসিকালচার এবং -এর মাধ্যমে আমরা স্বাদুজল ও সমুদ্র উভয় স্থানেই জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছি। পিসিকালচার এবং অ্যাকোয়াকালচার-এর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করো। এর ফলে মৎস্য শিল্প বিকশিত ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে এবং নির্দিষ্টভাবে কৃষকদের ও সার্বিকভাবে দেশের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এখন ‘নীল বিপ্লব’ (Blue revolution) সম্পর্কে বলছি যা ‘সবুজ বিপ্লব’ (Green revolution) -এর মতো একই পথ অবলম্বন করে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

9.2 উদ্ভিদ প্রজনন (Plant breeding)

প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা মানুষ এবং প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে কেবলমাত্র সীমিত জীবভরই সৃষ্টি করে। উন্নত ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ এবং কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি কেবলমাত্র একটি নিদিস্ট সীমা পর্যন্তই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা প্রযুক্তিগত ভাবে অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লবের কথা কে না শুনেছে যা আমাদের দেশে শুধুমাত্র জাতীয়স্তরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের চাহিদাই পূরণ করেনি, এর পাশাপাশি আমাদেরকে খাদ্যশস্য রপ্তানিতেও সাহায্য করেছে। সবুজ বিপ্লব গম, ধান, ভূট্টা ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যারাইটি তৈরীর জন্য বহুলাংশে উদ্ভিদ প্রজনন কৌশলসমূহের উপর নির্ভরশীল ছিল।

9.2.1 উদ্ভিদ প্রজনন কী? (what is plant breeding?)

অধিকতর চাষোপোযোগী, অধিক ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ সৃষ্টি করার জন্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনভিত্তিক পরিবর্তনসাধনই হল উদ্ভিদ প্রজনন। মানব সভ্যতা সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই, হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজননের পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদ্ভিদ প্রজননের 9000-11,000 বছর পূর্বের নথিভুক্তপ্রমাণ রয়েছে। প্রচীনকালে শস্য চাষাবাদের ফলশ্রুতিতেই বর্তমান দিনের শস্য উদ্ভিদসমূহের আর্বিভাব ঘটেছে। প্রাচীনকালে যে সব শস্য ভ্যারাইটিগুলোর চাষাবাদ করা হয়েছে সেগুলো থেকেই বর্তমানে আমাদের প্রধান খাদ্যশস্যগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। চিরাচরিত উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বংশধারাসমূহের মধ্যে প্রজনন বা সংকরায়ণ ঘটানো হয় এবং এরপর কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থাৎ অধিক উৎপাদনক্ষম, পুষ্টি গুণসম্পন্ন এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়। সুপ্রজননবিদ্যা, আনবিক জীববিদ্যা এবং কলা পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে আনবিক জিনগত সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে অধিকমাত্রায় উদ্ভিদ প্রজনন করা হচ্ছে।

উদ্ভিদ প্রজননে সহায়কগণ শস্য উদ্ভিদে যে প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোর অর্ন্তভুক্তিকরণের চেষ্টা করেছিলেন আমরা যদি সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করি তবে আমরা প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যগুলো তালিকাভুক্ত করবো সেগুলো হল শস্যের উচ্চ উৎপাদনক্ষমতা এবং উন্নত গুণমান। এছাড়া পরিবেশীয় চাপগুলো (লবনতা, অত্যধিক তাপমাত্রা, খরা) সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, রোগজাবীণু (ভাইরাস, ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়া) প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পতঙ্গ পেস্ট-এর আক্রমণ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি আমাদের এই তালিকায় থাকবে।

পৃথিবীব্যাপী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক উদ্ভিদ প্রজনন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত করা হয়। প্রজননের মাধ্যমে একটি শস্যের নতুন জিনগত ভ্যারাইটি সৃষ্টির মুখ্য ধাপগুলো হল —

(i) ***পরিবর্তনশীলতা সংগ্রহ (Collection of variability)*** **ঃ** যেকোনো প্রজনন কর্মসূচির উৎস হল জিনগত পরিবর্তনশীলতা। বহু শস্য উদ্ভিদে যে জিনগত পরিবর্তনশীলতা আগে থেকেই রয়েছে তা এই শস্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত জংলি ভ্যারাইটিগুলো থেকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের সব জংলি ভ্যারাইটি, চাষ করা হয় এমন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রজাতির (তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের মূল্যায়ন করার পর) সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ হল পপুলেশনে উপলব্ধ প্রাকৃতিক জিনগুলোর কার্যকরী ব্যবহারের প্রাথমিক শর্ত। একটি প্রদত্ত শস্য উদ্ভিদে উপস্থিত সব জিনের সব বৈচিত্র্যময় অ্যালিল সমন্বিত সম্পূর্ণ সংগ্রহটিকে (উদ্ভিদ/বীজসমূহ) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ বলে।

(ii) ***জনিতৃ উদ্ভিদের মূল্যায়ন এবং নির্বাচন (Evaluation and selection of parents)*** **ঃ** কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ রয়েছে এমন উদ্ভিদের শনাক্তকরনের জন্য জার্মপ্লাজমের মূল্যায়ন করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং এদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়। যেখানে বিশুদ্ধ বংশধারা সৃষ্টি করা প্রয়োজন ও সম্ভব সেখানেই তা করা হয়।

(iii) ***নির্বাচিত জনিতৃ উদ্ভিদসমূহের মধ্যে ক্রস হাইব্রিডাইজেশন (Cross hybridisation among the selected parents)*** **ঃ** প্রায়শই দুটি ভিন্ন উদ্ভিদ (জনিতৃ উদ্ভিদ) থেকে আগত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, উদাহরণস্বরূপ, একটি জনিতৃ উদ্ভিদের উচ্চ গুণমানসম্পন্ন প্রোটিন উৎপাদন ক্ষমতার জন্য দায়ী প্রলক্ষণের সাথে অপর জনিতৃ উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী প্রলক্ষণের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। দুটি জনিতৃ জীবের মধ্যে ক্রস হাইব্রিডাইজেশন ঘটানোর মাধ্যমে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় এবং এর ফলেই একটি উদ্ভিদে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যাবলির জীনগত সংমিশ্রণ ঘটে। এটি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং একঘেয়ে প্রক্রিয়া, কারণ এক্ষেত্রে পুং জনিতৃ হিসাবে বেছে নেওয়া কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদটি থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করতে হয় এবং তা স্ত্রী জনিতৃ হিসাবে নির্বাচিত উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করতে হয় (কীভাবে ক্রসগুলো ঘটানো হয় তা অধ্যায় ২-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। সংকর উদ্ভিদগুলোতে যে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ ঘটবেই এমনটা নয়, সাধারণত কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার ক্রসের ফলে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি সংকর উদ্ভিদের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

(iv) ***উৎকৃষ্ট রিকম্বিনেন্ট-এর নির্বাচন এবং এদের যাচাইকরণ (Selection and testing of superior recombinants)*** **ঃ** অপত্য হাইব্রিড উদ্ভিদগুলোর মধ্যে যেসব উদ্ভিদে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে তাদের নির্বাচন এই ধাপটিতে করা হয়। প্রজননের উদ্দেশ্য সফল করতে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য অপত্য উদ্ভিদগুলোর যত্ন সহকারে বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধাপে উভয় জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে উৎকৃষ্টতর অপত্য উদ্ভিদ লাভ করা যায় (প্রায়শই একাধিক উৎকৃষ্টতর অপত্য উদ্ভিদ লাভ করা যেতে পারে)। যতক্ষণ না উদ্ভিদগুলো সমরূপতায় (হোমোজাইগাস অবস্থায়) পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত বহু জনু ধরে এদের মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটানো হয়, যাতে অপত্য জীবে বৈশিষ্ট্যগুলোর পৃথকীকরণ না ঘটে।

(v) ***নতুন চাষযোগ্য ভ্যারাইটির পরীক্ষণ, চাষের জন্য সরবরাহকরণ এবং বাণিজ্যিকরণ (Testing, release and commercialisation of new cultivars)*** **ঃ** নতুনভাবে নির্বাচিত বংশধারাগুলোকে তাদের উৎপাদনক্ষমতা এবং গুণমান, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ইত্যাদির মত অন্যান্য কৃষি বিষয়ক প্রলক্ষণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। এই উদ্ভিদগুলোকে গবেষণার জন্য নির্বাচিত কৃষিক্ষেত্রে চাষ করে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ, জলসেচ ও অন্যান্য শস্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের সাথে সাথে এদের উৎপাদন ক্ষমতা নথিভুক্ত করার মাধ্যমে, এদের মূল্যায়ন করা হয়।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত কৃষিক্ষেত্রে জন্মানো শস্য উদ্ভিদগুলোর মূল্যায়ন করার পর এই উদ্ভিদগুলোকে দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ শস্য উদ্ভিদগুলো সাধারণত যেসব কৃষিজলবায়ু অঞ্চলে জন্মায় সেই সব অঞ্চলে কমপক্ষে তিন মরশুম ধরে চাষ করে এদের যাচাই করা হয়। উপলব্ধ সর্বোৎকৃষ্ট চাষযোগ্য উদ্ভিদ যেটিকে যাচাই করা হয়েছে বা যেটি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই উদ্ভিদটির সাথে নমুনা শস্য উদ্ভিদটির তুলনা করে নমুনা উদ্ভিদটির মূল্যায়ন করা হয়।

ভারতবর্ষ প্রধানত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের GDP এর প্রায় 33 শতাংশ কৃষি নির্ভর এবং এটি মোট জনসংখ্যার প্রায় 62 শতাংশ লোকের রোজগার সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে দেশকে যেসব সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার মধ্যে মুখ্য সমস্যাটি ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করা। যেহেতু ভারতবর্ষে খুব সীমিত পরিমাণ চাষযোগ্য জমি রয়েছে তাই এই উপলব্ধ কৃষিজমির প্রতি একক ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতবর্ষকে যথেষ্ট প্রয়াস নিতে হয়েছে। উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে 1960 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গম ও ধানের বহু উচ্চ ফলনশীল ভ্যারাইটির সৃষ্টি করা হয় এবং এর ফলে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির এই পর্যায়টি প্রায়শঃই সবুজ বিপ্লবরূপে আখ্যায়িত করা হয়। চিত্র 9.3-তে কিছু উচ্চ ফলনশীল ভারতীয় সংকর শস্য ভ্যারাইটি দেখানো হয়েছে।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র 9.3 কিছু ভারতীয় সংকর শস্য (ক) ভুট্টা (খ) গম (গ) বাগানের মটর

গম এবং ধান ঃ 1960 থেকে 2000 সাল, এই সময়কালের মধ্যে গম উৎপাদন 11 মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 75 মিলিয়ন টন হয়েছে, অন্যদিকে ধানের উৎপাদন 35 মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 89.5 মিলিয়ন টন হয়েছে। গম এবং ধানের আংশিক খর্ব ভ্যারাইটি (semi-dwarf variety) সৃষ্টির ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী Norman E. Borlaug, মেক্সিকোস্থিত গম এবং ভুট্টার উন্নতিসাধনের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে (ইন্টারনেশন্যাল সেন্টার ফর হুইট অ্যান্ড মেইজ ইমপ্রুভমেন্ট) গমের আংশিক খর্ব ভ্যারাইটি সৃষ্টি করেছিলেন। 1963 সালে সোনালিকা এবং কল্যাণসোনার মত বহু উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন গমের ভ্যারাইটি ভারতবর্ষের সব গম উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে চাষ করা শুরু হয়। ধানের আংশিক খর্ব ভ্যারাইটি IR-8 [আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IRRI), ফিলিপিনস] এবং তাইচুং নেটিভ-1 (তাইওয়ান থেকে প্রাপ্ত) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ধানের এই ভ্যারাইটিগুলোর চাষ 1966 সালে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে জয়া এবং রত্না-এর মত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ফলনশীল আংশিক খর্ব ভ্যারাইটির সৃষ্টি করা হয়েছে।

আখ ঃ *Saccharum barberi* মূলত উত্তর ভারতে জন্মায়, কিন্তু এর উৎপাদনক্ষমতা এবং শর্করার মাত্রা খুবই কম হয়। দক্ষিণ ভারতে জন্মানো ক্রান্তীয় আখ প্রজাতি *Saccharum officinarum* তুলনামুলকভাবে অধিকতর স্থূল কান্ডবিশিষ্ট এবং অধিক শর্করাযুক্ত হয় কিন্তু তা উত্তর ভারতে ভালভাবে জন্মায় না। উচ্চ ফলনশীল, স্থূল কাণ্ড, অধিক শর্করা সমন্বিত এবং উত্তর ভারতের আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে জন্মানোর ক্ষমতা ইত্যাদির মতো কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির আখের ভ্যারাইটিতে সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্য আখের এই দুটি ভ্যারাইটির মধ্যে সার্থকভাবে প্রজনন ঘটানো হয়েছে।

মিলেট ঃ ভারতবর্ষে সফলভাবে সংকর প্রজাতির ভুট্টা, জোয়ার এবং বাজরা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রজননের মাধ্যমে সংকর জীব সৃষ্টির ফলে জলের ঘাটতি প্রতিরোধে সক্ষম উচ্চ ফলনশীল বহু ভ্যারাইটির সৃষ্টি করা যায়।

9.2.2 রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির জন্য উদ্ভিদ প্রজনন (Plant Breeding for Disease Resistance) ঃ চাষযোগ্য শস্য প্রজাতির উৎপাদনক্ষমতা, বিশেষত ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে জন্মানো শস্যের উৎপাদনক্ষমতা একটি ব্যাপক পরিসরে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস জাতীয় প্যাথোজেন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে প্রায়শই শস্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে; এই ক্ষতির মাত্রা শস্যের 20-30 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে, আবার কখনো কখনো সম্পূর্ণ শস্যই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রোগ প্রতিরোধক্ষম চাষযোগ্য শস্যের প্রজনন এবং বিকাশ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতিটি ছত্রাকনাশক এবং ব্যাক্টিরিয়ানাশকের ব্যবহারের উপর নির্ভরতাও হ্রাস করে। পোষক উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বলতে এর প্যাথোজেনদের রোগ সৃষ্টিতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাকে বোঝায় এবং এই ক্ষমতা পোষক উদ্ভিদের জিনগত গঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদ্ভিদের মধ্যে প্রজনন ঘটানোর পূর্বে, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং এর বিস্তার সম্পর্কে জেনে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের ছত্রাকঘটিত রোগ হল মরিচা রোগ (Rust), উদাহরণ, —গমের বাদামি মরিচা রোগ (Brown rust of Wheat), আখের লোহিত পচন রোগ (Red rot of sugarcane) এবং আলুর বিলম্বিত ধসা রোগ (late blight of potato)। আবার উদ্ভিদের ব্যাক্টিরিয়াঘটিত রোগগুলোর মধ্যে একটি হল — ক্রুসিফেরি গোত্রভুক্ত উদ্ভিদের কালো পচন রোগ (black rot of crucifers) এবং উদ্ভিদের ভাইরাসঘটিত কিছু রোগ হল - তামাকের মোজেইক রোগ (tobacco mosaic), শালগমের মোজেইক রোগ (turnip mosaic) ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রজননের পদ্ধতিসমূহ (Methods of breeding for disease resistance) ঃ প্রচলিত প্রজনন কৌশল সমূহের মাধ্যমে (পূর্বে বর্ণিত) বা পরিব্যাক্তি প্রজননের দ্বারাও প্রজনন ঘটানো হয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টিতে প্রজননের প্রচলিত পদ্ধতি হল সংকরায়ণ ও নির্বাচন। এক্ষেত্রেও প্রজননের ধাপগুলো আবশ্যিকভাবেই উচ্চ ফলনক্ষমতার মতো অন্যান্য কৃষি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যবলী লাভের জন্য ঘটানো প্রজননের ধাপগুলোর মতো হয়। পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন ধাপগুলো হল ঃ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন উৎসের জন্য জার্মপ্লাজমের বাছাই, নির্বাচিত জনিতৃ উদ্ভিদসমূহের সংকরায়ণ,

সংকর উদ্ভিদের নির্বাচন, মূল্যায়ন এবং নতুন ভ্যারাইটিগুলোর পরীক্ষণ ও চাষের জন্য সরবরাহকরণ। সংকরায়ণ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাসঘটিত রোগ প্রতিরোধে সক্ষম কিছু শস্য ভ্যারাইটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং চাষের জন্য এদের সরবরাহ করা হয়েছে (টেবিল 9.1)।

টেবিল 9.1

শস্য	ভ্যারাইটি	যে রোগ প্রতিরোধে সক্ষম
গম	হিমগিরি (Himgiri)	পাতা এবং স্ট্রাইপের মরিচা রোগ (Leaf and stripe rust), হিল কান্ট রোগ
ব্রাসিকা / সরিষা	Pusa swarnim করণ রাই	শ্বেত মরিচা রোগ (White rust)
ফুলকপি	Pusa Shubhra Pusa Snowball k-1	ব্ল্যাক রট এবং কার্ল ব্লাইট ব্ল্যাক রট
বরবটি	Pusa Komal	ব্যাক্টিরিয়াঘটিত ব্লাইট
লঙ্কা	Pusa Sadabahar	চিলি মোজেইক ভাইরাস, টোবাকো মোজেইক ভাইরাস এবং লিফ কার্ল

বিভিন্ন শস্য ভ্যারাইটি বা এদের সাথে সম্পর্কিত জংলি ভ্যারাইটিগুলোতে উপস্থিত এবং চিহ্নিত স্বল্প সংখ্যক রোগ প্রতিরোধী জিনের উপলব্ধতার ফলে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিটি প্রায়শঃই বাধার সম্মুখীন হয়। বিবিধ উপায়ে উদ্ভিদে পরিব্যক্তি ঘটিয়ে এবং তারপর প্রতিরোধ ক্ষমতার নিরিখে উদ্ভিদের বাছাইয়ের মাধ্যমে মাঝে মাঝে কাঙ্ক্ষিত জিনগুলো শনাক্ত করা যায়। কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত উদ্ভিদগুলোর এরপর সরাসরি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে বা প্রজনন কার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রজননের জন্য অন্যান্য যেসব পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েন্টগুলোর মধ্যে নির্বাচন এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

মিউটেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে জিনের বেস সজ্জাক্রমের পরিবর্তন ঘটিয়ে জিনগত প্রকরণ সৃষ্টি করা হয় (অধ্যায় 5 দেখো)। এর ফলে এমন সব নতুন বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণের সৃষ্টি হয় যেগুলো জনিতৃ জীবে পাওয়া যায় না। রাসায়নিক পদার্থ বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (গামা বিকিরণ) ব্যবহারের মাধ্যমেই কৃত্রিমভাবে মিউটেশন ঘটানো সম্ভব এবং এরপর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদগুলোকে নির্বাচন করা হয় এবং প্রজননের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে মিউটেশন ব্রিডিং বা পরিব্যক্তি প্রজনন বলে। মুগ ডাল উৎপন্নকারী উদ্ভিদে ইয়েলো মোজেইক ভাইরাস এবং পাওডারি মিলডিও প্রতিরোধে সক্ষম জিনগুলোকে মিউটেশনের মাধ্যমে উদ্দীপিত করা হয়েছিল।

চাষযোগ্য বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর বহু জংলি ভ্যারাইটি রয়েছে যেগুলোর উৎপাদনক্ষমতা খুব কম হলেও এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু রোগ প্রতিরোধক্ষম বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে, তাই উচ্চ ফলনশীল চাষযোগ্য ভ্যারাইটিগুলোতে প্রতিরোধী জিনগুলোকে প্রবেশ করানো প্রয়োজন। ঢেঁড়সে (*Abelmoschus esculentus*) উপস্থিত ইয়েলো মোজেইক ভাইরাস প্রতিরোধী জিন একটি জংলি প্রজাতি থেকে প্রবেশ করানো হয় এবং এর ফলে *A. esculentus*-এর একটি নতুন ভ্যারাইটি সৃষ্টি হয়েছে যাকে ‘পরভানি ক্রান্তি’ (Parbhani Kranti) বলে।

উপরিউক্ত সব উদাহরণগুলোই হল প্রতিরোধক্ষম জিনগুলোর উৎস যে জিনগুলো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রজনন ঘটাতে হবে এমন একই শস্য প্রজাতিতে অথবা সেই ক্ষুদ্র প্রজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো জংলি প্রজাতিতে অবস্থান করে। অভিষ্ট উদ্ভিদ ও উৎস উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে নির্বাচনের দ্বারা প্রতিবেশী জিনের স্থানান্তরণের কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

9.2.3 পতঙ্গা পেস্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য উদ্ভিদ প্রজনন (Plant Breeding for Developing Resistance to insect pests)

শস্য উদ্ভিদ এবং উৎপন্ন শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির অপর একটি মূখ্য কারণ হল পতঙ্গের এবং পতঙ্গাপেস্টের আক্রমণ। পোষক শস্য উদ্ভিদের অঙ্গা সংস্থানিক, জৈবরাসায়নিক বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে এদের পতঙ্গা প্রতিরোধী ক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। বহু উদ্ভিদে উপস্থিত রোমশ পাতাগুলো পতঙ্গা পেস্ট প্রতিরোধের সাথে জড়িত। যেমন, জাসিড পতঙ্গা (jassid) -এর বিরুদ্ধে তুলা গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দানাশস্যের পাতায় জন্মানো গুবরে পোকার বিরুদ্ধে গম গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা। গম গাছের নিরেট কাণ্ড স্টেম স ফ্লাই (stem sawfly) -এর অপছন্দের খাদ্য এবং মসৃণ পাতাযুক্ত ও মকরন্দবিহীন তুলোর ভ্যারাইটি তুলো আক্রমণকারী পতঙ্গের লার্ভাদের (bollworms) আকৃষ্ট করতে পারে না। ভুট্টা উদ্ভিদে অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের উচ্চমাত্রা, নাইট্রোজেন এবং শর্করার নিম্নমাত্রা ভুট্টার কাণ্ড ছিদ্রকারী পতঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে।

কীটপতঙ্গা প্রতিরোধী ক্ষমতা লাভের জন্য প্রজননসমূহের পদ্ধতির ধাপগুলো উৎপাদন, গুণমান এবং পূর্বে আলোচ্য অন্যান্য কৃষি-বিষয়ক প্রলক্ষণ লাভের জন্য ঘটানো প্রজননের ধাপগুলোর মতই। চাষযোগ্য ভ্যারাইটি, শস্যের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ বা সম্পর্কযুক্ত জংলি ভ্যারাইটিগুলো প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত জিনের উৎস হতে পারে।

সংকরায়ণ ও নির্বাচন দ্বারা সৃষ্ট পতঙ্গা পেস্ট প্রতিরোধী কিছু শস্য ভ্যারাইটির নাম টেবিল 9.2 তে দেখানো হল।

টেবিল 9.2

শস্য	ভ্যারাইটি	পতঙ্গা- পেস্টস
ব্রাসিকা (Brassica) (রাই সরিষা)	Pusa Gaurav	এফিড (Aphids)
সীম	Pusa Sem 2 Pusa Sem 3	জাসিড (Jassids), এফিড (aphids) এবং ফল ছিদ্রকারী
ওকরা (Ocra) (ঢেঁড়স)	Pusa Sawani Pusa A-4	বিটপ ও ফল ছিদ্রকারী

9.2.4 খাদ্যের গুণমানের উন্নতিসাধনের জন্য উদ্ভিদ প্রজনন (Plant Breeding for Improved Food Quality)

সমগ্র বিশ্বে 840 মিলিয়নেরও অধিক সংখ্যক মানুষ তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য ও পরিপোষকের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত খাদ্যবস্তু পায় না। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ - তিন বিলিয়ন মানুষ- স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক, প্রোটিন এবং ভিটামিনের অভাবে বা 'hidden hunger'-এর সমস্যায় ভোগে কারণ তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল, সব্জি, ডাল-জাতীয় শস্য, মাছ এবং মাংস ক্রয় করার সামর্থ নেই। খাদ্যে অত্যাবশ্যকীয় স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক- বিশেষত আয়রন, ভিটামিন A , আয়োডিন এবং জিঙ্ক-এর অভাব দেহে রোগ সৃষ্টিজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, জীবনকাল হ্রাস করে এবং মানসিক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বায়োফর্টিফিকেশন- জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদ্ধতিটি হল উচ্চমাত্রিক ভিটামিন ও খনিজ বা উচ্চমাত্রিক প্রোটিন ও তুলনামূলকভাবে অধিক স্বাস্থ্যসম্মত ফ্যাট সমৃদ্ধ শস্যের প্রজনন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের লক্ষে উন্নত পুষ্টিগত গুণমান লাভের জন্য প্রজনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় —

(i) প্রোটিনের পরিমাণ এবং এর গুণগতমান;

(ii) তৈল জাতীয় পদার্থের পরিমাণ এবং এর গুণগতমান;

(iii) ভিটামিনের পরিমাণ এবং

(iv) স্বল্পমাত্রিক পরিপোষক এবং খনিজের পরিমাণ।

2000 সালে, এমন সংকর ভুট্টা উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছিল যাতে লাইসিন ও ট্রিপটোফেন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ পূর্বের সংকর ভুট্টা উদ্ভিদগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। অধিক পরিমাণ প্রোটিনযুক্ত গমের ভ্যারাইটি অ্যাটলাস 66 (Atlas 66) কে চাষযোগ্য গমের উন্নতিসাধনের জন্য দাতা উদ্ভিদরূপে ব্যবহার করা হয়। বর্ধিত আয়রনযুক্ত ধানের এমন ভ্যারাইটি তৈরি করাও সম্ভব যার মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ভ্যারাইটিতে উপস্থিত আয়রনের তুলনায় পাঁচ গুণেরও অধিক আয়রন থাকবে।

নয়াদিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থাতে (ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ বহু শাকসব্জি উৎপন্ন করা হয়েছে এবং জমিতে এগুলোর চাষ করা হচ্ছে, যেমন, ভিটামিন A সমৃদ্ধ গাজর, পালংশাক, কুমড়ো, ভিটামিন C সমৃদ্ধ করলা, বথুয়া, সরিষা, টমেটো, আয়রন ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ পালংশাক ও বথুয়া এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ বীন - ব্রড, ল্যাবল্যাব, ফ্রেঞ্চ এবং বাগানের মটর।

9.3 একক কোশ প্রোটিনসমূহ (Single Cell Protein (SCP))

যে হারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে দানাশস্য, ডাল, শাকসব্জি, ফল ইত্যাদির উৎপাদন খাদ্যের চাহিদা পূরণে সমর্থ নাও হতে পারে। খাদ্য হিসাবে দানাশস্যের পরিবর্তে মাংসের ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলেও দানাশস্যের চাহিদা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ প্রাণী খামারে 1kg মাংস উৎপন্ন করতে 3-10 kg দানাশস্যের প্রয়োজন হয়। তোমরা কি এই বিবৃতিটিকে খাদ্যশৃঙ্খল বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছো সে জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারো? মানুষের জনসংখ্যার 25 শতাংশেরও বেশি মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। মানুষ ও প্রাণীর পুষ্টির জন্য প্রোটিনের বিকল্প উৎসগুলোর মধ্যে একটি হল একক কোশ প্রোটিন বা Single Cell Protein (SCP)।

অনুজীবগুলোকে প্রোটিনের ভাল উৎস হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। প্রচুর পরিমাণে Spirulina-এর মত নীলাভ-সবুজ শৈবাল উৎপন্ন করতে এদেরকে আলুর প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বর্জ্য জল (শ্বেতসার সমন্বিত), খড়, গুড়, প্রাণীজ সার এবং এমনকি নর্দমাতেও সহজেই চাষ করা যেতে পারে। এরা প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ঘটনাক্রমে বর্জ্য বস্তুর এ ধরনের ব্যবহারের ফলে পরিবেশীয় দূষণও হ্রাস পায়।

Methylophilus methylotrophus -এর মতো কিছু ব্যাকটিরিয়া প্রজাতির বৃদ্ধি ও বায়োমাস উৎপাদনের হার অধিক হওয়ায়, এরা 25 টন প্রোটিন উৎপন্ন করবে এমনটা আশা করা যেতে পারে। এটি সত্য যে বহু মানুষ খাদ্যোপোযোগী মাশরুমকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং অধিক মাত্রায় মাশরুম চাষ একটি

ক্রমবর্ধমান শিল্পে পরিণত হওয়ায় এটি এখন বিশ্বাসযোগ্য যে আনুবীক্ষণিক ছত্রাকও খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

9.4 কলা পালন (Tissue Culture)

যেহেতু প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিগুলো চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এবং শস্যের উন্নতিসাধনের জন্য যথেষ্ট দ্রুত ও কার্যকরী পদ্ধতি বের করতে পারেনি, তাই **কলা পালন** নামক অপর একটি কৌশলের সৃষ্টি হয়েছে। কলা পালন বলতে কী বোঝায়? 1950 এর দশকে বিজ্ঞানীরা এটি জানতে পেরেছিলেন যে **এক্সপ্ল্যান্ট** বা উদ্ভিদ অংশ থেকে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়; অর্থাৎ, একটি উদ্ভিদের যেকোনো অংশ কেটে নেওয়া হয় এবং তা নির্বীজ পরিবেশে বিশেষ পরিপোষক ধাত্র সমন্বিত টেস্ট টিউবে এর বৃদ্ধি ঘটানো হয়। যেকোনো উদ্ভিদ কোশ / এক্সপ্ল্যান্টের থেকে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টি করার এই ক্ষমতাকে টোটিপোটেন্সি (Totipotency) বলে। এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে অধ্যয়ন করবে। এখানে এটি জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, পরিপোষক মাধ্যমটিতে অবশ্যই একটি কার্বন উৎস যেমন সুক্রোজ এবং অজৈব লবণ, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অক্সিন, সাইটোকাইনিন ইত্যাদির মতো বৃদ্ধি উদ্দীপকসমূহও থাকতে হবে। এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে খুব কম সময়েই বিশাল সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। কলা পালনের মাধ্যমে হাজার হাজার উদ্ভিদ উৎপাদনের এই পদ্ধতিটিকে **অনুবিস্তারণ (micropropagation)** বলে। অনুবিস্তারণের মাধ্যমে উৎপন্ন এই উদ্ভিদগুলোর প্রতিটিই মূল যে উদ্ভিদ থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে সেই সব উদ্ভিদের সাথে জিনগতভাবে সদৃশ হবে অর্থাৎ, এরা হল **সোমাক্লোন (Somaclone)**। এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে টমেটো, কলা, আপেল ইত্যাদির মত বহু গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে আরও ভালভাবে বোঝ এবং উপলব্ধি করার জন্য তোমরা তোমাদের শিক্ষকের সাথে একটি কলা পালন ল্যাবোরেটরি পরিদর্শন করার চেষ্টা করো।

এই পদ্ধতিটির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হল রোগগ্রস্থ উদ্ভিদ থেকে সুস্থ উদ্ভিদের সৃষ্টি। এমনকি উদ্ভিদটি ভাইরাস-সংক্রমিত হলেও উদ্ভিদটির ভাজক কলা (অগ্রস্থ ও কাক্ষিক) ভাইরাস মুক্ত থাকে। তাই ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য কৃত্রিম পরিবেশে ভাজক কলার অপসারণ ঘটিয়ে এই কলার বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। কলা, আখ, আলু ইত্যাদির ভাজক কলার প্রতিপালনে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন।

এমনকি বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ থেকে একক কোশগুলোকে পৃথক করে নেওয়ার পর এদের কোশ প্রাচীরগুলোর পাচন ঘটিয়ে নগ্ন প্রোটোপ্লাজমগুলোকে (প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত) পৃথক করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিন্ন ভ্যারাইটির উদ্ভিদের প্রতিটি থেকে প্রোটোপ্লাস্ট পৃথক করে সংকর প্রোটোপ্লাস্ট লাভের জন্য সেগুলোর মিলন ঘটানো যেতে পারে। এই সংকর প্রোটোপ্লাস্টের আবার বৃদ্ধি ঘটিয়ে নতুন উদ্ভিদ লাভ করা যায়। এই হাইব্রিডগুলোকে **সোমাটিক হাইব্রিড (Somatic hybrids)** বলে এবং সোমাটিক হাইব্রিড তৈরির এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় **সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন (Somatic hybridisation)**। এমন একটি অবস্থার কথা ভাব যখন টমেটোর প্রোটোপ্লাস্টের সাথে আলুর প্রোটোপ্লাস্টের মিলন ঘটানো হয় এবং এরপর এগুলোর বৃদ্ধি ঘটিয়ে টমেটো ও আলুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি সমন্বিত নতুন সংকর উদ্ভিদ তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ফলস্বরূপ পমেটো উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উদ্ভিদটিতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহারোপোযোগী কাঙ্ক্ষিত সব বৈশিষ্ট্যাবলি সংমিশ্রণ ঘটেনি।

সারসংক্ষেপ

পশুপালন হল বিজ্ঞানসম্মত নীতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহপালিত প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজননের পদ্ধতি। উত্তম পশুপালন পদ্ধতিগুলোর দ্বারা গুণমানগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই খাদ্য হিসাবে প্রাণীদের ও প্রাণীজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলোর অন্তর্গত বিষয়গুলো হল (i) খামার ও খামার প্রতিপালিত প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা এবং (ii) প্রাণী প্রজনন। মধুর উচ্চ পুষ্টিমান এবং এর ঔষধি গুরুত্ব বিবেচনা করে মৌমাছির প্রতিপালন বা মৌচাষ পদ্ধতি (apiculture) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্যচাষ হল অপর একটি উন্নতিশীল শিল্পক্ষেত্র যা মাছ, মাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্যান্য জলজ খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে চলেছে।

প্যাথোজেন ও পতঙ্গাপেস্ট প্রতিরোধক্ষম ভ্যারাইটি সৃষ্টিতে উদ্ভিদ প্রজনন ব্যবহৃত হতে পারে। এর ফলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতিটি উদ্ভিজ্জ খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয় এবং এর ফলে খাদ্যের গুণমান বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে, বিভিন্ন শস্য উদ্ভিদের বহু ভ্যারাইটি সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্ভিদ প্রজননের এই সব পদ্ধতিগুলোই খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কলা পালনের কৌশলসমূহ এবং সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন, কৃত্রিম পরিবেশে নতুন ভ্যারাইটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্ভিদের পরিবর্তনসাধনের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী

1. মানব কল্যাণে পশুপালনের ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
2. যদি তোমার পরিবারের একটি ডেয়ারি ফার্ম থেকে থাকে, তাহলে তোমরা দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ও দুধের গুণমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে?
3. 'ব্রীড' বলতে কী বোঝায়? প্রাণী প্রজননের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
4. প্রাণী প্রজননে ব্যাবহৃত পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করো। তোমার মতে কোন্ পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী? কেন?
5. এপিকালচার বা মৌচাষ কী? আমাদের জীবনে এটি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ?
6. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৎস্যচাষের ভূমিকা আলোচনা করো।
7. উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির অন্তর্গত বিভিন্ন ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
8. বায়োফর্টিফিকেশন কী তা ব্যাখ্যা করো।
9. ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য উদ্ভিদের কোন্ অংশটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং কেন?
10. অনুবিস্তারণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সৃষ্টির মুখ্য সুবিধাটি কি?
11. কৃত্রিম পরিবেশে এক্সপ্ল্যান্ট বা উদ্ভিদাংশের বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত মাধ্যমটির বিভিন্ন উপাদানগুলো কী কী তা খুঁজে বের করো।
12. শস্য উদ্ভিদের এমন যেকোনো পাঁচটি সংকর ভ্যারাইটির নাম উল্লেখ করো যা ভারতবর্ষে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অধ্যায় **10**

মানব কল্যাণে অণুজীব
(MICROBES IN HUMAN WELFARE)

10.1 গৃহস্থালী সামগ্রী উৎপাদনে অণুজীব Microbes in Household Products

10.2 শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনে অণুজীব Microbes in Industrial Products

10.3 নর্দমার জল পরিশোধনে অণুজীব Microbes in Sewage Treatment

10.4 বায়োগ্যাস উৎপাদনে অণুজীব Microbes in Production of Biogas

10.5 জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধিরূপে অণুজীব Microbes as Biocontrol Agents

10.6 জীবজ সাররূপে অণুজীব Microbes as Biofertilisers

খালিচোখে দৃশ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর পাশাপাশি, অণুজীবরাও পৃথিবীতে জীবজ তন্ত্রের (biological systems) একটি প্রধান উপাদান। একাদশ শ্রেণিতে তোমরা জীবজগতের বৈচিত্র্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেছ। তোমাদের মনে আছে কি, জীবজগতের কোন্ রাজ্যে, অণুজীবরা অবস্থান করে? তারা কারা যারা শুধুমাত্র আণুবীক্ষণিক (microscopic)? অণুজীবেরা মাটি, জল, বায়ু, মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহঅভ্যন্তরে— সকল স্থানেই উপস্থিত। এরা এমনকি যেখানে জীবের অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব এইসব স্থানে-যেমন উষ্ণপ্রস্রবণের (উষ্ণ চিমণীর) অভ্যন্তরভাগ যেখানে $100^{0}C$ এর থেকেও উচ্চ তাপমাত্রা থাকে, মাটির গভীরভাগ, কয়েক মিটার পুরু বরফের নিম্নস্তর এবং অত্যন্ত আম্লিক পরিবেশে উপস্থিত থাকতে পারে। অণুজীবরা বিচিত্র ধরনের হয়। প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদ ভাইরাস, ভাইরয়েড এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত প্রিয়নও অণুজীবগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কিছু কিছু অণুজীবকে চিত্র 10.1 এবং চিত্র 10.2-তে দেখানো হল।

ব্যাকটেরিয়া এবং বহু ছত্রাকের মতো অণুজীবেরা খালিচোখে দৃশ্যমান হয় এমন কলোণীর (চিত্র 10.3) জন্য এদের পুষ্টি মাধ্যমে (nutritive media) বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। এধরনের অণুজীব সমন্বিত পালন মাধ্যমগুলো অণুজীবের অধ্যয়নে উপযোগী হয়।

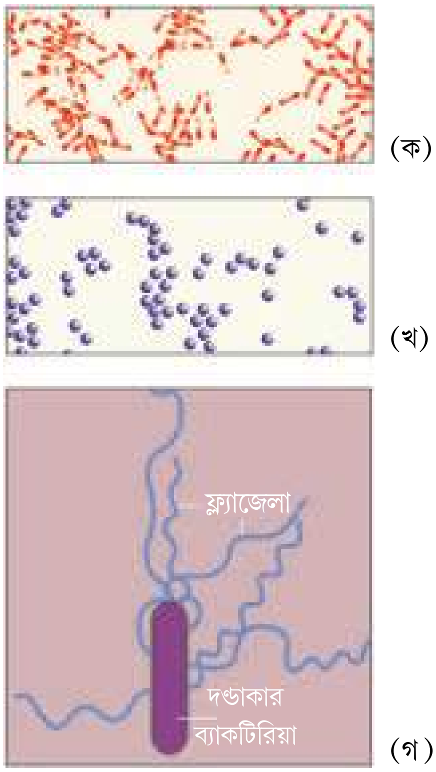

চিত্র 10.1 ব্যাকটেরিয়া (ক) দণ্ডাকার 1500x বিবর্ধিত, (খ) গোলাকার, 1500x বিবর্ধিত; (গ) একটি দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার প্রদর্শন, বিবর্ধিত 50,000x

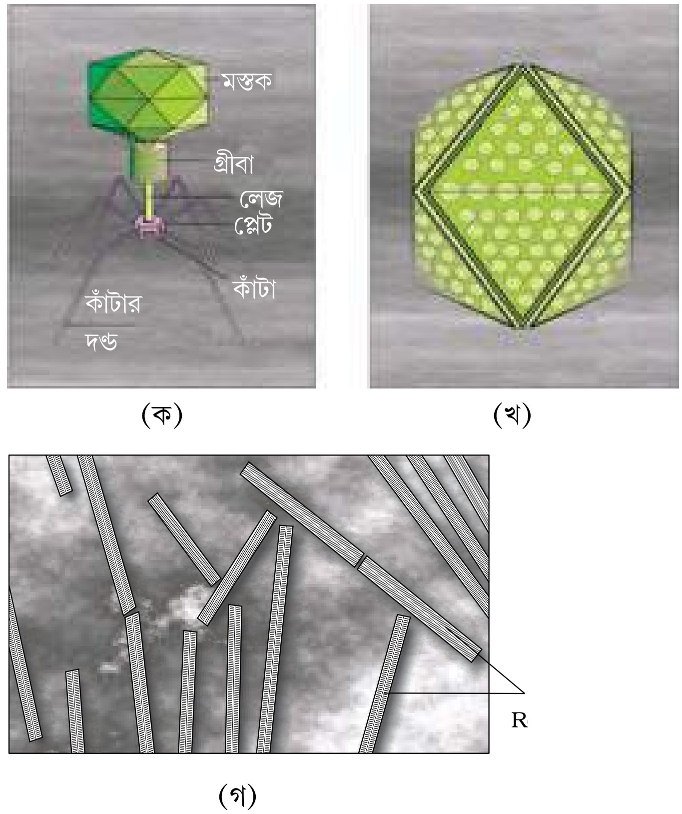

চিত্র 10.2 ভাইরাসমূহ : ক) একটি ব্যাকটেরিওফাজ; (খ) শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণকারী এডিনোভাইরাস (গ) দণ্ডাকার টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV)। প্রায় 100,000 –1,50,000x বিবর্ধিত

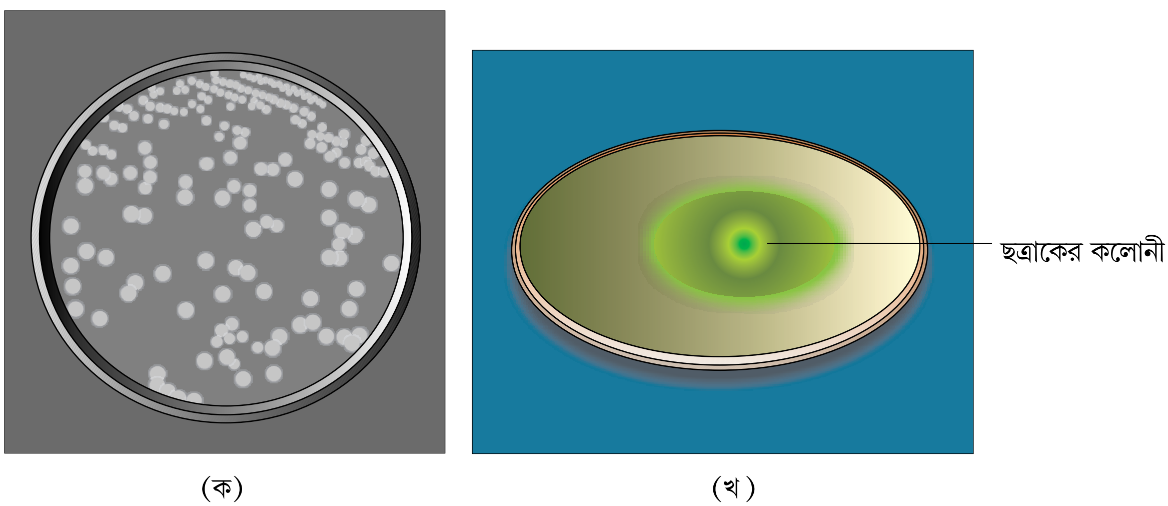

চিত্র 10.3 (ক) একটি পেট্রিডিসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যাকটেরিয়ার কলোণী (খ) একটি পেট্রিডিসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছত্রাক কলোণী

অষ্টম অধ্যায়ে তোমরা মানবদেহে অণুজীবের কারণে সৃষ্ট বহুসংখ্যক রোগ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। এরা প্রাণী এবং উদ্ভিদ দেহেও রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এর থেকে আমাদের এটা ভাবা উচিত নয় যে সব অণুজীবই ক্ষতিকর, আবার বহু (several) অণুজীব বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়। মানবকল্যাণে অণুজীবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহের মধ্যে কিছু অবদান, এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

10.1 গৃহস্থালী সামগ্রী উৎপাদনে অণুজীব (Microbes in Household products)

এটা জেনে তোমরা অবাক হতে পারো যে, আমরা অণুজীব বা তাদের থেকে উৎপাদিত পদার্থসমূহকে প্রতিদিন ব্যবহার করি। এর একটি সাধারণ উদাহরণ হল দুধ থেকে দই প্রস্তুতি। Lactobacillus এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার মত অণুজীবসমূহ যাদের সাধারণত ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া (LAB) বলে, তারা দুধে জন্মায় ও সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং দুধকে দইয়ে পরিণত করে। বৃদ্ধিকালে, ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, অ্যাসিড উৎপন্ন করে যা দুগ্ধ-প্রোটিনকে তঞ্চিত করে এবং আংশিকভাবে পাচিত করে। লক্ষাধিক ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া সমন্বিত অল্প পরিমাণ দই নিয়ে তাকে ছাঁচ (inoculum) বা সূচনাকারী পদার্থরূপে তাজা বা টাট্কা দুধের সাথে মেশানো হয়। অত:পর এই ব্যাকটেরিয়া উপযুক্ত তাপমাত্রার বিভাজিত হয় এবং দুধকে দইয়ে পরিণত করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ভিটামিন-B_{12} এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দইয়ের পুষ্টিগত মানও উন্নত করে। আমাদের পাকস্থলীতেও LAB রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণে বাধা দেয় এবং এভাবে অত্যন্ত উপকারী ভূমিকা পালন করে।

ইড্লী এবং ধোসার মত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করতে যে ময়দার তাল (dough) ব্যবহার করা হয় তাকেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে গাঁজানো হয়। এই সময় CO_2 গ্যাসের উৎপাদন হওয়ার কারণে ময়দার তালটি ফুলে উঠে। তোমরা কি বলতে পারো কোন্ বিপাকীয় পথটি সংগঠিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে CO_2 উৎপন্ন হয়? তোমরা চিন্তা করতে পারো কি এই সন্ধান প্রক্রিয়াগুলো ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া কোথা থেকে আসে? ঠিক একইভাবে রুটি বানানোর জন্য যে ময়দার তাল ব্যবহার করা হয়, তাকেও বেকারীর ইস্ট *(Saccharomyces cerevisiae)* ব্যবহার করে গাঁজানো হয়। কিছু সংখ্যক চিরাচরিত পানীয় এবং খাদ্যসামগ্রীও জীবাণুর সাহায্যে সন্ধান ঘটিয়ে প্রস্তুত করা হয়। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশের একটি চিরাচরিত পানীয় হল 'তাড়ি' (toddy), যা তালের রসকে গাঁজিয়ে তৈরি করা হয়। মাছ, সয়াবিন এবং বাঁশের কচিকাণ্ডকে গাঁজিয়ে খাদ্য তৈরির জন্যও অণুজীবসমূহ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনতম খাদ্যবস্তুর মধ্যে একটি হল চিজ (cheese) এবং এর প্রস্তুতিতে অণুজীবসমূহ ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন ভ্যারাইটির চিজকে তাদের চারিত্রিক গঠন বিন্যাস, সুগন্ধ ও স্বাদের সাহায্যে চেনা যায় এবং চিজের এই নির্দিষ্টতা অণুজীবের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, *Propionibacterium sharmanii* নামক একটি ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে CO_2 উৎপন্ন হওয়ার কারণেই 'সুইস চিজে' (Swiss cheese) বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। একটি বিশেষ প্রকার ছত্রাক 'রোকেফর্ট চিজ' (Roquefort cheese) এর উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এর পরিপক্কতা ঘটায় এবং এই চিজকে একটি বিশেষ সুগন্ধ প্রদান করে।

10.2 শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনে অণুজীব (Microbes In Household products)

এমনকি শিল্পক্ষেত্রেও, মানুষের জন্য মূল্যবান বিভিন্নপ্রকার সামগ্রী সংশ্লেষণের জন্য, অণুজীবরা ব্যবহৃত হয়। পানীয় সামগ্রী এবং অ্যান্টিবায়োটিক হল এর কিছু উদাহরণ। শিল্প কারখানায় বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের জন্য, খুব বড় একটি পাত্রে অণুজীবদের বৃদ্ধি ঘটানোর প্রয়োজন হয় এবং এই বৃহৎ পাত্রটিকে ফারমেনটর (fermentor) বলে (চিত্র 10.4)।

চিত্র 10.4 ফারমেনটর

চিত্র 10.5 ফারমেনটেশন প্ল্যান্ট

10.2.1 সন্ধান প্রক্রিয়াজাত পানীয়সমূহ (Fermented Beverages)

মদ, বিয়ার, হুইস্কি, ব্রান্ডি বা রামের মত পানীয়গুলোর উৎপাদনের জন্য স্মরণাতীত কাল থেকেই অণুজীবসমূহ বিশেষত ইস্ট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কাজের জন্য রুটি তৈরিতে ব্যবহৃত এবং সচরাচর বেকারীর ইস্ট (brewer's yeast) নামে পরিচিত, একই ইস্ট *Saccharoymes cerevisiae* ইথানল উৎপাদনের জন্য খাদ্য শস্যের মণ্ড ও ফলের রসকে গাঁজাতে ব্যবহৃত হয়। তোমরা কি সেই বিপাকীয় বিক্রিয়াগুলোর কথা মনে করতে পারো যেগুলোর ফলশ্রুতিতে ইস্ট দ্বারা ইথানলের উৎপাদন ঘটে? সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন এবং প্রক্রিয়াকরণের ধরন (পাতন বা পাতনবিহীন) উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের অ্যালকোহলজাতীয় পানীয় পাওয়া যায়। গেঁজানো রসের (fermented borth) পাতনক্রিয়া দ্বারা হুইস্কি, ব্রান্ডি ও রাম তৈরি করা হয়, অপরদিকে পাতন ব্যতিরেকে মদ ও বিয়ার উৎপাদন করা হয়। চিত্র 10.5 এ একটি ফারমেনটেশন প্ল্যান্টের আলোকচিত্র বা ফটো দেখানো হয়েছে।

10.2.2 অ্যান্টিবায়োটিকস (Antibiotics)

অণুজীব ব্যবহার করে অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন, বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি রূপে গণ্য করা হয় এবং মানব সমাজের কল্যাণে এর মহৎ অবদান রয়েছে। 'Anti' হল একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল কোন কিছুর বিরুদ্ধে, এবং 'bio' বলতে জীবনকে বোঝায়; এই দুটি শব্দকে একসাথে করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, কোন কিছু যা 'জীবনের বিরুদ্ধে' (against life) কাজ করে (রোগ সৃষ্টিকারী জীবসমূহের প্রেক্ষাপটে); অপরদিকে মানুষের প্রসঙ্গে এই শব্দদুটি একসাথে জীবনের স্বপক্ষে কোনো কিছু বোঝায়, জীবনের বিরুদ্ধে নয়। অ্যান্টিবায়োটিক বলতে সেইসব রাসায়নিক পদার্থগুলোকে বোঝায়, যেগুলোকে কিছু অণুজীব ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয় এবং এরা অন্যান্য অণুজীবদের (রোগ সৃষ্টিকারী) ধ্বংস করতে বা বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে।

সচরাচর ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিনের সাথে তোমরা পরিচিত। তোমরা কি জানো যে, পেনিসিলিনই ছিল সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক এবং ঘটনাচক্রেই (chance) এর আবিষ্কার হয়েছিল? *Staphylococci* ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করার সময় আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একবার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, তাঁর অধৌত কলাপালন প্লেটগুলোর একটিতে মোল্ড (mould) বেড়ে উঠায় তার চতুর্দিকে *Staphylococci* আর বেড়ে উঠতে পারেনি। তিনি বের করেছিলেন যে, মোল্ড দ্বারা সৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই এরকম ঘটেছে এবং তিনি ঐ মোল্ড *Penicillium notatum* এর উপর ভিত্তি করে, এর নামকরণ করেন পেনিসিলিন। তবে এটি কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে, এর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আরও পরে, আর্নেস্ট চেইন এবং হাওয়ার্ড ফ্লোরি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত আমেরিকার সৈন্যদের চিকিৎসায় এই অ্যান্টিবায়োটিকটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই আবিষ্কারের জন্য 1945 খ্রিস্টাব্দে ফ্লেমিং, চেইন এবং ফ্লোরিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

পেনিসিলিনের পর, অন্য অণুজীবের সাহায্যে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিকগুলোরও বিশুদ্ধিকরণ হয়েছিল। তোমরা কি অন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলতে এবং তাদের উৎস খুঁজে বের করতে পারবে? সারা বিশ্বে মিলিয়নেরও বেশি মানুষের প্রাণ নাশকারী বিভিন্ন রোগ যেমন- প্লেগ, হুপিং কফ (কালো কাঁশি), ডিপথেরিয়া (গাল ঘোঁটু) এবং লেপ্রোসি (কুষ্ঠ রোগ) ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে অ্যান্টিবায়োটিক, আমাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করে। বর্তমানে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক বিহীন একটি পৃথিবীর কথা কল্পনা করতে পারিনা।

10.2.3 রাসায়নিক পদার্থসমূহ, উৎসেচকসমূহ এবং অন্যান্য জৈবসক্রিয় অণুসমূহ (Chemicals, Enzymes and other Bioactive Molecules)

জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল এবং উৎসেচকের মতো কতিপয় রাসায়নিক পদার্থসমূহের, বাণিজ্যিক ও শিল্পজাত উৎপাদনের জন্যও অণুজীবদের ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি অ্যাসিড উৎপাদনকারী অণুজীবদের মধ্যে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য *Aspergillus niger* (একটি ছত্রাক), অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য *Acetobacter aceti* (একটি ব্যাকটেরিয়া), বিউটারিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য *Clostridium butylicum* (একটি ব্যাকটেরিয়া) এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য *Lactobacillus* (একটি ব্যাকটেরিয়া)।

ইথানলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ইস্ট (Saccharomyces cerevisiae) ব্যবহৃত হয়। উৎসেচক উৎপাদনের জন্যও অণুজীবদের ব্যবহার করা হয়। সাবান (detergent) প্রস্তুত করতে লাইপেজ ব্যবহৃত হয় এবং ইহা লন্ড্রিতে তৈলাক্ত দাগ (stain) দূর করতে সাহায্য করে। তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যে বাজার থেকে আনা বোতলজাত ফলের রস, ঘরে তৈরি করা ফলের রস থেকে অধিকতর স্বচ্ছ হয়। এক্ষেত্রে পেকটিনেজ এবং প্রোটিয়েজ ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই বোতলজাত ফলের রস স্বচ্ছ হয়। Streptococcus ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন জিনগত প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তিত উৎসেচক স্ট্রেপটোকাইনেজ (streptokinase) মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশানে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তবাহ থেকে রক্ততঞ্চনপিণ্ড অপসারণের জন্য একটি 'ক্লট ব্লাস্টার (clot buster)' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশানের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হয়।

অপর একটি জৈব সক্রিয় অণু হল *Trichoderma polysporum* ছত্রাক দ্বারা উৎপন্ন সাইক্লোস্পোরিন A, যা রোগীর দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সময় একটি অনাক্রম্য প্রতিরোধক (immunosuppressive) পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। *Monascus purpureus* নামক ছত্রাক থেকে উৎপন্ন স্ট্যাটিনকে (statins) রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাসকারী বস্তুরূপে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে। এটি কোলেস্টেরল সংশ্লেষণের জন্য দায়ী উৎসেচকটিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাধা দেওয়ার কাজটি করে।

10.3 নর্দমার জল পরিশোধনে অণুজীব (Microbes in Sewage Treatment)

আমরা জানি যে, প্রতিদিন শহর ও নগরে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য জল উৎপন্ন হয়। এই বর্জ্য জলের একটি মুখ্য উপাদান হলো মানুষের মলমূত্র। পৌর এলাকায় উৎপন্ন এই বর্জ্যজলকে নর্দমার জলও (sewage) বলে। এতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ এবং অণুজীব রয়েছে। এই অণুজীবগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব। তোমরা কি কখনো এটা ভেবে অবাক হয়েছে যে, প্রতিদিন এই বিশাল পরিমাণ নর্দমার জল বা পৌর এলাকার বর্জ্য জল, কোথায় অপসারিত হয়? এই বর্জ্য জলকে নদী বা ছোটো জলধারার মতো প্রাকৃতিক জলাশয়ে মুক্ত করা যেতে পারে না এবং এর কারণও তোমরা বুঝতে পারছ। তাই অপসারণের পূর্বে বর্জ্য জলের দূষণ হ্রাস করার জন্য বর্জ্য জল পরিশোধন কেন্দ্রে বা স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে (STPs) এর পরিশোধন করা হয়। বর্জ্য জলে স্বাভাবিকভাবে

চিত্র 10.6 গৌণ পরিশোধন

উপস্থিত পরভোজী অণুজীব দ্বারা, এই বর্জ্য জলের পরিশোধন করা হয়। বর্জ্য জলের এই পরিশোধন দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয় :

প্রাথমিক পরিশোধন (Primary treatment)

বর্জ্যজল পরিশোধনের এই পর্যায় মূলত পরিস্রাবণ এবং অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে বর্জ্য জল থেকে ভৌত প্রক্রিয়ায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কণাগুলোর অপসারণ ঘটে। এই বর্জ্যগুলোর অপসারণ ধাপে ধাপে ঘটে, প্রথমদিকে ধারাবাহিক পরিস্রাবণের মাধ্যমে ভাসমান বস্তুগুলোর অপসারণ ঘটানো হয়। এরপর অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে কাকড়গুলোকে (grit-বালি ও ছোটো নুড়ি) বর্জ্য জল থেকে আলাদা করা হয়। থিতিয়ে পড়া সব পদার্থগুলো প্রাইমারী স্লাজ (sludge) গঠন করে এবং অধঃক্ষেপণের উপরিস্থিত তরল (supernatant) প্রবহমান বর্জ্যতরল অ্যাফ্লুয়েন্ট (effluent) গঠন করে। গৌণ পরিশোধনের জন্য, প্রাথমিক অধঃক্ষেপণ জলাধার (primary setting tank) থেকে প্রবহমান বর্জ্যতরল সংগ্রহ করা হয়।

গৌণ পরিশোধন বা জীবজ পরিশোধন (Secondary treatment or Biological treatment)

প্রাথমিক প্রবহমান বর্জ্য তরলকে বায়ু চালনা করা হয় এমন একটি ট্যাঙ্কে (aeration tank) পাঠানো হয় (চিত্র 10.6), যেখানে ক্রমাগতভাবে, যান্ত্রিক উপায়ে এর আলোড়ন (agitated) হয় এবং পাম্পক্রিয়ার মাধ্যমে এতে বায়ুপ্রবেশ করানো হয়। এরফলে ঐ ট্যাঙ্কে উপযোগী সবাত অণুজীবগুলো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফ্লক (flocs) (ছত্রাক অণুসূত্রগুলোর সাথে সম্মিলিত প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া যা জালকের ন্যায় গঠন) সৃষ্টি করে। বৃদ্ধি চলাকালে, এইসব অণুজীবরা প্রবহমান বর্জ্য তরলে উপস্থিত জৈবপদার্থের বেশীরভাগ অংশ ভক্ষণ করে। এরফলে প্রবহমান বর্জ্যতরলের BOD (biochemical oxygen demand অর্থাৎ অক্সিজেনের জৈব রাসায়নিক চাহিদা) তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। BOD বলতে অক্সিজেনের সেই পরিমাণকে বোঝায়, যা এক লিটার জলে উপস্থিত সব জৈববস্তু ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারণকালে ব্যবহৃত হবে। নর্দমার বর্জ্যজলের পরিশোধন ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ না ঐ জলের BOD হ্রাস পাচ্ছে। নমুনা হিসেবে নেওয়া জলে উপস্থিত অণুজীব দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করার হারকে BOD পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং তাই পরোক্ষভাবে বলা যায় যে, জলের মধ্যে উপস্থিত জৈববস্তুর একটি পরিমাপ হল BOD। বর্জ্যজলের BOD যত বেশি হবে তার দূষণ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তত বেশি হবে।

যে মুহূর্তে নর্দমা কিংবা বর্জ্যজলের BOD তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায় তখন প্রবহমান বর্জ্যতরলকে অধঃক্ষেপণ জলাধারে (setting tank) পাঠানো হয়, যেখানে ব্যাকটেরিয়া সমন্বিত 'ফ্লকের' অধঃক্ষেপণ ঘটে। এই প্রকার অধঃক্ষেপকে 'একটিভেটেড স্লাজ' (activated sludge) বলে। একটিভেটেড স্লাজের একটি ছোটো অংশ ছাঁচ (inoculum) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বায়ু প্রবাহ চালনা করা হয় এমন ট্যাঙ্কে, পাম্পক্রিয়ার সাহায্যে ফেরৎ পাঠানো হয়। স্লাজের অবশিষ্ট বৃহৎ অংশটিকে পাম্পের সাহায্যে বড় ট্যাঙ্কে পাঠানো হয় এবং এই বড় ট্যাঙ্কগুলোকে এনেরোবিক স্লাজ ডাইজেস্টার (anaerobic sludge digesters) বলে। এখানে অবাত পরিবেশে বৃদ্ধি পায় এমন অন্য ব্যাকটেরিয়াগুলো স্লাজে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকদের পাচিত (digest) করে। এই পাচনকালে ব্যাকটেরিয়া গ্যাসের একটি মিশ্রণ তৈরি করে যাতে মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উপস্থিত

থাকে। এই গ্যাসগুলো জৈব গ্যাসের (বায়োগ্যাস) সৃষ্টি করে এবং এটি দাহ্য (inflammable) হওয়ায় শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গৌণ পরিশোধন প্ল্যান্ট থেকে প্রবাহমান বর্জ্যতরলকে (effluent) সাধারণত নদী এবং ছোটো জলধারার মত প্রাকৃতিক জলাধারে পাঠানো হয়। পরিশোধক প্ল্যান্টের একটি আন্তরীক্ষ দৃশ্য, চিত্র 10.7 এ দেখানো হল।

চিত্র 10.7 একটি নর্দমার জল পরিশোধন প্ল্যান্টের একটি আন্তরীক্ষ দৃশ্য

প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ গ্যালন বর্জ্যজল পরিশোধনে অণুজীবরা কিভাবে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো। এই পদ্ধতিটি বিশ্বের প্রায় সব অংশেই এক শতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজ পর্যন্তও অণুজীব দ্বারা নর্দমার বর্জ্যজল পরিশোধনের সমকক্ষ কোনো মনুষ্যনির্মিত প্রযুক্তি বের করা যায়নি।

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নর্দমার বর্জ্যজল যে অধিক পরিমাণে তৈরি হচ্ছে সেই বিষয়ে তোমরা অবগত আছো। তবে এই বিশাল পরিমাণ নর্দমার বর্জ্যজল পরিশোধনের জন্য নর্দমার জল পরিশোধন কেন্দ্রের সংখ্যা তেমনভাবে বাড়েনি। তাই অপরিশোধিত নর্দমার বর্জ্য জলকে প্রায়শই নদীতে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হয় যা জলদূষণ এবং জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের দেশের মুখ্য নদীগুলোকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, পরিবেশ ও বনমন্ত্রক, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান এবং যমুনা অ্যাকশন প্ল্যানের সূচনা করেন। এই প্রকল্পে অধিক সংখ্যক নর্দমার বর্জ্যজল পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে কেবলমাত্র পরিশোধিত বর্জ্যজল নদীতে মুক্ত হতে পারে। তোমাদের আশেপাশে অবস্থিত যে-কোনো একটি নর্দমার জল পরিশোধন কেন্দ্র পরিদর্শন কর, এরফলে তোমাদের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা হবে।

10.4 বায়োগ্যাস উৎপাদনে অণুজীব (Microbes in Production of Biogas)

অণুজীবদের ক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসসমূহের একটি মিশ্রণ (প্রধানত মিথেন সমন্বিত) হল বায়োগ্যাস এবং এটি জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তোমরা জেনেছ যে, অণুজীবরা তাদের বৃদ্ধি ও বিপাকের সময় বিভিন্ন ধরনের গ্যাসীয় অন্তিম পদার্থ সৃষ্টি করে। কি ধরনের গ্যাস উৎপন্ন হবে তা অণুজীবসমূহ এবং যে সাবস্ট্রেট অণুগুলোকে এরা কাজে লাগায় তার উপর নির্ভর করে। ময়দার তালের সন্ধান, চিজ তৈরি এবং পানীয়সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রধান গ্যাসটি ছিল CO_2। তবে সেলুলোজ জাতীয় দ্রব্যের উপর অবাতভাবে বেড়ে উঠা কতিপয় ব্যাকটেরিয়া CO_2 এবং H_2 এর সাথে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সামগ্রিকভাবে মিথানোজেন (methanogens) বলে এবং এমন একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়া হল *Methanobacterium*। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সাধারণত নর্দমার বর্জ্যজল পরিশোধনকালে অবাত নর্দমা বর্জ্যে (anaerobic sludge) পাওয়া যায়। এইসব ব্যাকটেরিয়া গবাদিপশুর রুমেনেও (পাকস্থলীর একটি অংশ) উপস্থিত থাকে। গবাদিপশুর খাদ্যে উপস্থিত প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ জাতীয় বস্তু এদের রুমেনেও উপস্থিত থাকে। রুমেনের মধ্যে এই সব ব্যাকটেরিয়া লেলুলোজ ভাঙ্গানে সাহায্য করে। তোমরা কি মনে করো, আমরা অর্থাৎ মানুষেরা, আমাদের খাদ্যে উপস্থিত সেলুলোজের পরিপাকে সক্ষম? তাই গবাদি পশুর মলমূত্র, গো মল (dung), যাকে সাধারণত গোবর (gobor) বলা হয়, তা ব্যাকটেরিয়াসমৃদ্ধ হয়। গো মলকে জৈবগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে

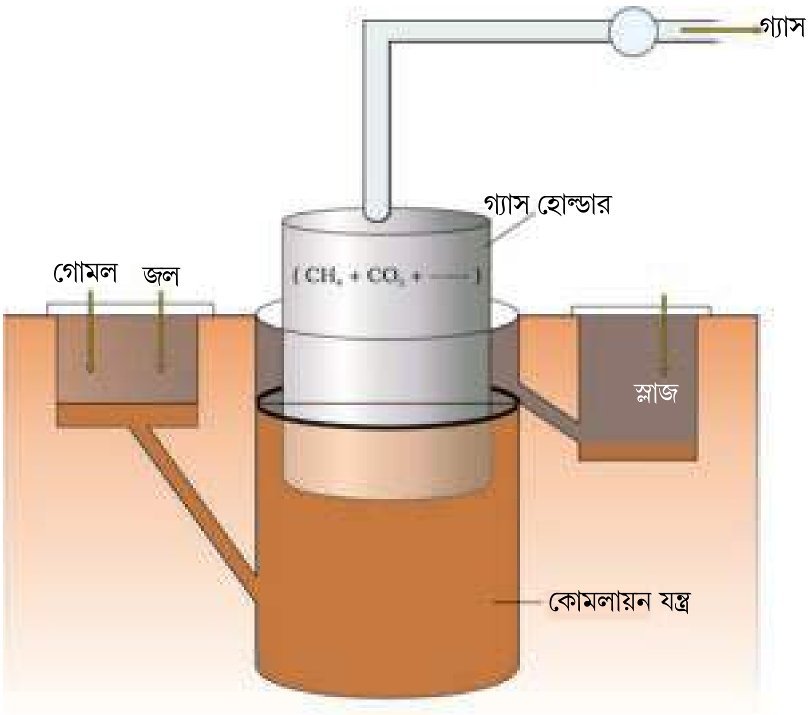

চিত্র 10.8 একটি সাধারণ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

পারে, যাকে সাধারণত গোবর গ্যাস বলা হয়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটি একটি কংক্রীট নির্মিত ট্যাঙ্ক (10-15ফুট গভীর) একটি গোবর জলের মিশ্রণ (slurry) রাখার পাত্র নিয়ে গঠিত হয়। কংক্রীট নির্মিত ট্যাঙ্কটিতে জৈববর্জ্য সংগ্রীহত হয় এবং বাকী পাত্রটি গোবরজলের মিশ্রণে পূর্ণ থাকে। ঐ গোবরজলের মিশ্রণের উপর একটি ভাসমান ঢাকনা স্থাপন করা হয়। অণুজীবদের ক্রিয়ার ফলে ট্যাঙ্কটিতে গ্যাস উৎপন্ন হলে ঢাকনাটি উপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে একটি নির্গমনপথ (outlet) থাকে, যা পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরগুলোতে বায়োগ্যাস সরবরাহের জন্য, একটি নলের সাথে যুক্ত করা থাকে। অপর একটি নির্গমদ্বারের মাধ্যমে ব্যবহৃত গোবর মিশ্রিত জল অপসারিত হয় এবং এটি সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। গ্রামাঞ্চল যেখানে, বিভিন্ন কাজে গবাদিপশু ব্যবহৃত হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে গো মল অর্থাৎ গোবর পাওয়া যায়। তাই গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মিত হয়। তাই উৎপন্ন বায়োগ্যাস রান্না করা এবং আলোকিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। চিত্র 10.8 এ একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ছবি দেখানো হয়েছে। ভারতবর্ষে বায়োগ্যাস উৎপাদনের প্রযুক্তি মূলতঃ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IARI) এবং খাদি এণ্ড ভিলেজ ইনড্রাস্টিজ কমিশনের (KVIC) প্রচেষ্টার কারণেই বিকশিত হয়েছে। যদি তোমাদের বিদ্যালয়টি কোন্ গ্রাম বা গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে তবে তার নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। ঐ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটির পরিদর্শন করো এবং প্রকৃত অর্থেই যারা এরসঙ্গে যুক্ত তাদের কাছ থেকে এবিষয়ে আরও কিছু জেনে নাও।

10.5 জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধিরূপে অণুজীব (Microbes as biocontrol agents)

জীবজ নিয়ন্ত্রণ বলতে উদ্ভিদের রোগসমূহ এবং পেষ্টনিয়ন্ত্রণের জন্য জীবজ পদ্ধতিসমূহের (biological methods) ব্যবহারকে বোঝায়। আধুনিক সমাজে, রাসায়নিক পদার্থসমূহের ব্যবহার দ্বারা অর্থাৎ পতঙ্গানাশক ও পেষ্টনাশকের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের সাহায্যে এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা হচ্ছে। এইসব রাসায়নিক পদার্থসমূহ মানুষ এবং তার সমগোত্রীয় প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এগুলো আমাদের পরিবেশ (মাটি, ভূনিম্নস্থ জল), ফল, শাকসব্জি এবং শস্যজাত উদ্ভিদেরও দূষিত করছে। আগাছা দূরীকরণের জন্য আগাছানাশক ব্যবহারের ফলে আমাদের মৃত্তিকাও দূষিত হচ্ছে।

পেষ্ট ও রোগসমূহের জীবজ নিয়ন্ত্রণ (Biological control of pests and diseases)

কৃষিকার্যে, এমন একটি পেষ্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে যা রাসায়নিক পদার্থসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে পেষ্টনিয়ন্ত্রণের তুলনায় প্রকৃতিতে সংগঠিত শিকারের (predation) উপর অধিক নির্ভর করে। যেসব চাষীরা জৈবপদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তাদের একটি প্রধান বিশ্বাস হল যে, জৈববৈচিত্র্য স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। একটি ল্যাণ্ডস্ক্যাপে (landscape) যতবেশি বৈচিত্র্য থাকে ইহা ততবেশি টেকসই হয়। কাজেই

যেসব চাষীরা জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তারা এমন একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে যেখানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেস্ট বলে অভিহিত কীট পতঙ্গাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়না। বরং এর পরিবর্তে একটি সজীব ও স্পন্দনশীল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বাধাদান এবং ভারসাম্য রক্ষার একটি জটিল পদ্ধতির সাহায্যে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা যায় এমন স্তরে রাখা হয়। প্রথাগত চাষ পদ্ধতি যেখানে প্রায়শই রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে উপযোগী এবং ক্ষতিকর জীবসমূহ নির্বিচারে ধ্বংস হয় । তার বিপরীতে, এটি এমন একটি সার্বিক পদক্ষেপ যা প্রকৃতিতে ফ্লোরা ও ফণা গঠনকারী অসংখ্য জীবের মধ্য জালকাকার আন্তক্রিয়া উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এমন কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী হল এই যে প্রায়শই পেস্টরূপে বর্ণিত সজীব বস্তুদের সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণ কেবলমাত্র যে অসম্ভব তাই নয়, এটি অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে, কারণ এদের অনুপস্থিতিতে এদের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল উপযোগী শিকারী প্রাণীরা এবং এদের পোষক হিসেবে ব্যবহার করে, এমন পরজীবী পতঙ্গোরা প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সমর্থ হবে না। তাই জীব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহকে ব্যবহার করলে, বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশকের প্রতি আমাদের নির্ভরতা অনেকটা হ্রাস পাবে। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঐ এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের অর্থাৎ শিকারী প্রাণীদের পাশাপাশি পতঙ্গাদের জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস এবং তাদের পছন্দমাফিক বাসস্থান সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া। এটি জীবজ নিয়ন্ত্রণের যথাযথ পথের বিকাশে সাহায্য করবে।

খুবই পরিচিত লাল ও কালো ছোপযুক্ত গোবরেপোকা— লেডিবার্ড এবং গঙ্গাফড়িং যথাক্রমে এফিড ও মশাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়। জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী অণুজীব প্রতিনিধিদের একটি উদাহরণ হল *Bacillus thuringiensis* (প্রায়শই Bt রূপে লেখা হয়) নামক ব্যাকটেরিয়া যা প্রজাপতির শুঁয়োপোকাদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এগুলো ছোট প্যাকেটে শুষ্ক রেণুরূপে উপলব্ধ হয়। এই রেণুগুলোকে জলের সাথে মিশিয়ে সরিষা জাতীয় উদ্ভিদ (brassicas) এবং ফলদায়ী বৃক্ষের মত আক্রান্ত হতে পারে এমন উদ্ভিদে স্প্রে করা হলে সেগুলো পতঙ্গাদের লার্ভা দ্বারা ভক্ষিত হয়। লার্ভাগুলোর অন্ত্রে অধিবিষ (toxin) নির্গত হয় এবং এরফলে লার্ভাগুলোর মৃত্যু ঘটে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজাত রোগটি শুঁয়োপোকাগুলোকে মেরে ফেলে, কিন্তু অন্যান্য পতঙ্গাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। বিগত দশক বা তারও বেশি সময়কাল ধরে জিনগত প্রযুক্তির বিকাশ ঘটার কারণে বিজ্ঞানীরা *B. thuringiensis* এর অধিবিষের সংকেত বহনকারী জিনগুলোকে উদ্ভিদদেহে অনুপ্রবেশ ঘটান। এই ধরনের উদ্ভিদেরা কীট পতঙ্গাদের আক্রমণ প্রতিরোধী হয়। এমন একটি উদাহরণ হল Bt তুলা (Bt-cotton), যাকে আমাদের দেশের কিছু রাজ্যে চাষ করা হয়। অধ্যায় 12 তে এই সম্পর্কে তোমরা আরও কিছু শিখবে।

উদ্ভিদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য *Trichoderma* নামক ছত্রাককে একটি জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি করা হয়। *Trichoderma* প্রজাতিরা হল স্বাধীনজীবী ছত্রাক, যাদের সাধারণত মূলের বাস্তুতন্ত্রে পাওয়া যায়। এগুলো বহু উদ্ভিদ প্যাথোজেন নিয়ন্ত্রণে জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধি হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

ব্যাকিউলোভাইরাস হল এমন রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব যারা পতঙ্গ এবং অন্যান্য সন্ধিপদ প্রাণীদের আক্রমণ করে। জীবজ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহৃত অধিকাংশ ব্যাকিউলোভাইরাসই, নিউক্লিও পলিহেড্রোভাইরাসগণের অন্তর্গত হয়। এই ভাইরাসগুলো প্রজাতি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পরিসরে, পতঙ্গানাশকরূপে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এরা উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী, পক্ষী, মৎস্য এমনকি যেসব পতঙ্গাদের কথা মাথায় রেখে প্রয়োগ হয়নি, তাদের উপরও এদের ঋণাত্মক প্রভাব দেখা যায়নি। এটি বিশেষত তখনই কাঙ্ক্ষিত হবে যখন একটি সামগ্রিক সুসংহত পেস্ট ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে (IPM) সফল করার জন্য উপকারী পতঙ্গাগুলোকে সংরক্ষণ করা হবে অথবা যখন বাস্তুতন্ত্রগত দিক থেকে একটি সংবেদনশীল অঞ্চলের পরিচর্যা করা হবে।

10.6 জীবজসাররূপে অণুজীব (Microbes as biofertisers)

বর্তমানযুগে আমাদের ক্রিয়াকলাপের কারণেই পরিবেশীয় দূষণ আমাদের উদ্বেগের একটি মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এই দূষণ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এখন অবশ্যই বুঝতে পারছি যে, রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহার এইসব সমস্যার সাথে যুক্ত এবং এর ফলস্বরূপ, জীবজ সার ব্যবহারের মাধ্যমে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করার জন্য উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবজ সার বলতে সেই সব জীবদের বোঝায় যারা মাটির পুষ্টিগত গুণমান বৃদ্ধি করে। জীবজ সারসমূহের মুখ্য উৎসগুলো হল ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া। শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের *Rhizobium* এর মিথোজীবী সহাবস্থানের ফলে গঠিত অর্বুদগুলো সম্বন্ধে তোমরা অধ্যয়ন করেছ। এই ব্যাকটিরিয়াগুলো পরিবেশীয় নাইট্রোজেনকে আবন্ধ করে জৈবযৌগে পরিণত করে যা পরিপোষকরূপে উদ্ভিদ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। মাটিতে স্বাধীনজীবীরূপে বসবাসকারী অন্য ব্যাকটেরিয়া (উদাহরণ *Azospirillum* এবং *Azotobacter*), বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে মাটিতে আবন্ধ করতে পারে এবং এইভাবে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ছত্রাকদেরও উদ্ভিদের সাথে মিথোজীবীয় সংগঠন (mycorrhiza) গঠন করতে দেখা যায়। Glomus গণের অন্তর্ভুক্ত বহু ছত্রাক মাইকোরাইজা গঠন করে। এই সংগঠনগুলোতে উপস্থিত মিথোজীবী ছত্রাকগুলো মাটি থেকে ফসফরাস শোষণ করে এবং তাকে উদ্ভিদদেহে প্রেরণ করে। যেসব উদ্ভিদে এরূপ সংগঠন দেখা যায় তারা কিছু সুবিধাও লাভ করে যেমন, মূলের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায় এমন প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠা, লবণতা ও খরা সহনক্ষমতা এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের সামগ্রিক উন্নতি ঘটা। তোমরা কি বলতে পারো, এই সংগঠন থেকে ছত্রাক কি সুবিধা লাভ করে?

সাযানোব্যাকটেরিয়া হল সেইসব স্বভোজী অণুজীব যারা জলজ ও স্থলজ পরিবেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার বহু প্রজাতি বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে সংবন্ধন করতে পারে, যেমন Anabaena, Nostoc, Oscillatoria ইত্যাদি। ধানক্ষেতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবজ সাররূপে সায়ানোব্যাকটেরিয়া কাজ করে। নীলাভ সবুজ শৈবালও মাটিতে জৈববস্তু যোগ করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অধুনা, আমাদের দেশে বেশকিছু জীবজসার বাজারে বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ রয়েছে এবং মাটির পুষ্টিদ্রব্যের পুনঃবুদ্ধার ও রাসায়নিক সার নির্ভরতা হ্রাস করতে কৃষকেরা তাদের জমিতে নিয়মিতভাবে এগুলো ব্যবহার করছে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অণুজীব। সব অণুজীবরা রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব নয়, বহু অণুজীবই মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমরা প্রায় প্রতিদিনই অণুজীব এবং অণুজীবের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুসমূহ ব্যবহার করি। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া (LAB) নামে পরিচিত ব্যাকটেরিয়া দুধে জন্মায় এবং দুধকে দইয়ে পরিণত করে। রুটি তৈরির জন্য যে ময়দার তাল ব্যবহার করা হয় তাকে *Saccharomyees cerevisiae* নামক ঈস্টের সাহায্যে গাঁজানো হয়। ইড্‌লী এবং দোসার মত কিছু খাবার অণুজীবের সাহায্যে গাঁজানো ময়দার তাল থেকে তৈরি করা হয়। চিজের নির্দিষ্ট গঠন, স্বাদ এবং সুগন্ধের জন্য ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ব্যবহৃত হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মত শিল্পজাত বস্তু উৎপাদনে অণুজীব ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অণুজীবরা শিল্পকারখানাতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকরণের সময় ব্যবহৃত হয়। উপকারী অণুজীব থেকে সৃষ্ট পেনিসিলিনের মত অ্যান্টিবায়োটিকদের বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর জীবাণুসমূহকে ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়। ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও নিউমোনিয়ার মত সংক্রামক রোগসমূহের

নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো মুখ্য ভূমিকা নেয়। একশো বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে একটিভেটেড স্লাজ সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়ার সাহায্যে নর্দমার জল (বর্জ্যজল) পরিশোধনের অণুজীবরা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটি প্রকৃতিতে জলের পুনরাবর্তনে সাহায্য করে। উদ্ভিজ্জ বর্জ্যের বিয়োজনকালে মিথানোজেনসমূহ মিথেন (বায়োগ্যাস) উৎপন্ন করে। অণুজীবের সাহায্যে উৎপন্ন বায়োগ্যাসকে গ্রামাঞ্চলে শক্তির একটি উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়। পেস্টদের ধ্বংস করার কাজেও অণুজীবসমূহ ব্যবহৃত হতে পারে এই প্রক্রিয়াটিকে জীবজনিয়ন্ত্রণরূপে অভিহিত করা হয়। পেস্টদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিক মাত্রায় ক্ষতিকর পেস্টিসাইডগুলোর ব্যবহার এড়াতে জীবজনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ আমাদের সাহায্য করে। বর্তমান দিনগুলোর একটি চাহিদা হল এই যে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জীবজসার ব্যবহারে কৃষকদের অণুপ্রাণিত করা। মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজে অণুজীবের ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এরা মানব সমাজের উন্নতি সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

1. ব্যাকটেরিয়াদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু এদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যেতে পারে। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে অণুজীবের উপস্থিতি প্রদর্শনের জন্য তোমরা যদি একটি নমুনাকে বাড়ি থেকে তোমাদের জীববিদ্যার পরীক্ষাগারে নিয়ে যেতে হয় তবে কোন নমুনাটিকে তোমরা নিয়ে যাবে এবং কেন?

2. বিপাককালে অণুজীবদের দেহ থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তা প্রমাণের জন্য উদাহরণ দাও।

3. কোন্ ধরনের খাদ্যে তোমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া পাবে? তাদের কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ লিখ।

4. অণুজীবদের ব্যবহার করে গম, চাল এবং ছোলা (অথবা তাদের থেকে উৎপন্ন বস্তু) থেকে প্রস্তুত করা হয় এমন কিছু চিরাচরিত ভারতীয় খাবারের নাম উল্লেখ কর।

5. ক্ষতিকর অণুজীবদের দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণে অণুজীবেরা কি উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়?

6. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন যে-কোনো একটি ছত্রাক প্রজাতির নাম উল্লেখ কর।

7. নর্দমার বর্জ্য জল কি? কিভাবে নর্দমার জল আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে?

8. প্রাথমিক ও গৌণ নর্দমার বর্জ্য জল পরিশোধনের মধ্যে মূল পার্থক্যটি কি ?

9. তোমরা কি মনে কর যে, অণুজীবদেরকেও শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে?

10. অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার ও পেস্টিসাইড ব্যবহার কমানো যেতে পারে। ইহা কিভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে ব্যাখ্যা কর।

11. নদীর জল, অপরিশোধিত নর্দমার বর্জ্য জল এবং একটি নর্দমার বর্জ্যজল পরিশোধন কেন্দ্র থেকে নির্গত গৌণ প্রবাহমান তরল— এই তিনটি জলের নমুনা BOD পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। এই নমুনাগুলোকে A,B,C দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষাগারের কর্মী কোনটি কোন নমুনা তা লিখে রাখেননি। A,B ও C তিনটি নমুনার BODর মান যথাক্রমে 20mg/L, 8mg/L

এবং 400mg/L নথিভুক্ত করা হয়েছিল। জলের কোন নমুনাটি সবচেয়ে বেশি দূষিত? নদীর জল অপেক্ষাকৃতভাবে স্বচ্ছ এই তথ্যকে ধরে নিয়ে তুমি কি তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবে?

12. সাইক্লোস্পোরিন-A (অনাক্রম্যতা দমনকাকারী ঔষধ) এবং স্ট্যাটিন (রক্ত কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাসকারী প্রতিনিধি) যেসব অণুজীবসমূহ থেকে পাওয়া যায় তাদের নাম খুঁজে বের কর।

12. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অণুজীবদের ভূমিকা খুঁজে বের কর এবং তোমাদের শিক্ষকের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা কর —

    (ক) একক কোশ প্রোটিন (SCP)

    (খ) মাটি।

14. নিম্নলিখিতগুলোকে মানবসমাজের কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অনুসারে অধ:ক্রমে (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি প্রথমে) সাজাও। তোমাদের উত্তরের স্বপক্ষে কারণ দর্শাও।

    বায়োগ্যাস, সাইট্রিক অ্যাসিড, পেনিসিলিন এবং দই।

15. জীবজসারগুলো কিভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে?

একক IX
জীবপ্রযুক্তি বিদ্যা (Biotechnology)

*অধ্যায় - **11***
জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা ঃ নীতি ও পদ্ধতিসমূহ
(Biotechnology : Principle and Processes)

*অধ্যায়- **12***
জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা এবং এর প্রয়োগসমূহ
(Biotechnology and its application)

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক, গণিতবিদ ও জীববিদ সকলের মতেই, Rene Descartes -এর সময়কাল হতে সব মানবজ্ঞান বিশেষত ঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে প্রযুক্তি বিকাশের জন্য পরিচালিত করা হয়েছিল, যা মানবজীবনের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি মানুষের জীবনের মূল্যবোধকেও উন্নত করে তুলেছিল। সম্পূর্ণ পন্থাটিই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বোঝার জন্য নৃতাত্ত্বিক বা মানবকেন্দ্রিক (antropocentric) হয়ে উঠেছিল। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র থেকে প্রকৌশলবিদ্যা (engineering), প্রযুক্তি (technologies) এবং শিল্পকে গড়ে তুলেছিল। যাদের সবগুলিই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও জনকল্যাণে কাজ করে চলছে। জীবজগতের মুখ্য উপযোগীতাই হচ্ছে এর খাদ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহার। জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীববিদ্যার একটি প্রশাখা, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন পাল্টে দিয়েছে কারণ এর সহায়তায় উৎপন্ন বিভিন্ন পন্য বা পদার্থসমূহ স্বাস্থ্য ও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়ন ঘটিয়েছে। যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রক্রিয়াসমূহ এবং কিছু প্রয়োগ গুরুত্ব পেয়েছে, এই এককে সেই বিষয়সমূহ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হল।

Horbert Boyer 1936 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার একটি অংশে/অঞ্চলে যেখানে বেশিরভাগ যুবকের জীবনী ছিল রেলপথ ও খনিনির্ভর, সেখানে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি 1963 সালে বিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি নেন এবং পরবর্তীতে ইয়ালেতে (Yale) স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অধ্যয়ন করেন।

HERBERT BOYER
(1936)

1966 সালে Boyer, San Francisco অঞ্চলের ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। 1969 সালের মধ্যে তিনি বিশেষ উপযোগী ধর্মসমন্বিত *E.coli* ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি রেস্ট্রিকশান উৎসেচকের উপর গবেষণা করেন। Boyer লক্ষ্য করেছিলেন যে, উৎসেচকগুলোর একটি নির্দিষ্ট সজ্জায় DNA স্ট্র্যান্ডগুলি কাটার ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে তন্ত্রীগুলির উপর যে একতন্ত্রীয় গঠন সৃষ্টি হয়, তা 'আঠালো প্রান্ত' (Sticky ends) হিসাবে পরিচিত। এই কাটা প্রান্তগুলিকে (clipped ends) DNA অণুর টুকরো খন্ডগুলিকে পরস্পর জোড়া লাগানোই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন বা অধ্যয়নের বিষয়।

এই আবিষ্কারের কারণেই পরবর্তীসময়ে স্ট্যানফোর্ড বিজ্ঞনী Stanley Cohen এর সহিত হাওয়াই এ একটি সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ কথোপকথনের সূচনা হয়েছিল। কোহেন প্লাজমিড নামক ছোটো, চক্রাকার DNA অধ্যায়ন করেছিলেন, যা কিছু ব্যাকটেরিয়া কোশের সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে ভেসে থাকে এবং DNA অণুর কোডিং তন্ত্রী থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিলিপিকরণে (replicate) সক্ষম। কোহেন এই প্লাজমিডগুলোকে কোশ থেকে অপসারণ/পৃথকীকণের উপায় প্রণয়ন করেছিলেন এবং এগুলিকে অন্যকোশে পুনঃস্থাপন করেছিলেন। এই পদ্ধতির সহিত DNA স্প্লাইসিং (splicing) পদ্ধতি সংযুক্ত করে Boyer এবং Cohen কাঙ্খিত সজ্জায় DNA খন্ডকগুলির পুনঃসংযোজন ঘটিয়ে ব্যাকটেরিয়া কোশে পুনঃযোজিত (Recombinant) DNA প্রবেশ করান, যা তখন নির্দিষ্ট প্রোটিন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকেন্দ্র রূপে কাজ করতে পারে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা (Biotechnology) নামক শাখা সৃষ্টি হয়েছিল।

অধ্যায় -11
জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা ঃ মূলনীতি এবং পদ্ধতিসমূহ
(BIOTECHNOLOGY : PRINCIPLES AND PROCESSES)

11.1 জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার মূলনীতি সমূহ (Principles of Biotechnology)

11.2 পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তির সরঞ্জামসমূহ (Tools of Recombinant DNA Technology)

11.3 পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তির প্রক্রিয়াসমূহ (Processes of Recombinant DNA Technology)

জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বা ব্যবহারযোগ্য পদার্থ উৎপাদন এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য সজীববস্তু বা জীব হতে সংগৃহীত উৎসেচকগুলোর প্রয়োগ কৌশলের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে। এই অর্থে, দই, রুটি বা মদ্যজাতীয় পদার্থ তৈরি করা, যেগুলির সবকয়টি জীবাণুঘটিত প্রক্রিয়া, জীবপ্রযুক্তিবিদ্যারই একটি রূপ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। যাই হোক, এটি বর্তমান কালে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি সেইসব প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝায় যেগুলো অধিকতর মাত্রায় উক্ত বস্তুসমূহ উৎপাদনের জন্য জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবগুলোকে (Genetically Modified Organism) কাজে লাগায়। এছাড়াও, আরও অনেক কৌশল বা প্রযুক্তিও জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, *ইন-ভিট্রো* নিষেক পদ্ধতির দ্বারা 'টেস্ট টিউব' শিশুর জন্ম, জিন সংশ্লেষ ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে DNA ভ্যাক্সিন প্রস্তুতি অথবা একটি ক্ষতিগ্রস্ত জিনের সংশোধন করা ইত্যাদি সবকিছুই জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার অংশ।

জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার ইউরোপীয় সংঘ বা European Fedaration of Biotechnology (EFB) বায়োটেকনোলোজির একটি সংজ্ঞা দিয়েছে যাতে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক আণবিক জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা উভয়ই যুক্ত আছে। EFB কর্তৃক প্রদত্ত বায়োটেকনোলজির সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

'এটি বিভিন্ন পণ্য বা পদার্থ উৎপাদন ও পরিষেবার জন্য প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও জীব, কোশ, কোশের অংশবিশেষ এবং আণবিক অ্যানালগুলোর একত্রীকরণ বা সংমিশ্রণ।'

11.1 জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার নীতিসমূহ (Principles of Biotechnology)

বহুনীতির মধ্যে, দুটি মূল কৌশল যা আধুনিক জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার জন্ম দিয়েছে তা হল— জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার জন্ম দিয়েছে তা হল—

i) **জীবতত্ত্ব প্রকৌশল** (Geneti engineering) ঃ এই প্রযুক্তি সমূহ দ্বারা

জিনগত উপাদানের (DNA ও RNA) রাসায়নিক গঠন বা প্রকৃতি পরিবর্তন দ্বারা এগুলোকে পোষক কোশে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এভাবে পোষক জীবের ফিনোটাইপ পরিবর্তন করা হয়।

ii) বায়োপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (Bioprocess engineering) ঃ অ্যান্টিবায়োটিকস্, ভ্যাক্সিন, উৎসেচক ইত্যাদির মতো জীবপ্রযুক্তিজাত বস্তু সমূহের উৎপাদনের জন্য কেবলমাত্র কাঙ্খিত অনুজীব বা ইউক্যারিওটিক কোশের বৃদ্ধি ঘটাতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়াগুলোতে জীবানুমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা।

চলো এবার আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মূলনীতি সমূহের ধারণাগত পরিবর্তন বা বিকাশ বুঝতে চেষ্টা করি।

তুমি সম্ভবত ঃ অযৌন জনন অপেক্ষা যৌন জননের সুবিধাগুলো উপলব্ধি করবে। যৌন জনন ভেদ বা প্রকরণের (Variations) সুযোগ প্রদান করে এবং জিনগত বিন্যাসের স্বতন্ত্র সমাহার ঘটায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি সজীব বস্তু এবং এর পাশাপাশি পপুলেশনের ক্ষেত্রেও উপযোগী হতে পারে। অযৌন জনন জিনগত তথ্য সংরক্ষণ করে, যেখানে যৌন জনন ভেদ বা প্রকরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজননে (breeding) ব্যবহৃত প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিগুলো প্রায়শঃই কাঙ্খিত বা ইপ্সিত জিনের সাথে অবাঞ্ছিত জিনগুলোকেও জীবে অন্তর্ভুক্তি এবং তার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। জিনগত প্রযুক্তিবিদ্যার (Genetic Engineering) পদ্ধতি সমূহের মধ্যে রয়েছে **পুনঃযোজিত DNA** প্রস্তুতি, **জিন ক্লোনিং** ও **জিন স্থানান্তরণ** পদ্ধতির প্রয়োগ বা ব্যবহার। এই কৌশলগুলি উক্ত সীমাবদ্ধতা কাটাতে সাহায্য করে এবং অবাঞ্ছিত জিনের অর্ন্তভূক্তি না ঘটিয়ে অভীষ্ট জীবে বা পোষক জীবকোশে কেবলমাত্র একটি বা একগুচ্ছ ইপ্সিত জিনের পৃথকীকরণ ও অর্ন্তভুক্তিতে সাহায্য করে।

তোমরা কী একখন্ড DNA-এর সম্ভাব্য পরিণতি জানো বা বলতে পারো যাকে যেকোনো উপায়ে অন্য কোনো জীবে (Alien organism) স্থানান্তরিত করা হয়েছে? খুব সম্ভবতঃ এই DNA খন্ডটি সেই জীবের অপত্য কোশগুলোতে নিজেই বিভাজিত হয়ে এর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হবে না। কিন্তু এই DNA খন্ডকটি (যখন গ্রহীতার জিনোমের সাথে যুক্ত হবে, তখন এটি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে এবং পোষক DNA এর সহিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে। এর কারণ, বিজাতীয় DNA খণ্ডকটি পোষককোশের ক্রোমোজোমে অঙ্গীভূত হয় যার প্রতিলিপি গঠন করার ক্ষমতা রয়েছে। একটি ক্রোমোজোমের মধ্যে সুনির্দিষ্ট DNA বেসসজ্জাক্রম থাকে, যাকে প্রতিলিপিকরণের উৎসস্থল (orgin of replication) বলে, যা প্রতিলিপিকরণের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটাতে সাহায্য করে। অতএব কোনো একটি জীবে একখন্ড বিজাতীয় DNA অনুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য একে অবশ্যই ক্রোমোজোমে অঙ্গীভূত হতে হয়, যার একটি সুনির্দিষ্ট বেসজ্জাক্রম থাকবে এবং এটি **'প্রতিলিপিকরণের উৎসস্থান'** (origin of replication), নামে পরিচিত। তাই একটি বিজাতীয় DNA খন্ড ক্রোমোজোমের প্রতিলিপিকরণের উৎসস্থলে সংযুক্ত হয়, যাতে একখণ্ড বিজাতীয় DNA পোষক জীবে প্রতিলিপি গঠন করতে পারে এবং নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, এই পদ্ধতিকে **ক্লোনিং (cloning)** বলা যেতে পারে, অথবা যেকোনো টেমপ্লেট DNA এর বহুসংখ্যক সদৃশ প্রতিলিপি তৈরী করা যেতে পারে।

আমরা এখন একটি কৃত্রিম পুনঃযোজিত DNA অনু গঠনের প্রথম উদাহরণের দিকে নজর দেব। প্রথম পুনঃযোজিত DNA প্রস্তুতির সম্ভাবনা উদিত (Emerged) হয় একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের সহিত *Salmonella typhimurium* কোশস্থিত **প্লাজমিড** (স্বেচ্ছায় প্রতিলিপি গঠনকারী, চক্রাকার, বহিঃক্রোমোজোমীয় (DNA) কে যুক্ত করার মাধ্যমে। Stanley Cohen এবং Herbert Boyer 1972 সালে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লাজমিড DNA -এর একটি অংশ কেটে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনকে আলাদা করে নিয়ে এই কাজটি সম্পাদন করেন। DNA অনুর একটি নির্দিষ্টস্থানে কর্তন সম্ভব হয়েছিল তথাকথিত 'আণবিক কাচি'

নামে পরিচিত '**রেস্ট্রিকশন উৎসেচক**' আবিস্কারের মাধ্যমে। কর্তিত DNA খন্ডকটিকে এরপর প্লাজমিড DNA-এর সহিত যুক্ত করা হয়েছিল। এই প্লাজমিড DNA ভেক্টর রূপে কাজ করে, তাতে যুক্ত DNA খন্ডককে স্থানান্তর করার জন্য। তোমরা সম্ভবত জানো যে, মশা ম্যালেরিয়ার পরজীবীকে মানবদেহে স্থানান্তরণের জন্য **বাহক (vector)** রূপে কাজ করে। অনুরূপভাবেই, একটি প্লাজমিডও ভেক্টর হিসাবে একখন্ড বিজাতীয় DNA অনুকে পোষক জীবে, স্থানান্তর করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনকে DNA লাইগেজের সাহায্যে প্লাজমিড ভেক্টরের সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এই উৎসেচকটি কর্তিত DNA অনুগুলির কতির্ত স্থানে কাজ করে এবং তাদের প্রান্তগুলিকে জুড়ে দেয়। এরফলে ইনভিট্রো পরিবেশে নতুন সজ্জাক্রম সমন্বিত চক্রাকার, স্বেচ্ছায় প্রতিলিপিক্ষম DNA অনু তৈরি হয়েছিল এবং এটিই পুনঃযোজিত DNA (Recombinant DNA) নামে পরিচিত। যখন এই DNA অনুকে *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয় তখন এটি নতুন পোষক কোশের DNA পরিমারেজ উৎসেচক ব্যবহার করে প্রজনন করতে পারে ও অসংখ্য নিজ প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে পারে। ,E. coli - এর দেহে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের বহুসংখ্যক প্রতিলিপি তৈরীর ক্ষমতাকে E.coli- স্থিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের **ক্লোনিং** বলা হয়েছিল।

অতঃপর তোমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারো যে, তিনটি মৌলিক ধাপ রয়েছে জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব তৈরী করার জন্য—

i) কঙ্খিত জিনসমেত DNA সনাক্ত করা।

ii) সনাক্তকৃত DNA অনুকে পোষক দেহে প্রবেশ করানো।

iii) পোষক দেহে প্রবিষ্ট DNA অনুর রক্ষণাবেক্ষণ ও এর পরবর্তী জনুতে DNA এর স্থানান্তর ঘটানো।

11.2 পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তির সরঞ্জামসমূহ (Tools of recombinant DNA Technology)

পূর্বের আলোচনা হতে এখন আমরা জানি যে, যদি আমাদের কাছে প্রধান সরঞ্জাম সমূহ যেমন— রেস্ট্রিকশন উৎসেচক, পলিমারেজ উৎসেচক, লাইগেজ, ভেক্টর ও পোষক জীব ইত্যাদি উপলব্ধ হয় তখনই কেবলমাত্র আমরা জিনগত প্রকৌশল বা পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক কার্য সম্পন্ন করতে পারবো। চলো আমরা এবার এইসব সরঞ্জামসমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক সরঞ্জম সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করি।

11.2.1 রেস্ট্রিকশন উৎসেচক (Restriction Enzymes)

1963 সালে *E.coli*. ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজের বৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম দুটি উৎসেচক পৃথক (isolated) করা হয়েছিল। এদের মধ্যে একটি উৎসেচক DNA অনুতে মিথাইলমূলক সংযুক্ত করে, অন্যদিকে অপর উৎসেচকটি DNA অনুতে কর্তন করে। শেষোক্ত উৎসেচকটিকে '**রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ**' বলে।

প্রথম রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ হল *Hind II*, যার কার্যকারীতা DNA অনুর সুনির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড সজ্জারীতির উপর নির্ভর করে তাকে পৃথক করা হয়েছিল এবং পাঁচ বছর পর তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এটা দেখা গেছে যে, *Hind II* সর্বদাই DNA অনুর 6টি বেসজোড় সমন্বিত সুনির্দিষ্ট অঞ্চলেই ছেদ করে। এই সুনির্দিষ্ট বেসসজ্জাক্রমটিকে *Hind II* উৎসেচকের *রিকগ্‌নিশন সজ্জাক্রম* (Recognition Sequence) বলে। *Hind II* ছাড়াও বর্তমানে আমরা প্রায় 230 টি অধিক ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেন হতে 900 এর অধিক রেস্ট্রিকশন উৎসেচক পৃথক করতে পেরেছি যাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রিকগ্‌নিশন সজ্জাক্রম সনাক্ত করে।

এই উৎসেচকগুলোর নামকরণ সম্বন্ধে প্রচলিত পদ্ধতি হল এই রূপ -যে প্রোক্যারিওটিক কোশ হতে এই উৎসেচকগুলোকে পৃথক করা হয়, তার গুণগত নামের ও প্রজাতিগত নামের আদ্যক্ষর হতে উৎসেচকের নামের যথাক্রমে প্রথম ও পরবর্তী দুটি অক্ষর দেওয়া হয়, যেমন -Eco RI উৎসেচকটি *Escherichia coli* RY13 ব্যাকটেরিয়া হতে নিষ্কাশন করা হয়েছে। Eco RI এর ক্ষেত্রে 'R' অক্ষরটি ঐ

ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেনের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে এবং নামের পরে উল্লেখিত রোমান সংখ্যাটি ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেন হতে যে ক্রমে উৎসেচকটি নিষ্কাশিত করা হয়েছিল সেই ক্রম নির্দেশ করে।

রেস্ট্রিকশন উৎসেচকসমূহ **নিউক্লিয়েজ** নামক একটি বৃহৎ উৎসেচকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। নিউক্লিয়েজ দুই ধরনের হয়— **এক্সোনিউক্লিয়েজ** ও **এন্ডোনিউক্লিয়েজ**। DNA অনুর প্রান্ত হতে নিউক্লিওটাইড অপসারণ করে এক্সোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক, পক্ষান্তরে এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক DNA অনুর সুনির্দিষ্ট সজ্জায় কর্তন করে। প্রতিটি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক একটি DNA সজ্জাক্রমের দৈর্ঘ্য বরাবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে কাজ করে। যে মুহূর্তে উৎসেচকটি তার নির্দিষ্ট রিকগ্‌নিশন সজ্জাক্রম খুঁজে বের করে, এটি DNA এর সহিত যুক্ত হবে এবং দ্বিতন্ত্রী হেলিক্সের উভয়তন্ত্রীয় প্রতিটিকে তাদের শর্করা-ফসফেট-শর্করা শৃঙ্খলের (Sugar-Phosphate backbone of DNA) একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেটে দেয় (চিত্র 11.1) প্রতিটি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক DNA স্থিত নির্দিষ্ট **প্যালিনড্রোম নিউক্লিওটাইড** সজ্জা সনাক্ত করতে পারে।

রেস্ট্রিকশন উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি

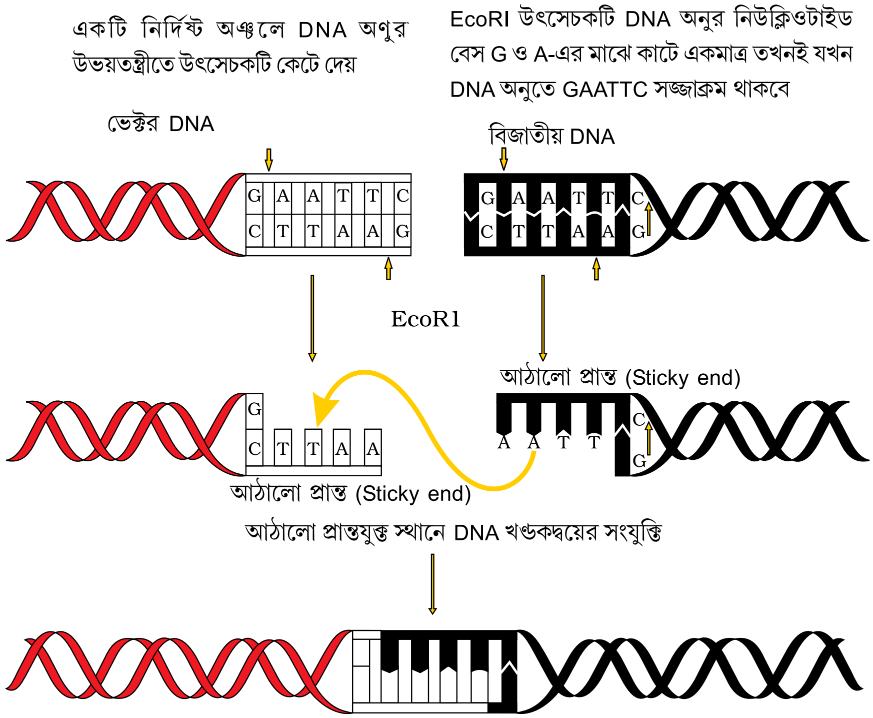

চিত্র 11.1 রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক- EcoRI এর কার্যকারীতায় পুনঃযোজিত DNA সৃষ্টির ধাপসমূহ।

তোমরা কী জানো প্যালিনড্রোম সজ্জাক্রম কোন্ গুলো? এগুলো প্রকৃতপক্ষে অক্ষর/বর্ণমালার একটি গুচ্ছ দ্বারা গঠিত একটি শব্দ যেটি অগ্রবর্তী ও বিপরীত দিক হতে পড়লে একই শব্দ গঠন করতে দেখা যায়, যেমন “MALAYALAM”। যেহেতু প্যালিনড্রোম শব্দটিকে উভয় অভিমুখ থেকে পড়লে একই শব্দ পাওয়া যায়, তাই DNA স্থিত এমন প্যালিনড্রোম হল বেসজোড়ের এমন একটি সজ্জাক্রম যার পঠন সজ্জাক্রম।

একই রকম রেখে পড়লে উভয় তন্ত্রীতে একই শব্দ পড়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিম্নের সজ্জায় 5′— 3′ অভিমুখে দুটি তন্ত্রীই পড়তে একই রকম হবে। এটি 3′— 5′ অভিমুখে পড়ার ক্ষেত্রেও সত্য।

5′——GAATTC——3′
3′——CTTAAG——5′

রেস্ট্রিকশন উৎসেচকসমূহ DNAস্থিত প্যালিনড্রোম সজ্জাক্রমের কেন্দ্রীয় অংশ হতে সামান্য দুরে কিন্তু বিপরীত তন্ত্রীর একই বেসজোড়ের মাঝে কেটে দেয়। এর ফলে DNA তন্ত্রীর প্রান্তে একতন্ত্রীয় অংশ সৃষ্টি হয়। DNA অণুর প্রতিটি তন্ত্রীতে প্রান্তের দিকে ঝুলানো প্রসারিত অংশ থেকে যায়, যেগুলিকে আঠালো প্রান্ত (Sticky end) বলে (চিত্র 11.1)। এদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা তাদের পরিপূরক, কেটে যাওয়া প্রতিরূপের (Copy) সহিত হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠন করে। DNA খণ্ডকের প্রান্তীয় অংশের এইরূপ আঠালো চরিত্র DNA লাইগেজ উৎসেচকের কার্যকারিতায় সাহায্য করে।

পুনঃযোজিত DNA অনু গঠনের জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক সমূহ বিভিন্ন উৎস বা জিনোম হতে সংগৃহীত DNA নিয়ে গঠিত।

একটি নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন উৎসেচক দ্বারা DNA অনুকে যখন কাটা হয়, উৎপন্ন DNA খন্ডকগুলোতে একই প্রকারের আঠালো প্রান্ত (Sticky end) তৈরি হয় এবং এই খণ্ডগুলোকে DNA লাইগেজ উৎসেচক দ্বারা পরস্পর যুক্ত (end-to-end) করা যেতে পারে (চিত্র 11.2)।

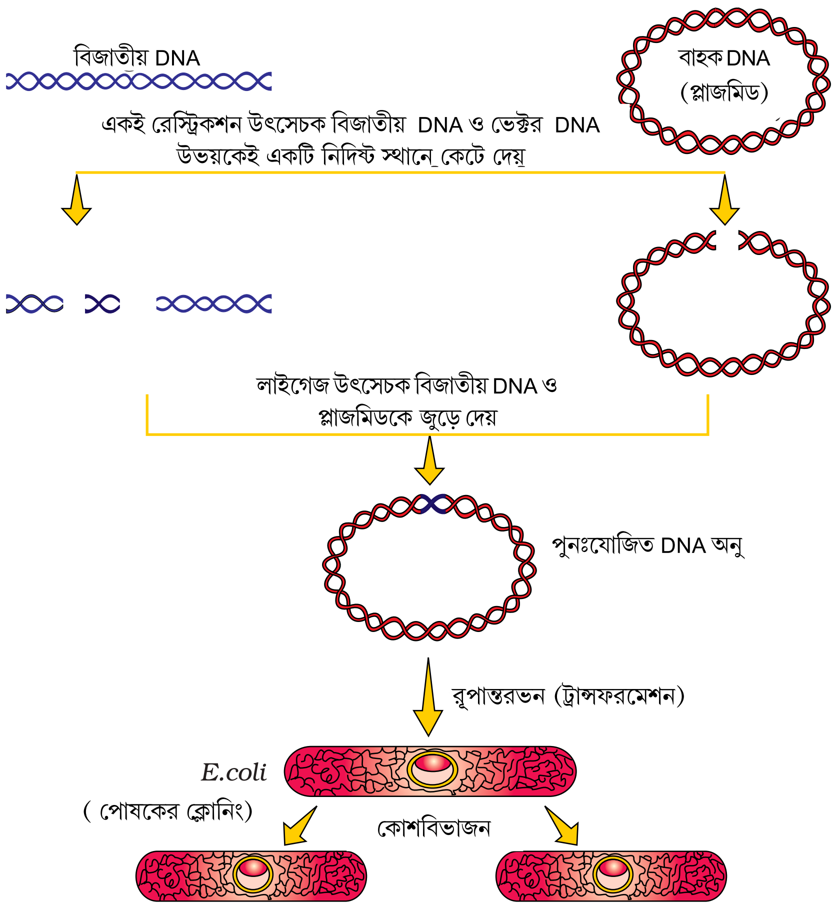

চিত্র 11.2 পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তির চিত্ররূপ উপস্থাপন

তোমরা স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করতে পারছো যে, একটি নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন উৎসেচক দ্বারা যদি বাহক DNA ও কাঙ্খিত জিনবহনকারী বিজাতীয় DNA অনুর নির্দিষ্ট সজ্জায় কাটা না হয়, তবে পুনঃযোজিত DNA ভেক্টর অণু গঠিত হতে পারবে না।

DNA খন্ডসমূহের পৃথিকীকরণ ও নিষ্কাশন (Separation and isolation of DNA Fragment)ঃ

রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা DNA অনুকে কাটা হলে ঘন্ডিত DNA পাওয়া যায়। এই খন্ডগুলোকে যে পৃথকীকরণ কৌশলের সাহায্যে আলাদা করা যেতে পারে, তা **জেল ইলেকট্রোফোরেসিস** নামে পরিচিত। যেহেতু DNA খন্ডসমূহ ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট অনু তাই তাদের একটি তড়িৎ ক্ষেত্রের মাধ্যমে বা ধাত্রের (Matrix) মধ্য দিয়ে অ্যানোডের দিকে জোড়পূর্বক চালনা করে পৃথক করা যেতে পারে। আধুনিককালে বহুল ব্যবহৃত ধাত্রটি হল অ্যাগারোজ, যা সামুদ্রিক আগাছা হতে সংগৃহীত একপ্রকার প্রাকৃতিক পলিমার। অ্যাগারোজ জেলের সিভিং এফেক্টের প্রভাবে DNA খন্ডসমূহ তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে পৃথকীকৃত (Resolve) হয়। অতঃপর, DNA খন্ডকের আকার যত ছোট হবে, তা তত বেশী দূরত্ব অতিক্রম করবে। *চিত্র 11.3 দেখ এবং অ্যাগারোজ জেলের কোন্ প্রান্তে DNA নমুনাগুলোকে ভরা (loaded) হয়েছে অনুমান কর।*

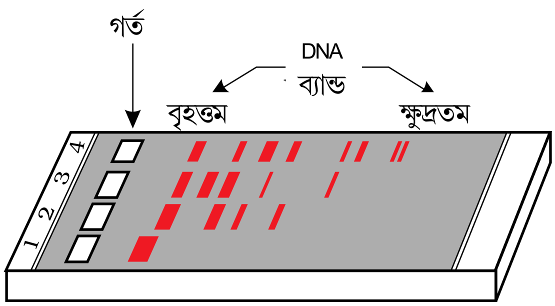

চিত্র 11.3 একটি আদর্শ অ্যাগারোজ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির প্রতিরূপ যেখানে অজীর্ণ (Lane 1) ও জীর্ণ/খন্ডিত DNA খণ্ডকসমূহ (Lane 2 থেকে 4) দেখানো হচ্ছে।

পৃথকীকৃত বা খণ্ডিত DNA খন্ডসমূহকে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড দ্বারা রঞ্জিত করে অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণে রেখেই কেবলমাত্র এদের দৃশ্যমান করা যাবে (তোমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় DNA খন্ডকসমূহকে দৃশ্যমান আলোকে এবং রঞ্জিতকরণ ছাড়া দেখতে পারবে না)। ইথিডিয়াম ব্রোমাইডে রঞ্জিত জেলে DNA খন্ডকসমূহকে অতিবেগুনী আলোতে রাখলে উজ্জ্বল কমলা বর্ণের পট্টি (Band) আকারে তোমরা দেখতে পাবে (চিত্র11.3) পৃথকীকৃত DNA পট্টিসমূহকে অ্যাগারোজ জেল হতে কেটে নিয়ে জেলখন্ডক থেকে নিষ্কাশিত করা হয়। এই ধাপটি ইলুশন (elution) নামে পরিচিত। এইভাবে পরিশোধিত (purified) DNA খন্ডসমূহকে ক্লোনিং ভেক্টরের সহিত সংযোজনের মাধ্যমে পুনঃযোজিত DNA (recombinant DNA) প্রস্তুতির জন্য এদের ব্যবহার করা হয়।

11.2.2 ক্লোনিং ভেক্টরসমূহ (Cloning Vectors)ঃ

তোমরা জানো যে, প্লাজমিড এবং ব্যাকটেরিওকাজের ব্যাকটেরিয়া কোশের ভেতর ক্রোমোজোমাল DNA অণুর নিয়ন্ত্রণাধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিলিপিকরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রতিটি কোশে উচ্চ সংখ্যায় ব্যাকটেরিওফাজ থাকায়, ব্যাকটেরিয়া কোশে এদের জিনোমেরও অত্যন্ত বেশি কপিসংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিকোশে কিছু সংখ্যক প্লাজমিডের কপিসংখ্যা কেবলমাত্র একটি বা দু'টি হলেও অন্য কোশের ক্ষেত্রে প্রতিকোশে প্লাজমিডের সংখ্যা 15-100 টি পর্যন্ত রয়েছে। প্লাজমিডসমূহের কপিসংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। যদি আমরা একটি বিজাতীয় DNA খণ্ডককে ব্যাকটেরিওফাজ বা প্লাজমিড DNA এর সহিত সংযুক্ত করতে পারি, আমরা সেই বিজাতীয় DNA খন্ডকের সংখ্যাও প্লাজমিড বা ব্যাকটেরিওফাজের কপিসংখ্যার সমসংখ্যায় বাড়াতে পারবো। অধুনা ব্যবহৃত ভেক্টরগুলোকে এমনভাবে প্রযুক্তিপ্রাপ্ত করে তোলা হয় যে, এরা সহজেই বিজাতীয় DNA অনুর সহজ সংযোগসাধন এবং নন-রিকম্বিন্যান্ট DNA থেকে রিকম্বিন্যান্ট DNA গুলোকে নির্বাচন সাহায্য করে।

ভেক্টর গুলোর মধ্যে ক্লোনিং করার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োজন হয়—

i) **প্রতিলিপিকরণের উৎস (ori)** ঃ এটি একটি নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রম যেখানে প্রতিলিপিকরণ শুরু হয় এবং যেকোন DNA খন্ডককে যখন এই সজ্জার সাথে সংযুক্ত করা হয় তখন পোষক কোশের মধ্যে খন্ডকটি প্রতিলিপিকরণ করতে পারে। এই সজ্জাক্রম আবার সংযুক্ত DNA অনুর কপিসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও দায়ী। তাই, যদি কেউ কাঙ্খিত DNA অণুর বহুকপি প্রস্তুত করতে চায় (recover) তবে একে এমন ভক্টরের মধ্যে ক্লোন করতে হবে যার উৎস বহুসংখ্যক কপি গঠনে সহায়ক।

ii) **সিলেক্টেবল মার্কার** ঃ 'Ori' অংশ ছাড়াও ভেক্টরের একটি নির্বাচনযোগ্য চিহ্নিতকারী অংশের (সিলেক্টেবল মার্কার) প্রয়োজন, যা নন্-ট্রান্সফরমেন্টগুলোর সনাক্তকরণ ও অপসারণে সাহায্য করে এবং নির্বাচিত ট্রান্সফরমেন্টদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তরভবন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি DNA খন্ডককে একটি পোষক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো হয় (তোমরা এই বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে পড়বে)। সাধারণভাবে, সেসব জিন আম্পিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, টেট্রাসাইক্লিন বা ক্যানামাইসিন ইত্যাদির মত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী বার্তা বহন করে, তাদের *E.coli* ব্যাকটেরিয়ার কোশের জন্য উপযোগী সিলেকটেবল মার্কার রূপে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক *E.coli* ব্যাকটেরিয়া কোশ এইসমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন বহন করে না।

iii) ক্লোনিং অঞ্চল সমূহ (Cloning sites) ঃ সাধারণভাবে ব্যবহৃত রেস্ট্রিকশন উৎসেচকগুলোর ক্ষেত্রে ভেক্টরের সাথে বিজাতীয় DNA সংযুক্তি করার জন্য ভেক্টরটির খুব কম, সাধারণত একটি, রিকগ্নিশন অঞ্চল প্রয়োজন। কোনো ভেক্টরে একাধিক রিকগ্নিশন অঞ্চলের উপস্থিতি DNA অণুতে বহু খন্ডকের সৃষ্টি করবে, যা জিন ক্লোনিং প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলে (চিত্র 11.4) দুটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের যে-কোনো একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের মধ্যে অবস্থিত রেস্ট্রিকশন অঞ্চলে বিজাতীয় DNA অনুর সংযুক্তি ঘটানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা একটি বিজাতীয় DNA অণুতে pBR322 ভেক্টরে উপস্থিত টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধী জিনে অবস্থিত *Bam HI* অঞ্চলে সংযুক্ত করতে পারো। বিজাতীয় DNA অনুপ্রবেশের দরুণ pBR322 ভেক্টরে পুনঃযোজিত প্লাজমিডটি টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে,

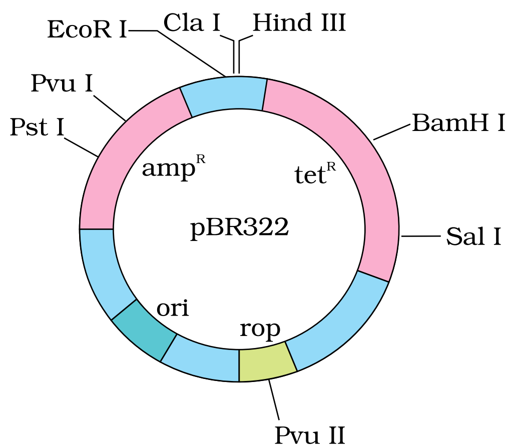

চিত্র 11.4 E. coli এর ক্লোনিং ভেক্টর pBR322 স্থিত রেস্ট্রিকশন অঞ্চলসমূহ (Hind III, EcoRI,Bam HI, Sal-I, Pvu II, Pst I, Cla I),Ori অঞ্চল এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন (amp ^{R} ও tet ^{R})। প্লাজমিডের রেপ্লিকশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সংকেতবাহী জিন হল rop

কিন্তু এর পরও ট্রান্সফরমেন্টসমূহকে টেট্রাসাইক্লিনযুক্ত মাধ্যমে প্লেটিং (Plating) করে অপুনঃযোজিত অংশ থেকে একে নির্বাচন করা সম্ভব। যে ট্রান্সফরমেন্টসমূহ অ্যাম্পিসিলিনযুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছিল, এদের এরপর টেট্রাসাইক্লিনযুক্ত মাধ্যমে স্থানান্তরণ করা হয়। রিকম্বিন্যান্টগুলো অ্যাম্পিসিলিনযুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু টেট্রাসাইক্লিনযুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু, নন্-রিকম্বিন্যান্টগুলো উভয়প্রকার অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে। এইক্ষেত্রে, একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন ট্রান্সফরম্যান্টের নির্বাচনে সাহায্য করে,

যেখানে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনটি বিজাতীয় DNA অনুর 'অনুপ্রবেশের দরুণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়' এবং এইভাবে রিকম্বিন্যান্টের নির্বাচনে সাহায্য করে।

অ্যান্টিবায়োটিকের নিষ্ক্রিয়তার দরুণ রিকম্বিন্যান্টদের নির্বাচন করা একটি কষ্টকর পদ্ধতি, কারণ এর জন্য দুটি পৃথক প্লেটে পৃথক অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত মাধ্যমে একইসাথে প্লেটিং করে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। অতএব, একটি ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সিলেকটেবল মার্কারদের বর্ণ সৃষ্টির ক্ষমতার ভিত্তিতে নন্-রিকম্বিন্যান্টসমূহ হতে রিকম্বিন্যান্টগুলোকে পৃথকীকৃত করা যাবে। এইক্ষেত্রে একটি পুনঃযোজিত DNA অণুকে β গ্যালাকটোসাইডেজ নামক উৎসেচক সৃষ্টির জন্য দায়ী কোডিং সজ্জাক্রমে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। এর ফলস্বরূপ, এই উৎসেচকটির সংশ্লেষণের জন্য দায়ী জিনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে, এই ঘটনাটিকে **ইনসারশানাল ইনএক্টিভেশন (Insertional inactivation)** বলে। তবে ব্যাকটেরিয়াস্থিত প্লাজমিডে কোনো প্রকার DNA বা জিনের অনুপ্রবেশ ঘটানো না হলে ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার কলোনি নীলবর্ণ তৈরী করে। সন্নিবিষ্ট বা নিবেশিত জিনের উপস্থিতিতে β গ্যালাকটোসাইডেজের ইনসারশানাল ইনক্টিভেশন ঘটে এবং এরফলে ব্যাকটেরিয়ার কলোনিগুলোতে কোনো বর্ণ সৃষ্টি হয় না এবং এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে পুনঃ যোজিত উপনিবেশ (recombinant colony) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

iv) উদ্ভিদ ও প্রাণীতে জিনক্লোনিং এর জন্য ভেক্টরসমূহ (Vectors for cloning genes in plants and animals)ঃ

তোমরা এটা জেনে অবাক হবে যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে জিন প্রতিস্থাপনের বিষয়টি আমরা এই জীবগুলোতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণ কৌশল থেকেই শিখেছি। উল্লেখ্য ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসগুলো বহুকাল ধরেই এই কাজটি করে আসছে অর্থাৎ ইউক্যারিওটিক কোশসমূহের রূপান্তর করার জন্য কীভাবে ঐ কোশে জিনের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায় এবং কীভাবে ইউক্যারিওটিক কোশসমূহকে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদদের সংক্রমণকারী অনুজীব *Agrobacterium tumifaciens* স্বাভাবিক উদ্ভিদকোশকে **টিউমারে** পরিণত করার জন্য 'T-DNA' রূপে একখণ্ড DNA কে স্থানান্তরণে এবং সংক্রমণকারী অনুজীবের প্রয়োজন অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের জন্য টিউমার কোশগুলোকে উদ্দীপিত করে। একইভাবে, রেট্রোভাইরাসগুলো প্রাণীদেহের সাধারণ কোশকে **ক্যান্সারকোশে** পরিবর্তিত করতে সক্ষম। প্যাথোজেন দ্বারা তাদের ইউক্যারিওটিক পোষকদেহে জিনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কৌশল বিষয়ে আমাদের অধিকতর বোধগম্যতা থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তা প্যাথোজেনের এই উপাদানসমূহকে মানুষের জন্য ইপ্সিত বা প্রয়োজনীয় জিনের অনুপ্রবেশের জন্য উপযোগী ভেক্টরে রূপান্তরিত করে। অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের টিউমার সৃষ্টিতে উদ্দীপনা দানকারী (tumour inducing) প্লাজমিড (Ti plasmid) এখন ক্লোনিং ভেক্টরে পরিবর্তিত করা হয়েছে যা উদ্ভিদদেহে আর রোগ সৃষ্টি করে না, কিন্তু বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদে আমাদের কাঙ্খিত জিনকে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারে এখনও সক্ষম। একইভাবে, রিট্রোভাইরাসগুলোকে রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে বর্তমানে প্রাণীকোশে কাঙ্খিত জিনকে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব, একটি জিন বা একটি DNA খন্ডককে একবার উপযোগী ভেক্টরের সহিত সংযুক্ত করা হলে একে পোষক ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে স্থানান্তরণ করা যাবে (যেখানে এটি সংখ্যাবৃদ্ধি করবে)।

11.2.3 উপযুক্ত পোষক (দেহে পুনঃযোজিত DNA সহ রূপান্তরণের জন্য) [Competent Host; for transformation with recombinant DNA)] ঃ

DNA একটি জলাকর্ষী অণু হওয়ায় এটি কোশপর্দার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না, কেন? ব্যাকটেরিয়া কোশকে প্লাজমিড গ্রহণে বাধ্য করার পূর্বে তাকে প্রথমে DNA গ্রহণের জন্য উপযক্ত করে তোলা প্রয়োজন । একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের দ্বিযোজী ক্যাটায়নের সহিত অনুশীলন মাধ্যমে রেখে এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়, যেমন ক্যালসিয়াম ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরস্থিত ছিদ্রেরমধ্য দিয়ে DNA অণুর অনুপ্রবেশ

ঘটানোর ক্ষেত্রে কোশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে । পোষক ব্যাকটেরিয়া কোশগুলিকে পুনঃযোজিত DNA সহ বরফে রাখার পর সেখান থেকে তুলে নিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য 42^0C তাপমাত্রায় (heat shock) রেখে এরপর পুনরায় বরফে নিয়ে এসে এই পুনঃযোজিত DNA কে জোড়পূর্বক এই ধরণের পোষক কোশগুলোতে অনুপ্রবেশ করানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে পুনঃযোজিত DNA গ্রহণে সক্ষম করে তোলা হয়।

এটিই পোষক কোশে বিজাতীয় DNA অনুপ্রবেশ করানোর একমাত্র পদ্ধতি নয়। **মাইক্রোইনজেকশন** পদ্ধতিতে, পুনঃযোজিত DNA কে সরাসরি একটি প্রাণীকোশের নিউক্লিয়াসে মাইক্রোসিরিঞ্জের সাহায্যে প্রবেশ করানো যায়। অপর একটি পদ্ধতিতে, যেখানে সোনা বা টাংস্টেন ধাতুর ক্ষুদ্র কণার উপর DNA -এর প্রলেপ তৈরী করে তীব্র গতিতে সজোড়ে উদ্ভিদ কোশে DNA অনুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এই পদ্ধতি **বায়োলিস্টিক বা জিনগান** পদ্ধতি নামে পরিচিত এবং এটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই উপযোগী। সর্বশেষ পদ্ধতিতে রোগসৃষ্টিতে 'অক্ষম (disarmed) জীবানুকে' ভেক্টর হিসাবে ব্যবহার করে কোশে সংক্রমণ ঘটালে পোষক কোশে পুনঃযোজিত DNA স্থানান্তরিত হয়।

আমরা এখন পুনঃযোজিত DNA প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বন্ধে শিখলাম। পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যায় সুবিধা এনেছে এমন পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

11.3 পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যার প্রক্রিয়াসমূহ (Process of Recombinant DNA Technology) ঃ

পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন ধাপসমূহ যে সজ্জাক্রমে রয়েছে তা হল DNA নিষ্কাশন, রেস্ট্রিকশন এন্ডোক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা DNA অনুর খন্ডীভবন, কাঙ্খিত DNA খন্ডকের নিষ্কাশন, ভেক্টরের সহিত খন্ডিত DNA অনুর সংযুক্তি, পুনঃযোজিত DNA অনুকে পোষক কোষে স্থানান্তরণ, পোষক কোশগুলোকে একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে অধিকমাত্রায় পালন (Culture) এবং কাঙ্খিত উপজাত বস্তুসমূহের মাধ্যম হতে নিষ্কাশন। এখন এই ধাপগুলোর প্রতিটি ধাপ কিছুটা বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করব।

11.3.1 জিনগত বস্তু (DNA) নিষ্কাশন ঃ

স্মরণ করো যে, নিউক্লিক অ্যাসিড হলো সব সজীববস্তুর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জিনগত বস্তু (Genetic material)। বেশিরভাগ জীবে এই জিনগত বস্তুটি হল ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) । যদি DNA অনুকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা কাটতে হয় তবে একে অবশ্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হবে, অন্য কোনো বৃহৎ জৈব অনু মুক্ত হতে হবে। যেহেতু DNA অনুটি পর্দাবৃত অবস্থায় থাকে, তাই আমাদের অন্যান্য বৃহৎ জৈব অনু যথা- RNA, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড ও স্নেহপদার্থ সমূহকে DNA অনুসহ কোশ হতে আলাদা করার জন্য কোশটিকে আবরণমুক্ত করতে হবে। ব্যাকটেরিয়া কোশ/উদ্ভিদ বা প্রাণীকলাকে **লাইসোজাইম** (ব্যাকটেরিয়া), **সেলুলেজ** (উদ্ভিদ), **কাইটিনেজ** (ছত্রাক) ইত্যাদি উৎসেচক সমন্বিত পালন মাধ্যমে রেখে এই কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। তোমরা জানো যে, হিস্টোন প্রোটিনের সহিত বিজড়িত (interwined) অবস্থায় বৃহৎ জৈব অনু DNA এর মধ্যে জিনগুলি অবস্থান করে। রাইবোনিউক্লিয়েজ উৎসেচকের সাহায্যে RNA অনুকে এবং প্রোটিয়েজ উৎসেচক দ্বারা প্রোটিন অনুকে অপসারণ করা যেতে পারে। যথাযথ উৎসেচকের সাহায্যে অন্যান্য জৈব অনুসমূহকে অপসারণ করা যেতে পারে এবং অবশেষে খুব ঠান্ডা ইথানল প্রয়োগের পর বিশুদ্ধ DNA শেষপর্যন্ত অধঃক্ষিপ্ত হয়। সূক্ষ্ম তন্তুর সমস্টি রূপে DNA অনুসমূহকে নিলম্বনে (Suspension) দেখা যেতে পারে (চিত্র 11.5) ।

চিত্র 11.5 পৃথকীকৃত DNA সমূহকে স্পূলিং (Spooling) পদ্ধতি দ্বারা অপসারণ করা যেতে পারে।

11.3.2 DNA এর নির্দিষ্ট অঞ্চলে কর্তন (Cutting of DNA at specific Locations) ঃ বিশুদ্ধ DNA অনুগুলোকে রেস্ট্রিকশন উৎসেচক সমেত এই উৎসেচকের জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় রেখে রেস্ট্রিকশন উৎসেচক দ্বারা ভাঙন ঘটানো হয়। রেস্ট্রিকশন উৎসেচকের সাহায্যে DNA এর ভাঙনের অগ্রগতি পরীক্ষা যাচাই করার জন্য অ্যাগারোজ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। DNA ঋণাত্মক আধানধর্মী অনু হওয়ায় ধনাত্মক ইলেকট্রোড (অ্যানোড) অভিমুখে গমন করে (চিত্র11.3) । ভেক্টর DNA সহ এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়।

DNA অনুর সংযুক্তিকরণে বহু প্রক্রিয়া যুক্ত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন উৎসেচকের সাহায্যে যে DNA থেকে ইপ্সিত জিনটি নেওয়া হবে সেই উৎস DNA ও ভেক্টর DNA কে কর্তনের পর উৎস DNA হতে কেটে নেওয়া ইপ্সিত জিন ও কর্তিত ভেক্টরের মিশ্রণে লাইগেজ উৎসেচক যুক্ত করা হয়, এর ফলেই পুনঃযোজিত DNA প্রস্তুত হয়।

11.3.3 PCR পদ্ধতির সাহায্যে কাঙ্খিত জিনের পরিবর্ধন (Amplification of gene of interest using PCR) ঃ

PCR -এর সম্পূর্ণ নাম হল পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (Polymerase Chain Reaction) বা পরিমারেজ শৃঙ্খল বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায়, *ইন ভিট্রো* পরিবেশে দুই সেট প্রাইমার (রাসায়নিকভাবে

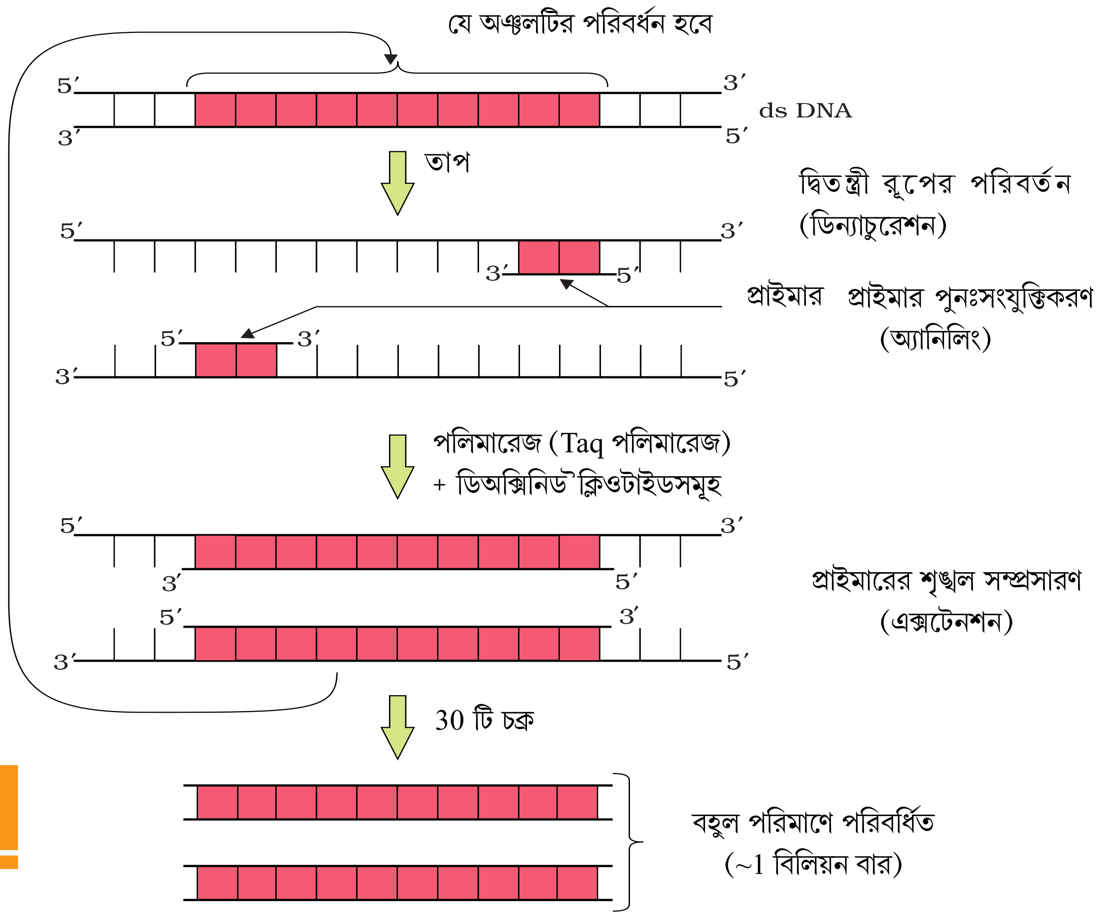

চিত্র 11.6 পলিমারেজ চেন রিয়েক্শন (PCR) ঃ প্রতিটি চক্রের তিনটি ধাপ রয়েছে ঃ i) দ্বিতন্ত্রী DNA অনুর দ্বিতন্ত্রী রূপের পরিবর্তন (Denaturation), ii) প্রাইমার পুনঃসংযুক্তিকরণ (annealing) এবং iii) প্রাইমারের সম্প্রসারণ (extension of primers)।

সংশ্লেষিত ক্ষুদ্র অলিগোনিউক্লিওটাইড সমূহ DNA অনুর নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিপূরক) এবং DNA পলিমারেজ উৎসেচক ব্যবহার করে জিন বা DNA এর বহু প্রতিলিপি সংশ্লেষিত হয়। উৎসেচকটি বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত নিউক্লিওটাইড ও ছাঁচ (template) রূপে ব্যবহৃত জিনোমিক DNA এর উপর নির্ভর করে প্রাইমারের সম্প্রসারণ ঘটায়। যদি DNA এর প্রতিলিপিকরণ (Replication) পদ্ধতিটি বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায়, তবে খন্ডিত DNA টিকে প্রায় বিলিয়ন বার পরিবর্ধিত করা যেতে পারে, অর্থাৎ খন্ডিত DNA টির 1 বিলিয়ন প্রতিলিপি (copy) গঠিত হবে। তাপ সহনশীল DNA পলিমারেজ উৎসেচক (*Thermus aquaticus* ব্যাকটেরিয়া হতে নিষ্কাশিত Taq পলিমারেজ উৎসেচক) ব্যবহারের মাধ্যমে ইপ্সিত জিন বা DNA অনুর পরিবর্ধন (amplification) বহুলাংশে অর্জন সম্ভব। এই DNA পরিমারেজ উৎসেচকটি উচ্চতাপমাত্রায় দ্বিতন্ত্রী DNA অনুর স্বাভাবিক ধর্মের অর্থাৎ দ্বিতন্ত্রীরূপের পরিবর্তনকালে (Denaturation) সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই পরিবর্ধিত (amplified) DNA খন্ডকে এখন প্রয়োজন অনুসারে আবারও ক্লোনিং প্রক্রিয়ার জন্য ভেক্টরের সাথে সংযুক্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে (চিত্র 11.6)।

11.3.4 পোষক কোশে বা জীবে পুনঃযোজিত DNA এর অন্তর্নিবেশ (Insertion of Recombinant DNA into the host cell/organism) ঃ

গ্রাহক কোশে পুনঃযোজিত DNA অন্তর্নিবেশ করানোর বহু পদ্ধতি রয়েছে। গ্রাহক কোশ সমূহ এই পুনঃ যোজিত DNA সমূহকে গ্রহণের পর গ্রাহক কোশ এর পার্শ্ববর্তী মাধ্যম হতে DNA গ্রহণ করে। সুতরাং, যদি কোনো একটি অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন-অ্যাম্পিসিলিন) প্রতিরোধী জিন বহনকারী পুনঃযোজিত DNA বহন করে এবং একে *E.coli* কোশে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন পোষক কোশও অ্যাম্পিসিলিন প্রতিরোধী কোশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যদি আমরা অ্যাম্পিসিলিনযুক্ত আগর মাধ্যম বা প্লেটে (Agar plate) এই রূপান্তরিত কোশগুলোকে ছড়িয়ে দেই তবে কেবলমাত্র ট্রান্সফরম্যান্টস্ বৃদ্ধি পাবে, অরূপান্তরিত (untranformed) গ্রাহক কোশসমূহ মারা যাবে। তাই অ্যাম্পিসিলিন প্রতিরোধী জিনের উপস্থিতির জন্যই অ্যাম্পিসিলিনের উপস্থিতিতে (অ্যাম্পিসিলিনযুক্ত আগর প্লেট) একটি রূপান্তরিত কোশকে নির্বাচন করা যায়। এই ক্ষেত্রে অ্যাম্পিসিলিন প্রতিরোধী জিনকে *সিলেকটেবল* মার্কার বলে।

11.3.5 বিজাতীয় জিনের প্রভাবে সৃষ্ট উপজাতবস্তু সংগ্রহ (obtainging the foreign gene product) ঃ

যখন তোমরা একখণ্ড বিজাতীয় DNA অনুকে ক্লোনিং ভেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করে, একে ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণীকোশে স্থানান্তরিত করবে, বিজাতীয় DNA অনুটি সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। প্রায় সবধরণের পুনঃযোজিত প্রযুক্তিবিদ্যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল কাঙ্খিত প্রোটিন উৎপাদন করা। তাই, পুনঃযোজিত DNA অনুটির প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিজাতীয় জিনটির উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশ ঘটে। পোষক কোশের অভ্যন্তরে বিজাতীয় জিনের প্রকাশ মূলতঃ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয় বুঝতে সাহায্য করে।

ইপ্সিত বা কাঙ্খিত জিনের ক্লোন করা এবং টার্গেট প্রোটিনের প্রকাশিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করার পর কেউ অধিক মাত্রায় টার্গেট প্রোটিন উৎপাদনের বিবেচনা করতে পারে। *কেন অধিক মাত্রায় উৎপাদনের প্রয়োজন তার কোনো কারণ তোমরা ভেবেছ কী?* একটি হেটেরোলোগাস পোষকে (heterologous host) একটি প্রোটিন সংকেত বহনকারী জিন প্রকাশিত হয় তখন সেই প্রোটিনকে *পুনঃযোজিত প্রোটিন (recombinant protein)* বলে। পীরক্ষাগারে কাঙ্খিত জিনের ক্লোন বহনকারী (harbouring) কোশসমূহকে স্বল্পমাত্রায় বৃদ্ধি করানো যেতে পারে। কাঙ্খিত প্রোটিন নিষ্কাশনের জন্য কলাপালন মাধ্যম বা কালচার (culture) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এরপর একে বিভিন্ন পৃথকীকরণ কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে বিশুদ্ধীকরণ করা হয়। কোশগুলোকে অবিচ্ছিন্ন পালন মাধ্যমে (Continuous Culture system) বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে, যেখানে কোশগুলোর শারীরবৃত্তীয় ভাবে সর্বাপেক্ষা

সক্রিয় লগ্ এক্সপোনেনসিয়াল বৃদ্ধি দশা বজায় রাখার জন্য একদিক দিয়ে ব্যবহৃত পরিপোষক মাধ্যমকে বের করে দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি অপর তাজা বা নতুন মাধ্যমকে অন্যদিক থেকে যুক্ত করা হয়। এই প্রকারের পালন পদ্ধতিতে কাঙ্খিত প্রোটিনের অধিকতর উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে বায়োমাস তৈরী হয়।

যথেষ্ট পরিমান উপজাত বস্তুর উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট পরিপোষক/পালন মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। অধিক পরিমাণে উপজাত বস্তু পেতে হলে **বায়োরিয়েক্টার** তৈরী করা প্রয়োজন, যেমন অধিক আয়তনবিশিষ্ট (100-1000 লিটার) পালনমাধ্যম বা কালচারের প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে। তাই বায়োরিয়েক্টারগুলোকে বড় আকারের পাত্ররূপে কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে কাঁচামাল সমূহকে জৈবিক উপায়ে জীবানুযুক্ত উদ্ভিদ, প্রাণী বা মানবকোশ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট উপজাত বস্তু, স্বতন্ত্র উৎসেচক ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বৃদ্ধির পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা (অনুকূল তাপমাত্রা, pH, যৌগক, লবন, ভিটামিন, অক্সিজেন ইত্যাদি) সরবরাহের মাধ্যমে একটি বায়োরিয়েক্টার কাঙ্খিত উপজাত বস্তু উৎপাদনের জন্য অনুকূল প্রভাবকে যোগান দিতে পারে।

স্টায়ারিং প্রকৃতির বায়োরিয়েক্টার সচরাচর সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়, যা চিত্র 11.7- এ দেখানো হল।

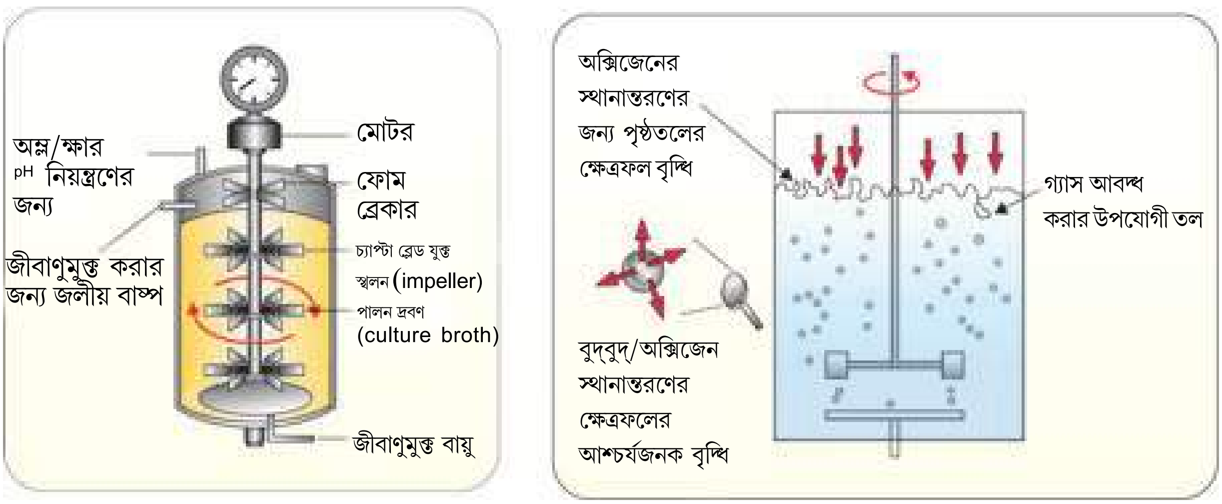

(ক) (খ)

চিত্র 11.7- a) সরল স্টায়ার্ড ট্যাঙ্ক বায়োরিয়েক্টার b) স্পার্জড - স্টায়ার্ড ট্যাঙ্ক বায়োরিয়েক্টার যার মাধ্যমে নির্বীজ বা জীবানুমুক্ত বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌ চালনা করা হয়।

স্টায়ার্ড ট্যাঙ্ক রিয়েক্টারস্থিত উপাদানসমূহের (Reactor contents) ভালোভাবে সংমিশ্রণে সাহায্য করার জন্য স্টায়ার্ড ট্যাঙ্ক রিয়েক্টার সাধারণত বেলনাকার চোঙের মতো অথবা বাঁকানো ভূমি বিশিষ্ট হয়। বায়োরিয়েক্টারস্থিত আন্দোলক (Stirrer) সর্বদাই উপকরণ সমূহের মিশ্রিতকরণ ও অক্সিজেনের সরবরাহ বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিকল্প হিসাবে বায়ু সর্বদাই রিয়েক্টারের মধ্যে বুদ্‌বুদ রূপে উঠতে পারে। তোমরা যদি চিত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করো তাহলে তোমরা দেখবে যে বায়োরিয়েক্টারে একটি আন্দোলক তন্ত্র (agitator systecm), একটি অক্সিজেন সরবরাহকারী অংশ ও একটি ফেনা নিয়ন্ত্রণকারী অংশ, একটি তাপ নিয়ন্ত্রণ অংশ, p^H নিয়ন্ত্রক অংশ ও একটি নমুনা সংগ্রহকারী পথ বা দ্বার রয়েছে যার মাধ্যমে স্বল্পায়তনের পালন মাধ্যম বা পুষ্টিমাধ্যম নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিয়েক্টর হতে বের করে নেওয়া যেতে পারে।

11.3.6 সংশ্লেষিত উপজাতবস্তুর প্রক্রিয়াকরণ (Downstream processing) ঃ

জৈব সংশ্লেষ দশা সমাপ্ত হবার পর, বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ বা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ব্যবহারযোগ্য পদার্থ

হিসাবে বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ ধাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রক্রিয়াকরণের অন্তর্ভুক্ত ধাপগুলি হল পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধীকরণ এবং এদের একত্রে সংশ্লেষিত উপজাতবস্তুর প্রক্রিয়াকরণ বা ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং বলে। উৎপাদিত বস্তুর সাথে উপযুক্ত সংরক্ষণকর বস্তু মিশিয়ে (preservatives) একে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং বিভিন্ন ঔষধের ক্ষেত্রে একে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি উৎপাদিত বস্তুর জন্য কঠোর গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। সংশ্লেষিত উপজাত বস্তুর প্রক্রিয়াকরণ ও গুণমান পরীক্ষাব্যবস্থা উপজাত বস্তু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সারসংক্ষেপ

জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা বা বায়োটেকনোলজি, অধিক মাত্রায় উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণে এবং সজীববস্তু, কোশ ও উৎসেচককে ব্যবহার করে প্রক্রিয়াকরণ, এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করে। যখন মানুষ DNA অনুর রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন এবং পুনঃযোজিত DNA তৈরী করতে শিখেছিল তখনই কেবলমাত্র আধুনিক জীব প্রযুক্তিবিদ্যায় জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবের ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। এই মূখ্য প্রক্রিয়াকে রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনোলোজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। বিজাতীয় DNAএর পৃথকীকরণ ও পোষক জীবে এর স্থানান্তরণের জন্য রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ সমূহ, DNA লাইগেজ, উপযুক্ত প্লাজমিড বা ভাইরাস ভেক্টরের ব্যবহার, বিজাতীয় জিনের বহিঃপ্রকাশ, জিনের ক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুর বিশুদ্ধীকরণ অর্থাৎ কার্যকরী প্রোটিন তৈরি ও অবশেষে উপজাত বস্তুর বাজারজাতকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ এই পদ্ধতির সাথে যুক্ত। অধিক মাত্রায় উৎপাদনের জন্য বায়োরিয়েক্টর ব্যবহার হয়।

অনুশীলনী

1. তোমরা কী চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন 10 টি পুনঃযোজিত প্রোটিনের নাম লিপিবদ্ধ করতে পারবে? কোন্ কোন্ প্রোটিনগুলো রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয় খুঁজে বের করো (ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেখো)।
2. এমন একটি চার্ট প্রস্তুত করো (চিত্ররূপ উপস্থাপন) যেখানে একটি রেস্ট্রিকশন উৎসেচক, যে সাবস্ট্রেট DNA -এর উপর উৎসেচকটি কাজ করবে, যে নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলে উৎসেচকটি DNA কে কাটবে এবং যে খন্ডিত উপজাত বস্তু প্রস্তুত করবে, তা দেখানো হয়েছে।
3. তুমি যা শিখলে ও বুঝলে, সেই ধারণার ভিত্তিতে তোমরা কী বলতে পারো আণবিক আকৃতিগত দিক থেকে উৎসেচক ও DNA অনুর মধ্যে কোন্‌টি বড়? তোমরা কীভাবে জানলে?
4. একটি মানব কোশের মধ্যে মানব DNA অণুর আণবিক গুরুত্ব বা মোলার ঘনত্ব কত হবে? তোমাদের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করো।
5. ইউক্যারিওটিক কোশগুলোতে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক আছে কি? তোমাদের উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
6. অধিকতর ভালো বায়ুচালনা (aeration) ও সংমিশ্রণ (mixing) ধর্ম ছাড়াও একটি অবিরাম আন্দোলিত ফ্লাস্কের তুলনায় স্টায়ার্ড ট্যাঙ্ক বায়োরিয়াক্টারে আর কী কী সুবিধা রয়েছে?
7. তোমরা শিক্ষকের সাথে বিবেচনা করে 5টি প্যালিনড্রোম DNA সজ্জাক্রমের উদাহরণ সংগ্রহ করো। বেস-জোড় নিয়ম অনুসরণ করে তোমরা একটি প্যালিনড্রোম সজ্জাক্রম তৈরি করার চেষ্টা করো।
8. তুমি কী মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়া মনে করতে পারছো এবং এটা বলতে পারো কি মিয়োসিসের কোন্ দশায় পুনঃযোজিত DNA প্রস্তুত হয়?
9. তোমরা কি চিন্তা করতে পারো, একটি রিপোর্টার উৎসেচক সিলেকটেবল মার্কার ব্যবহার ছাড়াই কীভাবে বিজাতীয় DNA অণুর প্রভাবে একটি পোষক কোশসমূহের রূপান্তরণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে?

10. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো-
   a) প্রতিলিপিকরণের উৎসস্থল (origin of Replication)
   b) বায়োরিয়েক্টার
   c) সংশ্লেষিত উপজাত বস্তুর প্রক্রিয়াকরণ (Downstream Processing).
11. সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো—
   a) পলিমারেজ চেন রিয়েকশন (PCR)
   b) রেস্ট্রিকশন উৎসেচক ও DNA ।
   c) কাইটিনেজ উৎসেচক।
12. তোমার শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে কীভাবে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য/তুলনা করা যায়, তা খুঁজে বের করো—
   a) প্লাজমিড DNA ও ক্রোমোজোমীয় DNA ।
   b) RNA ও DNA ।
   c) এক্সোনিউক্লিয়েজ ও এন্ডোনিউক্লিয়েজ।

অধ্যায় 12

জীব প্রযুক্তিবিদ্যা ও এর প্রয়োগসমূহ (Biotechnology and its Applications)

12.1 কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগসমূহ (Biotehnological Applications in Agriculture)

12.2 চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগসমূহ (Biotechnological Applications in Medicine)

12.3 ট্রান্সজেনিক প্রাণী (Transgenic animals)

12.4 নৈতিক বিষয়সমূহ (Ethical issues)

জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা মুখ্যত যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে সেগুলি মূলত ঃ জিনগতভাবে পরিবর্তিত বিভিন্ন জীবানু, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণী ব্যবহার করে অধিকমাত্রায় জীবজাত পদার্থ, ঔষধের শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে তোমরা পূর্বের অধ্যায় হতে ইতিমধ্যে শিখেছো। জীবপ্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে মূলত ঃ ভেষজ ঔষধ (therapeutics), রোগ নিদান তত্ত্ব (diagnostics), কৃষিক্ষেত্রে জিনগত ভাবে পরিবর্তিত, শস্য (GMO) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (Processed food) প্রস্তুতি, জৈবিক উপায়ে প্রতিকার (bioremediation), বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপনা (waste treatment) এবং শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি।

জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র হল—

(i) উন্নত জীব যথা একটি অনুজীব বা বিশুদ্ধ উৎসেচকরূপে সবচেয়ে ভালো অনুঘটকটি সরবরাহ করা।

(ii) একটি জৈব অনুঘটকের ক্রিয়াশীলতার জন্য প্রকৌশলের ব্যবহার দ্বারা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা, এবং

(iii) প্রোটিন বা জৈব যৌগসমূহের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সংশ্লেষিত উপজাত বস্তুর প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রযুক্তিসমূহ।

আমাদের এখন জানতে হবে, মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়নে বিশেষত ঃ খাদ্য উৎপাদন ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বা ব্যবহার করছে।

12.1 কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগসমূহ (Biotechnological Applications in Agriculture)

খাদ্য উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধির জন্য যে তিনটি বিষয়ে আমরা নজর দেই, সেই তিনটি বিষয় হল—

(i) কৃষিজ রাসায়নিক বস্তু (Agrochemicals) ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা।

(ii) জৈবিক কৃষিকার্য (organic agriculture) এবং
(iii) জিনগত প্রযুক্তিপ্রাপ্ত শস্যভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা।

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছে, কিন্তু বর্ধনশীল মানুষের জনসংখ্যায় সকলের জন্য এখনো খাদ্যের যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। উচ্চ ফলনহার কিছুটা উন্নত শস্য ভ্যারাইটির ব্যবহারের জন্য সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এটি মূলত ঃ সম্ভব হয়েছে অধিকতর ভালো পরিচালন ব্যবস্থা ও কৃষিজ রাসায়নিক বস্তু (সার ও কীটনাশক) ব্যবহারের ফলে। যাইহোক, উন্নয়নশীল পৃথিবীতে কৃষকদের জন্য কৃষিজ রাসায়নিক পদার্থ (Agro Chemical) প্রায়শই খুব দামী এবং গতানুগতিক সংকরায়ন কৌশল দ্বারা লব্ধ শস্য ভ্যারাইটির ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। আমাদের বংশগতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বারা কৃষকদের তাদের নিজস্ব জমিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য কোনো বিকল্প পথ রয়েছে কী? সার ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশে এদের ক্ষতিকারক প্রভাব কমানোর জন্য কোনো পথ রয়েছে কী ? এক্ষেত্রে জিনগতভাবে পরিবর্তিত শস্যের (Genetically Modified crops) ব্যবহারই একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান।

উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রাণী যাদের জিনসমূহকে জিনগত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে তাদেরকে জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব (Gevetically Modified Organisms) বলা হয়। জিনগতভাবে পরিবর্তিত উদ্ভিদগুলো বিভিন্নভাবে উপযোগী হতে পারে। যেকল দিকে জিনগতভাবে পরিবর্তন আনা হয়েছে ঃ

(i) জিনগত পরিবর্তন অজীবজ পীড়ন বা এবায়োটিক স্ট্রেস (ঠান্ডা, দুর্ভিক্ষ, লবন, উচ্চতাপমাত্রা) অধিকতর সহনশীল শস্য তৈরী করেছে।

(ii) "জিনগত-পরিবর্তন", জীবে কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পতঙ্গ -পেস্ট প্রতিরোধী শস্য (Pest resistant crops) তৈরী করেছে।

(iii) ফসলতোলার পরবর্তী ক্ষতি হ্রাসে সহায়তা করেছে।

(iv) উদ্ভিদ কর্তৃক সক্ষমতার সহিত খনিজ পদার্থের ব্যবহার জনিত সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে (ইহা মৃত্তিকার খুব তাড়াতাড়ি উর্বরতা হ্রাসে বাধা দেয়)

(v) খাদ্যের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করেছে, যেমন -গোল্ডেন রাইস একপ্রকার ভিটামিন- A সমৃদ্ধ ধান।

উল্লেখিত ব্যবহারিক দিকছাড়াও, শ্বেতসার, জ্বালানী ও ঔষধীরূপে বিকল্প সম্পদের শিল্পক্ষেত্রে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য জিনগতভাবে পরিবর্তিত উদ্ভিদ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রের জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ যেগুলো তোমরা পরবর্তী সময় বিশদে পড়বে, এমন একটি হল পতঙ্গ পেস্ট প্রতিরোধী উদ্ভিদের সৃষ্টি যা কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে পারবে। *Bacillus thuringiensis* (সংক্ষেপে Bt) নামক ব্যাকটেরিয়া হতে Bt টক্সিন প্রস্তুত হয়। Bt টক্সিন জিনকে ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে নিষ্কাশন করে ক্লোনিং এর মাধ্যমে জিনটির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং কীটনাশকের চাহিদা হ্রাস করার জন্য উদ্ভিদদেহে এই জিনটির প্রকাশ ঘটিয়ে উদ্ভিদটিকে পতঙ্গ পেস্ট প্রতিরোধী করা হয়, এর ফলে একটি জৈবকীটনাশক (Biopesticides) তৈরী হয়। উদাহরণস্বরূপ Bt তুলো (Bt cotton), Bt ভুট্টা, (Bt corn) ধান, টম্যাটো, আলু, সয়াবিন ইত্যাদি।

Bt তুলো (Bt cotton) ঃ *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়ার কিছু স্ট্রেন হতে প্রোটিন (ক্রাই প্রোটিন বা ক্রিস্টাল প্রোটিন) উৎপন্ন হয়, যেগুলি লেপিডোপটেরা গোত্রীয় পতঙ্গ (তামাক গাছের বাড্ওয়ার্ম, আর্মিওয়ার্ম), কোলিওপটেরা (গোবরে পোকা) এবং ডিপটেরা (মাছি, মশা) গোত্রীয় পতঙ্গের মত কিছু নির্দিষ্ট পতঙ্গাকে মেরে ফেলে। *B. thuringiensis* পতঙ্গাদের বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট দশা চলা কালে প্রোটিন কেলাস তৈরী করে। এই কেলাসসমূহে বিষাক্ত পতঙ্গানাশক টক্সিন প্রোটিন (insecticidal Protein) পাওয়া যায়। কেন এই টক্সিন Bacillus ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারে না? প্রকৃতপক্ষে, Bt টক্সিন প্রোটিন নিষ্ক্রিয় প্রোটক্সিন অবস্থায় থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে এই নিষ্ক্রিয় টক্সিন খাদ্যের মাধ্যমে একটি পতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে। তখন এই নিষ্ক্রিয় টক্সিনের কেলাস পতঙ্গের পাচননালীর (gut) ক্ষারীয় pH - এর প্রভাবে দ্রবীভূত হয় এবং সক্রিয় টক্সিনে রূপান্তরিত হয়। সক্রিয় টক্সিন পতঙ্গের মধ্যপাচননালীর (Mid gut) আবরণী কলাকোশের গাত্রে যুক্ত হয় এবং

কোশপর্দায় ছিদ্র করে কোশের স্ফীতি ঘটায়, কোশসমূহের ভাঙন ঘটায় এবং অবশেষে পতঙ্গের মৃত্যু ঘটায়।

Bacillus thuringiensis হতে নিষ্কাশিত সুনির্দিষ্ট Bt-টক্সিন জিন তুলোগাছের মত বিভিন্ন শস্যজাতীয় উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে (চিত্র 12.1) । শস্য উদ্ভিদ প্রজাতির এবং আক্রমণকারী পতঙ্গ পেস্টের উপর নির্ভর করে জিন নির্ধারণ ও বাছাই করা হয়, বেশীরভাগ Bt-টক্সিন পতঙ্গ নির্দিষ্ট হয়। cry IAC জিনটি এই টক্সিনের সংকেত বহন করে এবং এই জিনটি 'cry' নামে পরিচিত। সাধারণ 'cry' নামে পরিচিত জিনগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়, উদাহরণ স্বরূপ, জিন cry IAC এবং cry II Ab দ্বারা সংকেত বহনকারী প্রোটিন তুলোগাছের বলওয়ার্ম পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে, জিন cry I Ab ভুট্টার কান্ডের ছিদ্রসৃষ্টিকারী পতঙ্গ (borer) নিয়ন্ত্রণ করে।

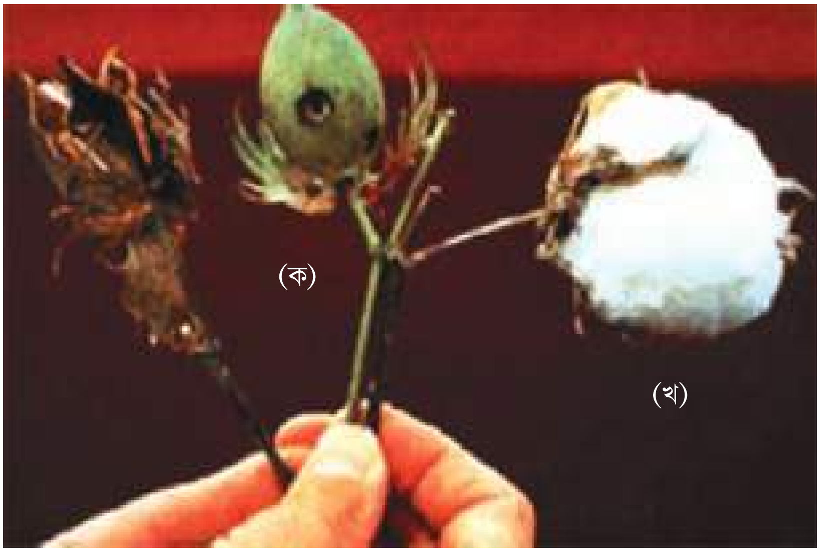

চিত্র 12.1 কটনবল ঃ (ক) বলওয়ার্ম দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, (খ) একটি সম্পূর্ণ পরিণত কটনবল।

পতঙ্গ পেস্ট প্রতিরোধী উদ্ভিদ (Pest Resistant Plant) ঃ মানুষসহ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বহু বিস্তৃত ভ্যারাইটিগুলোতে গোলকৃমি (Nematode) পরজীবীতা দেখায়। *Meloidegyne incognitia* নামক নিমাটোড তামাক গাছের মূলে সংক্রমণ করে এবং এর ফলে তামাকগাছের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায়। এই সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য RNA ইন্টারফেরেন্স (RNAi) প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে একটি অভূতপূর্ব কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি কোশীয় প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি হিসাবে সকল ইউক্যারিওটিক জীবে RNA ইন্টারফেরেন্স ঘটে। এই পদ্ধতি পরিপূরক দ্বিতন্ত্রী RNA (dsRNA) অনু m RNA অনুর সহিত যুক্ত হয়ে এবং ট্রান্সলেশনে বাধা দান করে নির্দিষ্ট m RNA কে নিষ্ক্রিয় করে দেয় (নিষ্ক্রিয়করণ বা Silencing)। RNA যুক্ত কোনো ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ফলে অথবা কোনো অন্তর্বর্তী RNA হতে রেপ্লিকেশন পদ্ধতিতে প্রস্তুত চলনশীল জিনগত উপাদান (mobile genetic elements বা ট্রান্সপোজন) থেকে এই পরিপূরক RNA টি আসতে পারে। Agrobacterium বাহক বা ভেক্টর ব্যবহার দ্বারা নিমাটোড-নির্দিষ্ট জিনগুলো কোনো পোষক উদ্ভিদের ভেতরে কোশে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছিল (চিত্র 12.2) । নিমাটোড -নির্দিষ্ট RNA অনুপ্রবেশ করিয়ে এর থেকে পোষক কোশে সেন্স ও অ্যান্টি-সেন্স RNA তৈরী করা হয়েছিল। এই উভয় RNA ই- পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় এরা দ্বিতন্ত্রী RNA (ds RNA) গঠন করে, যেটি RNA ইন্টারফেরেন্সের সূচনা করেছিল এবং এইভাবে নিমাটোডের নির্দিষ্ট m RNA

অণুকেও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, নির্দিষ্ট ইন্টারফেয়ারিং RNA প্রকাশিত হয় এমন একটি ট্রান্সজেনিক পোষকে যেখানে পরজীবী নিমাটোডটি বাঁচতে পারে না। এইভাবে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ পরজীবীটির সংক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে (চিত্র 12.2)।

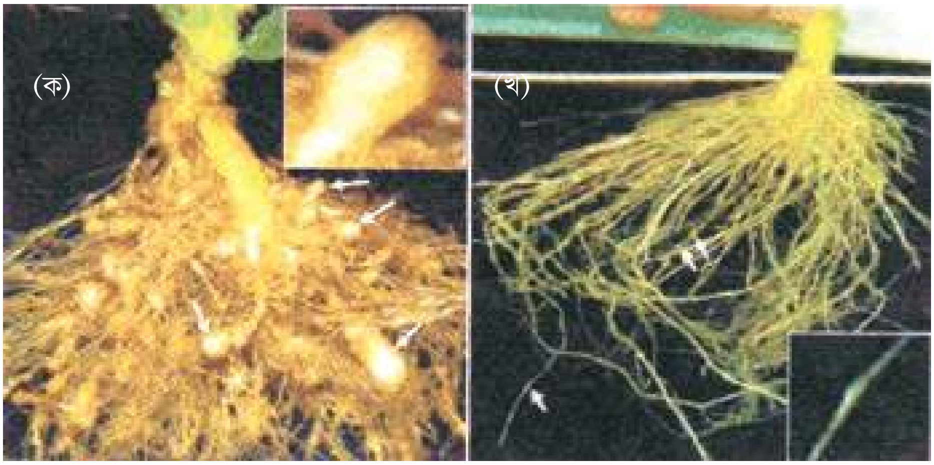

চিত্র 12.2 নিমাটোডের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পোষক উদ্ভিদে সৃষ্ট দ্বিতন্ত্রী RNA -এর ক্রিয়ার সূত্রপাত ঃ ক) একটি নিয়ন্ত্রিত আদর্শ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র। খ) ইচ্ছাকৃতভাবে নিমাটোডের সংক্রমণ ঘটানোর 5 দিন পরে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদের মূলতন্ত্র, যা এই অভূতপূর্ব পদ্ধতির মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে।

12.2 চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ (Biotechnological Applicstions in medicine)

নিরাপদ ও অধিকতর কার্যকর রোগ নিরাময়কারী ঔষধ (therapeutic drugs) প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের মাধ্যমে পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যার (rDNA technology) প্রক্রিয়াগুলি স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাবে ফেলেছে। এছাড়া, পুনঃযোজিত ঔষধপত্র অনাবশ্যক অনাক্রম্য সাড়া দেখাবে না, যা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী উৎস হতে নিষ্কাশিত বা সংগৃহীত অনুরূপ উপজাত বস্তুগুলোতে সচরাচর দেখা যায়। বর্তমানে, বিশ্বব্যাপী-মানুষের ব্যবহারযোগ্য প্রায় 30 টির অধিক পুনঃযোজিত ঔষধ (Recombinant therapeutics) অনুমোদন করা হয়েছে, এদের মধ্যে ইতিমধ্যেই 12টি পুনঃযোজিত ঔষধ ভারতবর্ষে বাজারজাত হয়েছে।

12.2.1 জিনগত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত ইনসুলিন (Genetically Engineered Insulin) ঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ডায়াবেটিসের দেখা দিলে তার ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ইনসুলিন গ্রহণ দ্বারা একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হবে। যদি যথেষ্ট পরিমাণে মানব ইনসুলিন পাওয়া না যায় তখন একজন ডায়াবেটিক রোগী কী করবে? তোমরা যদি এই বিষয়টি আলোচনা করো, অতি শীঘ্রই তোমরা বুঝতে পারবে যে, অন্য প্রাণী হতে ইনসুলিন নিষ্কাশন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য প্রাণী হতে সংগৃহীত ইনসুলিন কী মানবদেহে ক্ষরিত ইনসুলিনের মতই সমান কার্যকরী এবং এর ফলে কী মানবদেহে কোনো অনাক্রম্য সাড়া দেখা দেবে না? এখন কল্পনা করো, যদি এমন কোনো ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় যেটি মানব ইনসুলিন তৈরী করতে পারবে, তাহলে কেমন হয়? সহসাই সমগ্র পদ্ধতিটিই খুবই সরল হয়ে যাবে। তোমরা সহজেই বিশাল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে এবং তোমার প্রয়োজন অনুসারে যত খুশী ইনসুলিন তৈরী করতে পারবে।

ভাবো তো, ইনসুলিনকে কী ডায়াবেটিক রোগীকে বড়ি হিসেবে বা অন্য কোনো রূপে খাওয়ানো যাবে, না কী যাবে না? কেন?

পূর্বে গবাদিপশু ও শূকর হত্যা করে, তাদের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশন করে ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো, তবে প্রাণীজ উৎস হতে সংগৃহীত ইনসুলিন কোনো কোনো রোগীর দেহে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে অথবা বিজাতীয় প্রোটিনের উপস্থিতির জন্য ভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইনসুলিন দুটি ক্ষুদ্র পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়— শৃঙ্খল-A এবং শৃঙ্খল-B। এই পলিপেপটাইড শৃঙ্খলদুটি পরস্পর ডাই-সালফাইড বন্ধনী (Disulphide linkage) দ্বারা যুক্ত (চিত্র 12.3)। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ইনসুলিন প্রো-হরমোন (Prohormone) রূপে সংশ্লেষিত হয় (প্রো-এনজাইমের মত প্রো-হরমোনটিরও পুরোপুরিভাবে পরিণত হওয়ার পূর্বে এর প্রক্রিয়াকরণ হওয়া প্রয়োজন), যার মধ্যে একটি অতিরিক্ত C- পেপটাইড শৃঙ্খল বর্তমান। পরিণত ও সক্রিয় ইনসুলিন অণুতে C- পেপটাইভ শৃঙ্খলটি উপস্থিত থাকে না এবং পরিণমনের মাধ্যমে প্রো-ইনসুলিন হতে কার্যকরী ইনসুলিন গঠনকালে C- পেপটাইভটি অপসারিত হয়। পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তি (rDNA technol-ogy) ব্যবহারের মাধ্যমে ইনসুলিন তৈরীর প্রধান চ্যালেঞ্জটি হলো ইনসুলিন সৃষ্টিকারী পলিপেপটাইডগুলোকে একত্রিত করে কার্যকর ও পরিণত ইনসুলিন তৈরী করা। 1983 সালে Eli Lilly নামক আমেরিকান কোম্পানি মানব ইনসুলিনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খল-A ও শৃঙ্খল- B এর সংকেত বহনকারী দুটি অনুরূপ DNA বেস সজ্জা তৈরি করেছিল এবং ইনসুলিন শৃঙ্খল প্রস্তুতির জন্য এই বেসসজ্জাদ্বয়কে E.coli ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে যুক্ত করা হয়। পলিপেপটাডি শৃঙ্খল-A ও শৃঙ্খল -B। পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুত করে নিষ্কাশনের পর শৃঙ্খলদুটিকে ডাইসালকাইড লিংকেজ দ্বারা যুক্ত করে মানব ইনসুলিন তৈরী করা হয়েছিল।

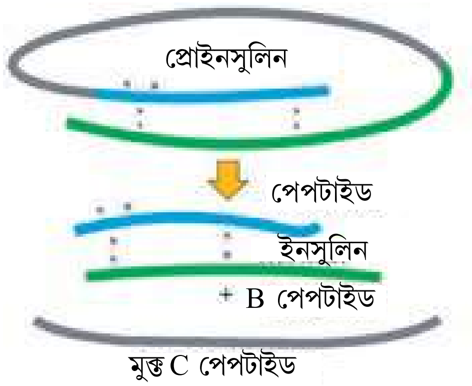

চিত্র 12.3 প্রোইনসুলিনের ইনসুলিনে পরিণমন (সরলিকৃত চিত্র)

12.2.2 জিন থেরাপি (Gene therapy) ঃ

যদি কোনো মানুষ বংশগত বা জিনগত রোগ নিয়ে জন্মায়, তবে এই ধরনের রোগের নিরাময়ের জন্য কোনো সঠিক চিকিৎসাকৌশল (therapy) গ্রহণ করা যেতে পারে কী? জিন থেরাপিই হল এই ধরণের রোগ নিরাময়ের জন্য একটি উপায় বা পন্থা। জিন থেরাপি হল কয়েকটি পদ্ধতির সম্ভার, যার সাহায্যে কোনো শিশু বা ভ্রূণে সনাক্ত হয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ জিনের সারাই করা সম্ভব। এখানে রোগ চিকিৎসা বা নিরাময়ের জন্য কোনো ত্রুটিবিহীন জিনকে বংশগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কোশ বা কলায় সন্নিবিষ্ট করা হয়। জিনগত ত্রুটি সারাইয়ের ক্ষেত্রে অকার্যকরী জিনটির উপস্থিতির কারণে যে কাজটি হয় না, সেই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এবং এভাবে ঐ জিনের ক্ষতিপূরণের জন্য একটি স্বাভাবিক জিনকে ব্যক্তি বা ভ্রূণের দেহে অনুপ্রবেশ করানো হয়।

1990 সালে অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামাইনেজ (ADA) ঘাটতিযুক্ত চার বছর বয়সী একটি মেয়ের দেহে প্রথম এই রোগ সারাইয়ের জন্য চিকিৎসা সম্পর্কিত জিন থেরাপি গ্রহণ করা হয়েছিল। অনাক্রম্যতন্ত্রের সঠিক কার্যকারীতার জন্য এই উৎসেচকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামাইনেজ উৎসেচক সংশ্লেষের জন্য দায়ী জিনের ডিলিশন মিউটেশনের কারণেই এই জিনগত অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছিল। কিছু শিশুর দেহে অস্থিমজ্জার প্রতিস্থাপন (Bone marrow transplantation) দ্বারা ADA ঘাটতিজনিত সমস্যা (রোগ) নিরাময় করা যেতে পারে, অন্যদের মধ্যে উৎসেচক প্রতিস্থাপন চিকিৎসা কৌশলের (enzyme replacement therapy) সাহায্যে এই রোগ নিরাময় হতে পারে, যেখানে কার্যকরী ADA উৎসেচকটিকে ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে পাঠানো হয়। কিন্তু এই উভয় ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সমস্যা হল যে, এগুলো সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য পদ্ধতি নয়। জিন থেরাপির অভিমুখে প্রথম ধাপটি হল, রোগীর রক্ত হতে লিম্ফোসাইট সংগ্রহ করে দেহের বাইরে পালন মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটানো। একটি পালন মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কার্যকরী ADA & DNA (রিট্রোভাইরাস ভেক্টরের ব্যবহারের মাধ্যমে) কে লিম্ফোসাইট শ্বেতকনিকায় প্রবেশ করানো হয় এবং এই লিম্ফোসাইটগুলোকে পুনরায় রোগীর দেহে পাঠানো হয়। যদিও এই কোশগুলি যেহেতু অমর নয়, তাই রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে এই ধরনের প্রযুক্তিপ্রাপ্ত, জিনগতভাবে পরিবর্তিত লিম্ফোসাইটগুলোকে রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করানো প্রয়োজন। যাই হোক, ADA প্রস্তুতকারী অস্থিমজ্জার কোশ হতে পৃথকীকৃত জিনগুলোকে যদি প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থায় কোশগুলোতে প্রতিস্থাপন করা যায়, তবে এটিই হবে স্থায়ী নিরাময় পদ্ধতি।

12.2.3 আণবিক স্তরে রোগ নির্ণয় (Molecular Diagnosis) ঃ

তোমরা জানো যে, কোনো রোগের কার্যকরী চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় এবং এই রোগের নির্ণয় রোগশারীর বিদ্যা (Diagnosis and Pathophysiology) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগ নির্ণয়ের চিরাচরিত পদ্ধতি ব্যবহার (রক্তের সিরাম ও মূত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি) দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় রোগ সনাক্তকরণ সম্ভব নয়। পুনর্যোজিত DNA প্রযুক্তি (rDNA technology), পলিমারেজ চেন রিয়েক্শন (PCR) এবং এনজাইম লিঙ্কড্ ইমিউনো সরবেন্ট অ্যাসে (ELISA) হল কিছু রোগ নির্ণয়ের সহায়ক পদ্ধতি যেগুলো প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য সাধন করে।

দেহে সংক্রমণযোগ্য অনুজীবের (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি) উপস্থিত রয়েছে কিনা তা সাধারণত তখনই কেবলমাত্র সন্দেহ করা হয় যখন এই সংক্রমণযোগ্য জীব (Pathogen) রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে। এই সময়ের মধ্যে দেহে সংক্রমণযোগ্য অনুজীবের ঘনত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে PCR পদ্ধতির মাধ্যমে নিউক্লিক অ্যাসিড অণুগুলোকে পরিবর্ধন করে বা সংখ্যা বাড়িয়ে (amplification) নিয়ে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের খুবই স্বল্প ঘনত্বে (যেসময়ে দেহে রোগলক্ষণ দৃশ্যমান হয় নি) সনাক্তকরণ করা সম্ভব। PCR পদ্ধতি দ্বারা স্বল্প পরিমাণ DNA কীভাবে সনাক্ত সম্ভব তা কী তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে? সন্দেহভাজন AIDS রোগীর দেহে HIV সনাক্ত করার জন্য বর্তমানে নিয়মিত PCR পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্দেহভাজন ক্যান্সার রোগীর ক্ষেত্রেও জিনের পরিব্যক্তি (mutation) সনাক্তকরণেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য অনেক বংশগত বা জিনগত অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করার জন্য PCR একটি শক্তিশালী পদ্ধতি।

একটি একতন্ত্রী DNA বা RNA -এর সাথে একটি তেজস্ক্রিয় অনু (Probe) যুক্ত করে (tagged) একে কিছু কোশের একটি ক্লোনে এর পরিপূরক DNA অণুর সাথে সংকরায়ন করানো হয় এবং এরপর অটোরেডিও গ্রাফির সাহায্যে ঐ সংকর DNA অণুর সনাক্তকরণ করা হয়। পরিব্যক্তি ঘটেছে এমন জিন সমন্বিত ক্লোনকোশগুলো তাই ফোটোগ্রাফিক ফিল্মে দৃশ্যমান হয় না, কারণ পরিব্যক্তি ঘটেছে এমন পরিপূরক বেস সজ্জাক্রম প্রোবে থাকে না।

ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbant Assay) পদ্ধতিটি অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অ্যান্টিজেনের (প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন ইত্যাদি) উপস্থিতি অথবা প্যাথোজেনের প্রভাবে দেহে সৃষ্ট অ্যান্টিবডির চিহ্নিতকরণের সাহায্যে প্যাথোজেনের সংক্রমণ সনাক্ত করা যেতে পারে।

12.3 জিনগতভাবে পরিবর্তিত প্রাণী সমূহ (Transgenic Animals) ঃ

কোনো অতিরিক্ত বা বিজাতীয় জিন বহন ও প্রকাশ করার জন্য যেসব প্রাণীদের নিজস্ব DNA-এর পরিবর্তন করেছে, তাদের ট্রান্সজেনিক প্রাণী বলে। যেসব ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরী করা হয়েছে এদের মধ্যে ট্রান্সজেনিক ইদুঁর, খরগোস, শূকর, ভেড়া, গরু ও মাছ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে, যদিও এখনও পর্যন্ত উৎপন্ন সব ট্রান্সজেনিক প্রাণীদের মধ্যে 95 শতাংশ এরও বেশী হল ইদুঁর। কেন এই সকল ট্রান্সজেনিক প্রাণীদের, উৎপন্ন করা হয়েছিল? কীভাবে মানুষ এইরূপ পরিবর্তনের সুবিধা পেতে পারে? চলো আমরা কিছু ট্রান্সজেনিক প্রাণীর সৃষ্টির কারণ অন্বেষণ করার চেষ্টা করি ঃ

i) স্বাভাবিক শারীরবৃত্ত ও বিকাশ (Normal Physiology and development) ঃ

জিনের কার্যপদ্ধতি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং কীভাবে জিনগুলি দেহের স্বাভাবিক কাজ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে তা অধ্যয়নের জন্য ট্রান্সজেনিক প্রাণীগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, বৃদ্ধির সহিত যুক্ত জটিল শর্তসমূহ অধ্যয়ন যথা ইনসুলিনের ন্যায় বৃদ্ধি প্রভাবক। অন্য প্রজাতির জিন যা এই প্রভাবকটির (Factor) গঠনে পরিবর্তন ঘটায়, তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এর ফলে যে জীবজ প্রভাব পরে তার অধ্যয়ন করা হয় এবং দেহে ঐ প্রভাবকটির জীবজ ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ii) রোগ বিষয়ে অধ্যয়ন (Study of Disease) ঃ

কীভাবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিতে জিন ভূমিকা রাখে, এই বিষয়ে আমাদের অধ্যয়ন ও বোধশক্তি

বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরী করা হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন রোগের আদর্শ নমুনা (Model) হিসাবে কাজ করার জন্য এই ট্রান্সজনিক প্রাণীদের বিশেষভাবে তৈরী করা হয় যাতে রোগসমূহের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সম্ভবপর হয়। ক্যান্সার, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, রিওমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও অ্যালজাইমার সহ বহু রোগের জন্য ট্রান্সজেনিক প্রাণী মডেল রয়েছে।

iii) **জীবজ দ্রব্যসমূহ (Biological Products) ঃ** মানুষের কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধগুলো জৈবিক বা জীবজাত বস্তু সমন্বিত হতে পারে, কিন্তু এইসকল বস্তু সমূহ প্রস্তুত করা প্রায়শই ব্যয়বহুল হয়। উপযোগী জীবজাত বস্তু প্রস্তুত করতে পারে এমন ট্রান্সজেনিক প্রাণীদের মাধ্যমে এম্ফাইসেমা রোগের চিকিৎসায় মানব প্রোটিন (**σ** অ্যান্টিট্রিপসিন) তৈরী করার জন্য ঐ প্রোটিন প্রস্তুতকারী সংকেতযুক্ত (codes) DNA খন্ড (বা জিন) কে ট্রান্সজেনিক প্রাণীতে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। একই প্রয়াশ নেওয়া হয়েছে ফিনাইল কিটোনুরিয়া (PKU) এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগের চিকিৎসার জন্য। 1997 সালে প্রথম ট্রান্সজেনিক গরু রোজি (Rosic) মানব প্রোটিনসমৃদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনে (2.4 গ্রাম/লিটার) সমর্থ হয়েছিল। এই গোদুগ্ধ মানব **σ** ল্যাক্টালবুমিন সমন্বিত এবং এটি পুষ্টিগত দিক থেকে স্বাভাবিক গোদুগ্ধের তুলনায় মানব শিশুর জন্য অধিকতর সুষম পদার্থ (balanced product).

iv) **ভ্যাক্সিন সুরক্ষা (Vaccine Safety) ঃ** মানবদেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পূর্বে সেই ভ্যাক্সিনের সুরক্ষার যাচাই এর কাজে ব্যবহার করার জন্য ট্রান্সজেনিক ইদুঁর প্রস্তুত করা হয়। ট্রান্সজেনিক ইদুঁর ব্যবহৃত হয় পোলিও ভ্যাক্সিনের সুরক্ষা পরীক্ষার জন্যও। যদিও এই পরীক্ষা সফল ও বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে টীকা বা ভ্যাক্সিনের ব্যাচগুলোর সুরক্ষা বা তীব্রতা জনিত নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বানরের পরিবর্তে ইদুঁর ব্যবহার করা যেতে পারে।

v) **রাসায়নিক নিরাপত্তা পরীক্ষা (Chemical safety testing) ঃ**
এটি বিষক্রিয়া/সুরক্ষা পরীক্ষা (test) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন ঔষধের (drug) বিষক্রিয়া পরীক্ষার মত ব্যবহৃত পদ্ধতির অনুরূপ নন-ট্রান্সজেনিক প্রাণীর তুলনায় বিষাক্ত পদার্থের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল (sensitive) জীব তৈরী করার স্বার্থে বিজাতীয় জিনসমন্বিত ট্রান্সজেনিক প্রাণী প্রস্তুত করা হয়। এরপর এদের বিষাক্ত পদার্থের সান্নিধ্যে রাখা হয় এবং এর ফলাফল অধ্যয়ন করা হয়। এই ধরনের প্রাণীগুলোতে বিষক্রিয়াজনিত পরীক্ষা স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ফলাফল পেতে সাহায্য করে।

12.4 নৈতিক বিষয়সমূহ (Ethical issues) ঃ

মানবজাতি কর্তৃক সজীব বস্তুতে পরিবর্তনসাধন (Manipulation) নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর বেশীদূর চলতে পারে না। মানুষের বিভিন্ন কার্যের নৈতিকতার মূল্যায়নের জন্য কিছু নৈতিক মানদণ্ড স্থির করা প্রয়োজন যেগুলো সজীব বস্তুর উপকার কিংবা অনিস্ট করতে পারে।

এই সমস্ত সমস্যা বা বিষয়ের (issues) নৈতিকতার বাইরে এই বস্তুসমূহের জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত গুরুত্ব অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। জীবে জিনগত পরিবর্তনসাধনের (genetic modifications) পর অনেকসময় বাস্তুতন্ত্রে যখন এদের যুক্ত করা হয় তখন অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেখা দিতে পারে।

তাই, ভারতসরকার GEAC (Genetic Engineering Approval Committee) এর মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে, যে সংগঠন জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব সম্পর্কিত (Genetically Modified Organism) গবেষণার বৈধতা বিষয়ে এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য GMO গুলোকে প্রবর্তনের নিরাপত্তা/সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

জনসেবামূলক বিষয়সমূহের (খাদ্য ও ঔষধের উৎস হিসাবে) জন্য সজীববস্তুর জিনগত পরিবর্তনসাধন ও এদের পেটেন্ট প্রদান নিয়ে কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

কিছু কোম্পানীকে পণ্য/পদার্থ উৎপাদন ও প্রযুক্তির জন্য পেটেন্টের অনুমোদন দেওয়ায় তারা এমন জিনগত পদার্থ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবজ সম্পদ ব্যবহার করতে পারছে, যেগুলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল/দেশের কৃষক ও জনজাতির মানুষেরা বহুকাল ধরেই চিহ্নিত, বিকশিত ও ব্যবহার করে আসছে এবং এই কারণেই সর্বসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য, যার উপস্থিতি এশিয়া মহাদেশের কৃষি ইতিহাসে একহাজার বছরেরও পুরানো। কেবলমাত্র ভারতেই ধানের আনুমানিক 200,000 ভ্যারাইটি রয়েছে। পৃথিবীর যে দেশগুলোতে ধানে সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্য রয়েছে, তাদের মধ্যে ভারত একটি। বাসমতী চাল তার সুবাস ও গন্ধের জন্য স্বতন্ত্র হয় এবং ভারতবর্ষে বাসমতীর 27 টি নথিভুক্ত ভ্যারাইটির চাষ হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাসমতীর চাষ হওয়ায় প্রাচীন লিপি, লোকাচারবিদ্যা এবং কবিতায় বাসমতী চালের নিদর্শন মিলে। 1997 সালে একটি আমেরিকার কোম্পানী US পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিসের মাধ্যমে বাসমতী চালের উপর পেটেন্ট পেয়েছিল। এর ফলে আমেরিকা ও বিশ্বব্যাপী নতুন ভ্যারাইটির বাসমতী চাল বিক্রি করার জন্য কোম্পানীটি স্বীকৃতিও পেয়ে যায়। বাসমতীর এই নতুন ভ্যারাইটি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কৃষকরা যে ভ্যারাইটির বাসমতী চাষ করে, তার থেকেই উৎপন্ন করা হয়েছিল। ভারতীয় বাসমতীকে ধানের একটি আংশিক খর্ব ভ্যারাইটির সহিত সংকরায়ন ঘটিয়ে এবং এর ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদটিকে একটি আবিষ্কার বা নতুনত্ব বলে দাবী করা হয়েছিল। পেটেন্টের বিস্তৃতি কার্যকরী সমতুল্য পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ এর অর্থ হল এই যে পেটেন্টের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বাসমতী চালের বিক্রির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। ভারতের চিরাচরিত ভেষজ ঔষধের উপর ভিত্তি করে পন্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে পেটেন্টের ব্যবহার নিয়েও কিছু প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, হলুদ নিমের (turmeric neem) ব্যবহার। যদি আমরা সজাগ না থাকি এবং যদি আমরা এজাতীয় পেটেন্ট আবেদন নিয়ে অবিলম্বে তৎক্ষনাৎ রূখে না দাঁড়াই তবে অন্যান্য দেশ/ব্যক্তিবর্গ আমাদের সমৃদ্ধ সম্পদ বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের উপর হাতছানি ঘটাবে। এতে উক্ত সম্পদসমূহ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তখন আমাদের এই বিষয়ে আর কিছুই করার থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট দেশ ও জনসাধারণের অনুমোদন না নিয়ে এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানী ও অন্যান্য সংগঠন/সংস্থা দ্বারা জীবজ সম্পদের ব্যবহার বোঝাতে **বায়োপাইরেসি (Biopiracy)** পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

বেশীরভাগ শিল্পোন্নত দশ/জাতি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হলেও জীববৈচিত্র্য ও চিরাচরিত জ্ঞানের দিক থেকে দুর্বল হয়। বিপরীত দিকে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে জীববৈচিত্র্যে প্রাচুর্যতা ও জৈবসম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত চিরাচরিত জ্ঞানের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়। জীবজ সম্পদ সংক্রান্ত চিরাচরিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক উপযোগী বস্তু তৈরী করতে পারে এবং এদের বাণিজ্যিকরণকালে সময়, প্রচেষ্টা ও খরচ কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অবিচার, অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ সুবিধা লাভের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে চেতনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, কিছু দেশ বা জাতি নিজস্ব জীবজ সম্পদ ও তাদের চিরাচরিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুমোদিত শোষণ প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে।

ভারতীয় সংসদ সম্প্রতি ভারতীয় পেটেন্ট বিলের দ্বিতীয় সংশোধনী পাশ করেছে এবং এতে পেটেন্টের অন্তর্গত নিয়মের জরুরীবিধান ও গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগসহ এই সমস্ত সমস্যা বা বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

অনুজীব, উদ্ভিদ, প্রাণী ও তাদের বিপাকীয় পদ্ধতিকে ব্যবহার করে জীবপ্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষের পক্ষে বহু উপযোগী পন্য পেয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে পুনঃযোজিত DNA প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে অনুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এমনভাবে প্রযুক্তিপ্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে, যাতে তাদের মধ্যে এই অভূতপূর্ব সামর্থ গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যতীত অপর পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণত ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তিগত পদ্ধতি যথা r DNA প্রযুক্তির সাহায্যে এক বা একাধিক জিনকে একটি জীব হতে অন্য জীবে স্থানান্তরণ দ্বারা জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব তৈরী করা হয়েছে।

খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ফলন পরবর্তী ক্ষতি হ্রাসে ও শস্যগুলোকে আরও পীড়ন প্রতিরোধী করার জন্য জিনগতভাবে পরিবর্তিত উদ্ভিদ গুলো (Genetically Modified Plants) খুবই উপযোগী। উন্নত পুষ্টিমূল্য সমন্বিত ও রাসায়নিক কীটনাশকের উপর কম নির্ভরশীল (পতঙ্গ-পেস্ট প্রতিরোধী খাদ্যশস্য) এমন বহু জিনগতভাবে পরিবর্তিত (Genetically Modified) শস্য উদ্ভিদ রয়েছে।

পুনর্যোজিত DNAপ্রযুক্তিবিদ্যার পদ্ধতিসমূহ নিরাপদ, জীবনদায়ী ও অধিকতর কার্যকর ঔষধের পর্যাপ্ত উৎপাদনের দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রে অপরিমেয় প্রভাব ফেলেছে। যেহেতু পুনর্যোজিত ঔষধ মানব প্রোটিনের সমতুল্য, এগুলো অনাবশ্যক অনাক্রম্য সাড়া তৈরী করে না এবং সংক্রমনের ঝুঁকি মুক্ত হয়, যা কিনা মানুষ ব্যতীত অন্য জীব উৎস হতে সংগৃহীত পদার্থের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়। মানব ইনসুলিন ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রস্তুত করা হয় অথচ এর গঠন পুরোপুরি প্রাকৃতিক অণুর (মানব ইনসুলিন) অনুরূপ।

ক্যান্সার, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, রিওমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও অ্যালজাইমার এর মতো মানব রোগগুলোর ক্ষেত্রে কীভাবে জিন দেহে রোগসৃষ্টিতে অবদান রাখছে তা বোঝার জন্য এই রোগগুলোর মডেল হিসাবেও ট্রান্সজেনিক প্রাণীগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

জিন থেরাপি হল কোনো ব্যক্তির কোশে বা কলায় জিনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিভিন্ন রোগ বিশেষত ঃ বংশগত রোগের চিকিৎসা করানো। একটি ত্রুটিপূর্ণ মিউট্যান্ট অ্যালিলকে কার্যকরী অ্যালিল/জিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে, কিংবা জিনের পরিবর্ধন বা সংখ্যাবৃদ্ধি (Gene amplification) ঘটিয়ে কোনো লক্ষ্যকোশের (target cell) জিনের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়। যেসব ভাইরাস তাদের প্রতিলিপিকরণচক্রের অঙ্গ হিসাবে পোষক জীবদের আক্রমণ করে এবং পোষক কোশে তাদের জিনগত বস্তুর অনুপ্রবেশ করায় সেইসব ভাইরাসদের সুস্থ জিন বা সাম্প্রতিক কালে জিনের অংশবিশেষ স্থানান্তরণের জন্য ভেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন অনুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জিনগত গঠনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কৌতূহলের কারণে গুরুতর নৈতিক প্রশ্ন উঠে আসছে।

অনুশীলনী

1) কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত Bt-টক্সিনের কেলাস (crystals of Bt toxin) সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোকেই মারতে পারে না কারণ—
   a) ব্যাকটেরিয়াগুলো অধিবিষ (toxin) প্রতিরোধী,
   b) অধিবিষ (toxin) অপরিণত হয়,
   c) অধিবিষ নিষ্ক্রিয় হয়,
   d) ব্যাকটেরিয়া তাদের একটি বিশেষ থলিতে অধিবিষকে ঘিরে রাখে।
2) ট্রান্সজেনিক ব্যাকটেরিয়া কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
3) জিনগতভাবে পরিবর্তিত শস্য (Gevetically Modified crops) উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের তুলনা (compare) ও পার্থক্য (contrast) নির্দেশ কর।

4) Cry প্রোটিন কী? এই প্রোটিন উৎপাদন করে এমন একটি জীবের নাম কর। মানুষ কীভাবে তার সুবিধার জন্য এই প্রোটিনকে কাজে লাগায়?
5) জিন থেরাপি কী? অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামাইনেজ (ADA) উৎসেচকের ঘাটতি জনিত উদাহরণের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা কর।
6) ক্লোনিং পদ্ধতির পরীক্ষামূলক ধাপসমূহ এবং ই.কোলি এর মতো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটি মানবজিনের (ধরো বৃদ্ধি হরমোনের জন্য দায়ী জিন) প্রকাশ রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন কর।
7) পুনর্যোজিত DNA প্রযুক্তি ও তেলের রাসায়নিক প্রকৃতির বিষয় তোমাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে বীজ হতে তেল (হাইড্রোকার্বন) অপসারণের একটি উপায় বা পদ্ধতি উল্লেখ কর।
8) গোল্ডেন রাইস্ (Golden Rice) কী তা ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের কর।
9) আমাদের রক্তে কী প্রোটিয়েজ ও নিউক্লিয়েজ উৎসেচক রয়েছে?
10) কীভাবে মুখে গ্রহণযোগ্য সক্রিয় প্রোটিন ঔষধ তৈরী করবে ইন্টারনেট হতে তথ্য খুঁজে বের কর। এক্ষেত্রে কী প্রধান সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়?

একক X

বাস্তব্যবিদ্যা (ECOLOGY)

অধ্যায় - 13

জীবসমূহ এবং জীবসংখ্যা বা পপুলেশন
(Organisms and populations)

অধ্যায় - 14

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

অধ্যায় - 15

জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ
(Biodiversity and Conservation)

অধ্যায় - 16

পরিবেশগত বিষয় সমূহ
(Environmental issues)

বৈচিত্র্য শুধুমাত্র সজীব বস্তুর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই নয়, এটি জীবনবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয়বস্তুও বটে। জীববিদ্যাকে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং অনুজীববিদ্যা রূপে অথবা তাত্ত্বিক এবং আধুনিক জীববিদ্যারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষোক্তটি জীববিদ্যার আনবিক দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে একটি সরল বহিঃপ্রকাশ। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে অনেক তথ্যসূত্র রয়েছে যার দ্বারা জীববিদ্যার এতগুলো অধ্যায়কে এক সূত্রে গাঁথতে পারি এবং একটি একক নীতিতে উপনীত হতে পারি। বাস্তব্যবিদ্যা হল এমন এক শাখা, যার সাহায্যে আমরা সামগ্রিকভাবে জীবনবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে পারি। জীববিদ্যা বোঝার ক্ষেত্রে সারমর্ম হল এই যে, সজীববস্তুরা যদিও একটি একক জীব রূপে থাকে, তবুও কিভাবে এরা অন্য জীবসমূহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে একটি গোষ্ঠী হিসেবে আন্তঃক্রিয়া করে এবং একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর মতো আচরণ করে অর্থাৎ জীবসংখ্যা বা পপুলেশন, জীবসম্প্রদায়, বাস্তুতন্ত্র অথবা এমনকি সম্পূর্ণ জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার রূপে কিভাবে আন্তঃক্রিয়া করে তা জানা। বাস্তব্যবিদ্যা এ সবই আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে। এর একটি বিশেষ দিক হল নৃতাত্ত্বিক পরিবেশগত অবক্ষয় এবং এর ফলে উত্থাপিত সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়সমূহের অধ্যয়ন। এই এককটিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো কেবলমাত্র বর্ণনাই করা হয় না, পাশাপাশি এগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন ও করা হয়।

ভারতবর্ষে রামদেও মিশ্রকে বাস্তব্যবিদ্যার জনক রূপে সম্মানিত করা হয়। রামদেও মিশ্র 1908 সালের 26 শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রফেসর W.H. Pearsall, FRS এর তত্বাবধানে যুক্তরাজ্য বা ইংল্যান্ডের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1937 সালে বাস্তব্যবিদ্যায় পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বারানসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে বাস্তব্যবিদ্যা সংক্রান্ত পঠন পাঠন এবং গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণা ক্রান্তীয় জীব সম্প্রদায় এবং তাদের পর্যায়ক্রম, ক্রান্তীয় বনভূমি এবং তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র সমূহের উদ্ভিদের পপুলেশন এবং উৎপাদনশীলতা এবং পরিপোষক চক্রের পরিবেশীয় সাড়া বোঝার ক্ষেত্রে ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের বাস্তুতন্ত্রের উপর স্নাতকোত্তর স্তরের পঠন পাঠনের সূচনা করেন। রামদেও মিশ্রর তত্বাবধানে পঞ্চাশেরও বেশি গবেষক পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা কেন্দ্রে বাস্তব্যবিদ্যার পাঠদান এবং গবেষণা শুরু করেছিলেন।

রামদেও মিশ্র
(1908-1998)

তাঁকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি এবং ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স থেকে ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল এবং পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর মর্যাদাপূর্ণ সঞ্জয় গান্ধি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর চেষ্টার জন্যই ভারত সরকার 1972 সালে ন্যাশনাল কমিটি ফর এনভায়রমেন্টাল প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তী বছরগুলোতে পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and forest, 1984) প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

অধ্যায় 13

জীবসমূহ এবং পপুলেশন (ORGANISM AND POPULATIONS)

13.1 জীবসমূহ এবং তার পরিবেশ Organism and its Environment

13.2 জীব সংখ্যা বা পপুলেশন Populations

আমাদের জীবজগতে মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এর জটিলতায় আমরা বিস্ময়াভিভূত। জীব সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ বৃহৎ জৈব অনু, কোশ,কলা, অঙ্গা, একক জীব, পপুলেশন, সম্প্রদায়, বাস্তুতন্ত্র এবং বায়োমস্তরে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলোকে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে আমরা এই জটিলতা বুঝতে চেস্টা করি। জীব সংগঠনের যে কোনো স্তরে আমাদের মনে দুই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন আমরা খুব ভোরে বাগানে বুলবুলি পাখিকে গান গাইতে শুনি, আমরা এরূপ ভাবতে পারি — কি ভাবে পাখিটি গান করে অথবা পাখিটি গান করে কেন? 'কিভাবে' প্রকৃতির প্রশ্নটির সাহায্যে আমরা প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটছে তার কৌশল জানার চেষ্টা করি এবং 'কেন' প্রকৃতির প্রশ্নটির মাধ্যমে আমরা প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করি। আমাদের উদাহরণে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হতে পারে — পাখিটির ভয়েস বক্স বা সিরিংক্স এবং গলার কম্পনশীল হাড়ের কার্যপ্রণালী, অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে পাখিটির জনন ঋতুতে সঙ্গীর সঙ্গো সংযোগ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর। তোমরা যখন বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিকতা নিয়ে তোমাদের চারপাশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবে, তখন উভয় ধরনের বহু আকর্ষণীয় প্রশ্ন অবশ্যই তোমাদের মনে জাগবে — *কেন যেসব ফুল রাতে ফোটে সেগুলো সাদা বর্ণের হয়? কোন্ ফুলে মকরন্দ আছে মৌমাছি তা কিভাবে বুঝতে পারে? ক্যাকটাসে অসংখ্য কন্টক থাকে কেন? কিভাবে মুরগীর ছানা নিজের মাকে চিনতে পারে? এবং এ ধরনের আরও বহু প্রশ্ন।*

তোমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে জেনেছ যে বাস্তব্যবিদ্যা হল এমন একটি বিষয় যেখানে বিভিন্ন জীবদের মধ্যে এবং জীব ও তার ভৌত পরিবেশের (অজীবজ) সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া বর্ণনা করা হয়।

বাস্তববিদ্যা মূলতঃ জীব সংগঠনের যে চারটি স্তর নিয়ে আলোচনা করে সেগুলো হল জীব, জীবসংখ্যা বা পল পুলেশন, জীব সম্প্রদায় এবং বায়োম। এই অধ্যায়ে আমরা জীবস্তর ও জীবসংখ্যা বা পপুলেশন স্তরে বাস্তব্যবিদ্যার অনুসন্ধান করব।

13.1 জীব এবং তার পরিবেশ (Organism and its Environment)

জীবস্তরের বাস্তব্যবিদ্যা হল আবশ্যিকভাবে শারীরবৃত্তীয় বাস্তব্যবিদ্যা যা বিভিন্ন জীব সমূহ, শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য নয় প্রজননের জন্যও কিভাবে তাদের পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয় তা বোঝার চেষ্টা করে। পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা জেনে থাকবে যে কিভাবে আমাদের গ্রহটি এর অক্ষের সাথে হেলে থেকে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হওয়ার কারণে তাপমাত্রার তীব্রতা এবং স্থিতিকালের ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে নির্দিষ্ট ঋতুসমূহের সৃষ্টি হয়। অধঃক্ষেপণের (মনে রাখতে হবে অধঃক্ষেপণ বলতে বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত উভয়কেই বোঝায়) ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিবর্তন সহ এই পরিবর্তনসমূহ একসাথে মরুভূমি, বৃষ্টিস্নাত অরণ্য এবং তুন্দ্রা এর মত মুখ্য বায়োম গঠনের জন্য দায়ী (চিত্র 13.1)

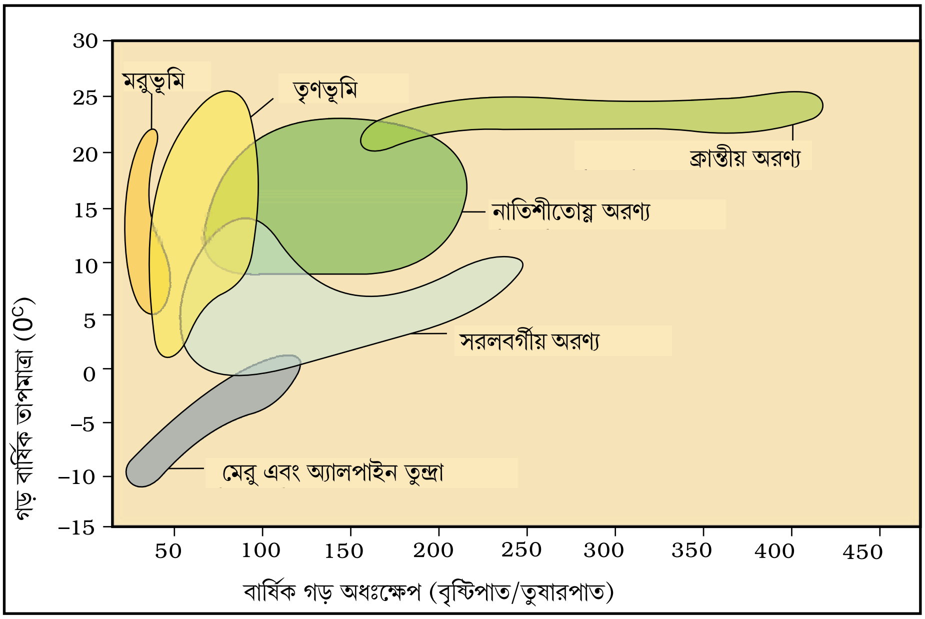

চিত্র 13.1 বার্ষিক তাপমাত্রা এবং অধঃক্ষেপের (বৃষ্টিপাত/তুষারপাত) ভিত্তিতে বায়োমের বিন্যাস

প্রতিটি বায়োমে যে আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রভেদ ঘটে তার ফলেই ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ বাসস্থানের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের মুখ্য বায়োমসমূহ চিত্র (13.2) তে দেখানো হয়েছে। পৃথিবী গ্রহটিতে শুধুমাত্র কয়েকটি অনুকূল পরিবেশ যুক্ত বাসস্থানেই জীবনের অস্তিত্ব বর্তমান তা নয়, এমনকি রুক্ষ এবং চূড়ান্ত প্রতিকূল বাসস্থান যেমন তীব্র গরম রাজস্থানের মরুভূমি, বৃষ্টি সিক্ত মেঘালয়ের জঙ্গাল, গভীর সমুদ্রখাত, খরস্রোতা নদী, বরফাবৃত মেরু অঞ্চল, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গা, উষ্ণ প্রস্রবণ, দুর্গন্ধযুক্ত কম্পোস্ট গর্ত এবং আরও কিছু স্থানে জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এমনকি আমাদের অন্ত্র ও অনুজীবের শতাধিক প্রজাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসস্থান।

(ক)

(খ)

(গ)

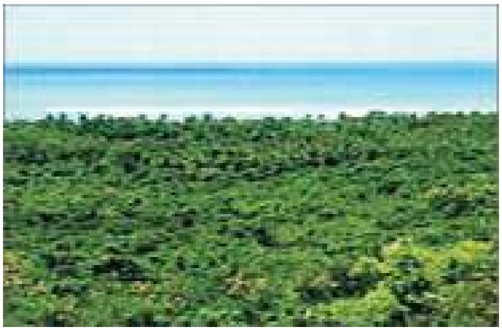

(ঘ)

চিত্র 13.2 ভারতের প্রধান বায়োমসমূহ (ক) ক্রান্তীয় বৃষ্টিস্নাত অরণ্য (খ) পর্ণমোচী উদ্ভিদের অরণ্য (গ) মরুভূমি (ঘ) সমুদ্র উপকূল।

কোন্ কোন্ মূল উপাদানের জন্য বিভিন্ন বাসস্থানের ভৌত এবং রাসায়নিক অবস্থায় এতটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়? এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হল তাপমাত্রা, জল, আলোক এবং মৃত্তিকা। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র ভৌত-রাসায়নিক (অজীবজ) উপাদানই কোনো জীবের বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে তা নয়, জীবজ উপাদানগুলিও অর্থাৎ কোনো জীবের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, পরজীবী, শিকারি প্রাণী এবং প্রতিযোগী যারা জীবটির সাথে প্রতিনিয়ত আন্তঃক্রিয়া করে, তারাও বাসস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা অনুমান করতে পারি যে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবদেহে অভিযোজন ঘটে যাতে সে তার নির্দিষ্ট বাসস্থানে সার্থকভাবে টিকে থাকতে পারে এবং প্রজনন করতে পারে।

প্রতিটি জীব প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিসরে বাস করে যা জীবটি সহ্য করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে এবং বাস্তুতন্ত্রে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে — এই সবগুলো একসাথে জীবটির নীচ্ (niche) গঠন করে।

13.1.1 মুখ্য অজীবজ প্রভাবক সমূহ (Major Abiotic Factors)

তাপমাত্রা (Temperature) ঃ তাপমাত্রা হল বাস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় প্রভাবক। তোমরা জান যে স্থলভূমির গড় তাপমাত্রা ঋতুভেদে বিভিন্ন রকম হয়, নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে এবং সমতল ভূমি থেকে পর্বতচূড়ায় তাপমাত্রা নিয়মিতক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। এর বিস্তৃতি মেরু অঞ্চল এবং সুউচ্চ স্থানে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নীচের স্তর থেকে গ্রীষ্মকালে ক্রান্তীয় মরুভূমিতে 50^0 C র বেশি পর্যন্ত হয়। তবে উষ্ণ প্রস্রবন এবং গভীর সমুদ্রে উপস্থিত হাইড্রোথার্মাল ভেন্টগুলোর মতো এমন কিছু স্বতন্ত্র বাসস্থান রয়েছে যেখানে গড় তাপমাত্রা 100^0C এর বেশি হয়। সাধারণ জ্ঞান থেকে বলা যায় যে জার্মানি এবং কানাডার মতো নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোতে

আম গাছ জন্মায় না বা জন্মাতে পারে না, কেরালার জঙ্গালে তুষারচিতা দেখা যায় না এবং ক্রান্তীয় অক্ষাংশ পেরিয়ে গেলে সমুদ্রে টুনামাছ খুব কমই ধরা পড়ে। সজীব বস্তুর উপর তাপমাত্রার তাৎপর্য তোমরা তখনই অনুধাবন করতে পারবে যখন তোমরা এটা বুঝবে যে তাপমাত্রা উৎসেচক গতিবিদ্যাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে জীবের বিপাকীয় ক্রিয়া এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু কিছু জীব তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করে সফলভাবে বেঁচে থাকতে পারে (এদের ইউরিথার্মাল বলে) কিন্তু বেশিরভাগ জীব তাপমাত্রার অল্প পরিসরেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে (এদের স্টেনোথার্মাল জীব বলে)। বিভিন্ন প্রজাতির জীবের তাপ-সহিষ্ণুতার মাত্রা অনেকাংশেই তাদের ভৌগোলিক বিস্তার নির্ধারণ করে। তোমরা কি কয়েকটি ইউরিথার্মাল ও স্টেনোথার্মাল উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম ভাবতে পার?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার ধারাবাহিক বৃদ্ধি গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। (অধ্যায় 16) যদি এই ধারা চলতে থাকে তবে তোমরা কি এরূপ প্রত্যাশা করবে যে কিছু প্রজাতির বিস্তৃতির পরিসর ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

জল (water) ঃ জীবকে প্রভাবিত করে এমন অপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হল জল। বস্তুপক্ষে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি জলেই হয়েছিল এবং জল ছাড়া জীবনকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। মরুভূমিতে জলের পরিমাণ এতটাই সীমিত যে কেবলমাত্র বিশেষ অভিযোজন ছাড়া জীবের পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব। উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা এবং বিস্তৃতি ও মুখ্যত জলের উপর নির্ভরশীল। তোমরা হয়ত ভাবতে পার, যেসব জীব সমুদ্র হ্রদ, অথবা নদীতে বাস করে, তাদের জল সম্পর্কিত কোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় না, কিন্তু এটি ঠিক নয়। জলজ জীবদের ক্ষেত্রে জলের গুণমান (রাসায়নিকগঠন, ph) খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্তর্দেশীয় জলাশয়, সমুদ্র এবংকিছু কিছু অতিরিক্ত লবণাক্ত উপহ্রদগুলিতে লবণের ঘনত্ব (লবণাক্ততার পরিমাণ, পার্টস পার থাউজ্যান্ড এককে মাপা হয়) যথাক্রমে 5 এর চেয়ে কম, 30-35 এবং 100 র চেয়ে বেশি হয়। কিছু জীব বিস্তৃত পরিসরে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে (ইউরিহ্যালাইন) কিন্তু অন্যরা সংকীর্ণ পরিসরে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে (স্টেনোহ্যালাইন)। অনেক স্বাদু জলে বসবাসকারী প্রাণীরা সমুদ্রে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না এবং বিপরীতভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও স্বাদু জলে রাখলে একই ঘটনা ঘটে। এদের অভিস্রবণ জনিত সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় বলেই এরূপ ঘটনা ঘটে।

আলোক (Light) ঃ যেহেতু উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে, এই প্রক্রিয়াটি তখনই ঘটা সম্ভবপর হয় যখন শক্তির উৎস হিসেবে আলোক উপস্থিত থাকে, তাই সজীব বস্তু, বিশেষতঃ স্বভোজী উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে আলোকের গুরুত্ব আমরা দ্রুত বুঝতে পারি। বনভূমিতে বেড়ে উঠা ছোট উদ্ভিদগুলোর বহু প্রজাতি (বীরুৎ এবং গুল্ম) অত্যন্ত কম আলোকের উপস্থিতিতে সর্বোত্তমভাবে সালোকসংশ্লেষ করার জন্য অভিযোজিত হয়, কারণ এই উদ্ভিদগুলো সবসময় দীর্ঘ, আচ্ছাদনকারী বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করে। পুষ্প প্রস্ফুটনের জন্য আলোক পর্যায় বৃত্তির চাহিদা মেটাতেও বহু উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপর নির্ভরশীল হয়। বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোক এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এরা আলোকের তীব্রতা ও স্থিতিকাল (আলোক পর্যায়বৃত্তি) এ যে দৈনিক ও ঋতুগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে তাদের খাদ্য অন্বেষণ, প্রজনন ও পরিযাণজনিত কার্যকলাপের সময়কাল স্থির করার ক্ষেত্রে সূত্র হিসাবে কাজে লাগায়। স্থলভূমিতে আলোকের উপস্থিত তাপমাত্রার সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কারণ উভয়েরই উৎস সূর্য। কিন্তু সমুদ্রের গভীরের (> 500 মিটার) পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী জীব সূর্যের মতো শক্তির উৎসের অস্তিত্ব অনুভব করে না। তাহলে তাদের ক্ষেত্রে শক্তির উৎস কি? সৌর বিকিরণের বর্ণালীর গুণমান ও জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণালীর অতিবেগুণী রশ্মি বহু জীবের জন্য ক্ষতিকারক আবার দৃশ্যমান বর্ণালীর

সব রঙিন উপাদানই সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় বসবাসকারী উদ্ভিদদের কাছে পৌঁছায় না। সমুদ্রে বসবাসকারী লাল, সবুজ এবং বাদামি শৈবালদের মধ্যে কোন্‌টিকে সমুদ্রের গভীরতম স্থানে পাওয়া যায়? কেন?

মৃত্তিকা (Soil) ঃ বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার প্রকৃতি এবং ধর্ম বিভিন্ন ধরনের হয়। এটি জলবায়ু অবহবিকার প্রক্রিয়া, মৃত্তিকা স্থানান্তরিত না কি একই স্থানে থেকে যায়, এবং কিভাবে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় তার উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকার গঠন, মৃত্তিকা কণার আকার এবং সংযুক্তির মতো মাটির বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে। মৃত্তিকার P^H, খনিজ সংগঠন এবং ভূ-সংস্থানের মতো নির্ণায়কগুলো সহ এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকাংশে কোন্ অঞ্চলে কি ধরনের গাছপালা জন্মাবে তা নির্ধারণ করে। এটি পরবর্তীতে কোন্ ধরনের প্রাণী এই অঞ্চলে বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পেতে পারে তা নির্ধারণ করে। জলজ পরিবেশে অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য প্রায়শই কোনো ধরনের জলাশয়ের তলদেশে বসবাসকারী প্রাণীরা (benthic animal) ঐ পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে তা নির্ধারণ করে।

13.1.2 অজীবজ প্রভাবক গুলির প্রতি সাড়া (Responses to Abiotic Factors)

বহু বাসস্থানের অজীবীয় পরিবেশ সময়ের সাথে সাথে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এটা উপলব্ধি করার পর এখন আমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগে সেটি হল - ঐ ধরনের বাসস্থানে বসবাসকারী জীবসমূহ কিভাবে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয় অথবা এর মোকাবিলা করে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার পূর্বে সম্ভবত আমাদের মনে এই প্রশ্নটি আসতে পারে যে কেন এই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক পরিবেশ শেষ পর্যন্ত জীবসমূহকে প্রভাবিত করে। এটা আশা করা যায় যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের দেহে তুলনামূলকভাবে একটি স্থিতিশীল আভ্যন্তরীণ পরিবেশের (দেহের ভেতরে) সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সর্বাধিক ক্রিয়াশীলতার সাথে সব জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো চলতে পারছে এবং তাই টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রজাতির সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্থিতিশীলতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা এবং দেহতরলের অভিস্রবণ ঘনত্বের ক্ষেত্রে হতে পারে। বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রভাবে জীবের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও জীব তখন তার দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। (এই প্রক্রিয়াকে হোমিওস্ট্যাসিস বলে) এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটিকে পরিস্ফুট করার জন্য চল আমরা এই ধরনের একটি উপমার সাহায্য নিই। ধরে নেওয়া যাক একজন ব্যক্তি 25^0C তাপমাত্রায় তার সর্বাধিক দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ এবং এমনকি বাইরে প্রচণ্ড গরম বা অত্যন্ত ঠান্ডা হলেও সে তার দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখার চেষ্টা করে। বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে অথবা ভ্রমণকালে গাড়ির ভেতরে থাকাকালীন সময়ে এবং কর্মস্থলে গ্রীষ্মকালে শীততাপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র এবং শীতকালে হিটার ব্যবহারের মাধ্যমে সে এই কাজটি করতে পারে। এইরূপ হলে সে তার চারপাশের আবহাওয়া যাই হোক না কেন সর্বদাই সর্বাধিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে। এই ক্ষেত্রে তার অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা (homeostasis) বজায় রাখার কাজটি শারীরবৃত্তীয় উপায়ে না হয়ে কৃত্রিম উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে। কিভাবে অন্যান্য জীব এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে? চল আমরা সম্ভাবনাগুলি পর্যালোচনা করি। (চিত্র 13.3)

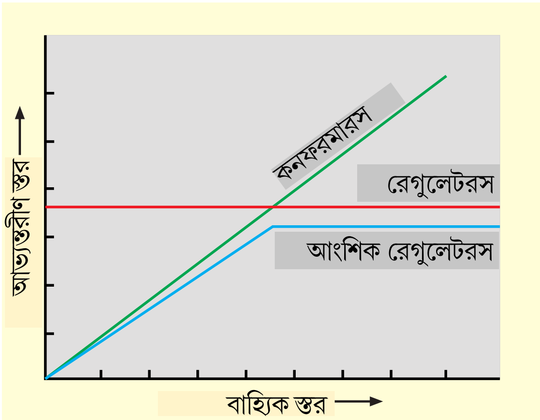

চিত্র 13.3 জীবের সাড়া প্রদানের চিত্ররূপ উপস্থাপন

(i) নিয়ন্ত্রণ (regulate) ঃ কিছু কিছু জীব শারীরবৃত্তীয় (মাঝে মাঝে আচরণগতও) প্রক্রিয়া যা দেহের অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রা, অপরিবর্তনীয় অভিস্রবণ ঘনত্ব ইত্যাদি সুনিশ্চিত করে তার সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বস্তুতপক্ষে সমস্ত পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অল্প সংখ্যক নিম্ন শ্রেণির মেরুদন্ডী প্রাণী এবং অমেরুদন্ডী প্রজাতিরাই এ ধরনের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম (তাপ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ থার্মোরেগুলেশন এবং অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অসমোরেগুলেশন)। অভিব্যক্তি নিয়ে গবেষণা করেন এমন জীববিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রধানত যে কারণে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সফলভাবে অভিযোজিত হতে পেরেছে তা হল এরা দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে এবং অ্যান্টার্কটিকা বা সাহারা মরুভূমি যেখানেই বসবাস করুক না কেন, সেখানে এরা টিকে থাকতে সমর্থ হয়।

মানুষ যে পদ্ধতিতে দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে, বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে। আমরা আমাদের দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (37^0C) বজায় রাখতে পারি। গ্রীষ্মকালে যখন পরিবেশের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, আমাদের প্রচুর ঘাম হয়। বাষ্পীভবনজনিত শীতলতার ফলে আমাদের দেহের তাপমাত্রা নামতে শুরু করে এবং এক্ষেত্রে যেভাবে ডেজার্ট কুলার কাজ করে, ঠিক সেভাবেই এই কাজটি সম্পন্ন হয়। শীতকালে যখন তাপমাত্রা 37^0C এর অনেক নীচে নেমে যায়, আমাদের দেহে কাঁপুনি শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, ফলস্বরূপ দেহ উষ্ণতা বেড়ে যায়। অন্যদিকে উদ্ভিদদেহে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বজায় রাখার এমন কোনো পদ্ধতি নেই।

(ii) অনুগমন (Conform) বিশাল সংখ্যক প্রাণী (99%) এবং প্রায় সকল উদ্ভিদ গোষ্ঠী তাদের দেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পারে না। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো এদের তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটে। জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক তরলের অভিস্রবণ ঘনত্বের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো দেহের অভ্যন্তরীণ তরলের অভিস্রবণ ঘনত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। এই সব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শুধুই অনুগামী বা কনফরমার বলে। জীবের স্থিতিশীল আভ্যন্তরীণ অবস্থা বজায় রাখার সুবিধা বিবেচনা করলে আমাদের মনে অবশ্যই এই প্রশ্নটি আসবে যে কেন এই অনুগামীরা বিবর্তিত হয়ে নিয়ন্ত্রক জীবে পরিণত হল না। উপরে উল্লিখিত মানুষের উপমাটি মনে কর — সর্বাধিক পছন্দের হওয়া সত্ত্বেও কতজন ব্যক্তি বাতানুকূল যন্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখতে পারে? অনেকেই সহজ পদ্ধতিতে ঘর্ম নিঃসরণের মাধ্যমে দেহ উষ্ণতা বজায় রাখে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সর্বাধিক কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে না। বহু জীবের জন্য তাপ নিয়ন্ত্রণ একটি অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়কারী প্রক্রিয়া। বিশেষ করে ছুঁচো জাতীয় প্রাণী অথবা হামিংবার্ডের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে তাপ গ্রহণ এবং তাপ মোচন করা উভয় প্রক্রিয়াই হল দেহের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের কাজ। যেহেতু ছোট ছোট প্রাণীদের আয়তনের তুলনায় দেহের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অনেকটাই বেশি হয়, তাই বহিঃপরিবেশ শীতল হলে অত্যন্ত দ্রুত তারা দেহতাপ মোচনের প্রবণতা দেখায় এবং দেহ উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য তাদের প্রচুর শক্তি খরচ করতে হয়, যা বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে আসে। প্রধানতঃ এই কারণেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীদের মেরু অঞ্চলে প্রায় দেখাই যায় না। বিবর্তনকালে জীবদেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার উপযোগিতা এবং মূল্য উভয়েই বিবেচ্য বিষয়। কিছু প্রজাতি কেবলমাত্র পরিবেশীয় অবস্থার সংকীর্ণ পরিসরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে, অন্যরা শুধুই অনুগামী বা কমফর্ম রূপে রয়ে গেছে।

যদি প্রতিকূল বাহ্যিক পরিস্থিতি স্থানীয় হয় বা কেবলমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য হয় তবে জীবদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আরও দুটি বিকল্প উপায় রয়েছে।

(iii) পরিযান করা (Migrate) **ঃ** জীব সাময়িকভাবে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে তুলনামূলক আরামদায়ক পরিবেশে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে পুনরায় পূর্বের জায়গায় ফিরে আসতে পারে। মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় অনেকটা যেন গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে দিল্লি থেকে সিমলা বেড়াতে যাওয়া। অনেক প্রাণী বিশেষতঃ পাখিরা শীতের সময় দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক পরিবেশে পরিযান করে। প্রতি বছর শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া এবং উত্তর মেরু থেকে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি রাজস্থানের keolado জাতীয় উদ্যানে (ভরতপুর) অতিথি পাখি হিসেবে আসে।

(iv) স্থগিত রাখা (Suspend) **ঃ** ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এবং নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট রেণু উৎপন্ন হয় যেগুলো তাদের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অনুকূল পরিবেশের উপস্থিতিতে এই রেণুগুলি অঙ্কুরিত হয়। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে বীজ এবং আরও কিছু অঙ্গজ জনন অঙ্গ বংশ বিস্তারের পাশাপাশি, উদ্ভিদকে প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে উঠতেও সাহায্য করে। অনুকূল আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং নতুন গাছ জন্মায়। তারা তাদের বিপাকীয় ক্রিয়ার হার হ্রাস করার মাধ্যমে এইরূপ কাজ করে এবং সুপ্তাবস্থায় প্রবেশ করে।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে, যে সব জীব পরিযানে অক্ষম তারা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঐ সময়টিকে এড়িয়ে যায়। সময়কে এড়ানোর একটি সুপরিচিত উদাহরণ হল শীতকালে ভালুকের শীতঘুমে যাওয়া। কিছু কিছু শামুক এবং মাছ গরমকাল জনিত সমস্যা যেমন তাপ এবং শুষ্কতা এড়ানোর জন্য গ্রীষ্মকালীন ঘুম বা এস্টিভেশনে যায়। প্রতিকূল পরিবেশে পুকুর ও হ্রদে বসবাসকারী বহু জুপ্লাঙ্কটন প্রজাতি ডায়াপজ দশায় প্রবেশ করে এবং এই দশায় তাদের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে।

13.1.3 অভিযোজন (adaptation)

প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলার জন্য জীবসমূহের কাছে যে বিকল্প উপায়গুলি রয়েছে তা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু জীব তাদের কিছু নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সমর্থ হয় এবং অন্যান্যরা আচরণগত পরিবর্তনের (তুলনামূলক অনুকূল পরিবেশে পরিযানের মাধ্যমে) এই কাজটি করে থাকে। এইসব প্রতিক্রিয়াগুলিই প্রকৃতপক্ষে তাদের অভিযোজন। তাই আমরা বলতে পারি যে অভিযোজন হল জীবের এমন একটি ধর্ম (অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, আচরণগত) যা জীবসমূহকে তার বাসস্থানে টিকে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। দীর্ঘ বিবর্তনকাল ধরে বহু অভিযোজনের উদ্ভব ঘটেছে এবং এগুলি জীনগতভাবে স্থায়ী হয়। জলের পরিবেশীয় উৎসের অনুপস্থিতিতে উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে বসবাসকারী ক্যাঙারু-ইঁদুর দেহের অভ্যন্তরে ফ্যাট জারণের মাধ্যমে (যেখানে জল একটি উপজাত পদার্থ) তার সমস্ত রকম জলের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়। এই প্রাণীটির মূত্রের ঘনত্ব বৃদ্ধি করারও ক্ষমতা রয়েছে যারফলে রেচন পদার্থ অপসারণের জন্য ন্যূনতম জল ব্যবহৃত হয়।

বহু জঙ্গাল উদ্ভিদের পাতার উপরিতলে পুরু কিউটিকলের আস্তরণ থাকে এবং এদের পত্ররন্ধ্র পাতার গভীরে প্রোথিত থাকে (Sunken) যাতে প্রস্বেদনের সময় জলের অপচয় কম হয়। এদের দেহে একটি বিশেষ সালোকসংশ্লেষীয় পথও রয়েছে (CAM) যে কারণে এরা দিনের বেলা তাদের পত্ররন্ধ্রগুলোকে বন্ধ রাখতে পারে। ফণীমনসার মতো কিছু জঙ্গাল উদ্ভিদের পাতা থাকে না কারণ এদের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয় এবং এদের চ্যাপ্টা কাণ্ডেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি ঘটে।

তাপের অপচয় হ্রাস করার জন্য শীত প্রধান অঞ্চলে বসবাসকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কান এবং প্রত্যঙ্গগুলি সাধারণতঃ খর্বাকার হয়। [একে বলে অ্যালেনের সূত্র (Allen's Rule)] মেরু অঞ্চলে সমুদ্রে বসবাসকারী সীল মাছের মতো জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ত্বকের নীচে পুরু ফ্যাটের আস্তরণ (ব্লাবার) থাকে যা অন্তরক হিসেবে কাজ করে, যার ফলে দেহ থেকে তাপ মোচন হ্রাস পায়।

কিছু কিছু জীবে শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যার জন্য এরা দ্রুত প্রতিকূল পরিবেশে সাড়া দিতে পারে। যদি তোমরা কখনও কোনো সুউচ্চ স্থান (> 3500 মি) যেমন মানালীর নিকটস্থ রোটাংপাস এবং লেহ্‌তে যাওয়া তাহলে তোমাদের অবশ্যই এক ধরনের শারীরিক সমস্যা জনিত অভিজ্ঞতা হবে, তাকে পর্বতপীড়া (Altitude sickness) বলে। এর লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, ক্লান্তি এবং বুক ধড়ফড় করা। এর কারণ হল এই যে অধিক উচ্চতার কারণে সেখানে বায়ুর চাপ কম হয় এবং শরীর যথেষ্ট অক্সিজেন পায় না। কিন্তু ক্রমশঃ তোমরা ওই পরিবেশে ধাতস্থ হয়ে যাবে ও পর্বতপীড়ার লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হবে এবং একে আবহ-সহিষ্ণুতা (acclimatization) বলে। কিভাবে তোমার দেহ এই সমস্যাটি সমাধান করল? লোহিত কনিকার উৎপাদন বৃদ্ধি, হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হওয়ার আসক্তি হ্রাস এবং শ্বাসক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমাদের দেহ কম পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতি জনিত সমস্যাটি সমাধান করে। বহু জনগোষ্ঠী হিমালয়ের সুউচ্চ স্থানে বাস করে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের দেহে সমতলে বসবাসকারী লোকদের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোহিত কনিকা (অথবা মোট হিমোগ্লোবিন) থাকে কিনা তা খুঁজে বের কর।

অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিপাকীয় বিক্রিয়া এবং তার জন্য সমস্ত শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ তাপমাত্রার একটি সংকীর্ণ পরিসরে সর্বোত্তমভাবে ঘটে। (মানুষের ক্ষেত্রে এটি 37^0C) কিন্তু এরকম জীবানুও রয়েছে (আর্কিব্যাকটিরিয়া) যারা উষ্ণ প্রস্রবণ এবং সমুদ্র গভীরের হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট (nydrothermal vent) যেখানে তাপমাত্রা 100^0C এর অনেকটাই বেশি সেখানেও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে ও বেড়ে উঠে। কিভাবে এটি সম্ভব হয়?

অনেক মাছ অ্যান্টার্কটিকার সমুদ্র জলে টিকে থাকতে পারে, যেখানে তাপমাত্রা সর্বদা 0^0C এর ও কম থাকে। তারা কিভাবে দেহতরলকে ঠান্ডায় জমে যাওয়া রোধ করে? বহু সামুদ্রিক অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং মৎস্য সমুদ্রের অনেক গভীরে বাস করে যেখানে বায়ুর চাপ, যে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীর চাপ আমরা অনুভব করি, তার চেয়ে 100 গুণ বেশি হতে পারে। তারা কি ভাবে এই রূপ উচ্চ চাপযুক্ত অঞ্চলে বেঁচে থাকে এবং এদের দেহে কি বিশেষ কোনো উৎসেচক রয়েছে? এ ধরনেরপ্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী জীবদের দেহে জৈব রাসায়নিক অভিযোজনের একটি চমৎকার বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

কিছু জীব আচরণগত সাড়া প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা যে শারীরবৃত্তীয় ক্ষমতাবলে তাদের পরিবেশীয় উচ্চ তাপমাত্রা মোকাবিলা করতে পারে মরুভূমিতে বসবাসকারী টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের সেই ক্ষমতা থাকে না, বরং মরুভূমিতে বসবাসকারী এই প্রাণীরা আচরণগত উপায়ে তাদের দেহের তাপমাত্রা মোটামুটি স্থিতিশীল রাখে। তাদের দেহের তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তার থেকে নিচে নেমে গেলে এরা রোদে শুয়ে থাকে এবং তাপ শোষণ করে আবার যখন পরিবেশীয় তাপামাত্রা বাড়তে শুরু করে তখন তারা ছায়াশীতল স্থানে চলে যায়। কিছু প্রজাতির জীব আবার ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং লুকোনোর জন্য গর্ত খুঁড়ে মাটির ভেতরে চলে যেতে সমর্থ হয়।

13.2 জীবসংখ্যা বা পপুলেশন (Populations)

13.2.1 পপুলেশনের বিশেষত্ব (Population Altributes)

প্রকৃতিতে যে কোনো প্রজাতির বিচ্ছিন্ন একক জীবকে খুব কমই পাওয়া যায়, এর মধ্যে অধিকাংশ জীবই একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে একই ধরনের সম্পদ ভাগ করে নেয়, নিজেদের মধ্যে একই ধরনের সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, নিজেদের মধ্যে আন্তঃপ্রজননে সক্ষম হয় এবং এভাবেই একটি পপুলেশন গঠিত হয়। যদিও আন্তঃপ্রজনন বলতে যৌন জননকেই বোঝায়

তবে এমনকি অযৌন জননের ফলে উৎপন্ন জীবগোষ্ঠীকেও সাধারণতঃ বাস্তব্যবিদ্যা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে পপুলেশন রূপে গণ্য করা হয়। জলাভূমিতে বসবাসকারী সকল পানকৌড়ি, পরিত্যক্ত স্থানে বসবাসকারী ইঁদুর, বিস্তৃত বনভূমিতে বেড়ে উঠা শালগাছ, পালন প্লেটের ব্যাকটিরিয়া, পুকুরে জন্মানো পদ্মগাছ — এগুলি হল পপুলেশনের কিছু উদাহরণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ যে যদিও একক জীব বলতে সেই জীবকে বোঝায় যাকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হয়, তবুও পপুলেশন স্তরেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করে এবং কাঙ্ক্ষিত প্রলক্ষণসমূহের উদ্ভব ঘটে। পপুলেশন বাস্তব্যবিদ্যাকে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রূপে গণ্য করা হয় কারণ এটি বাস্তব্যবিদ্যার সঙ্গে পপুলেশন বংশগতি ও বিবর্তনের সংযোগ সাধন করে।

একটি পপুলেশনের এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা একক জীবের দেখা যায় না। একক জীবের ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ এবং মৃত্যু বরণ ঘটে কিন্তু একটি পপুলেশনের ক্ষেত্রে একে জন্মহার এবং মৃত্যু হার রূপে প্রকাশ করা হয়। একটি পপুলেশনে এই হারগুলো বলতে মাথাপিছু জন্মহার এবং মৃত্যুহারকে বোঝায়। তাই এই হার বলতে পপুলেশনের মোট সদস্যসংখ্যার সাপেক্ষে সংখ্যার এই পরিবর্তনকে বোঝায় (সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা সংখ্যা হ্রাস)। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল। যদি একটি পুকুরে গত বছর 20টি পদ্ম গাছ থেকে থাকে এবং বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে 8 টি নূতন গাছ যুক্ত হয় তাহলে পদ্মগাছের বর্তমান মোট পপুলেশন হবে 28। জন্মহার গণনা করলে আমরা পাব 8/20=0.4 অপত্য গাছ প্রতি পদ্মগাছ প্রতি বছর। পরীক্ষাগারে ফলমাছির পপুলেশন 40 হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, ধরি এক সপ্তাহে, 4টি ফল মাছির মৃত্যু ঘটলে ঐ নির্দিষ্ট সময়কালে ফলমাছির পপুলেশনে মৃত্যু হার হবে 4/40=0.1 একক জীব প্রতি ফলমাছি প্রতি সপ্তাহ।

কোনো পপুলেশনের আর একটি বিশেষত্ব হল লিঙ্গ অনুপাত (Sen ratio)। একটি একক জীবের ক্ষেত্রে জীবটি পুরুষ জীব অথবা স্ত্রী জীব হতে পারে কিন্তু একটি পপুলেশনের ক্ষেত্রে একে লিঙ্গ অনুপাত দ্বারা প্রকাশ করা হয় (যেমন পপুলেশনের 60% হল স্ত্রী জীব এবং 40% হল পুরুষ জীব)।

যে কোনও প্রদত্ত সময়ে একটি পপুলেশন বিভিন্ন বয়সী সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। যদি পপুলেশনের জন্য বয়সের বিস্তারকে (একটি নির্দিষ্ট বয়স অথবা বয়সসীমার মধ্যে প্রাপ্ত একক জীবের শতকরা হার) একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাহলে যে গঠনটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বয়সভিত্তিক পিরামিড বা (age pyramid) (চিত্র 13.4)। মানুষের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বয়স ভিত্তিক পিরামিডগুলো সাধারণত একটি চিত্রের সাহায্যে পুরুষ এবং স্ত্রী প্রাণীর বয়সভিত্তিক বিস্তার প্রদর্শন করে। পিরামিডের আকৃতি জনসংখ্যার বৃদ্ধির ধরনকে প্রতিফলিত করে যেমন a) এটি বর্ধনশীল কিনা b) স্থিতিশীল কিনা c) ক্রম হ্রাসমান কিনা।

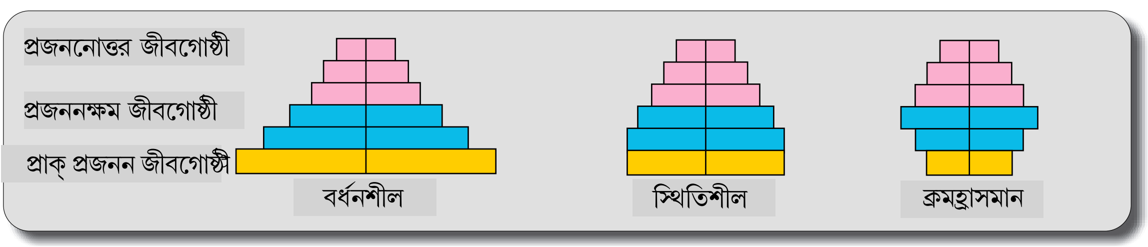

চিত্র 13.4 মানুষের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক পিরামিডের উপস্থাপন

একটি পপুলেশনের আকার বাসস্থানে ওই জীবের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অনেক কিছু অবহিত করে। কোনো পপুলেশনে আমরা যেসব বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোকে অনুসন্ধান করতে চাই, এগুলি অন্য প্রজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার বহিঃপ্রকাশই হোক, শিকারি প্রাণীর প্রভাব হোক কিংবা কীটনাশক ব্যবহারের প্রভাব হোক,

আমরা সর্বদাই পপুলেশনের আকারের যে কোনোরকম পরিবর্তনের ভিত্তিতেই এর মূল্যায়ন করে থাকি। প্রকৃতিতে এর আকার <10 হতে পারে (প্রতি বছর ভরতপুরের জলাভূমিতে সাইবেরিয়ান ক্রেন এর সংখ্যা) অথবা লক্ষ লক্ষ হতে পারে (পুকুরে বসবাসকারী ক্ল্যামাইডোমোনাস)। পপুলেশনের আকারকে, যাকে পদ্ধতিগতভাবে পপুলেশন ঘনত্ব (একে N এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়) বলা হয় তা কেবলমাত্র সংখ্যার মাধ্যমে গণনা করা আবশ্যিক নয়। যদিও জীবের মোট সংখ্যা সাধারণত পপুলেশন ঘনত্ব পরিমাপের জন্য সর্বাপেক্ষা সঠিক উপায় তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি নিরর্থক অথবা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। একটি অঞ্চলে যদি 200 টি পার্থেনিয়াম উদ্ভিদ এবং বিশাল আচ্ছাদনকারী একটি বৃহৎ বটগাছ থাকে তাহলে বলা হবে যে পার্থেনিয়ামের তুলনায় বটগাছের পপুলেশন ঘনত্ব কম এবং এইভাবে বিবেচনা করলে ওই জীবজ সম্প্রদায়ে বটগাছের ব্যাপক ভূমিকার অবমূল্যায়ন করা হবে। এই রূপ অবস্থায় শতকরা আচ্ছাদনের পরিমাণ (% কভার) বা বায়োমাস পপুলেশনের আকার পরিমাপের ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থবহ। যদি পপুলেশন বৃহদাকারের হয় এবং গণনা করা অসম্ভব হয় কিংবা পদ্ধতিটি খুবই সময়সাপেক্ষ হয় তাহলেও মোট সংখ্যা নির্ণয় করার মতো পদ্ধতি অবলম্বন করাও আবার সহজসাধ্য হয় না। যদি তোমরা পরীক্ষাগারে পেট্রিডিসে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া চাষ করো তাহলে এই প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার ঘনত্ব নির্ণয়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি কোন্‌টি হবে? কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু বাস্তুতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পপুলেশন ঘনত্বের পরম মান জানার প্রয়োজনীয়তা থাকে না বরং আপেক্ষিক ঘনত্বের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে ও উদ্দেশ্য সাধন করা সমানভাবে সম্ভবপর হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতিবার জালে যত সংখ্যক মাছ ধরা পড়ে, তা জলাশয়ে মাছের ঘনত্ব নির্ণয়ের একটি যথেষ্ট ভাল পদ্ধতি। আমরা বেশির ভাগ সময় কোনো পরিবেশে, প্রকৃত অর্থে জীবের সংখ্যা গণনা না করে বা তাদের পর্যবেক্ষণ না করে পরোক্ষ পদ্ধতিতে পপুলেশনের আকার পরিমাণ করে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্যান এবং ব্যাঘ্র সংরক্ষণ করা হয় এমন অরণ্যগুলোতে প্রায়শই বাঘের পায়ের ছাপ অথবা মলের গুটিগুলোর উপর ভিত্তি করে টাইগার সেনসাস অর্থাৎ বাঘের সংখ্যা গণনা করা হয়।

13.2.2 জীবসংখ্যা বৃদ্ধি বা পপুলেশন বৃদ্ধি (Population Growth)

যে কোনো প্রজাতির জন্য পপুলেশনের আকার কোনো স্থিতিশীল মানদণ্ড নয়। খাদ্যের যোগান, শিকারি প্রাণীর শিকার জনিত চাপ এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহ বিভিন্ন প্রভাবকের উপর নির্ভর করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পপুলেশনের আকার পরিবর্তিত হয়। বস্তুতপক্ষে এটি হল পপুলেশন ঘনত্বের সেই পরিবর্তন, যা থেকে পপুলেশনে কি ঘটছে, অর্থাৎ পপুলেশন বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে, আমরা সে সম্পর্কিত কিছু ধারণা লাভ করতে পারি। চূড়ান্ত কারণ যাই হোক না কেন প্রদত্ত সময়কালে একটি প্রদত্ত বাসস্থানে পপুলেশনের ঘনত্ব মূলত চারটি মৌলিক প্রক্রিয়ায় ঘটা পরিবর্তনের কারণে উঠানামা করে। এই চারটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি প্রক্রিয়ায় (জন্মহার এবং অভিবাসন) পপুলেশনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বাকি দুটি প্রক্রিয়ায় (মৃত্যুহার ও প্রবাসন) পপুলেশন ঘনত্ব হ্রাস পায়।

I. জন্মহার বলতে একটি প্রদত্ত সময়কালে কোনো পপুলেশনে যত সংখ্যক অপত্য জীব উৎপন্ন হয় এবং পপুলেশনের প্রাথমিক ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তাকে বোঝায়।

II. মৃত্যুহার বলতে প্রদত্ত সময়কালে কোনো পপুলেশনে মোট যত সংখ্যক জীবের মৃত্যু ঘটে তা বোঝায়।

III. অভিবাসন বলতে একই প্রজাতিভুক্ত সেই জীব সংখ্যাকে বোঝায় যারা বিবেচনাধীন সময়কালে অন্য কোনো স্থান থেকে একটি বাসস্থানে এসেছে।

IV. প্রবাসন বলতে কোনো পপুলেশনের সেই জীবসংখ্যাকে বোঝায় যারা বিবেচনাধীন সময়কালে ঐ বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে।

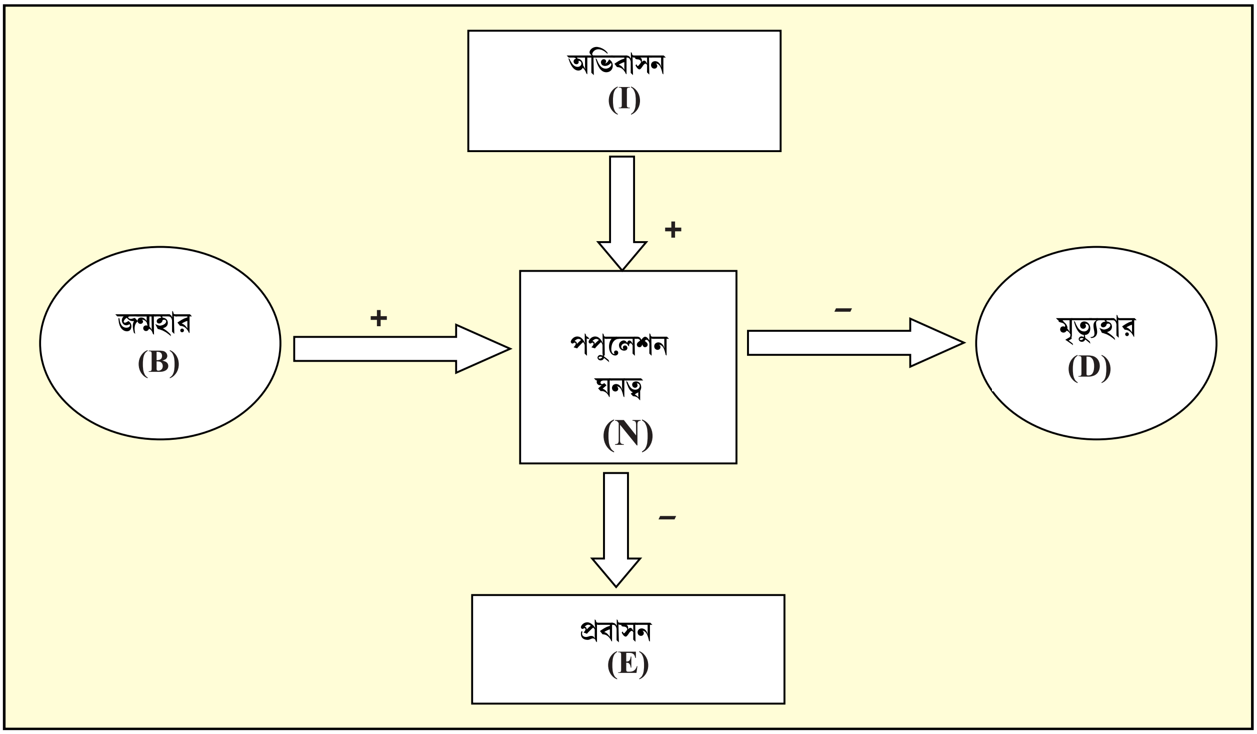

চিত্র 13.5

সুতরাং 't' সময়ে যদি পপুলেশন ঘনত্ব 'N' হয় তবে t+I সময়ে পপুলেশন ঘনত্ব হবে —

$$N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$$

উপরোক্ত সমীকরণ থেকে তোমরা দেখতে পাও যে যদি জন্ম হয়েছে এমন জীবের সংখ্যা এবং অভিবাসনকারী জীবের সংখ্যার যোগফল (B+I), মৃত্যু ঘটেছে এমন জীবের সংখ্যা এবং প্রবাসনকারী জীবের সংখ্যার যোগফলের (D+E) চেয়ে বেশি হয়, তাহলে পপুলেশন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় পপুলেশন ঘনত্বকে প্রভাবিত করে এমন দুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হলো জন্মগ্রহণকারী এবং মৃত্যুবরণকারী জীবের সংখ্যা। কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থাতেই পপুলেশনের বাকি দুটি প্রভাবক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি নতুন বাসস্থান, যেখানে সদ্য কলোনি গঠিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে জন্মহারের চাইতেও অভিবাসন, পপুলেশন বৃদ্ধিতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

বৃদ্ধি মডেল সমূহ (Growth Models)ঃ সময়ের সঙ্গে পপুলেশনের বৃদ্ধি কি কোনো নির্দিষ্ট এবং অনুমানযোগ্য ধরন প্রদর্শন করে? আমরা আমাদের দেশের জনসংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধি এবং তার ফলে উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং এই জন্য প্রকৃতিতে বিভিন্ন জীব পপুলেশনে ও এরকম বৃদ্ধি ঘটে কি না কিংবা এই বৃদ্ধির উপর কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহলী হয়ে উঠা স্বাভাবিক। পপুলেশন বৃদ্ধি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সে সম্পর্কিত সম্ভবত দু' একটি পাঠ আমরা প্রকৃতি থেকে নিতে পারি।

(i) ***সূচকীয় বৃদ্ধি (Exponential Growth)ঃ*** কোনো পপুলেশনের লাগামহীন বৃদ্ধির জন্য সম্পদের (খাদ্য এবং বাসস্থান) যোগান অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ একটি পরিবেশে যখন কোনো বাসস্থানে সম্পদের যোগান অসীম থাকে, তখন প্রতিটি প্রজাতি নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির সহজাত ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়, যা ডারউইন তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তখন পপুলেশন সূচকীয় অথবা

জ্যামিতিক নিয়মে বৃদ্ধি লাভ করে। যদি 'N' আকার বিশিষ্ট একটি পপুলেশনে জন্মহার (মোট সংখ্যা নয়, মাথাপিছু জন্মানো জীবের সংখ্যা) 'b' দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং মৃত্যুহার (পুনরায় মাথাপিছু মৃত্যুবরণকারী জীবের সংখ্যা) 'd' দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে 't' একক সময়কালে (dN/dT) N এর অর্থাৎ পপুলেশনের আকারের বৃদ্ধি বা হ্রাস নিম্নরূপ হবে।

$$dN/dt = (b-d)xN$$

ধরা যাক $(b-d)=r$, তবে

$$dN/dt=rN$$

এই সমীকরণে 'r' হল স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা (intrinsic rate of natural increase) এবং এটি পপুলেশন বৃদ্ধির উপর কোনো জীবজ এবং অজীবজ প্রভাবকের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য গৃহীত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।

তোমাদের 'r' এর মানের বিস্তার সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য নীচের উদাহরণগুলো দেওয়া হল। নরওয়ে ইঁদুরের জন্য r এর মান ছিল 0.015 এবং ময়দার পোকার জন্য এটির মান 0.12।

1981 সালে ভারতের জনসংখ্যার জন্য 'r' এর মান ছিল 0.0205। ভারতের জনসংখ্যায় r এর বর্তমান মান কত হবে তা খুঁজে বের করো।

উপরোক্ত সমীকরণটি একটি পপুলেশনের সূচকীয় এবং জ্যামিতিক বৃদ্ধির ধরন বর্ণনা করে (চিত্র 13.6), এবং যখন আমরা N কে সময়ের সাপেক্ষে লেখচিত্রে স্থাপন করি তখন 'J' আকৃতির লেখচিত্র পাই। তোমরা যদি ক্যালকুলাসের মূল ধারণার সঙ্গে পরিচিত থাকো, তবে তোমরা সূচকীয় বৃদ্ধির সমীকরণের নিম্নলিখিত সমাকলিত রূপটি বের করতে পারবে।

$$N_t = N_0 e^{rt}$$

যেখানে

N_t	=	সময় পর পপুলেশনের ঘনত্ব
N_0	=	শূন্য সময়ে পপুলেশনের ঘনত্ব
r	=	স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা
e	=	স্বাভাবিক লগারিদমের ভূমি (2.71828)

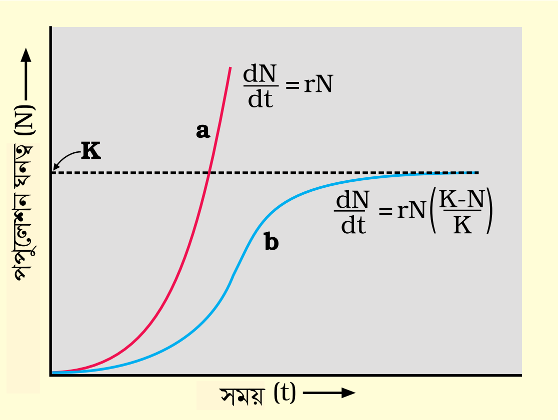

চিত্র 13.6 পপুলেশন বৃদ্ধি লেখচিত্র
- **a.** যখন প্রতিক্রিয়াগুলি বৃদ্ধিকে সীমিত করে না, লেখচিত্রটি সূচকীয়
- **b.** যখন প্রতিক্রিয়াগুলো বৃদ্ধিকে সীমিত করে, লেখচিত্রটি লজিস্টিক
- **k.** অক্ষর দ্বারা বহন ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে।

পরিবেশে অসীম সম্পদের উপস্থিতিতে সূচকীয় হারে বৃদ্ধি ঘটে, এমন প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করতে পারে। ডারউইন দেখিয়েছেন কিভাবে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায় এমন প্রাণীর সংখ্যাও কোনোরূপ বাধার অনুপস্থিতিতে বিশাল সংখ্যায় পৌঁছতে পারে। যখন সূচকীয় বৃদ্ধি ঘটে তখন কিভাবে একটি বিশাল পপুলেশন দ্রুত গড়ে উঠতে পারে তা সচরাচর বিবৃত নিম্নোক্ত ছোট গল্পটিতে নাটকীয়ভাবে দেখানো হয়েছে।

এক রাজা এবং মন্ত্রী দাবা খেলতে বসেছিলেন। জেতার ব্যাপারে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী রাজা মন্ত্রীর দেওয়া যে কোনো শর্ত মেনে নিতে রাজি ছিলেন। মন্ত্রী সবিনয়ে বললেন যদি তিনি জেতেন তিনি মাত্র কয়েকটি গমের দানা নেবেন। যার পরিমাণ দাবার বোর্ডের প্রথম ঘরে 1 টি দ্বিতীয় ঘরে 2 টি, তৃতীয় ঘরে 4 টি চতুর্থ ঘরে 8 টি, এভাবে প্রতিটি ঘরে পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ গমের দানা রেখে 64 টি বর্গক্ষেত্র পূর্ণ করতে হবে। রাজা আপাতভাবে দেখতে অতি সাধারণ এই শর্তে সম্মত হলেন এবং খেলা শুরু করলেন।

এবং রাজার দুর্ভাগ্য এই যে মন্ত্রী এই খেলায় জিতে গিয়েছিলেন। রাজা ভেবেছিলেন যে মন্ত্রী যে বাজি ধরেছিলেন তা পূরণ করা খুবই সহজ। রাজা দাবার বোর্ডের প্রথম বর্গাকার ক্ষেত্রে একটি শস্যদানা দিয়ে বাজির শর্ত পূরণ করতে শুরু করেছিলেন এবং মন্ত্রীর প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাকি বর্গাকার ঘরগুলোও পূরণ করতে থাকেন। যেই মুহূর্তে রাজা দাবার বোর্ডের মোট বর্গাকার ঘরের অর্ধেক শস্যদানা দ্বারা পূরণ করলেন। সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সারা রাজ্যে উৎপাদিত সমস্ত গমের দানা একত্র করলেও তা দিয়ে 64 টি বর্গক্ষেত্রের সবকয়টি পূরণ করা সম্ভব হবে না। এবার একটি ক্ষুদ্র প্যারামেসিয়ামের কথা ভাবো যে একটি একক জীব থেকে জীবন শুরু করে দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে প্রতিদিনে দ্বিগুণ হয়, তাহলে কল্পনা করো, 64 দিন পর এর পপুলেশনের আকার আমাদের কিরকম চমকে দেবে (তবে খাদ্যের যোগান এবং স্থান অসীম থাকতে হবে)।

III. ***লজিস্টিক বৃদ্ধি (Logistic Growth) ঃ*** প্রকৃতিতে কোনো একটি প্রজাতির কোনো পপুলেশনেরই সূচকীয় বৃদ্ধি ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান পরিবেশে অসীম থাকে না এর ফলে এই সীমিত সম্পদের জন্য জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত 'যোগ্যতম' জীবই টিকে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। বহু দেশের সরকারও এই ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নানাবিধ বাধা আরোপ করেছেন। প্রকৃতিতে একটি প্রদত্ত বাসস্থানে সর্বাধিক সংখ্যক জীবকে সহায়তা প্রদান করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে; এরপর আর বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না। চল আমরা ঐ বাসস্থানে ঐ প্রজাতির জন্য এই সর্বোচ্চ সীমাকে প্রকৃতির বহন ক্ষমতা বা carrying capacity (k) রূপে চিহ্নিত করি।

কোনো বাসস্থানে যেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেখানে বেড়ে উঠা পপুলেশন প্রথম অবস্থায় 'ল্যাগ দশা' প্রদর্শন করে তারপর একে একে বৃদ্ধি দশা, মন্থর দশা এবং শেষ পর্যন্ত অ্যাসিমটোট পর্যায়ে আসে, যখন পপুলেশন ঘনত্ব বহন ক্ষমতার স্তরে পৌঁছায়। পপুলেশন ঘনত্ব 'N' কে সময়ের (t) সাপেক্ষে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে একটি 'সিগময়েড' কার্ভ পাওয়া যায়। এই ধরনের পপুলেশনের বৃদ্ধিকে বলা হয় ভারহালস্ট পার্ল লজিস্টিক গ্রোথ (Verhulst Pearl logistic growth) (চিত্র 13.6) এবং একে নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হল।

$$dN/dt=rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$$

সেখানে N = 't' সময়ে পপুলেশন ঘনত্ব

r = স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা

k = বহন ক্ষমতা

যেহেতু বেশির ভাগ প্রাণীর পপুলেশনের বৃদ্ধির জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বা কিছুটা সময় পর আরও সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে তাই লজিস্টিক বৃদ্ধির মডেলকেই অধিকতর বাস্তবসম্মত বলে গণ্য করা হয়। সরকারি জনগণনা তথ্য থেকে গত100 বছরের ভারতের জনসংখ্যা কত ছিল তা সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর এবং কোন্ ধরনের বৃদ্ধির ধরন পাওয়া যাচ্ছে তা যাচাই কর।

13.2.3 জীবের জীবন ইতিহাসের বৈচিত্র্য ঃ (Life History Variation)

কোনো পপুলেশন যে বাসস্থানে বাস করে, সেখানে সে তার সর্বোচ্চ জননগত সক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়, যাকে ডারউইনীয় দক্ষতাও বলা হয়ে থাকে (উচ্চ r এর মান যুক্ত)। নির্দিষ্ট

একগুচ্ছ নির্বাচনজনিত চাপের কারণে জীবদেহে সর্বোচ্চদক্ষতায় বংশবৃদ্ধি করার কৌশলগুলির প্রকাশ ঘটে। কিছু জীব তাদের জীবনকালে কেবলমাত্র একবার প্রজনন করে (প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্যালমন মাছ, বাঁশ) আবার কিছু জীব সারাজীবনে বহুবার প্রজনন করে (বেশিরভাগ পক্ষী ও স্তন্যপায়ী)। কিছু প্রাণী ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট বহু সংখ্যক অপত্যের জন্ম দেয় (অয়েস্টার এবং প্যালাজিক মাছ) যেখানে অন্য প্রাণীরা বৃহৎ আকার বিশিষ্ট স্বল্প সংখ্যক অপত্যের জন্ম দেয় (পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী)। তাই চূড়ান্ত দক্ষতার বিকাশের জন্য কোন্‌টি কাম্য ? বাস্তব্যবিদ্যা-বিশেষজ্ঞদের মতে, জীব যে পরিবেশে বসবাস করে সেখানকার জীবজ ও অজীবজ উপাদনগুলোর দ্বারা সৃষ্ট বাধাসমূহের ভিত্তিতেই জীবের জীবনকালে দৃষ্ট প্রলক্ষণসমূহের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির জীবে জীবনকালে দৃস্ট প্রলক্ষণসমূহের বিবর্তন বর্তমান সময়ে বাস্তব্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

13.2.4 পপুলেশন আন্তঃক্রিয়াসমূহ ঃ (Population Interactions)

তুমি কি পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাকৃতিক বাসস্থানের কথা কল্পনা করতে পার যেখানে শুধুমাত্র একটি প্রজাতির জীব বাস করে ? পৃথিবীতে এরকম কোনো বাসস্থান নেই এবং এমনকি এরকম কোনো পরিস্থিতির কথা ও ভাবা যায় না। কোনো একটি প্রজাতির টিকে থাকার জন্য কমপক্ষে আরও একটি প্রজাতির উপস্থিতি প্রয়োজন যার উপর এটি খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে পারে। এমনকি একটি উদ্ভিদ প্রজাতি, যে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে, সেটিও একা বাঁচতে পারে না, তারও মাটিতে উপস্থিত জৈব বস্তুকে ভেঙে শোষণ উপযোগী অজৈব পরিপোষকে পরিণত করার জন্য মৃত্তিকাস্থিত অনুজীবের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও কিভাবে কোনো প্রাণী বাহকের সাহায্য ছাড়া উদ্ভিদে পরাগযোগ ঘটবে ? এটা অবশ্যই বলা যায় যে, প্রকৃতিতে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অনুজীব একা বাঁচে না এবং বাঁচতেপারে না, বরং এরা বিভিন্ন উপায়ে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীব সম্প্রদায় গঠন করে। এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সম্প্রদায়েও বহু আন্তঃক্রিয়াশীল যোগসূত্র রয়েছে, যদিও এদের সবগুলি সবসময় দেখা নাও যেতে পারে।

দুটি ভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে আন্তঃপ্রজাতি আন্তঃক্রিয়াসমূহের সৃষ্টি হয়। এই আন্তঃক্রিয়া একটি প্রজাতির জন্য বা উভয় প্রজাতির জন্য উপকারী, ক্ষতিকর বা নিরপেক্ষ (উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না) হতে পারে। উপকারী, ক্ষতিকর এবং নিরপেক্ষ আন্তঃসম্পর্কের জন্য যথাক্রমে '+' '-' ও 'O' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। চল আমরা আন্তঃপ্রজাতি আন্তঃক্রিয়াসমূহের সম্ভাব্য সব ধরনের ফলাফলের দিকে নজর দিই। (তালিকা 13.1)

চিত্র 13.1 পপুলেশন আন্তঃক্রিয়া সমূহ

প্রজাতি A	প্রজাতি B	আন্তঃক্রিয়ার ধরন
+	+	*মিথোজীবীত্ব বা মিউচুয়ালিজম*
–	–	*প্রতিযোগিতা বা কমপিটিশন*
+	–	*শিকার বা প্রিডেশন*
+	–	*পরজীবীত্ব বা প্যারাসাইটিজম*
+	0	*অনন্যজীবীত্ব বা কমেনসালিজম*
–	0	*অ্যামেনসালিজম*

দুটি প্রজাতির জীব একে অপরের সঙ্গো আন্তঃক্রিয়ার সময় মিথোজীবীতার ক্ষেত্রে উভয় প্রজাতিই উপকৃত হয় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উভয় প্রজাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরজীবীত্ব এবং শিকার উভয়ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি প্রজাতির জীব উপকৃত হয় (যথাক্রমে পরজীবী ও শিকারি প্রাণী) এবং এই আন্তক্রিয়ার ফলে

অপর প্রজাতিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যথাক্রমে আশ্রয়দাতা ও শিকার)। যে ধরনের আন্তঃক্রিয়ায় একটি প্রজাতির জীব উপকৃত হয় এবং অন্যটি উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত কোনটিই হয় না, তাকে বলা হয় কমেনসালিজম। অন্যদিকে অ্যামেনসালিজমের ক্ষেত্রে একটি প্রজাতির জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরটি এই আন্তঃক্রিয়ার ফলে প্রভাবিত হয় না। শিকার, পরজীবীত্ব এবং কমেনসালিজম — প্রত্যেক প্রকার আন্তঃক্রিয়ার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিক্ষেত্রেই, আন্তঃক্রিয়ারত প্রজাতি দুটিকে কাছাকাছি বাস করতে হবে।

(i) **শিকার *Predation* :** *স্বভোজী জীবসমূহ নিজদেহে যে শক্তি* আবদ্ধ করে সেই সম্পূর্ণ শক্তির কি পরিণতি হবে যদি ওই সম্প্রদায়ে উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার মতো কোনো প্রাণীই না থাকে। শিকারকে তোমরা উদ্ভিদদেহে আবদ্ধ শক্তির উচ্চতর ট্রফিক স্তরে স্থানান্তরণের একটি প্রাকৃতিক উপায় রূপে ভাবতে পার। যখন আমরা শিকার এবং শিকারির কথা ভাবি, খুব সম্ভবত বাঘ এবং হরিণের উদাহরণই তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের মনে আসে, কিন্তু চড়ুই পাখির বীজ ভক্ষণও শিকারের চেয়ে কম কিছু নয়। যদিও উদ্ভিদ ভক্ষণকারী প্রাণীদের পৃথকভাবে তৃণভোজী রূপে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়, তবুও বৃহৎ বাস্তুতান্ত্রিক অর্থে এদের সাথে শিকারি প্রাণীর খুব একটা তফাৎ নেই।

ট্রফিক স্তরের মধ্য দিয়ে শক্তি স্থানান্তরণের জন্য একটি পথ হিসেবে কাজ করা ছাড়াও শিকারি প্রাণীরা অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা শিকার জীবের (Prey) পপুলেশন নিয়ন্ত্রণে রাখে। যদি শিকারি প্রাণী না থাকে তাহলে শিকার প্রজাতির (Prey species) পপুলেশন ঘনত্ব অত্যধিক বেড়ে যাবে এবং এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে। যখন কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে কিছু বহিরাগত প্রজাতির জীবের অনুপ্রবেশ ঘটে, তারা অনেকটা স্থান দখল করে নেয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কারণ ওই ভূখণ্ডে তাদের কোনো প্রাকৃতিক শিকারি জীব থাকে না। 1920 এর দশকের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় যে প্রিকলী পিয়ার ক্যাকটাসের (Prickly Pear) আগমন ঘটেছিল, যা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হেক্টর চারণভূমির ব্যাপক ধ্বংস ঘটিয়েছিল। সবশেষে এক ধরনের ক্যাকটাস ভক্ষক (এক ধরনের মথ) শিকারি প্রাণীকে তার স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে তুলে ঐ দেশে নিয়ে এসে ঐ দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ক্যাকটাসকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। শিকারি জীবদের শিকার হওয়া জীবের পপুলেশন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই কৃষিক্ষেত্রে পেস্ট নিয়ন্ত্রণে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়। শিকারি জীবরা তাদের শিকার জীব প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমিয়ে দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় ও সাহায্য করে। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় তটরেখার পাথুরে আন্তঃজোয়ার (intertidal) অঞ্চলে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে Pisaster তারামাছ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিকারি প্রাণী। প্রাকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনো আবদ্ধ আন্তঃজোয়ার অঞ্চল থেকে সমস্ত তারামাছকে সরিয়ে নিলে এক বছরে মধ্যে আন্তঃ প্রজতি প্রতিযোগিতার কারণে দশটিরও অধিক প্রজাতির অমেরুদন্ডী প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটেছে।

যদি কোনো শিকারি জীব শিকারে খুব দক্ষ হয় এবং অত্যধিক হারে শিকার করে তাহলে শিকার জীবের অবলুপ্তি ঘটতে পারে, এবং এর ফলশ্রুতিতে খাদ্যের অভাবে শিকারি জীবেরও অবলুপ্তি ঘটবে। এই কারণেই প্রকৃতিতে উপস্থিত শিকারি জীবদের 'বিবেচক জীব' (Prudent) রূপে গণ্য করা হয়। শিকারি জীবের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা কমানোর জন্য শিকার জীব প্রজাতিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশলের উদ্ভব ঘটেছে। কিছু প্রজাতির পতঙ্গ এবং ব্যাঙ তাদের শিকারি জীব দ্বারা সহজে সনাক্ত হওয়া এড়ানোর জন্য

বিচিত্র বর্ণের হয় (ক্যামুফ্লাজ করে)। কেউ কেউ বিষাক্ত হয় তাই শিকারি জীবরা তাদের এড়িয়ে চলে। মনার্ক প্রজাপতি তাদের খাদক প্রাণীর (পাখি) কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়, কারণ এই প্রজাপতির দেহে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান। মজার বিষয় হল এই যে, প্রজাতিপতিটি এর লার্ভা দশা চলাকালে একটি বিষাক্ত আগাছা ভক্ষণ করার মাধ্যমে ঐ রাসায়নিক পদার্থটি তার দেহে আসে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তৃণভোজী প্রাণীরা হল শিকারি প্রাণী। সব পতঙ্গের প্রায় 25% পতঙ্গকে উদ্ভিদভক্ষক বা ফাইটোফেগাস (দেহরস এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ ভক্ষণ করে) বলে। উদ্ভিদের জন্য এই সমস্যাটি গুরুতর হয়, কারণ প্রাণীদের মত এরা শিকারি প্রাণীদের থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারে না। উদ্ভিদের দেহে তাই, তৃণভোজী প্রাণীদের বিরুদ্ধে অনেক আশ্চর্য্যরকমের অঙ্গাসংস্থানিক ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। অঙ্গাসংস্থানিক উপায়ে আত্মরক্ষার যে উপায়টি সচরাচর বেশি দেখা যায়, সেটি হল উদ্ভিদদেহে কন্টকের উপস্থিতি (আকাশমণি, ক্যাকটাস) বহু উদ্ভিদ এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে এবং দেহে সঞ্চয় করে রাখে, যেগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে প্রাণীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, খাদ্য গ্রহণ অথবা পরিপাকক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, এর জনন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, এমনকি প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তোমরা নিশ্চয় পরিত্যক্ত ভূমিতে আগাছা হিসেবে আকন্দ গাছকে জন্মাতে দেখেছ। এই উদ্ভিদ অত্যন্ত বিষাক্ত কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড উৎপন্ন করে এবং সেইজন্য তোমরা কখনও গবাদি পশু বা ছাগলকে এই গাছটিকে ভক্ষণ করতে দেখবে না। উদ্ভিদ থেকে আমরা বাণিজ্যিক ভাবে যে সব রাসায়নিক বস্তুর বিশাল ভ্যারাইটি (নিকোটিন, ক্যাফিন, কুইনাইন, স্ট্রিকনিন আফিং ইত্যাদি) নিষ্কাশন করি, সেগুলি মূলত চরে বেড়ানো প্রাণীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় সাহায্যকারী বস্তু হিসেবে উৎপন্ন হয়।

(ii) ***প্রতিযোগিতা (Competition) :*** যখন ডারউইন প্রকৃতিতে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামই জৈব বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, যখনই নিকট সম্পর্কিত প্রজাতির জীবরা একই সম্পদের জন্য যা সীমিত, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তখনই প্রতিযোগিতা ঘটে। তবে এটি সর্বাংশ সত্যি নয়। প্রথমত পুরোপুরিভাবে সম্পর্কহীন প্রজাতিরাও একই ধরনের সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অগভীর হ্রদে পরিযায়ী ফ্লেমিংগো এবং বসবাসকারী মাছ একই ধরনের খাদ্য অর্থাৎ হ্রদের জলে উপস্থিত জুপ্লাঙ্কটনের জন্য প্রতিযোগিতা করে। দ্বিতীয়ত জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সংঘটিত হওয়ার জন্য সম্পদ সীমিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, পরিবেশ কোন জীবের টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাধাদান করা হয় এমন প্রতিযোগিতার (ingerference competition) ক্ষেত্রে একটি জীবের খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা অন্য একটা প্রজাতির বাধাদান এবং প্রতিরোধের জন্য হ্রাস পেতে পারে, এমনকি সম্পদের (খাদ্য এবং বাসস্থান) প্রাচুর্য্য থাকলেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং প্রতিযোগিতার সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হল এই যে, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি প্রজাতির দক্ষতা (একে প্রজাতির r এর সাহায্যে মাপা হয় যেখানে r হল বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা) অপর একটি প্রজাতির উপস্থিতিতে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে কমে যায়। এটি পরীক্ষাগারে করা হয়েছে এমন কোনো পরীক্ষা প্রদর্শনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া তুলনামূলক ভাবে সহজ। Gause এবং বাস্তব্যবিদ্যার গবেষণার কাজে বিশারদ অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছিলেন যে, যখন সম্পদ সীমিত হয় তখন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রজাতির জীব অবশেষে অন্য প্রজাতির জীবের অবলুপ্তি ঘটাবে। কিন্তু প্রকৃতিতে এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কারের প্রমাণ সর্বদা চূড়ান্ত নয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জোরদার এবং বোধযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। গ্যালাপাগোস দ্বীপসমূহে ছাগলের আগমনের একদশকের মধ্যে abingdon কচ্ছপ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আপাতভাবে এর মূল কারণ ছিল ছাগলের অত্যধিক চারণ দক্ষতা। প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা ঘটার অপর

যে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায় সেটি হল প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার (competitive release)। যদি কোনো একটি প্রজাতির বিস্তার অধিক শক্তিশালী প্রতিযোগীর উপস্থিতির জন্য একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ প্রজাতির জীবকে পরীক্ষামূলকভাবে সরিয়ে নিলে ঐ ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলে আবদ্ধ প্রজাতির বিস্তৃতির পরিসর নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। Connell তার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুচারুভাবে সম্পন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে, স্কটল্যান্ডের পাথুরে সমুদ্রতীরে ব্যালানাস (Balanus) প্রজাতির বার্নাকল হল আন্তঃজোয়ার অঞ্চলের তুলনামূলক বৃহৎ এবং প্রতিযোগিতার দিক থেকে তুলনামূলক সবল প্রজাতি, তাই সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং তুলনামূলক ক্ষুদ্র বার্নাকলের ক্যাথামেলাস (Chathamalus) প্রজাতিকে ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে। সাধারণত প্রতিযোগিতার ফলে উদ্ভিদ এবং তৃণভোজী প্রাণীরা মাংসাশী প্রাণীদের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গাউসের (Gause) প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার নীতি (Competitive Exclusion principle) বিবৃত করে যে যদি দুটি নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতি একই সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তবে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য পরস্পরের সহাবস্থানে থাকতে পারবে না এবং প্রতিযোগিতার দিক দিয়ে তুলনামূলক দুর্বল প্রজাতি অবশেষে অবলুপ্ত হবে। এই ঘটনাটি তখনই ঘটবে যখন সম্পদ সীমিত থাকে, অন্যথায় তা ঘটবে না। সাম্প্রতিককালের গবেষণাগুলো প্রতিযোগিতার বিষয়ে এরূপ সামগ্রিক সাধারণীকরণ সমর্থন করে না। যদিও তারা প্রকৃতিতে ঘটা আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতাকে নস্যাৎ করে দেননি, তারা এটা উল্লেখ করেছিলেন যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন প্রজাতিসমূহ নিজেদের দেহে এমন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটাতে পারে যা তাদের অবলুপ্তি না ঘটিয়ে সহাবস্থানে থাকতে সাহায্য করে। এরূপ একটি পদ্ধতি হল সম্পদের বাটোয়ারা (resource partitioning)। যদি দুটি প্রজাতি একই সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তারা খাওয়ার সময় আলাদা করে নিয়ে অথবা খাদ্য গ্রহণের ধরন পৃথক করে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা এড়াতে পারে। ম্যাক আর্থার (Mac Arthur) দেখিয়েছেন যে একই বৃক্ষে বসবাসকারী ওয়ার্বলার (Warbler) এর পাঁচটি নিকট সম্পর্কিত প্রজাতি তাদের খাদ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ার আচরণগত পার্থক্য ঘটিয়ে প্রতিযোগিতা এড়াতে এবং সহাবস্থানে সমর্থ হয়।

(iii) ***পরজীবীতা (Parasitism) :*** পরজীবী জীবন যাপনে অন্য জীব থেকে খাদ্য এবং বাসস্থান লাভের নিশ্চয়তা থাকে এটা বিবেচনা করলে এটা অবাক হবার মতো বিষয় নয় যে, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যন্ত এত বিশাল গোষ্ঠীগুলোতে পরজীবীতার উদ্ভব ঘটেছে। বহু পরজীবী এমনভাবে পোষক নির্দিষ্ট (তারা শুধুমাত্র একটি প্রজাতির পোষকের দেহেই পরজীবীরূপে থাকতে পারে) রূপে উদ্ভূত হয়েছে যে পরজীবী এবং পোষক উভয়েই একই সাথে বিবর্তন ঘটার প্রবণতা দেখায়। অর্থাৎ যদি পোষক জীবে পরজীবীকে বাধা দেওয়ার কিংবা বর্জন করার জন্য বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে তাহলে ঐ বিশেষ পোষক প্রজাতির সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে টিকে থাকার জন্য বা ঐ সব বাধাগুলোকে প্রশমিত করার জন্য পরজীবীর দেহেও নানাবিধ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটবে। জীবন শৈলীর পাশাপাশি পরজীবীর দেহে বিশেষ অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যেরও উদ্ভব ঘটে যেমন --- অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবলুপ্তি, পোষক দেহের সঙ্গে আটকে থাকারজন্য আঠালো অঙ্গ অথবা চোষকের উপস্থিতি, পৌষ্টিকতন্ত্রের অবলুপ্তি এবং উচ্চজনন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া। পরজীবীদের জীবনচক্র প্রায়শই জটিল হয় এবং প্রাথমিক পোষকদেহে পরজীবী রূপে থাকার ক্ষেত্রে সহায়তা দানের জন্য এদের জীবনচক্রে একটি বা দুটি অন্তবর্তী পোষক অথবা বাহক যুক্ত থাকে। মানুষের পরজীবী লিভারফ্লুক (একটি নিমাটোডা গোষ্ঠীভুক্ত পরজীবী) এর জীবনচক্র সম্পূর্ণ করার জন্য দুটি অন্তবর্তী পোষকের উপর নির্ভরশীল (একটি হল শামুক অপরটি মাছ)। ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী জীবটির

জন্য পোষকের দেহে ছড়িয়ে পড়ার জন্য একটি বাহকের (মশা) প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ পরজীবী পোষকের ক্ষতিসাধন করে, এরা পোষক জীবের জীবন ধারণ, বৃদ্ধি এবং প্রজননকে ব্যাহত করতে পারে এবং পোষকের পপুলেশন ঘনত্ব হ্রাস করে। পরজীবীরা পোষকটিকে শারীরিক ভাবে দুর্বল করে দিয়ে তাকে শিকার হওয়ার জন্য অধিকতর অসুরক্ষিত করে। তোমরা কি বিশ্বাস করো একটি আদর্শ পরজীবী পোষককে ক্ষতিগ্রস্ত না করে তার দেহে টিকে থাকতে পারে? তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কেন এ ধরনের সম্পূর্ণ রূপে অক্ষতিকর পরজীবীর বিবর্তন ঘটাচ্ছে না? যে সব পরজীবী পোষক জীবের বাহ্যিক দেহতল থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাদের বহিঃপরজীবী বলে। এই পরজীবী গোষ্ঠীর সবচাইতে পরিচিত উদাহরণ হল মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থানকারী উকুন এবং কুকুরে গায়ে বসবাসকারী এঁটুলি। বহু সামুদ্রিক মাছ কপিপোড নামক বহিঃপরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্বর্ণলতা নামক পরজীবী উদ্ভিদটি ঝোপঝাঁড় সৃষ্টি করে এমন উদ্ভিদে সচরাচর বেড়ে উঠে এবং বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাতা এবং ক্লোরোফিলবিহীন হয়ে যায়। এটি যে পোষক উদ্ভিদ দেহে বাস করে, সে উদ্ভিদ থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে। স্ত্রী মশাকে পরজীবী বলে গণ্য করা হয় না, যদিও তার জননের জন্য আমাদের রক্তের প্রয়োজন হয়। তোমরা কি এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে?

বিপরীতভাবে অন্তঃপরজীবী তারাই যারা পোষক জীবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে (যকৃৎ বৃক্ক ফুসফুস, লোহিত রক্ত কণিকা ইত্যাদি) বাস করে। অন্তঃপরজীবীদের জীবনচক্র এদের চূড়ান্ত বিশেষীকরণের জন্য অধিকতর জটিল হয় এইসব পরজীবীগুলো তাদের জননক্ষমতার উপর জোর দেওয়ায় তাদের অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই সরলীকৃত হয়েছে।

পাখিদের ক্ষেত্রে অন্ডপরজীবীতা (brood parasitism) হল পরজীবীতার একটি অদ্ভুতপূর্ব উদাহরণ সেখানে পরজীবী পাখিটি এর পোষক পাখির বাসায় ডিম পাড়ে, যাতে পোষক পাখিটি ঐ ডিমে তা দিতে পারে। পরজীবী পাখির ডিমগুলো পোষক পাখি দ্বারা বিজাতীয় ডিমরূপে সনাক্ত হওয়া এবং এর ফলে বাসা থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য এই ডিমগুলো, পোষক পাখির ডিমের সাথে আকারগত এবং বর্ণগত দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উদ্ভুত হয়। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি পার্কে গিয়ে জনন ঋতুতে (বসন্ত থেকে গ্রীষ্মকাল) কাক এবং কোকিলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা কর এবং অন্ডপরজীবীতা সংঘটিত হতে দেখ।

(iv) ***অনন্যোজীবীতা (Commensalism) :*** এটি হল এক ধত্রনের আন্তঃক্রিয়া যেখানে একটি প্রজাতি উপকৃত হয় এবং অন্য প্রজাতিটি ক্ষতিগ্রস্ত ও হয় না আবার উপকৃত ও হয় না। আম গাছের শাখায় পরাশ্রয়ী রূপে বৃদ্ধি পাওয়া অর্কিড, তিমির দেহের পৃষ্ঠদেশে বেড়ে উঠা বার্নাকল (এক ধরনের সামুদ্রিক সন্ধিপদী) উভয়েই এই আন্তঃক্রিয়াগুলো থেকে উপকৃত হয়, অপরদিকে তিমি কিংবা আম গাছের তেমন কোনো লাভ হয় না। তোমরা যদি গ্রামাঞ্চলে কৃষি জমি সংলগ্ন স্থানে বাস করো, তাহলে গবাদি পশু ও গো-বকের (Catlle egret) ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানের দৃশ্য প্রায়শই তোমাদের চোখে ধরা পড়বে এবং এটি অনন্যোজাবীতার একটি প্রকৃত উদাহরণ। গবাদি পশু চরে বেড়ানোর সময় সর্বদা বক ও খাদ্যানুসন্ধানের জন্য এর কাছাকাছি থাকে, কারণ গবাদি পশুর চলাফেরা করারসময় তাদের পায়ের নড়াচড়ায় ঝোপঝাড় থেকে পোকামাকড় বেরিয়ে আসে, অন্যথায় গো-বকদের পক্ষে এদের খুঁজে বের করে ধরে নেওয়া কঠিন হতো। আবার সী-অ্যানিমোন এবং এর দংশক কর্ষিকাগুলোর মধ্যে

(ক)

(খ)

চিত্র 13.7 ডুমুরগাছ এবং বোলতায় মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক (a) বোলতার দ্বারা ডুমুর ফুলের পরাগসংযোগ (b) ডুমুর ফুলের মধ্যে বোলতা ডিম পাড়ছে।

বসবাসকারী ক্লাউন মাছের আন্তঃক্রিয়াও কমেনসালিজমের একটি সুন্দর উদাহরণ। শিকারি প্রাণীগুলো দংশক কর্ষিকাগুলোকে এড়িয়ে চলায় এই সহাবস্থানে থেকে মাছটি তার শিকারি প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পায়। এক্ষেত্রে ক্লাউন মাছের আশ্রয়দাতার ভূমিকা পালন করলেও সী-অ্যানিমোন কোনো সুবিধা লাভ করে এমনটা মনে হয় না।

(v) ***মিথোজীবীতা (Mutualism) :*** এই ধরনের আন্তঃক্রিয়ায় পরস্পর ক্রিয়াশীল উভয় প্রজাতিই উপকৃত হয়। লাইকেনগুলো একটি ছত্রাক এবং একটি সালোকসংশ্লেষকারী শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ মিথোজীবী সম্পর্ক প্রদর্শন করে। অনুরূপভাবে মাইকোরাইজা হল ছত্রাক এবং উন্নত উদ্ভিদের মূলের মধ্যেকার সহাবস্থান। ছত্রাক উদ্ভিদকে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিপোষকের শোষণে সাহায্য করে, অপরদিকে উদ্ভিদ ছত্রাককে শক্তি প্রদানকারী শর্করা সরবরাহ করে।

মিথোজীবীতার সবচেয়ে দর্শনীয় এবং বিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে আকর্ষণীয় উদাহরণ উদ্ভিদ প্রাণীর সম্পর্কের মধ্যে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ফুলের পরাগসংযোগ ঘটানোর জন্য এবং বীজের বিস্তারের জন্য প্রাণীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদরা যেহেতু প্রাণীদের কাছ থেকে কিছু সহায়তা প্রত্যাশা করে, তাই উদ্ভিদদেরও অবশ্যই প্রাণীদেরকে কিছু 'উপঢৌকন' (fees) দিতে হবে। উদ্ভিদরা পুরস্কার বা উপঢৌকন রূপে পরাগসংযোগে সাহায্যকারী প্রাণীদের পরাগরেণু ও মকরন্দ এং বীজের বিস্তারে সাহায্যকারী প্রাণীদের রসালো ও পুষ্টিকর ফল প্রদান করে। কিন্তু এই পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতিতে 'ঠকবাজ' প্রাণীদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু কিছু প্রাণী ফুলের পরাগ সংযোগে সাহায্য না করেই মকরন্দ চুরি করে নেওয়ার চেস্টা করে। এখন তোমরা দেখতে পাবে উদ্ভিদ প্রাণীর আন্তঃক্রিয়ায় কেন প্রায়শই দুটি সহযোগী জীবের সহ বিবর্তন ঘটে অর্থাৎ ফুল এবং পরাগসংযোগকারী প্রাণী প্রজাতির বিবর্তন একে অপরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। ডুমুরের বৃক্ষের বহু প্রজাতিতে এই বৃক্ষের সাথে পরাগ সংযোগে সহায়ক বোলতা প্রজাতির একটি মজবুত (one to one) সম্পর্ক রয়েছে। (চিত্র 13.7) এর অর্থ হল এই যে, একটি প্রদত্ত ডুমুর প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগসংযোগ কেবলমাত্র এর সহযোগী (Partner) বোলতা প্রজাতি দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে, অন্য কোনো প্রজাতির প্রাণীর সাহায্যে এটি সম্ভব হয় না। স্ত্রী বোলতা ডুমুরের ফলকে কেবলমাত্র তার ডিম পাড়ার স্থান হিসেবেই নয়, এরা ফলস্থিত বর্ধনশীল বীজগুলোকে বোলতার লার্ভাকে পুষ্টি প্রদানের জন্যও ব্যবহার করে।

চিত্র 13.8 অর্কিড ফুলের পরাগ সংযোগকারী মৌমাছি

বোলতা ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে গিয়ে ডুমুরের পুষ্প বিন্যাসে পরাগসংযোগ ঘটায়। ডুমুরের পরাগসংযোগ ঘটায় যে উপকারটি হয় তার বিনিময়ে ডুমুরগাছ তার কিছু বর্ধনশীল বীজকে বোলতার বর্ধনশীল লার্ভার জন্য খাদ্যরূপে প্রদান করে।

অর্কিড তার পুষ্পসজ্জায় বিস্ময়কর বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে, যার বেশিরভাগই সঠিক পরাগসংযোগকারী পতঙ্গকে (মৌমাছি ও ভ্রমর) আকর্ষণ করার জন্য উদ্ভূত হয়েছে যাতে এদের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরাগসংযোগ সম্ভব হয়। (চিত্র 13.8) আবার সব অর্কিডই পুরস্কার প্রদান করে না। ভূমধ্যসাগরীয় অর্কিড ophrys মৌমাছির একটি প্রজাতির দ্বারা পরাগসংযোগ ঘটানোর জন্য 'যৌন প্রতারক' (Sexual deceit) নিযুক্ত করে। ophrys অর্কিডের ফুলের একটি পাপড়ির সাথে আকৃতিগত, বর্ণগত এবং দাগের দিক থেকে স্ত্রী মৌমাছির অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ফুলের এই পাপড়িটিকে স্ত্রী মৌমাছি ধরে নিয়ে এর প্রতি পুরুষ মৌমাছিটি ছদ্ম সঙ্গামে (pseudocopulates) লিপ্ত হয়, এবং এই প্রক্রিয়া চলাকালে ফুলের পরাগরেণু মৌমাছিটির গায়ে লেগে যায়। যখন এই একই মৌমাছিটি অন্য ফুলের সাথে ছদ্ম-সঙ্গামে লিপ্ত হয় তখন সেটি ঐ ফুলে পরাগরেণুর স্থানান্তরণ ঘটায় এবং এইভাবে পরাগযোগে সাহায্য করে। এখানে তোমরা দেখতে পার যে কিভাবে সহ বিবর্তন ঘটছে। বিবর্তনকালে যদি কোনও একটি কারণে স্ত্রী মৌমাছির বর্ণের ধরনের সামান্যতম পরিবর্তন ও সংঘটিত হয়, তাহলে পরাগসংযোগের সাফল্যের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, যদি না স্ত্রী মৌমাছির সঙ্গো সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য অর্কিডের ফুলের পাপড়িরও সহ-বিবর্তন ঘটে।

সারসংক্ষেপ

জীববিদ্যার একটি শাখা হিসেবে বাস্তব্যবিদ্যা হলো সজীববস্তু সমূহের সাথে তাদের পরিবেশের অজীবজ (ভৌত রাসায়নিক প্রভাবকসমূহ) ও জীবজ উপাদানসমূহের (অন্যান্য প্রজাতি) সম্পর্কের অধ্যয়ন। বাস্তব্যবিদ্যা জীবজ সংগঠনের চারটি স্তর নিয়ে আলোচনা করে যেমন জীব, পপুলেশন, জীব সম্প্রদায় এবং বায়োম।

তাপমাত্রা, আলোক, জল এবং মৃত্তিকা হল পরিবেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভৌত উপাদান যার সঙ্গে জীব নানাভাবে অভিযোজিত হয়। একটি সুস্থিত অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (homeostasis) বজায় রাখার মাধ্যমেই জীব তার সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক জীবই বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন হলেও অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। অন্য জীবরা হয় তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অথবা শুধুমাত্র অনুগমন করে। অন্য কয়েকটি প্রজাতিতে আবার কোনো স্থানের প্রতিকূল পরিবেশ এড়ানোর জন্য (অভিবাসন) এবং সময়জনিত প্রতিকূল পরিবেশ এড়ানোর জন্য (শীতঘুম, গ্রীষ্মকালীন ঘুম ও ডায়াপজ) বিভিন্ন অভিযোজনের উদ্ভব ঘটে।

বিবর্তন জনিত পরিবর্তন সমূহ কেবলমাত্র পপুলেশন স্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটে এবং তাই পপুলেশন বাস্তব্যবিদ্যা হল বাস্তব্যবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পপুলেশন হল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী একটি প্রদত্ত প্রজাতির জীবগোষ্ঠী যারা একই সম্পদ ভাগ করে নেয় অথবা একই সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পপুলেশনের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা কোনও এক জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় না যেমন— মৃত্যুহার, জন্মহার, লিঙ্গ অনুপাত, বয়সের বিস্তার।

একটি পপুলেশনে বিভিন্ন বয়স সীমার পুরুষ এবং মহিলার অনুপাতকে প্রায়শই বয়স পিরামিড রূপে লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। বয়স পিরামিডের আকৃতি দ্বারা একটি পপুলেশন স্থিতিশীল, ক্রমবর্ধমান বা ক্রমহ্রাসমান কিনা তা বোঝা যায়।

কোনো পপুলেশনের উপর যে কোনো ফ্যাক্টরের বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাব সাধারণত এর আকারে প্রতিফলিত হয় (পপুলেশন ঘনত্ব) যা প্রজাতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপায়ে (সংখ্যা, বায়োম, আচ্ছাদনের শতকরা হার ইত্যাদি) প্রকাশ করা যেতে পারে।

জন্মগ্রহণ এবং অভিবাসনের মাধ্যমে পপুলেশন বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুবরণ ও প্রবাসনের মাধ্যমে পপুলেশন হ্রাস পায়। যখন সম্পদের পরিমাণ অসীম হয় তখন স্বভাবতই সূচকীয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় যখন সম্পদের যোগান ক্রমশঃ সীমাবন্ধ হয়ে আসে, তখন বৃদ্ধির ধরনটি লজিস্টিক প্রকৃতির হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ধারণ ক্ষমতার কারণে বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত সীমিত হয়ে আসে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা (r) হল একটি পপুলেশন বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা পরিমাপের একটি উপায়।

প্রকৃতিতে একটি বাসস্থানের বিভিন্ন প্রজাতির পপুলেশন সমূহ স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে পারে না। বরং এরা পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে আন্তঃক্রিয়া করে। ফলাফলের উপর নির্ভর করে দুটি প্রজাতির মধ্যেকার এই আন্তঃক্রিয়াগুলোকে প্রতিযোগিতা (উভয় প্রজাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়), শিকার ও পরজীবীতা (একটি উপকৃত হয়, অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়), অনন্যোজীবীতা (একটি উপকৃত হয় অন্যটির লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না), অ্যামেনসালিজম (একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অপরটির লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না), এবং মিথোজীবীতা (উভয় প্রজাতিই উপকৃত হয়) রূপে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। শিকার হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তরিত হওয়ার পথ সুগম হয় এবং কিছু শিকারী প্রাণী তাদের দ্বারা শিকার হওয়া প্রাণীর পপুলেশন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তৃণভোজীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্ভিদের দেহেও নানাবিধ গঠনগত ও রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হয় যে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দুর্বল প্রজাতিটির অপসারণ/অবলুপ্তি ঘটায় (প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার নীতি), কিন্তু বহু নিকট সম্পর্কিত প্রজাতির জীবের দেহে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতিতে মিথোজীবীতার কিছু আকর্ষণীয় উদাহরণ উদ্ভিদ— পরাগ সংযোগকারী প্রাণীর আন্তঃক্রিয়া সমূহে দেখা যায়।

অনুশীলনী

1. কিভাবে ‘শীতঘুম’ থেকে ডায়াপজ পৃথক হয়?
2. যদি একটি সামুদ্রিক মাছকে স্বাদু জলের অ্যাকোরিয়ামে রাখা হয় তাহলে কি মাছটি টিকে থাকতে সমর্থ হবে? কেন বা কেন নয়?
3. বেশির ভাগ জীব 45^0C এর বেশি তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না। কিভাবে কিছু অনুজীব এমন বাসস্থানেও বেঁচে থাকতে সমর্থ হয় যেখানে তাপমাত্রা 100^0C এরও বেশি?
4. পপুলেশনের এমন কিছু বিশেষত্বের তালিকা প্রস্তুত কর, যেগুলি একক জীবে দেখা যায় না।
5. যদি কোনো পপুলেশনের আকার সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বছরে দ্বিগুণ হয়, তবে ঐ পপুলেশনের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহজাত মাত্রা (r) কি হবে?
6. শাকাশী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্ভিদদেহে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি দেখা যায়, তার উল্লেখ কর।

7. একটি আম গাছের শাখার উপর অর্কিড গাছ বেড়ে উঠছে। তোমরা আমগাছ এবং অর্কিডের মধ্যে সংঘটিত এই আন্তঃক্রিয়া কিভাবে বর্ণনা করবে?
8. পেস্ট পতঙ্গের জৈবিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন্ বাস্তুতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত হয়?
9. নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে তুলনা কর ঃ—
   a) শীতঘুম এবং গ্রীষ্মঘুম।
   b) এক্টোথার্মস এবং এন্ডোথার্মস।
10. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—
   a) মরুভূমির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অভিযোজন।
   b) জলের ঘাটতি রয়েছে এমন স্থানে বসবাসকারী উদ্ভিদের অভিযোজন।
   c) প্রাণীদের আচরণগত অভিযোজন।
   d) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আলোকের প্রয়োজনীয়তা।
   e) উষ্ণতা অথবা জলের ঘাটতির প্রভাব এবং প্রাণীদের অভিযোজন।
11. পরিবেশের বিভিন্ন অজীবজ উপাদানসমূহের তলিকা প্রস্তুত কর।
12. উদাহরণ দাওঃ
   a) একটি এন্ডোথার্মিক প্রাণী।
   b) একটি এক্টোথার্মিক প্রাণী।
   c) বেনথিক অঞ্চলে বসবাসকারী একটি জীব
13. পপুলেশন এবং সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা লিখ।
14. নিম্নলিখিতগুলোর সংজ্ঞা লিখ এবং প্রতিক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ দাও।
   a) অনন্যোজীবীতা
   b) পরজীবীতা
   c) ক্যামুফ্লাজ (camouflage)
   d) মিথোজীবীতা
   e) আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতা
15. উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে লজিস্টিক পপুলেশন বৃদ্ধির লেখচিত্রটি বর্ণনা কর।
16. নিম্নোক্ত বিবৃতির মধ্যে সেই বিবৃতিটি নির্বাচন কর যেটি পরজীবীতাকে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা করে।
   a) একটি জীব উপকৃত হয়।
   b) উভয় জীব উপকৃত হয়।
   c) একটি জীব উপকৃত হয় অপরটির লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না।
   d) একটি জীব উপকৃত হয়, অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
17. পপুলেশনের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কর এবং ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়-14

বাস্তুতন্ত্র
(ECOSYSTEM)

14.1 বাস্তুতন্ত্র- গঠন এবং কাজ (Ecosystem - Structure and Function)
14.2 উৎপাদনশীলতা (Productivity)
14.3 বিয়োজন (Decomposition)
14.4 শক্তির প্রবাহ (Energy Flow)
14.5 বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সমূহ (Ecological Pyramids)
14.6 বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম (Ecological Succession)
14.7 পরিপোষক চক্র (Nutrient Cycle)
14.8 বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা (Ecosystem Services)

বাস্তুতন্ত্রকে প্রকৃতির একটি কার্য্যকরী একক হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে জীবসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিক ভৌত পরিবেশের সঙ্গেও আন্তঃ ক্রিয়া করে। বাস্তুতন্ত্রের আকারে ব্যাপক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটি একটি ছোট পুকুর থেকে শুরু করে বিশাল বনভূমি বা সমুদ্র হতে পারে। বহু বাস্তব্যবিদ্যায় বিশারদগন সমগ্র বায়োস্ফিয়ারকে একটি ভূ-বাস্তুতন্ত্র রূপে দেখেন, যা পৃথিবীর বুকে উপস্থিত সব স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের সমাহার। এই তন্ত্রটি খুবই বৃহৎ এবং জটিল হওয়ায় একসঙ্গে এর অধ্যয়ন করা কঠিন, তাই একে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র নামক দুটি মৌলিক বিভাগে ভাগ করে নেওয়া সুবিধাজনক। বনভূমি তৃণভুমি এবং মরুভূমি হল স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের কিছু উদাহরণ, আবার পুকুর, হ্রদ, জলাভূমি, নদী এবং মোহনা হল কিছু জলজ বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ। শষ্যক্ষেত্র এবং অ্যাকোয়ারিয়ামকেও মনুষ্যনির্মিত বাস্তুতন্ত্র রূপে গন্য করা যেতে পারে।

ইনপুট (উৎপাদন ক্ষমতা), শক্তির স্থানান্তরন (খাদ্য শৃঙ্খল / খাদ্যজাল, পুষ্টিচক্র) এবং আউটপুট (ক্ষয় এবং শক্তির ক্ষতি) বোঝার জন্য প্রথমেই আমরা বাস্তুতন্তের গঠনটি লক্ষ্য করব। পাশাপাশি আমরা পরিপোশক চক্র, খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্যজাল এই সম্পর্ক গুলোর দিকেও তাকাব, যেগুলো ঐ তন্ত্রগুলির মধ্যে শক্তি প্রবাহ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্কের ফলে গঠিত হয়।

14.1 বাস্তুতন্ত্র - গঠন ও কাজ (Ecosystem - Structure and Function)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তোমরা পরিবেশের বিভিন্ন জীবজ ও অজীবজ উপাদানগুলো লক্ষ্য করেছ। কিভাবে জীবজ উপাদানগুলো একক ভাবে একে অপরকে এবং তাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করে তা তোমরা অধ্যয়ন করেছ। চল আমরা এই উপাদানগুলোকে আরও সুসংহতভাবে লক্ষ্য করি এবং কিভাবে বাস্তুতন্ত্রে এই উপাদানগুলোর মধ্যে শক্তি প্রবাহ ঘটে তা দেখি।

জীবজ ও অজীবজ উপাদানগুলোর মধ্যে আন্ত:ক্রিয়ার ফলে একটি ভৌত গঠন গড়ে উঠাই প্রত্যেক প্রকার বাস্তুতন্ত্রের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ এবং প্রানী প্রজাতির সনাক্তকরণ এবং গননাকরণ এর প্রজাতির গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। বিভিন্ন স্তরে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জীবের উল্লম্ব বিস্তারকে বলা হয় স্ট্র্যাটিফিকেশন (Stratification)। উদাহরণস্বরূপ, একটি বনভূমিতে বৃক্ষরা সর্বোচ্চ উল্লম্ব স্তরে, গুল্মরা দ্বিতীয় উল্লম্বস্তরে এবং বীরূৎ ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদরা সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলোকে একটি একক হিসেবে তখনই কাজ করতে দেখা যাবে, যখন তোমরা নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করবে।

i) উৎপাদনশীলতা (productivity)
ii) বিয়োজন (decomposition)
iii) শক্তি প্রবাহ (energy flow) এবং
iv) পরিপোষক চক্র (nutrient cycling)।

একটি জলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি বোঝার জন্য চল আমরা একটি ছোটো পুকুরকে উদাহরণ হিসেবে নিই। এটি নিজেই নিজের টিকে থাকাকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম এমন একটি একক এবং একটি সরল উদাহরণ, যা, এমনকি একটি জলজ বাস্তুতন্ত্রে সংঘটিত হওয়া জটিল আন্ত:ক্রিয়া সমূহকেও ব্যাখ্যা করে। একটি পুকুর হলো এমন একটি অগভীর জলাশয় যেখানে একটি বাস্তুতন্ত্রের উপরে উল্লিখিত চারটি মৌলিক উপাদানের সবকয়টি খুব ভালভাবে প্রদর্শিত হয়। পুকুরের অজীবজ উপাদানটি হল জল, যার মধ্যে সব জৈব এবং অজৈব বস্তু সমূহ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত প্রচুর পরিমানে মৃত্তিকা। সূর্যালোকের উপস্থিতি, তাপমাত্রার চক্র, দিবা দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য জলবায়ুঘটিত অবস্থা সমগ্র পুকুরটির ক্রিয়াশীলতার হার নিয়ন্ত্রন করে। পুকুরের স্বভোজী উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন, কিছু শৈবাল এবং ভাসমান, নিমজ্জিত এবং জলাশয়ের কিনারায় পাওয়া যায় এমন উদ্ভিদসমূহ। খাদকগুলোর মধ্যে রয়েছে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত জুপ্ল্যাঙ্কটন, স্বাধীনভাবে সন্তরণশীল এবং তলদেশে বসবাসকারী জীবসমূহ। এই বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত বিয়োজক জীবগুলো হলো ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া এবং ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জীবসমূহ যাদের বিশেষত পুকুরের তলদেশে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। এই তন্ত্র যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের এবং সমগ্র জীবমণ্ডলের সবরকম ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থাৎ স্বভোজী দ্বারা সূর্যের বিকিরিত শক্তির সাহায্যে অজৈব বস্তুর জৈব বস্তুতে রূপান্তরণ, পরভোজী দ্বারা স্বভোজীদের খাদ্য রূপে গ্রহন, পরিপোষকদের পরিবেশে ফিরিয়ে দিয়ে স্বভোজী উদ্ভিদ যাতে পুনরায় ব্যবহার করতে পারে তার জন্য মৃত জৈব বস্তুর বিয়োজন এবং খনিজীভবন এবং এই প্রক্রিয়াগুলোর বার-বার পুনরাবৃত্তি ঘটা। উচ্চতর ট্রফিক স্তরের দিকে শক্তির একমুখী প্রবাহ ঘটে এবং পরিবেশে এর অপচয় হয় এবং তাপশক্তি রূপে ক্ষতি হয়।

14.2 উৎপাদনশীলতা (Productivity)

কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রকে কার্য্যকরী এবং টেকসই হওয়ার জন্য মৌলিক চাহিদাটি হল সূর্যালোকের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি। সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা সালোকসংশ্লেষকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে মোট যে পরিমান জৈববস্তু অথবা বায়োমাস উৎপন্ন হয়, তাকে তার প্রাথমিক উৎপাদান রূপে সংজ্ঞায়িত

করা হয়। একে ওজন (গ্রাম$^{-2}$) অথবা শক্তি ($kcal\ m^{-2}$) রূপে প্রকাশ করা হয়। জৈববস্তু উৎপাদনের হারকে উৎপাদনশীলতা বলে। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতার তুলনা করতে গিয়ে একে $gm^{-2}yr^{-1}$ অথবা $\left(kcalm^{-2}\right)yr^{-1}$ রূপে প্রকাশ করা হয়। উৎপাদনশীলতাকে মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (GPP) এবং প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি বাস্তুতন্ত্রের মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বলতে সালোকসংশ্লেষ কালে জৈববস্তুর উৎপাদনের হারকে বোঝায়। উদ্ভিদের শ্বসনকালে মোট উৎপন্ন প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার (GPP) একটি অংশ ব্যয়িত হয়। মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা থেকে শ্বসনকালীন ক্ষতি (R) বাদ দিলে প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) পাওয়া যায়।

$$GPP - R = NPP$$

প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বলতে পরভোজীদের (তৃণভোজী ও বিয়োজক) দ্বারা গ্রহনের জন্য উপস্থিত জৈববস্তুর পরিমানকে বোঝায়। গৌন উৎপাদনশীলতা বলতে খাদক দ্বারা নতুন জৈববস্তু উৎপাদনের হারকে বোঝায়। প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ প্রজাতির উপর নির্ভর করে। এটি নানবিধ পরিবেশীয় উপাদান, পরিপোষকের প্রাপ্যতা এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একটি সম্পূর্ণ জীবমণ্ডলের বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা হল প্রায় 170 বিলিয়ন টন জৈব বস্তু (শুষ্ক ওজন)। তার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতলের 70% সমুদ্র অধিকার করে থাকলেও সমুদ্রের উৎপাদনশীলতা কেবলমাত্র 55 বিলিয়ন টন। বার্ষিক মোট উৎপাদনের বাকী অংশটি ভূমি থেকে পাওয়া যায়। সমুদ্রের উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার মূল কারণ নিয়ে তোমাদের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা কর।

14.3 বিয়োজন (Decomposition)

তোমরা নিশ্চই শুনে থাকবে যে কেঁচোকে 'কৃষকের বন্ধু' হিসেবে গন্য করা হয়। এইরূপ বলা হয় কারণ, এরা একদিকে জটিল জৈব বস্তুকে ভাঙ্গাতে সাহায্য করে এবং অপরদিকে মাটিকে ঝুরঝুরে করে। একই ভাবে বিয়োজকরা জটিল জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং পরিপোষকের মতো অজৈব পদার্থে পরিণত করে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বিয়োজন বলে। মৃত উদ্ভিদের দেহাবশেষ যেমন পাতা, ফুল, বাকল এবং মলসহ মৃত প্রানীর দেহাবশেষ এক সাথে ডেট্রিটাস গঠন করে। এই ডেট্রিটাস হল বিয়োজনের জন্য কাঁচামাল। বিয়োজন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হল - খণ্ডীভবন, লীচিং, অপচিতি, হিউমাস গঠন এবং খনিজীভবন।

ডেট্রিভোর বা কর্করভক্ষকরা (যেমন কেঁচো) ডেট্রিটাস বা কর্করকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াটিকে খন্ডীভবন (fragmentation) বলে। লীচিং প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত অজৈব পরিপোষকগুলো নীচের দিকে নেমে গিয়ে মৃত্তিকার স্তরে আসে এবং অপ্রাপ্য লবনরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়ার দেহাস্থিত উৎসেচক ডেট্রিটাসকে ভেঙ্গে সরল অজৈব বস্তুতে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াটিকে অপচিতি (Catabolism) বলা হয়।

এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিয়োজনের উপরে উল্লিখিত সবগুলি ধাপই একসঙ্গে ডেট্রিটাস বা কর্করের উপর কাজ করে (চিত্র: 14.1)

বিয়োজন চলাকালে হিউমাস গঠন প্রক্রিয়া ও খনিজীভবন সংঘটিত হয়। হিউমাসগঠন প্রক্রিয়ার ফলে গাঢ় বর্ণের অনিয়তাকার বস্তু জমা হয়, যাকে হিউমাস বলে যা জীবানুর ক্রিয়ার বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিরোধী হয় এবং অত্যন্ত ধীর গতিতে এর বিয়োজন ঘটে।

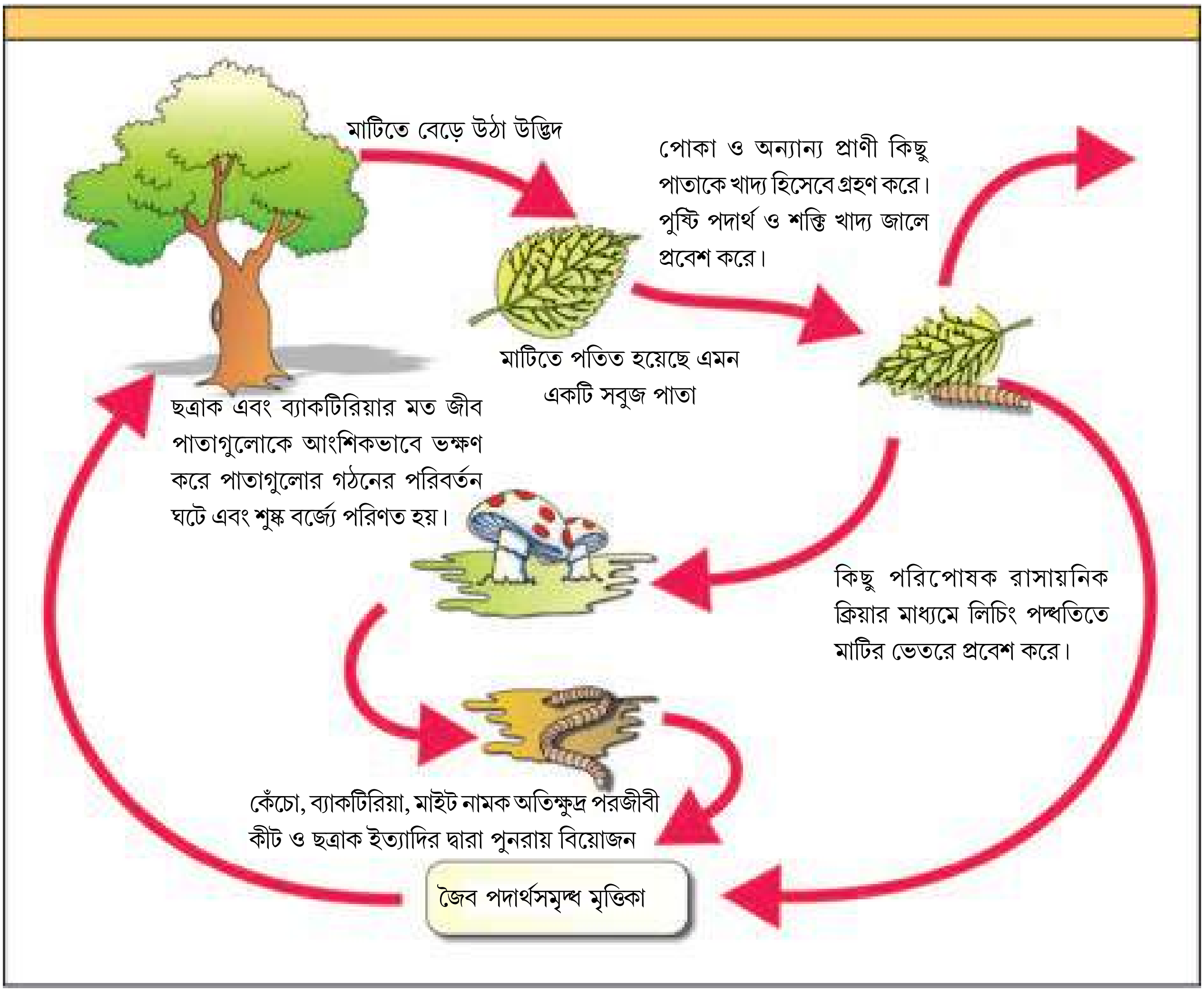

চিত্র 14.1 একটি স্থলভূমির বাস্তুতন্ত্রে বিয়োজন চক্রের চিত্ররূপ উপস্থাপন

হিউমাস কলডীয় প্রকৃতির হওয়ায় এটি পরিপোষকের সঞ্চয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। জীবানুর ক্রিয়ায় হিউমাস আবারও ভেঙ্গো যায় এবং যে পক্রিয়ায় অজৈব পরিপোষক মুক্ত করে তাকে খনিজীভবন বলে।

বিয়োজন হল প্রধানত একটি অক্সিজেন নির্ভর প্রক্রিয়া। ডেট্রিটাসের রাসায়নিক গঠন এবং জলবায়ুঘটিত প্রভাবক দ্বারা বিয়োজনের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি নির্দিষ্ট জলবায়ুঘটিত অবস্থায় যদি ডেট্রিটাসটি লিগনিন ও কাইটিন সমৃদ্ধ হয় তবে বিয়োজনের হার ধীর গতিতে হয় এবং যদি ডেট্রিটাস নাইট্রোজেন এবং শর্করার মতো জলে দ্রবণীয় বস্তু সমৃদ্ধ হয়, তবে বিয়োজনের হার দ্রুতগতিতে ঘটে। তাপমাত্রা এবং মাটির আর্দ্রতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ুগত প্রভাবক যা মাটিতে উপস্থিত জীবানুদের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে বিয়োজনের হার নিয়ন্ত্রন করে। উষ্ণ এবং আর্দ্র পরিবেশ বিয়োজনের পক্ষে অনুকূল হয়। অপরদিকে নিম্নতাপমাত্রা এবং অবাত পরিবেশ বিয়োজনে বাধা দান করে এবং এর ফলে জৈববস্তু গঠিত হয়।

14.4 শক্তি প্রবাহ (Energy Flow)

সমুদ্র গভীরের হাইড্রোথার্মাল বাস্তুতন্ত্র ব্যাতীত পৃথিবীর সব বাস্তুতন্ত্রের জন্য শক্তির একমাত্র উৎস হল সূর্য। পৃথিবীর পতিত সৌর বিকিরণের 50% এরও কম হলো সালোকসংশ্লেষীয় ভাবে সক্রিয় [**photosynthetically active radiation** (PAR)] বিকিরণ। আমরা জানি যে উদ্ভিদ এবং সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া (স্বভোজী) সরল অজৈব বস্তু থেকে খাদ্য উৎপাদনের সময় সূর্যের বিকিরিত শক্তি আবদ্ধ করে। উদ্ভিদরা PAR এর কেবলমাত্র 2 - 10% বিকিরণ তাদের দেহে আবদ্ধ করতে পারে আর এই সামান্য পরিমাণ শক্তিই সমগ্র জীবকূলকে টিকিয়ে রাখে। তাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে উদ্ভিদের দ্বারা আবদ্ধ সৌরশক্তি কিভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীবের মধ্যদিয়ে প্রভাবিত হয়।

সকল জীবই তাদের খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। তাই তোমরা সূর্য থেকে উৎপাদক এবং এর পর উৎপাদক থেকে খাদক সমূহে শক্তির একমুখী প্রবাহ দেখতে পাবে। এটা কি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটিকে মেনে চলছে?

উপরন্তু বাস্তুতন্ত্রগুলো তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি উল্লঙ্ঘন করছে না। চাহিদা অনুযায়ী জৈবঅনু সংশ্লেষ করতে এবং ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার দিকে সার্বজনীন প্রবণতা রুখতে বাস্তুতন্ত্রগুলোতে শক্তির একটি নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকা আবশ্যক।

বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত সবুজ উদ্ভিদগুলোকে উৎপাদক বলে। একটি স্থলভূমির বাস্তুতন্ত্রে মুখ্য উৎপাদকগুলো হলো তৃণ জাতীয় এবং কাষ্ঠল উদ্ভিদ। অনুরূপভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকগুলো হলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, শৈবাল এবং উন্নত উদ্ভিদের মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব।

প্রকৃতিতে বিদ্যমান খাদ্য শৃঙ্খলসমূহ এবং খাদ্যজাল সমূহ সম্পর্কে তোমরা অধ্যয়ন করেছ। উদ্ভিদ (উৎপাদক) থেকে শুরু করে খাদ্য জাল বিশেষ করে খাদ্যশৃঙ্খল এমন ভাবে গঠিত হয় যে, একটি প্রাণী একটি উদ্ভিদকে অথবা অপর প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে, আবার নিজেও অন্য প্রাণীর খাদ্য হয়ে যায়। এই আন্ত:নির্ভরতার জন্যই খাদ্যশৃঙ্খল অথবা খাদ্যজাল গঠিত হয়। জীবদেহে আবদ্ধ শক্তির কণামাত্র শক্তিও তাদের দেহে চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকে না। তাই উৎপাদক দ্বারা আবদ্ধ শক্তি কোনো খাদকের দেহে প্রবাহিত হয় অথবা জীবটির মৃত্যু ঘটে। জীবের মৃত্যু ডেট্রিটাস বা কর্কর খাদ্য শৃঙ্খল বা জালের সূচনা করে।

সব প্রাণীই তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভিদের উপর (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) নির্ভরশীল। তাই এদেরকে খাদক এবং পরভোজীও বলা হয়। যদি এরা উৎপাদক অর্থাৎ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে তখন তাদের প্রাথমিক খাদক বলে এবং যদি একটি প্রানী অন্য একটি প্রানীকে ভক্ষন করে যারা পরবর্তীতে উদ্ভিদকে (অথবা উদ্ভিদ পদার্থ) খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে তাদের গৌন খাদক বলে। এভাবে তোমরা প্রগৌন খাদকও পেতে পার। প্রাথমিক খাদকগুলো স্পষ্টতই তৃণভোজী। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত কিছু সুপরিচিত তৃণভোজী প্রানী হলো কীটপতঙ্গ, পাখী ও স্তন্যপায়ী এবং কম্বোজ (মোলাস্কা) পর্বভুক্ত প্রানীরা হলো জলজ বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত তৃণভোজী প্রানী।

যে সব খাদক এই তৃণভোজী প্রানীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে, তাদের বলে মাংসাশী বা আরও সঠিক ভাবে প্রাথমিক মাংসাশী (যদিও গৌন খাদক) বলে। যে সব প্রাণীরা প্রাথমিক মাংসাশী প্রাণীদের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল, তাদের গৌন মাংসাশী রূপে চিহ্নিত করা হয় একটি সরল শিকারজীবী খাদ্য শৃঙ্খল [Grazing food Chain (GFC)] নীচে দেখানো হলো:

ঘাস - - - - - ➜ ছাগল - - - - - - ➜ মানুষ - - - - - ➜
(উৎপাদক) (প্রাথমিক খাদক) (গৌন খাদক)

ডেট্রিটাস বা কর্কর খাদ্য শৃঙ্খল [Detritus Food Chain (DFC)] শুরু হয় মৃত জৈব বস্তু থেকে। এই ধরণের খাদ্য শৃঙ্খলটি বিয়োজক জীবদ্বারা গঠিত হয়, যারা হলো পরভোজী জীব প্রধানত ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়া। এরা ডেট্রিটাস অথবা মৃত জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের শক্তি এবং পরিপোষকের চাহিদা পূরণ করে। এদের আবার মৃতজীবী বা স্যাপরোট্রফ (Sapro : বিয়োজন ঘটানো) রূপেও গন্য করা হয়। বিয়োজক জীব থেকে ক্ষরিত উৎসেচকগুলো মৃত এবং বর্জ্য বস্তুকে ভেঙ্গে সরল অজৈব বস্তুতে পরিণত করে যারা পরবর্তী সময়ে এদের দ্বারাই শোষিত হয়। একটি জলজ বাস্তুতন্ত্রে শিকারজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (GFC) হল শক্তি প্রবাহের প্রধান পথ। এর বিপরীতে একটি স্থলভূমির বাস্তুতন্ত্রে শিকারজীবী খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে শক্তির যতটা অংশ প্রবাহিত হয়, তার তুলনায় শক্তির অনেকটা বড় অংশ ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। শিকারজীবী খাদ্য শৃঙ্খল (GFC) কিছুস্তরে কর্কর বা ডেট্রিটাস যাদ্য শৃঙ্খলের (DFC) সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কর্কর খাদ্য শৃঙ্খলের কিছু কিছু জীব আবার শিকারজীবী খাদ্যশৃঙ্খলের প্রানীদের শিকারে পরিনত হয়, এবং একটি প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে আরশোলা, কাক ইত্যাদির মত প্রানী রয়েছে, যারা সর্বভুক। খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর মধ্যে এই প্রাকৃতিক আন্ত:সম্পর্ক একে খাদ্যজালে পরিণত করে। এক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে মানুষকে শ্রেনীভুক্ত করবে?

জীবসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন্ স্থানটি অধিকার করবে অথবা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হবে তা অন্যজীব সমূহের সঙ্গে তাদের খাদ্য খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। জীব সমূহের পরিপোষক বা খাদ্যের উৎসের উপর নির্ভর করে খাদ্য শৃঙ্খলের-যে নির্দিষ্ট স্থানটি এরা দখল করে তা এদের পুষ্টিস্তর বা ট্রফিক লেভেল রূপে পরিচিত। উৎপাদকরা প্রথম স্তর, তৃণভোজী (প্রাথমিক খাদক) প্রানীরা দ্বিতীয় এবং মাংসাশী (গৌন খাদক) প্রানীরা তৃতীয় ট্রফিক স্তরভুক্ত হয় (চিত্র: 14.2)।

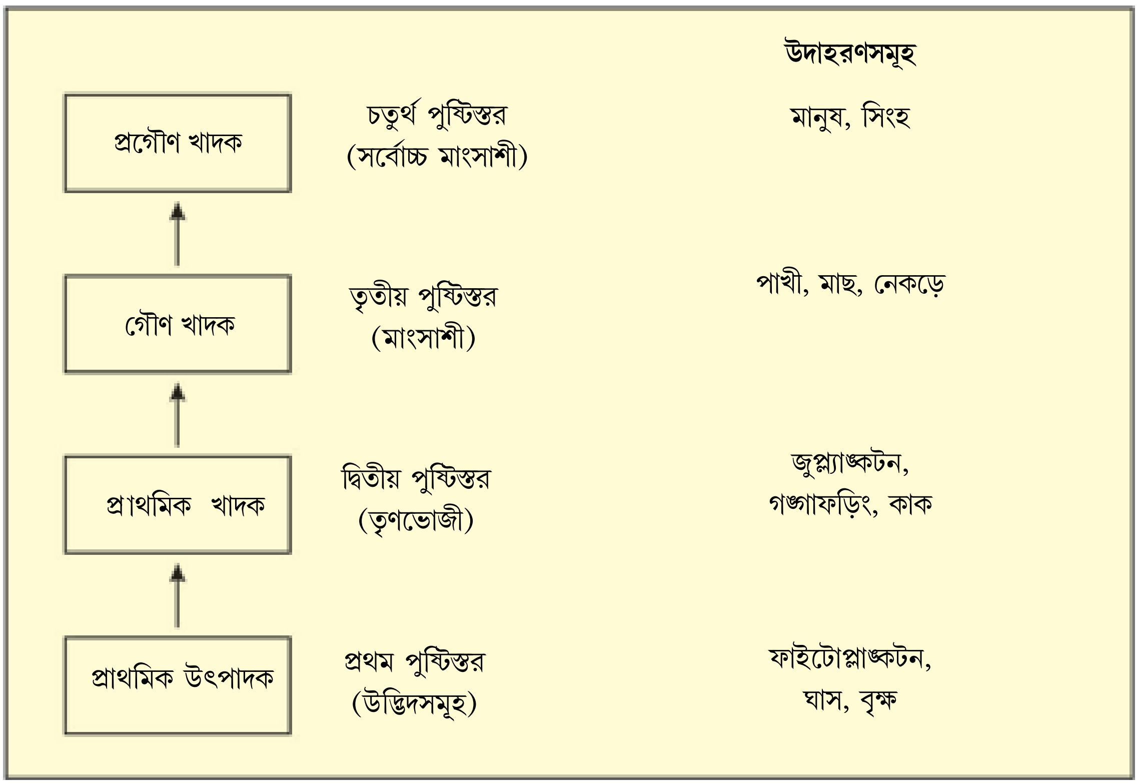

চিত্র: 14.2 একটি বাস্তুতন্ত্রস্থিত বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের চিত্ররূপ প্রদর্শন

লক্ষ্য করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত পুষ্টিস্তরগুলোতে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়। যখন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটে এটি ডেট্রিটাস বা মৃত জীবভরে পরিণত হয় যা বিয়োজকদের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি পুষ্টিস্তরের জীবসমূহ তাদের শক্তির চাহিদা মেটাতে সেইসব জীবদের উপর নির্ভর করে যারা ঐ জীবদের পুষ্টিস্তরের নীচে অবস্থান করে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি পুষ্টি স্তরের সজীব বস্তুর যে নির্দিষ্ট ভর রয়েছে তাকে স্ট্যান্ডিং ক্রুপ (Standing Crop) বলে। একটি একক ক্ষেত্রফলে সজীব বস্তুর সংখ্যা বা সজীব বস্তুর ভর রূপে স্ট্যান্ডিং ক্রপ পরিমাপ করা হয়। একটি প্রজাতির বায়োমাসকে তার সরস বা শুষ্ক ওজন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তবে জীবভর বা বায়োমাসের পরিমাপ শুষ্ক ওজনে প্রকাশ করাই অধিকতর সঠিক। কেন ?

একটি শিকারজীবী খাদ্য শৃঙ্খলের (GFC) পুষ্টি স্তরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে কারণ শক্তির স্থানান্তরন সর্বদা 10% নীতি অনুসরণ করে - অর্থাৎ কেবলমাত্র শক্তির 10% প্রতিটি পুষ্টিস্তরে তার নিম্ন পুষ্টিস্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়। প্রকৃতিতে একটি শিকারজীবী খাদ্য শৃঙ্খলে অনেক পুষ্টিস্তর থাকা সম্ভবপর হয় - উৎপাদক, তৃণভোজী, প্রাথমিক খাদক, গৌন খাদক ইত্যাদি (চিত্র: 14.3)। *তোমরা কি মনে করো কর্কর খাদ্য শৃঙ্খলেও এইরূপ কোনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে ?*

চিত্র: 14.3 বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রবাহ

14.5 বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড (Ecological Pyramids)

তোমরা একটি পিরামিডের আকৃতির সাথে অবশ্যই পরিচিত আছ। পিরামিডের ভূমি প্রশস্ত হয় এবং এটি এর চূড়ার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে আসে। যদি তোমরা বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে উপস্থিত জীবসমূহের মধ্যে খাদ্য বা শক্তির সম্পর্ককে প্রকাশ করতে চাও তবে তোমরা পিরামিডের আকৃতির অনুরূপ একটি আকৃতি পাবে। এই সম্পর্ককে সংখ্যা, জীবভর বা শক্তি রূপে প্রকাশ করা যায়। প্রতিটি পিরামিডের ভূমি উৎপাদক বা প্রথম পুষ্টিস্তরকে উপস্থাপন করে, যেখানে এর শীর্ষদেশ বা চূড়া প্রগৌন অর্থাৎ

সর্বোচ্চ সারির খাদককে উপস্থাপন করে। যে তিনটি বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সাধারণত অধ্যয়ন করা হয় সেগুলি হল -

(a) সংখ্যার পিরামিড, (b) জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড এবং (c) শক্তির পিরামিড বিস্তারিত ভাবে বোঝার জন্য চিত্র 14.4 ক, খ, গ এবং ঘ লক্ষ কর।

শক্তির পরিমানের, জীবভর অথবা সংখ্যার যে কোন গণনাতেই কোনো পুষ্টিস্তরস্থিত সব জীবসমূহকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যদি আমরা যে কোনো পুষ্টিস্তরের কেবলমাত্র অল্পকিছু জীবকে

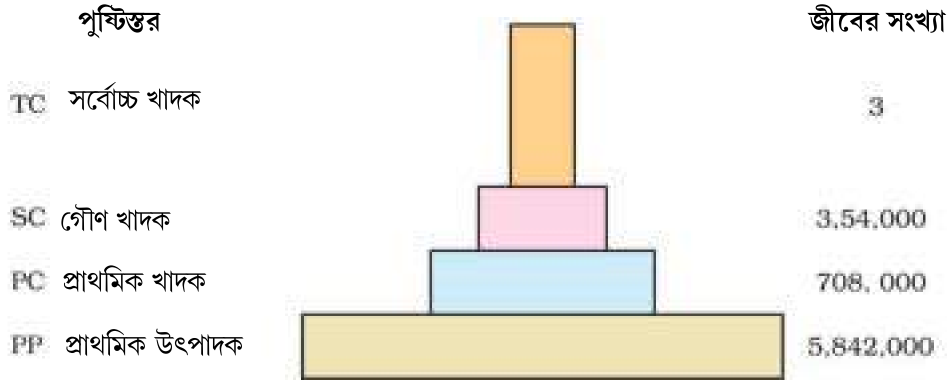

চিত্র: 14.4 (ক) একটি তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিড। একটি বাস্তুতন্ত্রে প্রায় 6 মিলিয়ন উদ্ভিদের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি স্তরে বসবাসকারী কেবলমাত্র 3টি মাংসাশী জীব টিকে থাকতে পারে।

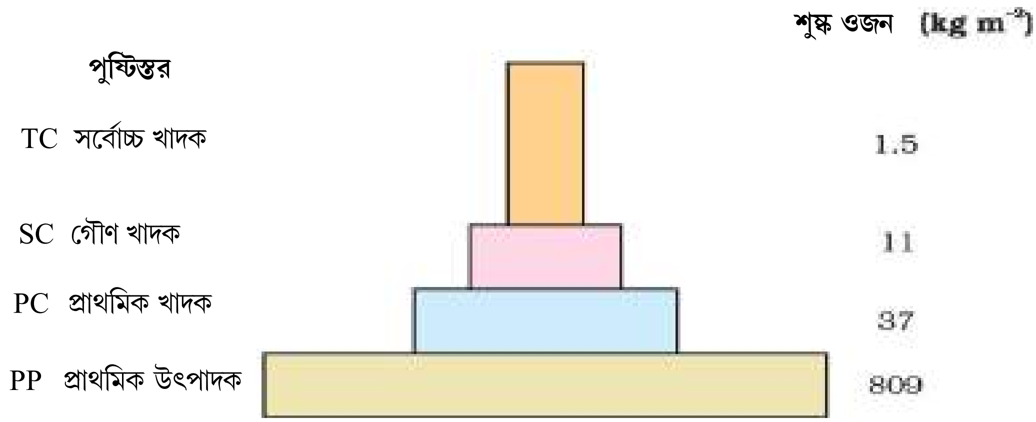

চিত্র: 14.4 (খ) বায়োমাসের পিরামিডের সাহায্যে উচ্চতর পুষ্টি স্তরের বায়োমাসের দ্রুত হ্রাস দেখানো হচ্ছে।

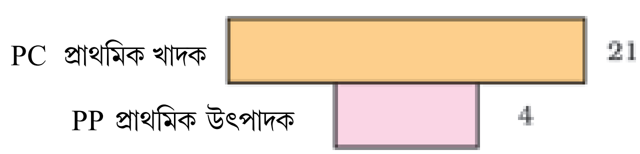

চিত্র: 14.4 (গ) বায়োমাসের উল্টানো পিরামিড। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের অল্পসংখ্যক স্ট্যান্ডিং ক্রপ জুপ্ল্যাঙ্কটনের বিশাল স্ট্যান্ডিং ক্রপকে সহায়তা প্রদান করছে।

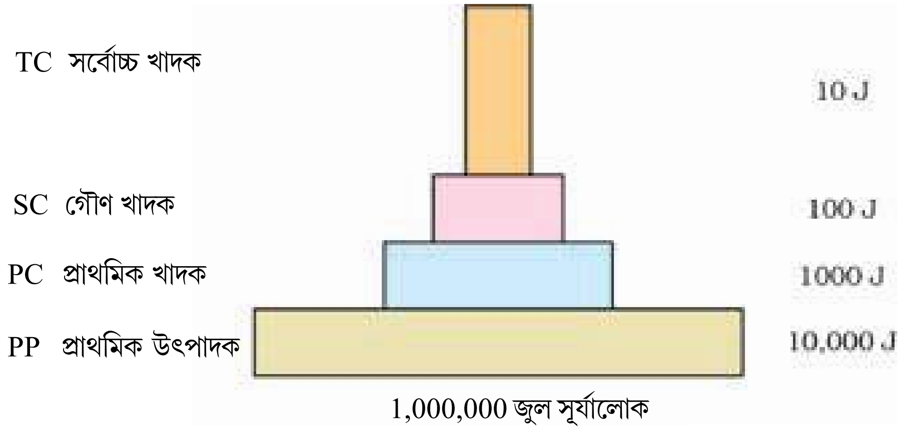

চিত্র: 14.4 (ঘ) একটি আদর্শ শক্তির পিরামিড। লক্ষ্য করে দেখ যে প্রাথমিক উৎপাদক তাদের কাছে লভ্য মোট সৌরশক্তির কেবলমাত্র 1% কে প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনে (NPP) রূপান্তরিত করে।

গণনার আওতায় আনি, তবে আমাদের দ্বারা করা কোনো সাধারণীকরনই সত্য হবে না। এছাড়া একটি প্রদত্ত জীব একই সঙ্গে একাধিক পুষ্টি স্তরেও অবস্থান করতে পারে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোনো পুষ্টি স্তর একটি কার্য্যকরী স্তরকেই উপাস্থাপন করে, কোনো একটি প্রজাতির নয়। একটি প্রদত্ত প্রজাতির জীব একই বাস্তুতন্ত্রের একাধিক পুষ্টিস্তরে অবস্থান করতে পারে; যেমন চড়াই পাখি যখন বীজ, ফল অথবা মটর ভক্ষণ করে তখন সেটি প্রাথমিক খাদক রূপে পরিগণিত হয়, আবার যখন পাখীটি পতঙ্গ এবং কেঁচো ভক্ষন করে তখন সেটি গৌন খাদক রূপে বিবেচিত হয়। *একটি খাদ্য শৃঙ্খলের পুষ্টিস্তরে মানুষ কার্য্যকরী থাকে, তা কি তোমরা বের করতে পারবে ?*

বেশীর ভাগ বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যা, শক্তি ও জীবভরের পিরামিডগুলি উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ উৎপাদক জীবের সংখ্যা ও বায়োমাসের পরিমাণ তৃণভোজীদের তুলনায় অধিক হয় এবং তৃণভোজী জীবের সংখ্যা ও বায়োমাসের পরিমাণ মাংসাশী জীবের তুলনায় অধিক হয়। আবার শক্তির পরিমাণও উচ্চতর পুষ্টিস্তরের তুলনায় নীচের পুষ্টিস্তরে সর্বদা অধিক হয়।

এই সাধারণীকরনের আবার ব্যাতিক্রমও রয়েছে। যদি তোমরা একটি বৃহৎ বৃক্ষের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল এমন পতঙ্গের সংখ্যা গণনা কর, তাহলে তোমরা কি ধরণের পিরামিড পেতে পার ? এখন সেই পতঙ্গগুলির উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল এমন ছোট পাখীর সংখ্যা কত হবে তা গণনা কর; আবার সেই ছোট পাখীকে ভক্ষন করে এমন বড় পাখীর সংখ্যা গণনা কর। উপরোক্ত সংখ্যাগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে তোমরা যে আকৃতিটি পাবে সেটি অঙ্কন করো।

সমুদ্রের জীবভরের পিরামিড সর্বদা উর্দ্ধমুখী হয়, কখনও উল্টানো হতে পারেনা, কারণ যখন শক্তি কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরের দিকে প্রবাহিত হয়, প্রতিটি ধাপে সর্বদা তাপশক্তি রূপে কিছু পরিমাণ শক্তির ক্ষয় হয়। শক্তির পিরামিডের প্রতিটি স্তম্ভ একটি প্রদত্ত সময়ে অথবা বার্ষিক প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রতিটি পুষ্টিস্তরে কতটা শক্তি রয়েছে তা নির্দেশ করে।

যদিও বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন একই প্রজাতির জীবের দুই বা ততোধিক পুষ্টি স্তরে অবস্থানকে বিবেচনায় আনা হয়না। এটি একটি সরল খাদ্য শৃঙ্খলের ধারণা প্রকাশ করে, বাস্তবে যা প্রকৃতিতে প্রায় কখনোই পাওয়া যায় না। বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডে খাদ্যজালের কোনো স্থান নেই। আরও বলা যায়, বাস্তুতন্ত্রে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের মৃতজীবীদের জন্য কোনো স্থান রাখা হয়নি।

14.6 বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম (Ecological Succession)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তোমরা পপুলেশন ও সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের উপর ও তাদের সাড়া এবং কি ভাবে এরূপ সাড়া গুলি একক জীবের সাড়া থেকে পৃথক হয় তা জেনেছ। চল আমরা সময়ের সঙ্গে পরিবেশের সম্প্রদায়গত সাড়ার অন্য দিকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষন করি।

সব সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পরিবর্তনশীল পরিবেশগত অবস্থার সঙ্গে সাড়া দিতে গিয়ে এদের উপাদান এবং গঠনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নিয়মিত, ধারাবাহিক এবং ভৌত পরিবেশে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর সাথে সমান্তরাল হয়। এই পরিবর্তন সমূহের ফলে সবশেষে এমন একটি সম্প্রদায় বা কমিউনিটি গঠিত হয় যা পরিবেশের সাথে সাম্যবস্থায় থাকে এবং তাকে ক্ল্যাইম্যাক্স কমিউনিটি বলা হয়। একটি প্রদত্ত এলাকার প্রজাতির গঠনের এই ধারাবাহিক ও পুর্বঅনুমানযোগ্য পরিবর্তনকে বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম বা Ecological Succession। পর্যায়ক্রম চলাকালীন সময়ে কোনো কোনো প্রজাতির জীব কোন অঞ্চলে কলোনী গঠন করে এবং পাশাপাশি অন্য প্রজাতির জীবের পপুলেশন হ্রাস পেতে পারে, এমনকি পপুলেশনটি অবলুপ্তও হয়ে যেতে পারে।

একটি প্রদত্ত অঞ্চলে উপস্থিত সম্প্রদায় সমূহের সম্পূর্ণ ক্রমটি যা ধারাবাহিক ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাকে সিয়ার (Sere) বলে। একক পরিবর্তনশীল জীব সম্প্রদায় গুলোকে সেরাল দশা বা সেরাল সম্প্রদায় বলে। এই পর্যায়ক্রমিক সেরাল দশা গুলোতে জীবের প্রজাতি বৈচিত্রের পরিবর্তন হয় এবং জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি মোট বায়োমাসেরও বৃদ্ধি ঘটে।

পৃথিবীস্থিত বর্তমানকালের জীবসম্প্রদায়সমূহের পৃথিবীপৃষ্ঠে জীব সৃষ্টির শুরু থেকে লক্ষ বছরে ঘটা পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ফলেই এসেছে। প্রকৃতপক্ষে পর্যায়ক্রম এবং বিবর্তন ঐ সময়ে সংঘটিত হওয়া সমান্তরাল প্রক্রিয়াও হতে পারে। সুতরাং পর্যায়ক্রম হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা, যেখানে কোনো জীবের অস্তিত্ব নেই সেখানে শুরু হয় - এই অঞ্চলটি এমন অঞ্চলও হতে পারে যেখানে পূর্বে কখনও জীবের অস্তিত্ব ছিলনা যেমন - নগ্ন পাথুরে ভূমি, অথবা এমন অঞ্চলে যেখানে কোনো না কোনো কারণে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী জীবগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্বের পর্যায়ক্রমটিকে প্রাথমিক পর্যায়ক্রম এবং পরের পর্যায়ক্রমটিকে গৌনপর্যায়ক্রম রূপে গন্য করা হয়।

যে সব স্থানে প্রাথমিক পর্যায়ক্রম সংঘটিত হয়, তার উদাহরণ হল সদ্য শীতল হয়েছে এমন লাভা, নগ্ন পাথর, সদ্য তৈরী করা হয়েছে এমন পুকুর বা জলাধার। একটি নূতন জীব সম্প্রদায় সৃষ্টি সাধারণত ধীর গতিতে ঘটে। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব সমন্বিত একটি জীব সম্প্রদায় গঠিত হওয়ার পূর্বে সেখানে অবশ্যই মৃত্তিকা গঠিত হবে। প্রধানত জলবায়ুর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নগ্ন পাথরের উপর উর্বর মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার বছর লেগে যায়।

যে অঞ্চলে প্রাকৃতিক জীব সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানেই গৌন পর্যায়ক্রমের সূচনা হয়, যেমন পরিত্যক্ত কৃষিজমি, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা কেটে ফেলা হয়েছে এমন বনভূমি অথবা বন্যায় ভেসে গেছে এমন ভূমি। যেহেতু সেখানে কিছু হলেও মৃত্তিকা অথবা পলি থাকে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ক্রমের তুলনায় গৌণ পর্যায়ক্রম দ্রুততর হয়।

বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রমের বর্ণনা সাধারণত গাছপালার পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করে। তবে গাছপালার এই পরিবর্তন আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর খাদ্য এবং বাসস্থানকে প্রভাবিত করে। এইভাবে যত পর্যায়ক্রম প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে থাকে, প্রাণী এবং বিয়োজক জীবের সংখ্যা ও প্রকৃতির ও পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক বা গৌণ পর্যায়ক্রম চলাকালীন যে-কোনো সময়ে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বাধাসমূহ (দাবানল, বনধ্বংস ইত্যাদি) পর্যায়ক্রমের একটি নির্দিষ্ট সেরাল দশাকে তার পূর্ববর্তী দশায় পরিণত করতে পারে। এই ধরণের বাধাসমূহ নূতন পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে যা কিছু প্রজাতির জীবকে সুবিধা প্রদান করে এবং অন্য জীবদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে বা এদের অবলুপ্তির পথ সুগম করে।

14.6.1 উদ্ভিদের পর্যায়ক্রম (Succession of Plants)

একটি বাসস্থানের প্রকৃতি অর্থাৎ এটি জলাশয় কিনা (অথবা অত্যন্ত আর্দ্র অঞ্চল) বা অত্যন্ত শুষ্ক অঞ্চল কিনা এর উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের পর্যায়ক্রমকে যথাক্রমে হাইড্রার্ক বা জেরার্ক বলে। হাইড্রার্ক পর্যায়ক্রম আর্দ্র অঞ্চলে সংঘটিত হয় এবং পর্যায়ক্রমের ধাপগুলি জলজ অবস্থা (হাইড্রিক) থেকে মাঝারি জলজ (মেসিক) অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এর বিপরীতে জেরিক পর্যায়ক্রম শুষ্ক অঞ্চলে সংঘটিত হয় এবং এর ধাপগুলি জেরিক থেকে মেসিক অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং হাইড্রার্ক ও জেরার্ক উভয়প্রকার পর্যায়ক্রমই মাঝারি জলজ অবস্থায় (মেসিক) উপনীত হয় - যা অতি শুষ্কও নয় (জেরিক) আবার অতি আর্দ্রও (হাইড্রিক) নয়।

যে প্রজাতিটি উদ্ভিদশূন্য নগ্ন ভুমিতে বসবাস করতে শুরু করে তাদের পায়োনিয়ার প্রজাতি বলে। পাথরের উপর সংঘটিত প্রাথমিক পর্যায়ক্রমে পায়োনিয়ার প্রজাতি হল সাধারণত লাইকেন যারা পাথরকে দ্রবীভূত করার জন্য অম্ল ক্ষরণে সমর্থ হয় এবং এইভাবে মৃত্তিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এইগুলি পরবর্তী সময়ে ব্রায়োফাইটার মতো অত্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জন্য ঐ স্থানে জন্মানোর পথ সুগম করে, যারা খুব সামান্য পরিমান মাটিতেও টিকে থাকতে পারে। সময়ের সঙ্গে এই উদ্ভিদগুলো বড় উদ্ভিদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং আরও অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করার পর অবশেষে একটি স্থিতিশীল চূড়ান্ত বন সম্প্রদায় (Climax forest community) গঠিত হয়। যতদিন পর্যন্ত পরিবেশ অপরির্তিত থাকে ততদিন পর্যন্ত এই চূড়ান্ত বন সম্প্রদায় স্থিতিশীল থেকে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাঙ্গাল বাসস্থান মাঝারি জলজ (মেসোফাইটিক) বাসস্থানে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

জলাশয়ে সংঘটিত হওয়া প্রাথমিক পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ফাইটোপ্লাঙ্কটনরা হল পায়োনিয়ার প্রজাতি, যারা সময়ের সাথে সাথে মূল বিশিষ্ট জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ, মূল বিশিষ্ট ভাসমান সপুষ্পক উদ্ভিদ, পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে ভাসমান উদ্ভিদ, তারপর শর-জল উদ্ভিদ (reed swamp), জলা তৃণভূমি উদ্ভিদ (marsh - midow) গুল্মরজি (scrub) এবং অবশেষে বৃক্ষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সম্প্রদায়টি বনভূমিই হবে। সময়ের সাথে সাথে জলাশয়টি স্থলভূমিতে পরিবর্তিত হয় (চিত্র:14.5)।

গৌন পর্যায়ক্রমে কোন্ জীবটি প্রথম বসতি স্থাপন করতে শুরু করে তা মৃত্তিকার অবস্থা, জলের লভ্যতা, পরিবেশ এবং বীজ ও অন্যান্য বংশবৃদ্ধির এককের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেহেতু গৌন পর্যায়ক্রমে মৃত্তিকা প্রথম থেকেই থাকে, তাই পর্যায়ক্রমের হার অনেকটা দ্রুততর হয় এবং তাই চূড়ান্ত সম্প্রদায়ও তুলনামূলক তাড়াতাড়ি গঠিত হয়।

এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, পর্যায়ক্রম, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ক্রম একটি অত্যন্ত মন্থর প্রক্রিয়া যেখানে চূড়ান্ত সম্প্রদায় গঠিত হতে কয়েক হাজার বছর লেগে যেতে পারে। আরও একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে - জল অথবা স্থল পর্যায়ক্রম যেখানেই ঘটুক না কেন, উভয়ক্ষেত্রেই যে একই ধরনের চরম সম্প্রদায় অর্থাৎ মাঝারি জলজ (মেসিক) সম্প্রদায় গঠিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয় তা বুঝতে পারা।

14.7 পরিপোষকের চক্রাকার আবর্তন (Nutrient Cycling)

তোমরা একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেছ যে জীবসমূহের বৃদ্ধি, জনন ও দেহের নানবিধ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে পরিপোষকের একটি নিয়মিত যোগান থাকা আবশ্যক। একটি প্রদত্ত সময়ে মাটিতে উপস্থিত কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মত পরিপোষকের পরিমানকে স্ট্যান্ডিং স্টেট (Standing State) বলা হয়। বিভিন্ন ধরণের বাস্তুতন্ত্রে এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, পরিপোষক গুলো কখনও বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যায় না, বরং

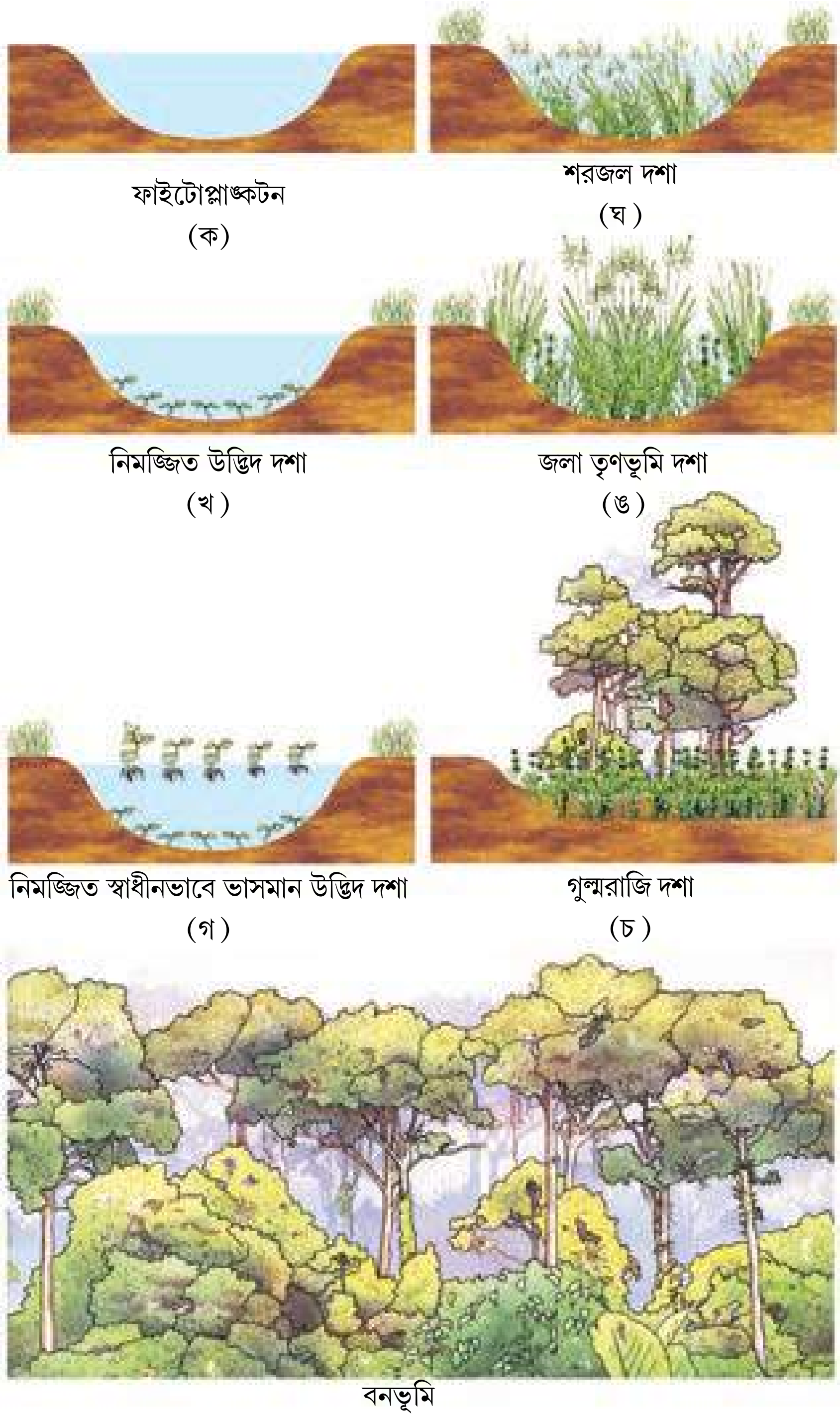

চিত্র 14.5 প্রাথমিক পর্যায়ক্রমের চিত্ররূপ উপস্থাপন

তাদের বার বার পুন:চক্রায়ন ঘটে (recycled) এবং এই আবর্তন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যদিয়ে পরিপোষক পদার্থের এই প্রবাহকে বলা হয় পরিপোষক চক্র। একটি বাস্তুতন্ত্রে পরিপোষক চক্রের অপর নাম হল জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্র (জৈব জীবদেহ সংক্রান্ত, ভূ-পাথর, জল, বায়ু)। পরিপোষক চক্র আবার দুই প্রকার যেমন (ক) গ্যাসীয় চক্র (খ) পাললিক চক্র। গ্যাসীয় পরিপোষক চক্রের (উদাহরণ- নাইট্রোজেন, কার্বন চক্র) সঞ্চয় ভাণ্ডার বায়ুমন্ডলে বিদ্যমান

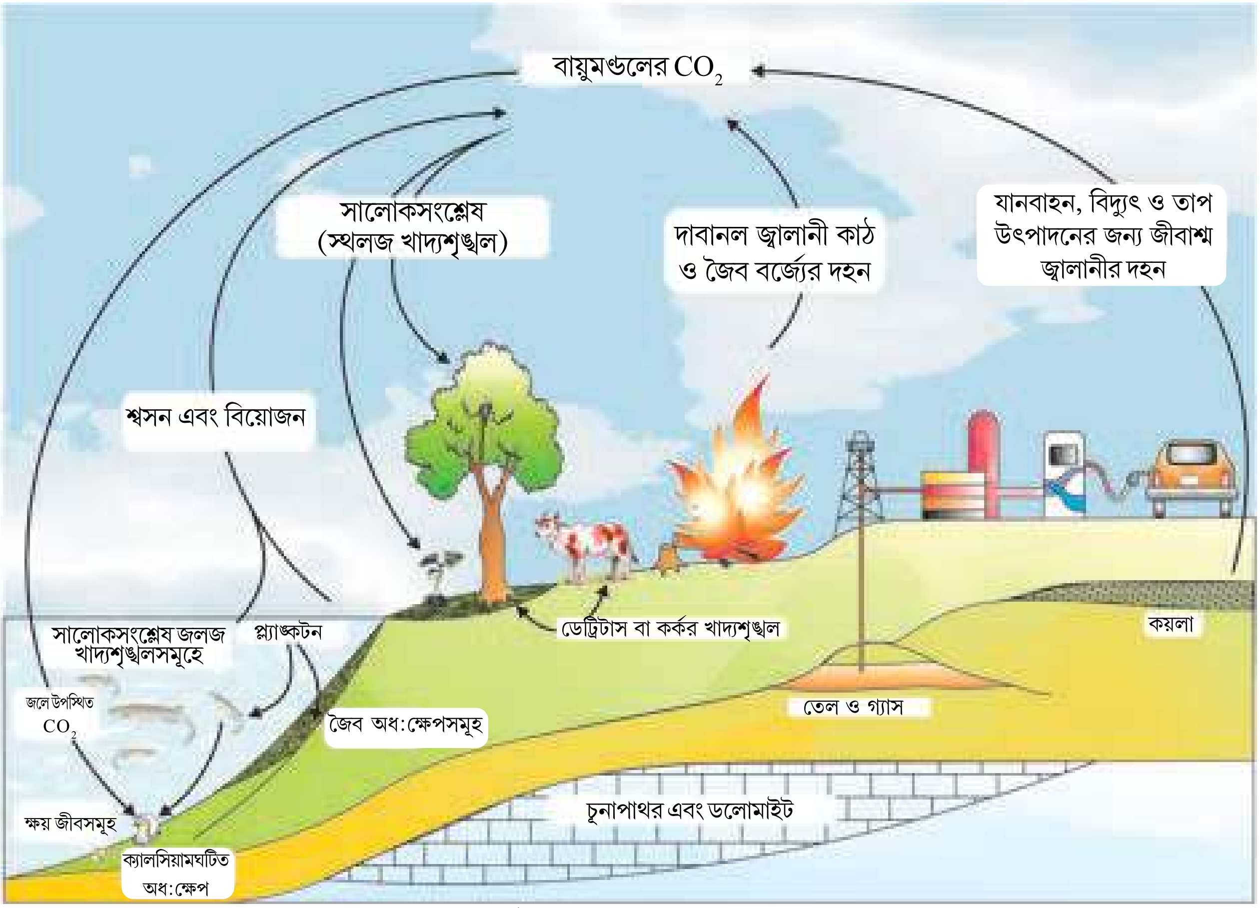

চিত্র 14.6 জীবমণ্ডলে কার্বনচক্রের একটি সরলীকৃত মডেল।

থাকে, অন্যদিকে পাললিক চক্রের (উদাহরণ - সালফার এবং ফসফরাস চক্র) সঞ্চয় ভাণ্ডার ভূ-ত্বকে অবস্থিত।

পরিবেশীয় প্রভাবক যেমন মৃত্তিকা, আর্দ্রতা, P^H, তাপমাত্রা ইত্যাদি বায়ুমন্ডলে পরিপোষকের মুক্তির হার নিয়ন্ত্রন করে। সঞ্চয় ভাণ্ডারের কাজ হল পরিবেশে বিভিন্ন পরিপোষকের আগমন ও নির্গমনের হারের অসাম্যের কারণে সংঘটিত ঘাটতি পূরণ করা।

তোমরা একাদশ শ্রেণীতে নাইট্রোজেন চক্র বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ন করেছ। এখানে কার্বন ও ফসফরাস চক্র বর্ণনা করা হল।

14.7.1 বাস্তুতন্ত্র কার্বন চক্র (Ecosystem - Carbon Cycle)

যখন তোমরা সজীব বস্তু সমূহের গঠন অধ্যয়ন করবে, তোমরা দেখতে পাবে যে জীবের শুষ্ক ওজনের 49 শতাংশ কার্বন দ্বারা গঠিত হয় এবং জীবদেহ গঠনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর মধ্যে পরিমানগত

দিক থেকে কার্বনের স্থান জলের ঠিক পরেই। আমরা যদি সারাবিশ্বের কার্বনের মোট পরিমানের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে 71 শতাংশ কার্বন সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। কার্বনের এই সামুদ্রিক সঞ্চয় ভান্ডার বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমান নিয়ন্ত্রন করে (চিত্র: 14.6)। তোমরা কি জান যে, সমগ্রবিশ্বে উপস্থিত মোট কার্বনের প্রায় 1 শতাংশ কার্বনই কেবলমাত্র বায়ুমন্ডলে রয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানীও কার্বনের একটি সঞ্চয় ভান্ডার রূপে কাজ করে। কার্বন চক্রায়ন, বায়ুমন্ডল, সমুদ্র এবং জীবিত ও মৃত জীবসমূহের মধ্যদিয়ে সংঘটিত হয়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বছরে 4×10^{13} kg কার্বন জীবমন্ডলে আবদ্ধ হয়। বেশ কিছু পরিমান কার্বন উৎপাদক এবং খাদক জীবদের শ্বাসকার্য্যের মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে বায়ুমন্ডলে ফেরত আসে। বিয়োজক জীবরাও সমুদ্র এবং স্থলভাগস্থিত বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত জৈব বস্তুর বিয়োজন ঘটানোর মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পুল এ কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযোজন করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কিছু পরিমান আবদ্ধ কার্বন চক্রাকার পথ থেকে মুক্ত হয়ে পলল রূপে জমা হয় এবং এইভাবে কার্বন চক্র থেকে অপসারিত হয়। জ্বালানী কাঠের দহন, দাবানল এবং জৈব বস্তুর দহন, জীবাশ্ম জ্বালানী, অগ্নুৎপাত হল বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের আরও কিছু অতিরিক্ত উৎস।

মানুষের ক্রিয়াকলাপ কার্বন-চক্রকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করে। দ্রুত হারে বন ধ্বংস এবং শক্তির চাহিদা মেটাতে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য জীবাশ্মজ্বালানীর ব্যাপক দহন, বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হারকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বাড়িয়েছে (যোড়শ অধ্যায়ে আলোচিত গ্রীণ হাউস প্রভাব দেখ)।

14.7.2. বাস্তুতন্ত্র-ফসফরাস চক্র (Ecosystem - Phosphorus Cycle)

জীবদেহস্থিত আবরনীসমূহ, নিউক্লিক অম্ল এবং কোশীয় শক্তির স্থানান্তরণ তন্ত্রের একটি মুখ্য গঠনগত উপাদান হল ফসফরাস। বহু প্রানীদের ও তাদের খোলক, অস্থি এবং দাঁত গঠনের জন্য এই মৌলটির প্রচুর পরিমানে প্রয়োজন হয়। ফসফরাসের প্রাকৃতিক সঞ্চয় ভান্ডার হল শিলা, যেখানে ফসফরাস ফসফেট রূপে বর্তমান। যখন শিলার আবহবিকার ঘটে, তখন এই ফসফেট যৌগগুলির খুব অল্প পরিমান মৃত্তিকার দ্রবনে দ্রবীভূত হয় এবং উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত হয় (চিত্র-14.7)। তৃণভোজী এবং অন্যান্য প্রানীরা উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে এই মৌলটি পায়। বর্জ্যবস্তু এবং মৃত জীবসমূহ ফসফেট দ্রবীভূত করনে সক্ষম এমন জীবানুর দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং এর ফলে ফসফরাস মুক্ত হয়। কার্বন চক্রের মতো শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে ফসফরাস মুক্ত হয় না। তোমরা কি কার্বনচক্র ও ফসফরাস চক্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারো।

কার্বন চক্র ও ফসফরাস চক্রের মধ্যে আরও দুটি প্রধান পার্থক্য রয়েছে— প্রথমত : বৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে ফসফরাস সংযোজনের পরিমান কার্বন সংযোজনের তুলনায় অনেকটা কম হয়। দ্বিতীয়ত: পরিবেশ এবং জীবসমূহের মধ্যে ফসফরাসের গ্যাসীয় আদান প্রদান খুব নগন্য মাত্রায় ঘটে।

14.8 বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা (Ecological Services)

একটি সুস্থিত বাস্তুতন্ত্র হল বৃহৎ পরিসরে অর্থনৈতিক, পরিবেশীয় এবং নান্দনিক দ্রব্য এবং বিবিধ পরিষেবার ভিত্তিস্বরূপ। বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহকে বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা রূপে গন্য করা হয়; উদাহরণস্বরূপ-সুস্থিত বনভূমির বাস্তুতন্ত্র সমূহ জল এবং বায়ু পরিশোধন করে, খরা ও বন্যা প্রশমিত করে, বন্য প্রনীদের বাসস্থান যোগায়, জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করে, শষ্য জাতীয় উদ্ভিদের পরাগ সংযোগ ঘটায়, কার্বনের জন্য সঞ্চয়ের স্থান প্রদান করে এবং নান্দনিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধও জাগিয়ে তোলে। যদিও জৈববৈচিত্র্যের এ ধরণের পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন, তবুও এটা ভাবা যুক্তি সঙ্গাত বলে মনে হয় যে এই জৈববৈচিত্র্যের একটি সুবিশাল মূল্যমান থাকা উচিৎ।

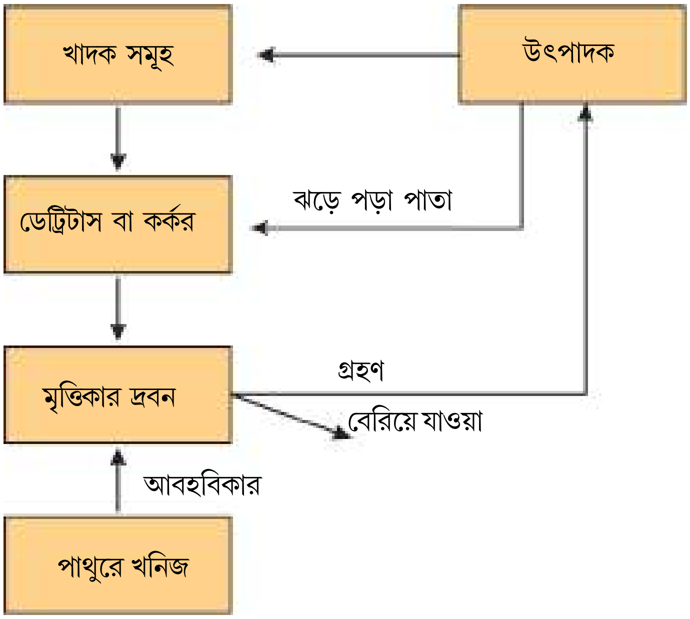

14.7 একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ফসফরাস চক্রের একটি সরলীকৃত মডেল

অতি সম্প্রতি রবার্ট কনস্ট্যানজা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ প্রকৃতির জীবনদায়ী পরিষেবাসমূহের মূল্যমান নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। গবেষকরা এই মৌলিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবার উপর গড় মূল্য বছরের 33 ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার নির্ধারণ করেছেন যা বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। এই পরিষেবার মূল্যমান সমগ্র বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি (18 ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার)। বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবার মোট মূল্যের 50 শতাংশ ভূমি গঠনের জন্য এবং বিনোদন, পরিপোষক চক্রায়নের মত পরিষেবার জন্য প্রতিক্ষেত্রে 10 শতাংশেরও কম ব্যায়িত হয়। জলবায়ু নিয়ন্ত্রন এবং বন্যজীবের বাসস্থানের জন্য প্রতিক্ষেত্রে প্রায় 6 শতাংশ ব্যয়িত হয়।

সারসংক্ষেপ

বাস্তুতন্ত্র হল প্রকৃতির গঠনগত ও কার্যগত একক এবং এটি জীবজ ও অজীবজ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। অজীবজ উপাদানগুলি হল অজৈব পদার্থ যেমন- বায়ু জল মৃত্তিকা; যেখানে জীবজ উপাদানগুলি হল উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজক। প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের জীবজ ও অজীবজ উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে একটি বিশেষ ভৌত গঠন গড়ে উঠে। প্রজাতি গঠন এবং স্তরবিন্যাস হল একটি বাস্তুতন্ত্রের প্রধান দুটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য। পরিপোষকের উৎসের উপর নির্ভর করে প্রতিটি জীবই বাস্তুতন্ত্রের একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করে।

উৎপাদনশীলতা, বিয়োজন, শক্তিপ্রবাহ এবং পরিপোষকের চক্রায়ন হল বাস্তুতন্ত্রের প্রধান চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা হল উৎপাদক কতৃক সৌর শক্তি আবদ্ধকরণ বা বায়োমাস উৎপাদনের হার। এটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত যেমন মোট প্রথমিক উৎপাদনশীলতা (GPP) এবং প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP)। সৌরশক্তি আবদ্ধ করণের বা মোট জৈব বস্তুর উৎপাদনের হারকে বলা হয় মোট প্রথমিক উৎপাদনশীলতা। উৎপাদকের ব্যবহারের পর যে পরিমান জীবভর বা বায়োমাস অবশিষ্ট থাকে তা হল প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশতীলতা। গৌণ উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় খাদক দ্বারা খাদ্য মধ্যস্থ শক্তির আত্তীকরণের হার। বিয়োজন কালে ডেট্রিটাসের জটিল জৈব বস্তুর বিয়োজক জীবের প্রভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং সরল অজৈব পরিপোষকে পরিণত হয়। বিয়োজক তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে— এগুলো হল ডেট্রিটাসের খন্ডীভবন, লীচিং এবং অপচিতি।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ একমুখী হয়। প্রথমে উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে নিজ দেহে আবদ্ধ করে, তারপর খাদ্য উৎপাদক থেকে বিয়োজক সমূহে স্থানান্তরিত হয়। প্রকৃতিতে বিভিন্ন পুষ্টি স্তরের জীবগুলো খাদ্য বা শক্তির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একে অপরের সাথে যুক্ত থেকে একটি খাদ্য শৃঙ্খল গঠন করে। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে দিয়ে পরিপোষক মৌলের সঞ্চয় এবং চলাচলকে পরিপোষকের চক্রায়ন বলে (Nutrient Cycling) এবং এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে পরিপোষক পদার্থ সমূহ বার বার ব্যবহৃত হয়। পরিপোষক চক্র আবার দুই ধরণের হয়— যেমন গ্যাসীয় চক্র এবং পাললিক চক্র। বায়ুমন্ডল এবং জলমন্ডল হল গ্যাসীয় প্রকৃতির পরিপোষক চক্রের (কার্বন) সঞ্চয় ভান্ডার। আবার ভূত্বক হল পাললিক পরিপোষক চক্রের (ফসফরাস) সঞ্চয় ভান্ডার। বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোতে উৎপন্ন বস্তুসমূহকে বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা; যেমন বনভূমির সাহায্যে বায়ু এবং জলের পরিশোধন।

জীবজ সম্প্রদায় সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ধারা বাহ্যিক ভাবে সুবিন্যস্ত এবং বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম গঠন করে। কোনো অনাবৃত, জীবনের অস্তিত্বহীন অঞ্চলে কোনো পায়োনীয়ার সম্প্রদায়ের আগমনের ফলে বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রমের সূচনা ঘটে যার ফলে একটি স্থিতিশীল চূড়ান্ত সম্প্রদায় গঠিত হয়। যতক্ষন পর্যন্ত পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষন পর্যন্ত চূড়ান্ত সম্প্রদায় স্থিতিশীল থাকে।

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ করো:—
   ক) উদ্ভিদকে ___________বলা হয় কারণ এরা নিজেদের দেহে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবদ্ধ করতে পারে।
   খ) উদ্ভিদের আধিক্য রয়েছে এমন বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিডটি ___________ প্রকারের হয়।

গ) জলজ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদনের সীমাস্থ প্রভাবকটি হল ___________।
ঘ) আমাদের বাস্তুতন্ত্রে সাধারণ বিয়োজক জীবগুলি হল ___________।
ঙ) পৃথিবীতে কার্বনের প্রধান সঞ্চয় ভান্ডার হল ___________।

2. একটি খাদ্যশৃঙ্খলে নিম্নলিখিত কোন্‌টির পপুলেশন সর্বাধিক হয়—
   ক) উৎপাদক
   খ) প্রাথমিক খাদক
   গ) গৌণ খাদক
   ঘ) বিয়োজক
3. জলাশয়ের দ্বিতীয় পুষ্টি স্তরটি হল—
   ক) ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন
   খ) জুপ্ল্যাঙ্কটন
   গ) বেনথস
   ঘ) মাছ
4. গৌণ উৎপাদক সমূহ হল—
   ক) তৃণভোজী
   খ) উৎপাদক
   গ) মাংসাশী
   ঘ) উপরের কোনোটাই নয়
5. ভূ-পৃষ্ঠে পতিত সৌর বিকিরণের কত শতাংশ সালোকসংশ্লেষীয় ভাবে সক্রিয় (PAR) বিকিরণ?
   ক) 100%
   খ) 50%
   গ) 1-5%
   ঘ) 2-10%
6. তুলনা কর:-
   ক) শিকারজীবি খাদ্যশৃঙ্খল এবং ডেট্রিটাস বা কর্কর খাদ্যশৃঙ্খল
   খ)উৎপাদন এবং বিয়োজন
   গ) উর্ধ্বমুখী এবং উল্টানো পিরামিড
   ঘ) খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজাল
   ঙ) ঝরে পড়া শুকনো উদ্ভিদ দেহাংশ (Litter) এবং ডেট্রিটাস বা কর্কর
   চ) প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা এবং গৌণ উৎপাদনশীলতা
7. একটি বাস্তুতন্ত্রে উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
8. বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের সংজ্ঞা দাও এবং উদাহরণ সহ সংখ্যার পিরামিড এবং জীবভরের পিরামিডের বর্ণাণা দাও।
9. প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কী? প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী শর্ত সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণাণা দাও।
10. বিয়োজনের সংজ্ঞা দাও এবং বিয়োজন প্রক্রিয়া এবং বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন উপজাত বস্তুসমূহের বর্ণনা দাও।
11. বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ কীভাবে ঘটে তা বর্ণনা কর।
12. বাস্তুতন্ত্রে পাললিক চক্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
13. বাস্তুতন্ত্রে কার্বন চক্রায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের সাহায্যে দেখাও।

অধ্যায় 15

জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ

BIODIVERSITY AND CONSERVATION

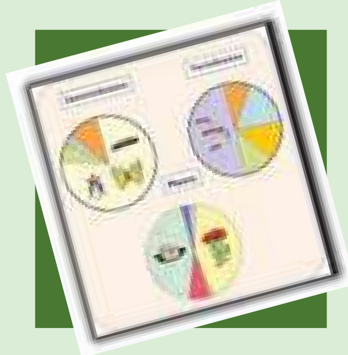

15.1 জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

15.2 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity Conservation)

যদি কোনো দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ বা ছায়াপথ থেকে এলিয়েন (alien) আমাদের গ্রহ পৃথিবীতে ভ্রমণে আসতো, তাহলে বিশাল বৈচিত্র্যের সম্মুখে এসে সেটি সর্বাগ্রে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তো। এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটে। পৃথিবীতে সজীববস্তুর বিশাল বৈচিত্র্য আমাদেরকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পরে যে, পিঁপড়ের 20,000 প্রজাতি, পোকার (beetles) 3,00,000 প্রজাতি, মাছের 28000 প্রজাতি এবং অর্কিডের 20000 প্রজাতি রয়েছে। বাস্তব্যবিদ এবং বিবর্তন বিষয়ে বিশারদগণ এতো বিশাল বৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন— কেন এখানে এতো বহু প্রজাতির বাস? পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু হতেই কী এতো বিশাল বৈচিত্র্য ছিল? কীভাবে এই জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হল? কীভাবে এবং কেন এই বৈচিত্র্য জীবমণ্ডলের (Biosphere) জন্য গুরুত্বপূর্ণ? যদি জীববৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে কম হয় তবে কী এর কার্যকারিতায় ভিন্ন প্রভাব পড়বে? জীবনের এই বিশাল জীব বৈচিত্র্য হতে মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে?

15.1 জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

আমাদের জীবমণ্ডলে এই অপরিসীম বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা (heterogeneity) কেবলমাত্র প্রজাতি স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল সংগঠনেও, যথা কোশস্থ বৃহৎ জৈব অণু (macromolecules) থেকে বায়োম পর্যন্ত এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত সংগঠনের সব মিলিত বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমাজ-জীববিদ Edward Wilson ‘বায়োডাইভারসিটি’ পরিভাষাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। জীববৈচিত্র্যের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল —

(i) জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) : একটি একক প্রজাতি জিনগত স্তরে তার বণ্টন বা বিন্যাসের পরিসরে অধিক বৈচিত্র্য দেখাতে পারে। হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মানো ঔষধি গাছ *Rauwolfia vomitoria* (সর্পগন্ধা গাছ) এর কার্যকারিতা এবং এতে উপস্থিত সক্রিয় রাসায়নিক যৌগের (রেসারপিন) ঘনত্বের ভিত্তিতে জিনগত বৈচিত্র্য দেখাতে পারে। ভারতবর্ষে প্রায় 50000 এর বেশি জিনগতভাবে পৃথক ধানের স্ট্রেন বা ভ্যারাইটি এবং 1000 আম গাছের ভ্যারাইটি রয়েছে।

ii) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity) : প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্যকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বঘাটের তুলনায় পশ্চিমঘাটে উভচর প্রাণীদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

iii) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecological diversity) : নরওয়ের মতো স্ক্যানডিন্যাভিয়ান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক স্তরে, যেমন— মরুভূমি, বৃষ্টি-অরণ্য, লবনাম্বু উদ্ভিদের অরণ্য, প্রবালপ্রাচীর, জলাভূমি, মোহনা, অতি উচ্চস্থানের তৃণভূমি প্রভৃতিতে অধিকতর বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য দেখা যায়।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের ফলেই প্রকৃতিতে এই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে যে হারে প্রজাতি বিপন্ন ও বিলুপ্ত হচ্ছে, তাতে আগামী দুই শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যেই এই বিশাল সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশগত বিষয়ে (environmental issues) জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীব্যাপী বহু সংখ্যক মানুষের টিকে থাকার জন্য এবং এই গ্রহের সুস্থিতির জন্য এই জীববৈচিত্র্যের সংকটপূর্ণ অবস্থার গুরুত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

15.1.1 এই পৃথিবীতে কত সংখ্যক প্রজাতি রয়েছে এবং এর মধ্যে কত সংখ্যক প্রজাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়? (How Many Species are there on Earth and How Many in India ?

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ও নামাঙ্কিত জীব প্রজাতির যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, এর ভিত্তিতে আমরা নথিভুক্ত প্রজাতি সম্পর্কে জানতে পারি, কিন্তু পৃথিবীতে মোট কত সংখ্যক প্রজাতি রয়েছে এর উত্তর করা সহজ নয়। IUCN(2004) অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 1.5 মিলিয়নের কিছুটা বেশি উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আরও কত প্রজাতি এখনো আবিষ্কৃত ও বর্ণিত হয়নি সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। এ সম্পর্কিত অনুমানেরও ব্যাপকভাবে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং বেশিরভাগই হচ্ছে শিক্ষানবিশদের পরীক্ষামূলক অনুমান। বহু ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাসগত গোষ্ঠীর (taxonomic group) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাতির তালিকা প্রণয়নের কাজ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলোতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক প্রজাতিই এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, এটা ধরে নিয়ে জীববিজ্ঞানীগণ নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রজাতি প্রাচুর্যের পরিসংখ্যানগত তুলনা করে বিভিন্ন পতঙ্গের বিস্তারিত তথ্য অধ্যয়ন করেন এবং এই তুলনামূলক অনুপাতকে অন্য শ্রেণির প্রাণী ও উদ্ভিদের সাথে বিবেচনা করে পৃথিবীতে মোট প্রজাতি সংখ্যার সামগ্রিক বা স্থূল (gross estimate) হিসাব দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, আনুমানিক 20-50 মিলিয়ন জীব পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু অধিকতর সংরক্ষণাত্মক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণার ভিত্তিতে Robert May-যে যুক্তিসম্মত হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বে প্রজাতি বৈচিত্র্যে দাঁড়ায় প্রায় 7 মিলিয়ন প্রজাতির জীব রয়েছে।

আমরা যদি অধুনা লভ্য ও আবিষ্কৃত প্রজাতির ভিত্তিতে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখা যায় যে, সকল নথিভুক্ত প্রজাতির মধ্যে 70% হলো প্রাণী, যেখানে উদ্ভিদ প্রজাতি (শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট, ব্যক্তবীজী, গুপ্তবীজীসহ) মোট প্রজাতির 22% এর অধিক নয়। প্রাণীদের মধ্যে, পতঙ্গগোষ্ঠী সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রজাতি সমন্বিত শ্রেণিবিন্যাসগত গোষ্ঠী, যা মোট প্রাণী প্রজাতির 70% এরও বেশি। এর অর্থ হল, পৃথিবীর প্রতি 10টি প্রাণী প্রজাতির মধ্যে 7টিই হল পতঙ্গ প্রজাতি। আবার, আমরা কীভাবে পতঙ্গগোষ্ঠীর এই বিশাল বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করবো? এই পৃথিবীতে মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রজাতির মোট সংখ্যার তুলনায় ছত্রাক প্রজাতির সংখ্যা বেশি। চিত্র 15.1-এ বিভিন্ন প্রধান ট্যাক্সন সমূহের প্রজাতি বৈচিত্র্য দেখানো হলো —

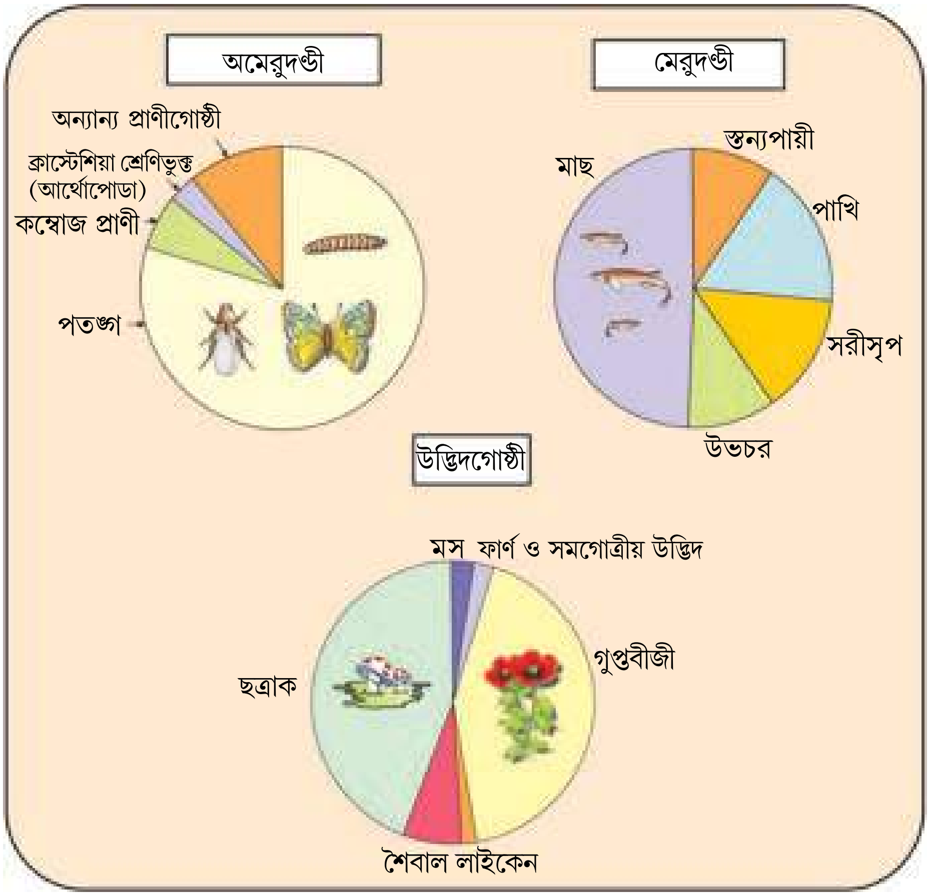

চিত্র 15.1 বিশ্ব জীববৈচিত্র্যের চিত্ররূপ: অমেরুদণ্ডী, মেরুদণ্ডী ও উদ্ভিদগোষ্ঠীর আনুপাতিক প্রজাতি সংখ্যা

এটা উল্লেখ করা উচিত যে, উল্লিখিত আনুমানিক প্রজাতি সংখ্যায় কোনো আদিকোশীয় বা প্রোক্যারিওটিক জীব সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই। জীববিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নয় যে কত প্রজাতির প্রোক্যারিওটিক জীব পৃথিবীতে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল, গতানুগতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিগুলো অণুজীব প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য উপযোগী নয় এবং বহু অণুজীব প্রজাতি পরীক্ষাগারে পুষ্টিমাধ্যমে বৃদ্ধি (culture) ঘটানো সম্ভব নয়। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিগুলোকে যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার জন্য জৈব রাসায়নিক বা আণবিক মানদণ্ড গ্রহণ করি, তবে এককভাবে এদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বা সংখ্যা লক্ষাধিক হতে পারে।

যদিও পৃথিবীর মোট ভূ-খণ্ডের কেবলমাত্র 2.4% ভারতবর্ষে অবস্থিত, তবে পৃথিবীর মোট জীববৈচিত্র্যের ভারতের অংশীদারিত্ব 8.1%, যা খুবই চিত্তাকর্ষক। এই কারণেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর 12টি মেগাডাইভারসিটি দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ। ভারতবর্ষে নথিকৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে প্রায় 45000 উদ্ভিদ প্রজাতি এবং এর প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক প্রাণী প্রজাতি নথিভুক্ত রয়েছে। এখানে আরও কত সংখ্যক জীবজ প্রজাতি আবিষ্কার ও নামকরণের অপেক্ষায় রয়েছে? যদি আমরা May'এর জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আনুমানিক তথ্য গ্রহণ করি, এতে দেখা যায় মোট জীবপ্রজাতির মাত্র 22% এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যের সংখ্যায় এই অনুপাতটি প্রয়োগ করে আমরা অনুমান করতে পারি যে সম্ভবত এখনো প্রায় 100000 উদ্ভিদ প্রজাতি এবং 300000-এর বেশি প্রাণী প্রজাতি আবিষ্কার ও বর্ণনা করার কাজ বাকী রয়েছে। আমরা কী কখনও আমাদের দেশের মোট জীবজ সম্পদের আবিষ্কারের কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারবো? আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাপক মানবসম্পদ (taxonomist) এবং এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কালের কথা বিবেচনা কর। যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রজাতির একটি বড় সংখ্যা এমনকি আবিষ্কারের পূর্বেই বিলুপ্ত হওয়ার সম্মুখীন হচ্ছে তখন অধিকতর আশাহত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটা অনেকটা প্রকৃতির জীবজ গ্রন্থাগারে (Biological Library) সংরক্ষিত সকল পুস্তকের শিরনামের তালিকা প্রস্তুত করার পূর্বেই গ্রন্থাগারে আগুন ধরে যাওয়ার মতো।

15.1.2 জীববৈচিত্র্যের ধরন (Patterns of Biodiversity)

i) ***অক্ষাংশের নতিমাত্রা (Latitudinal gradients) :*** পৃথিবীর সর্বত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য অভিন্ন নয় বরং অসমভাবে বণ্টিত। বহু সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য বেশ কিছু মজাদার ধরন রয়েছে, এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ধরনটি হল জীববৈচিত্র্যের মধ্যে অক্ষাংশ নতিমাত্রা। আমরা যদি নিরক্ষীয় অঞ্চল হতে মেরুঅঞ্চলের দিকে অগ্রসর হই সাধারণত: প্রজাতি বৈচিত্র্য কমতে থাকে। খুব কম ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রান্তীয় অঞ্চলে (অক্ষাংশের বিস্তৃতি 23.5^0N থেকে 23.5^0S) নাতিশীতোষ্ণ বা মেরু অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর প্রজাতি রয়েছে। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দেশ কলোম্বিয়ায় পাখীর 1400টি প্রজাতি পাওয়া যায়, যেখানে নিউইয়র্কে (41^0N) পাখীর 105টি প্রজাতি এবং গ্রীনল্যান্ডে (71^0N) পাখীর মাত্র 56টি প্রজাতি রয়েছে। ভারতবর্ষের মোট ভূ-খণ্ডের বেশিরভাগ অংশ ক্রান্তীয় অক্ষাংশে অবস্থিত ও এখানে প্রায় 1200 প্রজাতিরও বেশি পাখী রয়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি অরণ্য যেমন ইকুয়াডরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (USA) মধ্য-পশ্চিম অংশের মতো সমক্ষেত্রফলবিশিষ্ট নাতিশীতোষ্ণ বনভূমির তুলনায় 10 গুণ বেশি সংবহন কলা যুক্ত উদ্ভিদের বনভূমি রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম আমাজন বৃষ্টি অরণ্যে পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়— যেখানে 40000 এরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ, 3000 প্রজাতির মাছ, 1300 প্রজাতির পাখি, 427 প্রজাতির স্তন্যপায়ী, 427 প্রজাতির উভচর, 378 প্রজাতির সরীসৃপ এবং 125000-এর বেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি বাস করে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই বৃষ্টি-অরণ্যে কমপক্ষে আরও 2 মিলিয়ন পতঙ্গ প্রজাতি আবিষ্কার ও নামকরণের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের কী বিশেষত্বের জন্য সেখানে জীববৈচিত্র্য অধিকতর বেশি? এই প্রসঙ্গে বাস্তব্যবিদ ও বিবর্তন বিষয়ে বিশারদগণ; বিভিন্ন প্রকল্প (hypothesis) প্রস্তাব করেছেন, এদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল —ক) সাধারণত প্রজাতিকরণ (Speciation) হল একটি সময়ের কাজ, যেখানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহে প্রাচীনকালে প্রায়শই তুষারপাত ঘটত সেখানে ক্রান্তীয় অক্ষাংশ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তুলনামূলকভাবে নিরুপদ্রব ছিল এবং তাই প্রজাতির বৈচিত্র্যকরণের জন্য একটি বিশাল বিবর্তনের পক্ষে সহায়ক কাল ছিল। (খ) ক্রান্তীয় পরিবেশটি

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পরিবেশের মতো হয় না। ক্রান্তীয় পরিবেশ কম ঋতুভিত্তিক, অনেক স্থিতিশীল ও অনুমান সাপেক্ষ হয়। এই ধরনের স্থিতিশীল পরিবেশ নিচ্ বিশেষীকরণ (Niche specialisation) ঘটায় এবং অধিকতর প্রজাতি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এবং (গ) ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিকতর সূর্যালোক (সৌরশক্তি) উপলব্ধ হয় বলে এখানে উৎপাদনশীলতা (productivity) অধিকতর, যা পরোক্ষভাবে অধিক জীববৈচিত্র্য ঘটাতে সাহায্য করে।

ii) প্রজাতি-অঞ্চল সম্পর্ক (Species-Area Relationships) : বিখ্যাত জার্মান প্রকৃতিবিদ ও ভূ-তত্ত্ববিদ Alexander Von Humboldt দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে অন্বেষণকালে পর্যবেক্ষণ করেন যে, এলাকার বা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রজাতি প্রাচুর্য্যও বৃদ্ধি পায় তবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। বস্তুতপক্ষে, প্রজাতি প্রাচুর্য্য (Species richness) ও ট্যাক্সার বিস্তৃত ভ্যারাইটি সমন্বিত অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক (গুপ্তবীজী উদ্ভিদ, পাখি, বাদুড়, স্বাদুজলের মাছ) আয়তাকার পরাবৃত্ত (Rectangular hyperbola) গঠন করে (চিত্র 15.2)। এই প্রজাতি-এলাকা সম্পর্ক লগ্-স্কেলে উপস্থাপন করলে সরলরৈখিক রেখাচিত্র পাওয়া যায়, যাকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়—

$\log S = \log C + Z \log A$

যেখানে,

S= প্রজাতি প্রাচুর্য্য,

A= অঞ্চল/এলাকার ক্ষেত্রফল,

Z= নির্ভরণ গুণাঙ্ক (রিগ্রেশন কো-এফিসিয়েন্ট)

C= Y-বিচ্ছিন্ন রেখা (intercept)

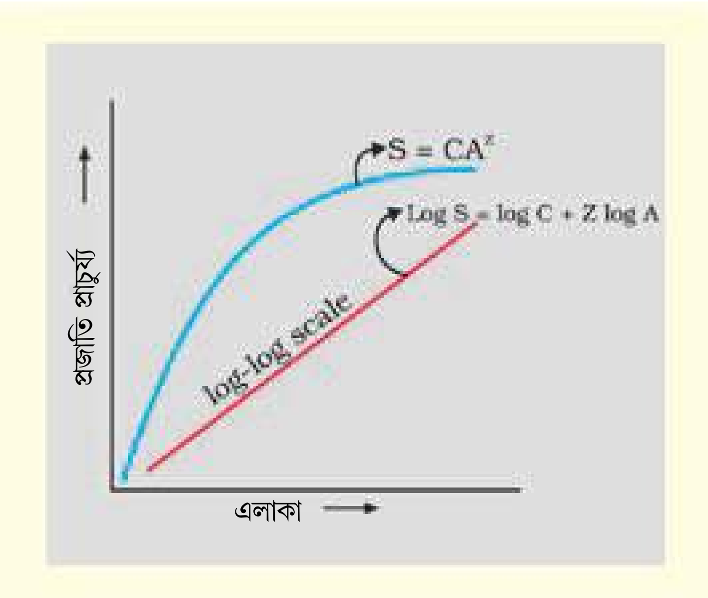

চিত্র 15.2 প্রজাতি-অঞ্চল সম্পর্ক দেখানো হল। লগ স্কেলে এই সম্পর্ক রৈখিক হয়।

বাস্তব্যবিদগণ আবিষ্কার করেছিলেন যে ট্যাক্সোনোমিক গোষ্ঠী বা অঞ্চলটি যেরূপই হোক না কেন (ব্রিটেনের কোনো উদ্ভিদ, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনো পাখী, নিউইয়র্কের কম্বোজ বা মোলাস্কা প্রাণী, যাদের ক্ষেত্রে লগ্-স্কেলে নির্ভরণ রেখার নতি (slopes of regression) বিস্ময়করভাবে অনুরূপ হয়) 'Z' এর মান 0.1-0.2 এর মধ্যে থাকে। কিন্তু, তোমরা যদি সমগ্র মহাদেশের মতো সুবিশাল অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রজাতি -অঞ্চল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো, তবে তোমরা দেখবে যে নির্ভরণ রেখার নতি (slope of the regression line) অনেকটাই খাড়া হয় (Z-এর মান 0.6-1.2 এর মধ্যে থাকে)। উদাহরণস্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের ক্রান্তীয় অরণ্যের কোনো ফলভোজী পাখী (frugivorous/ fruit-eating) ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের রিগ্রেশন ঢালটির মান 1.15 হতে দেখা যায়। এই আলোচনার সাপেক্ষে অধিকতর খাড়া নতি (steeper slope) বলতে কী বোঝায়?

15.1.3 বাস্তুতন্ত্রে প্রজাতি বৈচিত্র্যের গুরুত্ব (The importance of Species Diversity to the Ecosystem) :

বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতায় একটি সম্প্রদায়ের প্রজাতি সংখ্যার বস্তুতই কোনো প্রভাব রয়েছে কী? বাস্তুব্যবিদগণ এই প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর দিতে সমর্থ হননি। বহুদশক ধরেই বাস্তুব্যবিদরা বিশ্বাস করে আসছেন যে, অধিক সংখ্যক প্রজাতি সমন্বিত সম্প্রদায়গুলো সাধারণত স্বল্পসংখ্যক প্রজাতি সমন্বিত সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি স্থিতিশীল হতে পারে। জীব সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতা বলতে

প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়? এটি অবশ্যই কদাচিৎ ঘটা বিপত্তিসমূহকে (প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত) প্রতিরোধ করতে পারে অথবা এগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং এটি বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ ও বিস্তারকেও প্রতিরোধ করে। আমরা জানিনা এই বৈশিষ্ট্যাবলী কীভাবে একটি সম্প্রদায়ে প্রজাতি প্রাচুর্য্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়েছে, কিন্তু David Tilman-এর দীর্ঘস্থায়ী বহিঃপরিবেশে বাস্তুতান্ত্রিক পরীক্ষা হতে আমরা এর কিছু সম্ভাব্য উত্তর পেয়েছি। Tilman লক্ষ করেন কোনো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে অধিক সংখ্যক প্রজাতি থাকলে বছর থেকে বছরে প্রজাতিগুলোর মোট জীবভরের খুবই সামান্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর পরীক্ষায় আরও দেখান যে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি করে।

যদিও, আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারিনা কীভাবে প্রজাতি প্রাচুর্য একটি বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন বা ভালোর জন্য অবদান রাখে। আমরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করি যে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য শুধুই বাস্তুতন্ত্রের সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতেও অত্যাবশ্যক। একই সাথে যখন আমরা বিপজ্জনকহারে প্রজাতিগুলোকে হারিয়ে ফেলছি, কেউ একজন জিজ্ঞাসা করতে পারে— যদি কিছু সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় আমাদের উপর সত্যিই কী এর কোনো প্রভাব পড়বে? যদি পশ্চিমঘাট অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বৃক্ষবাসী ব্যাঙ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কী বাস্তুতন্ত্রের কার্যপদ্ধতিতে প্রভাব পড়বে? ধরো যদি 20000 প্রজাতির পরিবর্তে পৃথিবীতে 15000 প্রজাতির পিঁপড়া থাকে, তবে আমাদের জীবনধারণের মান কীভাবে প্রভাবিত হবে?

এমন সব প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর নেই, কিন্তু স্ট্যানফোর্ডের বাস্তব্যবিদ Paul Ehrlich-এর ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা তুলনামূলক ভিত্তিতে এই বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি (Rivet Popper hypothesis)। একটি বিমানে (বাস্তুতন্ত্র), এর সব অংশগুলোকে কয়েক হাজার রিভেট (প্রজাতি) ব্যবহার করে একসাথে যুক্ত করা হয় যদি প্রত্যেক যাত্রী বিমানের একটি করে সেই রিভেট বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য খুলতে থাকে (একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাবে), শুরুতে বিমান পরিবহনে ততোটা ঝুঁকি না থাকলেও (বাস্তুতান্ত্রিক কার্যক্রম) ধীরে ধীরে যত বেশি সংখ্যক রিভেট খুলে নেওয়া হবে বিমানটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। তদোপরি, কোন্ রিভেটটি খুলে নেওয়া হয়েছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিমানের ভেতরস্থিত আসন বা জানালার কিছু রিভেট অপসারণের তুলনায় বিমানের ডানার রিভেট-এর অপসারণ (মুখ্য প্রজাতি যা বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে) অবশ্যই উড্ডয়নকালে বিমানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

15.1.4 জীববৈচিত্র্যের হ্রাসপ্রাপ্তি (Loss of Biodiversity)

পৃথিবীর প্রজাতির সঞ্চয় ভাণ্ডারে নতুন প্রজাতি সংযোজিত হয় কিনা (প্রজাতিকরণের মাধ্যমে) সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, তবে প্রতিনিয়ত যে উক্ত প্রজাতিসমূহের অবলুপ্তি ঘটছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের গ্রহের জীবজসম্পদ খুবই দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে এবং এর জন্য অভিযোগের আঙ্গুল স্পষ্টভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের দিকেই উঠছে। মানুষ দ্বারা ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে (Tropical Pacific Islands) বসতি বা উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় প্রায় 2000 -এর বেশি স্থানীয় পাখি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। IUCN-এর লাল তালিকা (Red list, 2004) অনুযায়ী বিগত 500 বছরে 784 প্রজাতির (যেখানে 338 প্রজাতির মেরুদণ্ডী, 359 প্রজাতির অমেরুদণ্ডী ও 87 প্রজাতির উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত) বিলুপ্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে অবলুপ্ত কিছু সংখ্যক প্রজাতির উদাহরণ হল- ডোডো (মরিশাস), ক্যোয়েগা (আফ্রিকা), থাইলাসিন বা টাইগার উলফ্ (অস্ট্রেলিয়া), স্টেলারস্ সি কাউ (রাশিয়া) এবং বাঘের তিনটি উপপ্রজাতি (বালি, জাভান, ক্যাসপিয়ান)। কেবলমাত্র বিগত 20 বছরেই 27টি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যায় বিভিন্ন ট্যাক্সায় যদৃচ্ছভাবে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেনি, উভচরের মতো কিছু

প্রাণীগোষ্ঠী বিলুপ্তির একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির এই ভয়ানক পরিস্থিতির প্রকৃত ঘটনা হল এই যে প্রতিবছর 15000 এর বেশি প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় মোট পাখির প্রজাতির 12 শতাংশ, মোট স্তন্যপায়ী প্রজাতির 23 শতাংশ, মোট উভচর প্রজাতির 32 শতাংশ এবং মোট ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির 31 শতাংশ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

আবিষ্কৃত বা প্রাপ্ত জীবাশ্মঘটিত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পেরেছি যে বিশাল পরিমাণে প্রজাতি বিলুপ্তি এখনকার মতো আগের, এমনকি মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেও ঘটেছিল। পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির দীর্ঘসময় ধরে (>3বিলিয়ন বছর) পাঁচটি পর্বে বহুল সংখ্যক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছিল। 'ষষ্ঠ পর্যায়ের বিলুপ্তিকরণ'(Sixth extinction), যা বর্তমানে ঘটে চলেছে, তা কীভাবে পূর্ববর্তী পর্বগুলো/পর্যায়গুলো থেকে ভিন্ন ধরনের? পার্থক্য দেখা গেছে প্রজাতি বিলুপ্তির হারে, দেখা গেছে মানবজাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার পূর্বের সময়কালের তুলনায় সাম্প্রতিককালে প্রজাতি বিলুপ্তির হার 100 থেকে 1000 গুণ দ্রুততর হয়েছে এবং এই দ্রুততর হারে বিলুপ্তিকরণের জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপই মুখ্যত দায়ী। বাস্তব্যবিদ ও প্রকৃতিবিদরা সতর্ক করেছেন যে, যদি বর্তমান প্রবণতা চলতে থাকে, তাহলে আগামী 100 বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সাধারণত, কোনো একটি অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের ফলস্বরূপ-(ক) উদ্ভিদ উৎপাদন কমবে, (খ) খরার মতো প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং (গ) কিছু নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়াসমূহ যেমন-উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা, জলের ব্যবহার এবং কীটপতঙ্গ ও রোগের আবর্তন ইত্যাদির পরিবর্তনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির কারণসমূহ (Causes of Biodiversity losses) : বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী দ্রুতহারে প্রজাতি বিলুপ্তির জন্য মূলত মানুষের ক্রিয়াকলাপই দায়ী। এর প্রধান চারটি কারণ রয়েছে এগুলোকে বর্ণনা করার জন্য দুষ্ট চতুষ্টয় ('The Evil Quartel') এই উপনাম ব্যবহার করা হয়।

i) বাসস্থান হ্রাস ও খণ্ডীভবন (Habitat loss and fragmentation) : এটি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাসস্থান হ্রাস বা ক্ষতির সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণসমূহ পাওয়া যায় ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে। একদা এই বৃষ্টি অরণ্য পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের 14 শতাংশের অধিক অঞ্চল আচ্ছাদিত করে রাখলেও বর্তমানে এই অরণ্য আচ্ছাদিত অঞ্চল 6 শতাংশের বেশি হবে না। এই অরণ্য অতি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি এই অধ্যায়টি পড়ে শেষ করার পূর্বেই হয়ত আরও 1000 হেক্টরের বেশি বৃষ্টি অরণ্য হারিয়ে যাবে। আমাজন বৃষ্টি অরণ্য (এটি এত বৃহৎ যে একে এই 'গ্রহের ফুসফুস' বলা হয়) যেখানে দশ লক্ষাধিকপ্রজাতির আশ্রয়স্থল, সয়াবিন (soya beans) চাষের জন্য অথবা গো পালনের জন্য বনভূমিকে তৃণভূমিতে রূপান্তরিত করতে ঐ অঞ্চলের বহু উদ্ভিদকে কেটে ও পরিষ্কার করে কেটে দেওয়া হচ্ছে। এই সামগ্রিক ক্ষতির পাশাপাশি দূষণের ফলে বহু বাসস্থানের নির্মূলকরণ ঘটছে, যা বহু প্রজাতির অস্তিত্বকেও প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মানুষ বিভিন্ন কাজের জন্য যখন বৃহৎ বাসস্থানকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডে বিভক্ত করে,তখন স্তন্যপায়ী ও পাখী যাদের বসবাসের বিস্তৃত অঞ্চল প্রয়োজন এবং কিছু প্রাণী যাদের পরিযায়ী বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলস্বরূপ এদের জনসংখ্যার হ্রাসকরণ ঘটে।

ii) মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার/শোষণ (over-exploitation): মানুষ সর্বদাই খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু 'প্রয়োজন' যখন 'লালসায়' রূপান্তরিত হয়, তখনই প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুরু হয়। মানুষ দ্বারা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের দরুন বিগত 500 বছরে বহু প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে (স্টেলারস্ সি কাউ, যাত্রী পায়রা)।

সাম্প্রতিককালে পৃথিবী জুড়েই অনেক সামুদ্রিক মাছের অধিকমাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে, যা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কিছু প্রজাতির অস্তিত্বের ধারাকে বিপন্ন করে তুলছে।

iii) বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ (Alien species invasions) : যখন যে-কোনো কারণেই বহিরাগত প্রজাতিকে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যে কোথাও আনয়ন করা হয়, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রজাতি আক্রমণাত্মক (invasive) হয়ে স্থানীয় প্রজাতির হ্রাস বা বিলুপ্তি ঘটায়। পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদে নীলনদের আড় মাছ (Nile Perch) ছেড়ে দেওয়ার ফলে ঐ হ্রদে 200 এরও প্রজাতির তেলাপিয়া (Cichlid) মাছ যে স্বতন্ত্র বাস্তুতান্ত্রিক সমাবেশ গড়ে তুলেছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। গাজর ঘাস (Parthenium), ল্যান্টেনা (Lantana) এবং জলজ কচুরিপানা (Eicchornia) এর মতো আক্রমণাত্মক, ক্ষতিকারক প্রজাতি কর্তৃক পরিবেশের ক্ষতি এবং আমাদের স্থানীয় প্রজাতির উপর এরা কতোটা বিপজ্জনক সেই বিষয়ে তোমরা অবগত আছো। মৎস্যপালনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার ক্যাটফিস Clarias gariepinus-কে আমাদের নদী-নালাসমূহে বেআইনিভাবে ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্থানীয় বা দেশীয় ক্যাটফিসগুলো মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে।

iv) সহ-অবলুপ্তি (Co-extinctions) : যখন একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে, তখন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিও পরোক্ষভাবে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। যখন কোনো পোষক মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়, তখন তার দেহস্থিত পরজীবী জীবদের স্বতন্ত্র সমাবেশেরও একই পরিণতি ঘটে। এবিষয়ে আরেকটি উদাহরণ হল, একই সাথে বিবর্তিত উদ্ভিদ ও পরাগযোগের বাহক এই মিথোজীবী সম্বয়ের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি জীবের বিলুপ্তি ঘটলে অপর জীবেরও বিলুপ্তি ঘটে।

15.2 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity Conservation)

15.2.1 আমরা কেন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করবো ? (Why Should We Conserve Biodiversity?)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কিছু সুস্পষ্ট ও কিছু ততোটা সুস্পষ্ট নয়, এমন বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু উভয় প্রকার কারণসমূহই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণসমূহকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়: সংকীর্ণভাবে উপযোগী, বিস্তৃতভাবে উপযোগী ও নৈতিক কারণ বা যুক্তিসমূহ।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংকীর্ণভাবে উপযোগী (Narrowly Utilitarian) যুক্তি বা কারণসমূহ খুবই সুস্পষ্ট। প্রকৃতি থেকে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অসংখ্য অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপকারসমূহ, খাদ্য (দানাশস্য, ডাল, ফল), নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী কাঠ, তন্তু, শিল্প সামগ্রী (ট্যানিন, পিচ্ছিলকারক, রঞ্জক, রজন, সুগন্ধী) এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন উপাদান আহরণ করে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী বাজারচলতি ঔষধের 25 শতাংশেরও বেশি ঔষধের উপাদান উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয় এবং পৃথিবীজুড়ে স্থানীয় মানুষ কর্তৃক পরম্পরাগতভাবে ব্যবহৃত ঔষধসমূহ তৈরিতে প্রায় 25000 প্রজাতির উদ্ভিদের অবদান রয়েছে। ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে আরও কত ঔষধিগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে আমরা কেউ জানি না। যদি অধিক থেকে অধিকতর সম্পদের 'জীব অনুসন্ধান' করা যায় তবে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের উৎপাদনের জন্য আণবিক, জিনগত ও প্রজাতিগত স্তরে অনুসন্ধান জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ এই সম্পদসমূহ থেকে প্রচুর সুবিধা লাভ করতে পারে।

বিস্তৃতভাবে উপযোগী (Broadly Utilitarian) যুক্তিসমূহ দ্বারা প্রাকৃতিক বাস্তুতান্ত্রিক কার্যক্রমে জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিদ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত আমাজন অরণ্য সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মোট অক্সিজেনের 20 শতাংশের যোগান দেয়। আমরা কী প্রকৃতির এই উপকারের (services) অর্থনৈতিক মূল্য স্থির করতে পারি? তোমাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে অক্সিজেন

সিলিণ্ডারের জন্য কত খরচ হয় তার থেকে এই বিষয়ে তোমরা কিছুটা ধারণা পেতে পারো। পরাগসংযোগ বা পলিনেশন (যা ছাড়া উদ্ভিদ আমাদের ফল ও বীজ দিতে পারবেনা) এরকম আরেকটি কার্যক্রম (পরিষেবা), যেখানে বাস্তুতন্ত্র পরাগযোগের বাহক (Pollinators)—মৌমাছি, ভ্রমর, পাখি ও বাদুড় ইত্যাদি যোগান দেয় বলেই পরাগসংযোগ সম্ভব। প্রাকৃতিক পরাগবাহক ছাড়া পরাগসংযোগ সম্পন্ন করতে হলে কত খরচ হতে পারে? এখানে আরও এমন অনেক সুবিধা রয়েছে, যেগুলো আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা, সেগুলোও আমরা প্রকৃতি হতে পেয়ে থাকি— ঘন বৃক্ষরাজির বা অরণ্যের মাঝে হাঁটার সময় নান্দনিক আনন্দানুভূতি, বসন্তে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল দেখা, বুলবুল পাখির গান শুনে ভোরে ঘুম থেকে উঠা। আমরা কী এই নান্দনিক বিষয়গুলোর মূল্য ধার্য করতে পারি ?

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নৈতিক যুক্তিসমূহ (ethical arguments) লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই গ্রহে আমরা বসবাস করছি, তাদের সাথে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক স্থাপন করে। দার্শনিকভাবে ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমাদের অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রতিটি প্রজাতির এমনকি ইহা সাম্প্রতিক না হলেও বা আমাদের কাছে অর্থনৈতিক মূল্য না থাকলেও এদের নির্দিষ্ট স্বকীয় মূল্য (intrinsic value) রয়েছে। জীবের বৈচিত্র্যের কল্যাণের জন্য যত্নশীল হওয়া এবং সুস্থিত অবস্থায় জৈবিক উত্তরাধিকার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট একে পৌঁছে দেওয়াই হল আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

15.2.2 আমরা কীভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করবো ? (How do we conserve Biodiversity?)

যখন আমরা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদান করবো, তখন এর সব স্তরে জীববৈচিত্র্য যেমন সুরক্ষিত থাকবে আমরা বাঘকে রক্ষা করতে যেমন সমগ্র অরণ্যকে রক্ষা করি। এই পদক্ষেপটিকে ইন সিটু সংরক্ষণ (জীবদের নিজস্ব স্বাভাবিক স্থানে) বলে। যদিও, যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী লুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন হয়ে পড়ে (নিকট ভবিষ্যতে যে বন্যজীবদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে) তখন তাদের অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, এক্স সিটু সংরক্ষণ জীবদের নিজস্ব স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ।

ইনসিটু সংরক্ষণ : বিকাশ ও সংরক্ষণ বিষয়ক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে বহু জাতি বা দেশ বুঝতে পারলো যে, তাদের সামগ্রিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণ করা অবাস্তব এবং অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব। অপরিবর্তনীয়ভাবে, বর্তমানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের যে চালু ব্যবস্থাগুলো রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে যে বহুসংখ্যক প্রজাতি অবলুপ্তির পথে, তাদের বাঁচানো দুরূহ বিষয়। বিশ্বব্যাপি, এই সমস্যাটি প্রখ্যাত সংরক্ষণবিদদের নজরে এসেছে। সর্বাধিক সুরক্ষার জন্য তাঁরা এমন কিছু 'জীববৈচিত্র্য হটস্পট' অঞ্চল সনাক্ত করেছেন যেখানে অত্যধিক প্রজাতি প্রাচুর্য এবং উচ্চমাত্রাসম্পন্ন 'এণ্ডেমিজম' (কোনো প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলে, অন্যত্র পাওয়া না গেলে) রয়েছে । শুরুতে 25টি জীববৈচিত্র্য হটস্পট নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু ক্রমে এই তালিকায় আরও 7টি হট্স্পট চিহ্নিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে পৃথিবীতে হটস্পটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 34টি। এই হটস্পট অঞ্চলসমূহেও বাসস্থানের অবলুপ্তি দিন দিন বাড়ছে। এই হটস্পট অঞ্চলগুলোর মধ্যে 3টি অঞ্চল হল পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা, ইন্দো-বার্মা এবং হিমালয় অঞ্চল— এই অঞ্চলগুলো আমাদের দেশের অত্যধিক জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত। যদিও এই সকল হটস্পট অঞ্চলসমূহ একসাথে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের 2 শতাংশের কম ভূখণ্ড বা অঞ্চল জুড়ে হয়েছে, এই হটস্পট অঞ্চলসমূহে সম্মিলিতভাবে জীবপ্রজাতির আশ্রয়স্থল, তাই উক্ত অঞ্চলসমূহের (Hotspot) কঠোর সংরক্ষণ প্রায় 30 শতাংশ জীবপ্রজাতির দলগত অবলুপ্তি কমানো যাবে।

ভারতবর্ষে, বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে স্বতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ আইনগতভাবে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যসমূহ হিসাবে সুরক্ষিত আছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে 14টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, 90টি জাতীয় উদ্যান এবং 448টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণযোগ্য অভয়ারণ্য রয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাসেও প্রকৃতির সুরক্ষার উপর জোর দিতে দেখা গেছে। এমন অনেক সংস্কৃতি রয়েছে, যেখানে বনভূমির কিছু অঞ্চল আলাদা করে রাখা হতো এবং বনাঞ্চল ও তাতে উপস্থিত সকল উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীসমূহকে শ্রদ্ধার সহিত পূজো করা হতো এবং এইভাবে এদের পুরোপুরি সুরক্ষা প্রদান করা হতো। মেঘালয়ের খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, রাজস্থানের আড়াবল্লি পাহাড়, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা, ছন্দা, বস্তার অঞ্চলসমূহে এধরনের পবিত্র বনভূমি বা উপবন (sacred groves) দেখা যায়। মেঘালয়ের পবিত্র বনসমূহে বিশালসংখ্যক বিরল ও বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো রয়ে গেছে।

এক্স সিটু সংরক্ষণ : এই পদ্ধতিতে বিপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদগুলোকে তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থান থেকে সরিয়ে কোনো একটি বিশেষ স্থানে রাখা হয়, যেখানে তারা সুরক্ষা ও বিশেষ যত্ন পেতে পারে। জুওলোজিক্যাল পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যানসমূহ, বন্যপ্রাণী সাফারী পার্কগুলো এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বন্য পরিবেশে এমন অনেক প্রাণী প্রজাতি রয়েছে যারা অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু জুওলোজিক্যাল পার্কে তাদের জীবনধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। সাম্প্রতিককালে এক্স সিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে উন্নত করা হয়েছে, যেখানে বিপন্ন প্রজাতিগুলোকে আবদ্ধ না রেখে খোলা প্রাকৃতিক পরিবেশ রাখা যায়। বর্তমানে বিপন্ন প্রজাতিসমূহের জননকোশ বা গ্যামেটগুলোকে ক্রায়োসংরক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা কার্যক্ষমতাসম্পন্ন ও নিষিক্তকরণক্ষমতাসম্পন্ন (viable and fertile) অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবৎ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ডিম্বাণুগুলোকে ইন ভিট্রো অবস্থায় নিষিক্ত করা যেতে পারে এবং কলাপালন পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি করা যেতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বীজগুলোকে দীর্ঘসময়ের জন্য বীজব্যাঙ্কে রাখা যেতে পারে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কোনো রাষ্ট্রীয় সীমারেখা নেই, তাই এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সব জাতি বা দেশের সম্মিলিত দায়িত্ব। 1992 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযুক্ত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্যের সুসংহত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই সম্মেলনকে অনুসরণ করে জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকায় 2002 সালে টেকসই বিকাশের (sustainable development) লক্ষ্যে বিশ্ব সম্মেলন (world summit) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে 2010 সালের মধ্যে সম্মেলনে গৃহীত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য 190টি দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এর ফলে সারাবিশ্বে আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে প্রজাতির জীববৈচিত্র্য হ্রাসের বর্তমান হার তাৎপর্যপূর্ণভাবেই অনেকটা কমে গেছে।

সারসংক্ষেপ

প্রায় 3.8 বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির সময়কাল থেকে, জীবনের ধরনসমূহের বিশাল বৈচিত্রীকরণ ঘটে। জীবজ সংগঠনসমূহে সর্বস্তরে উপস্থিত জীব বৈচিত্র্যসমূহের যোগফলকেই 'বায়োডাইভার্সিটি' বলে। জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ে বৈচিত্র্যসমূহের নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং উক্ত প্রতিটি স্তরে জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষাপ্রদান করাই সংরক্ষণের লক্ষ।

পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত 1.5 মিলিয়নের অধিক প্রজাতির তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু আরও প্রায় 6 মিলিয়ন প্রজাতির তথ্য আবিষ্কার ও নামকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। নামাঙ্কিত

প্রজাতিগুলোর মধ্যে 70% এর অধিক প্রাণী প্রজাতি এবং এদের 70 শতাংশ হল পতঙ্গ প্রজাতি। ছত্রাকগোষ্ঠীর প্রজাতি সংখ্যা, মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীর সব প্রজাতির অপেক্ষা যোগফল অধিক হয়। ভারতবর্ষে প্রায় 45,000 প্রজাতির উদ্ভিদ এবং এর দ্বিগুণেরও অধিক প্রানী প্রজাতি রয়েছে, তাই ভারতবর্ষ বিশ্বের 12টি মেগাডাইভার্সিটি দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ।

পৃথিবীতে প্রজাতি বৈচিত্র্যের বণ্টন সর্বত্র একইরকম হয় না। কিন্তু এতে আকর্ষণীয় ধরন লক্ষ করা যায়। এই বৈচিত্র্য সাধারণত ক্রান্তীয় অঞ্চলে খুব বেশি হয় এবং মেরুঅঞ্চলের দিকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রজাতি প্রাচুর্য্য থাকার গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ হল—ক্রান্তীয় অঞ্চলের অধিক বিবর্তনকাল, এখানকার আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তনীয় পরিবেশ এবং এই অঞ্চল দ্বারা অধিকমাত্রায় সৌরশক্তির শোষণ, যার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রজাতি প্রাচুর্য্য একটি প্রদেশের কোন একটি অঞ্চলের কার্যকারিতাকেও নির্দেশ করে। প্রজাতি-অঞ্চল সম্পর্ক সাধারণতঃ একটি আয়তাকার (rectangular hyperbolic) পরাবৃত্ত প্রদর্শন করে।

এটা বিশ্বাস করা হয়, যে সম্প্রদায়গুলো অধিক বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়, তাদের মধ্যে কম পরিবর্তনশীল হওয়া, অধিকতর উৎপাদনশীল হওয়া এবং অধিকতর বহিরাগত প্রজাতিসমূহের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রতিরোধক্ষম হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পৃথিবীর জীবাশ্ম-ইতিহাস অতীতকালে প্রজাতির বিপুলহারে অবলুপ্তির ঘটনাকে উদ্‌ঘাটিত করে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রায় 100 থেকে 1000 গুণ বেশি হারে প্রজাতি অবলুপ্তি ঘটেছে এবং 15500 এর বেশি প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকির সম্মুখীন (এদের মধ্যে>650 প্রজাতি ভারতবর্ষের)। আধুনিককালে উচ্চহারে প্রজাতি অবলুপ্তির কারণসমূহ হল- বাসস্থানের সংকোচন (বিশেষত বনভূমি) ও বাসস্থানের খণ্ডীকরণ, মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বা শোষণ, বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ এবং সহ অবলুপ্তি।

মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের যুক্তি বা কারণসমূহ হল সংকীর্ণ উপযোগী যুক্তি বা কারণ, বিস্তৃত উপযোগী যুক্তি বা কারণ, বিস্তৃত উপযোগী যুক্তি বা কারণ এবং নৈতিক যুক্তি বা কারণ। জীববৈচিত্র্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা ছাড়াও (খাদ্য, তন্তু, আগুন জ্বালানোর কাঠ, ঔষধপত্র ইত্যাদি) পরাগযোগ, পতঙ্গ-পেস্ট নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবাসমূহ থেকে আমরা পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধা লাভ করি। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং একে যথাযথ অবস্থায় আমাদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছে দেওয়াও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইন সিটু এবং এক্স সিটু উপায়ে হতে পারে। ইন সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতিতে বিপন্ন বা লুপ্তপ্রায় প্রজাতিদের তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়, যার ফলে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রটি সুরক্ষিত থাকে। নিবিড়ভাবে সংরক্ষণ প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার জন্য পৃথিবীতে 34টি 'জীববৈচিত্র্য হটস্পট' স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে 3টি (পশ্চিমঘাট-শ্রীলঙ্কা, হিমালয় এবং ইন্দো-ব্রার্মা) ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের দেশের ইনসিটু সংরক্ষণের প্রয়াস 14টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, 90টি জাতীয় উদ্যান, 450টিরও অধিক অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuaries) এবং কিছু পবিত্র বনভূমিতে প্রয়াশই প্রতিফলিত হচ্ছে। জুওলোজিক্যাল পার্ক এবং উদ্ভিদ উদ্যানসমূহে বিপন্ন প্রজাতির সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা, ইন ভিট্রো নিষেক, কলাপালনের মাধমে বংশবিস্তার এবং জনন কোশের ক্রায়োসংরক্ষণ এক্স সিট্যু সংরক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

অনুশীলনী

1. জীববৈচিত্র্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নাম লেখো।
2. কীভাবে বাস্তব্যবিদগণ পৃথিবীতে বর্তমান মোট প্রজাতি সংখ্যা হিসাব করেছেন?
3. ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রজাতি প্রাচুর্য্য সর্বাধিক হয় কেন- তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি মতবাদের উল্লেখ কর।
4. একটি প্রজাতি অঞ্চল সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভরণ রেখার নতি (Slope of regression line)-এর তাৎপর্য্য কী?
5. একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রজাতির অবলুপ্তির প্রধান কারণগুলো কী কী ?
6. বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য জীববৈচিত্র্য কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ?
7. পবিত্র বনভূমিগুলো কি কি ? সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা কি ?
8. বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্যা এবং ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ। বাস্তুতন্ত্রের জীবজ উপাদানসমূহের সাহায্যে কীভাবে এই পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে?
9. উদ্ভিদের প্রজাতিবৈচিত্র্য (22%), প্রাণীর প্রজাতি বৈচিত্র্যের (72%) তুলনায় অনেকটাই কম। কিভাবে প্রাণীদের অধিক বৈচিত্র্যকরণ ঘটে— তার ব্যাখ্যা কি হতে পারে?
10. তোমরা কি এমন একটি পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পার যেখানে আমরা জেনে বুঝে একটি প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটাতে চাই? তোমরা কিভাবে একে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করবে?

অধ্যায় 16

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ
ENVIRONMENTAL ISSUES

16.1 বায়ুদূষণ এবং এর নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution and Its Control)

16.2 জলদূষণ এবং এর নিয়ন্ত্রণ (Water Pollution and Its Control)

16.3 কঠিন-বর্জ্যসমূহ (Solid Wastes)

16.4 কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ এবং এদের প্রভাব (Agro-chemicals and their Effects)

16.5 তেজস্ক্রিয় বর্জ্যসমূহ (Radioactive Wastes)

16.6 গ্রীণহাউস প্রভাব ও ভু-উষ্ণায়ন (Greenhouse Effect and Global Warming)

16.7 স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোনস্তরের ক্ষয় (Ozone Depletion in the Stratosphere)

16.8 সম্পদের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা সঠিক না হওয়ার ফলে সৃষ্ট অবক্ষয় (Degradation by Improper Resource Utilisation and Maintenance)

16.9 অরণ্যবিনাশ (Deforestation)

মানুষের জনসংখ্যার আকার বিগত একশ বৎসরে অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মানে খাদ্য, জল, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, মোটর চালিত যানবাহন এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই সব চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে এবং এর ফলস্বরূপ বায়ু, জল এবং মৃত্তিকা দূষণও ঘটছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা হল এই যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে আমাদের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও নিঃশেষিকরণ রোধ করা।

দূষণ হল বায়ু, ভূমি, জল অথবা মাটির ভৌত, রাসায়নিক কিংবা জীবজ বৈশিষ্ট্যের যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। যেসব পদার্থ এরূপ অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাদের দূষক পদার্থ (Pollutants) বলে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, ভারত সরকার আমাদের পরিবেশের সুরক্ষা এবং এর গুণমান (বায়ু, জল ও মৃত্তিকা) উন্নয়নের জন্য 1986 খ্রিস্টাব্দে পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন [Environment (Protection) Act, 1986] পাশ করেন।

16.1 বায়ুদূষণ এবং এর নিয়ন্ত্রণ (Air Pollution and its control)

আমাদের শ্বসনের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বায়ুর উপর নির্ভরশীল। বায়ুদূষক পদার্থসমূহ সব সজীববস্তুর ক্ষতিসাধন করে। এরা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদনের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় এবং উদ্ভিদের অকাল মৃত্যু ঘটায়। বায়ুদূষকসমূহ মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। দূষক পদার্থের ঘনত্ব, জীবের দূষক পদার্থের সংস্পর্শে থাকার সময়কাল এবং জীবের প্রকৃতির উপর দূষক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব নির্ভর করে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনী, ধাতু পরিশোধনাগার এবং অন্যান্য কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় নাইট্রোজেন, অক্সিজেন-এর মত ক্ষতিকর নয় এমন

গ্যাসের সাথে বস্তুকণা এবং গ্যাসীয় বায়ুদূষকসমূহ উপস্থিত থাকে। বায়ুমণ্ডলে এধরনের গ্যাসগুলোকে মুক্ত করে দেওয়ার পূর্বে, এই বায়ুদূষকগুলোকে অবশ্যই পৃথক/পরিশ্রুত করে নিতে হবে।

বায়ুদূষক-বস্তুকণা অপসারণের বিভিন্ন পথ রয়েছে, এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এমন একটি হল ইলেকট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটরের ব্যবহার (চিত্র 16.1)। এই যন্ত্রের সাহায্যে

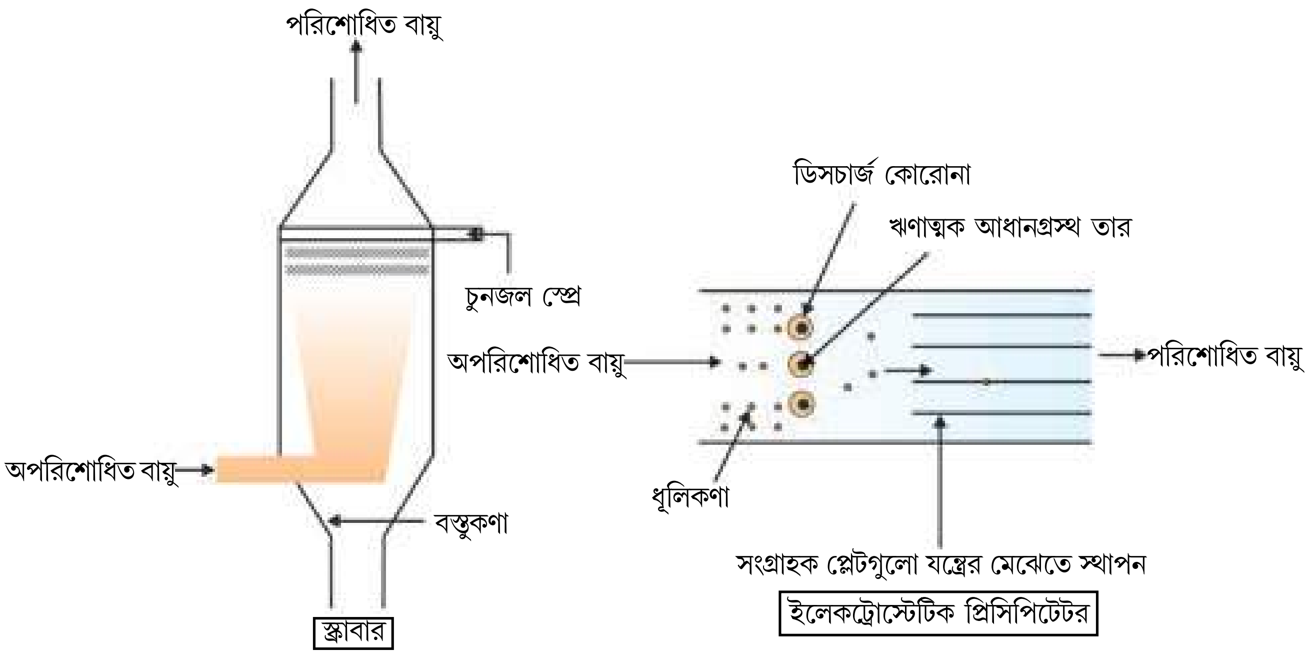

চিত্র 16.1 ইলেকট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটর

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ধোঁয়ায় উপস্থিত বস্তুকণার 99% এরও বেশি অপসারিত করা যেতে পারে। এটি তার নির্মিত তড়িৎদ্বার সমন্বিত হয়, যারমধ্যে কয়েক হাজার ভোল্ট বিভব পার্থক্য বজায় রাখা হয়, যা একটি কোরোনা সৃষ্টি করে এবং এই কোরোনা থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়। এই ইলেকট্রনসমূহ ধূলিকণাগুলোর সাথে যুক্ত হয় এবং এরফলে ধূলিকণাগুলো ঋণাত্মক আধানগ্রস্থ হয়। সংগ্রাহক প্লেটগুলোকে (Collecting plates) যন্ত্রের মেঝেতে স্থাপন করা হয় এবং এরা আধানগ্রস্থ ধূলিকণাগুলোকে আকর্ষণ করে। প্লেটগুলোর মধ্যস্থানে বায়ুর গতিবেগ এতটাই কম হওয়া দরকার যাতে ধূলিকণাগুলো নীচের দিকে নেমে আসতে পারে। একটি স্ক্রাবারের (চিত্র 16.1) সাহায্যে সালফার ডাইঅক্সাইডের মত গ্যাস অপসারিত হতে পারে। স্ক্রাবারের মধ্যে বর্জ্য ধোঁয়াকে জলের বা চুনের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। অধুনা যেসব বস্তুকণা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় এবং যাদের এই প্রিসিপিটেটর যন্ত্রগুলোর সাহায্যে অপসারণ করা যায় না তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কেন্দ্রীয় দূষণ পর্যদের (CPCB) নির্দেশ অনুসারে, 2.5 মাইক্রোমিটার বা তার থেকে কম ব্যাসের (PM2.5) বস্তুকণা মানব স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে। এসব সূক্ষ্ম বস্তুকণা শ্বাসগ্রহণকালে ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার শ্বাস প্রশ্বাস ও শ্বসন সংক্রান্ত উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে। এধরনের ধূলিকণাগুলোর প্রভাবে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অস্বস্থি, প্রদাহ, ফুসফুসের ক্ষতি এবং অকাল মৃত্যুও ঘটতে পারে।

অন্ততপক্ষে, মহানগরীগুলোতে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণের একটি মুখ্য কারণ হল যানবাহন। রাস্তাঘাটে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সৃষ্ট এই সমস্যাটি এখন অন্যান্য শহরগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। সিসামুক্ত পেট্রোল বা ডিজেল ব্যবহারের পাশাপাশি যদি যানবাহনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণও করা হয়

তবে এদের থেকে নির্গত দূষকপদার্থের মাত্রা হ্রাস পেতে পারে। ক্যাটালাইটিক কনভার্টারে প্ল্যাটিনাম—প্যালাডিয়াম ও রোডিয়াম নামক ব্যয়বহুল ধাতুসমূহ অনুঘটক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যানবাহনগুলো থেকে বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস করার জন্য এগুলোতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার লাগানো হয়। যানবাহনে উৎপন্ন বর্জ্যগ্যাসকে ক্যাটালাইটিক কনভার্টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে অদাহ্য হাইড্রোকার্বনগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিবর্তিত হয়। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার লাগানো আছে এমন মোটরগাড়িতে সিসাবিহীন পেট্রোল ব্যবহার করা উচিত, কারণ পেট্রোলে উপস্থিত সিসা অনুঘটককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

ভারতবর্ষে বায়ু (বায়ুদূষণের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) **[Air (Prevention and Control of Pollution) Act]** আইন 1981 সালে কার্যকরী হয়েছিল, কিন্তু শ্রবণের পক্ষে অস্বস্থিকর শব্দ (Noice)কে একটি বায়ুদূষকহিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 1987 সালে, এই আইনের সংশোধন করা হয়েছিল। শ্রবণের পক্ষে অস্বস্তিকর শব্দ হল অনাকাঙ্ক্ষিত উচ্চমাত্রার শব্দ। শ্রবণের পক্ষে অস্বস্তিকর শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে মানসিক এবং শারীরবৃত্তীয় ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এটি উপলব্ধি না করে আমরা আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য উচ্চমাত্রায় শব্দ সৃষ্টি করে থাকি। শহর যত বড় হয় তার কাজের পরিধিও তত বৃদ্ধি পায় এবং শ্রবণের পক্ষে অস্বস্তিকর শব্দ সৃষ্টিও বেশি হয়। জেটপ্লেন বা রকেট যখন উড্ডয়নের জন্য ভূমিত্যাগ করে তখন 150dB বা তারও বেশি শব্দ তৈরি হয় এবং খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এধরনের উচ্চমাত্রার শব্দের সংস্পর্শে এলে কর্ণপটহের ক্ষতি হতে পারে এবং এরফলে শ্রবণক্ষমতা চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি শহরগুলোতে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত কমমাত্রার শব্দের সংস্পর্শে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলেও মানুষের শ্রবণক্ষমতা স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শ্রবণের পক্ষে অস্বস্তিকর শব্দ অনিদ্রা, উচ্চহৃদস্পন্দন এবং শ্বাসক্রিয়ার ধরনেরও পরিবর্তন ঘটায় এবং এরফলে মানুষের ধকল অনেকটা বেড়ে যায়।

শব্দদূষণের বহু ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা মাথায় রেখে তোমরা কি তোমাদের চারপাশের শব্দদূষণের সেইসব অপ্রয়োজনীয় উৎসগুলোকে সনাক্ত করতে পারবে যেগুলো থেকে শব্দ সৃষ্টি, কারো কোনো অর্থনৈতিক ক্ষতি না ঘটিয়ে, তৎক্ষণাৎ হ্রাস করা যেতে পারে? আমাদের কলকারখানাগুলো থেকে নির্গত অস্বস্তিকর শব্দকে, শব্দশোষক বস্তু ব্যবহার করে বা কোন কিছুর মাধ্যমে শব্দকে চাপা দিয়ে কমানো যেতে পারে। আমাদেরকে শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শব্দদূষণ রোধে প্রণিত আইনসমূহ যেমন হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়ের চারপাশে হর্ণমুক্ত অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করা, বাজি এবং লাউডস্পীকার থেকে সৃষ্ট শব্দের মাত্রা অনুমোদিত স্তরে রাখা, নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যার পর লাউডস্পীকার বাজানো যেতে পারেনা ইত্যাদি কঠোরভাবে বলবৎ করা প্রয়োজন।

16.1.1 যানবাহণ থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ : দিল্লির একটি কেস অধ্যয়ণ বা স্টাডি (Controlling vehicular air pollution : A case study of Delhi)

দিল্লিতে যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক বেশি হওয়ার কারণে এই মহানগরটিতে বায়ুদূষণের মাত্রা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এই নগরীতে গাড়ীর সংখ্যা গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মোট গাড়ির তুলনায় বেশি। 1990 এর দশকে বিশ্বের 41টি সর্বাপেক্ষা দূষিত নগরীর মধ্যে দিল্লির স্থান ছিল চতুর্থ। দিল্লিতে বায়ুদূষণজনিত সমস্যা এতই মারাত্মক যে ভারতবর্ষের সুপ্রিমকোর্টে এর বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। এ বিষয়টি নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করার পর সুপ্রিমকোর্ট এর নির্দেশিকায় সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই দূষণজনিত সমস্যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলেন। একইসাথে জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত সব যানবাহনে জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে বলেন অর্থাৎ, বাসগুলোতে ডিজেলের পরিবর্তে **কমপ্রেস্‌ড ন্যাচারেল গ্যাস (CNG)** ব্যবহার করতে হবে। 2002 সালের মধ্যে দিল্লির সব বাসগুলোকে CNG চালিত বাসে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তোমাদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে কেন CNG ডিজেল অপেক্ষা অধিকতর ভাল জ্বালানী। এর উত্তর হল এই

যে, সর্বাপেক্ষা কার্যকরীভাবে CNG এর দহন ঘটে। পেট্রোল বা ডিজেল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হলে যানবাহনে যে পরিমাণ অদাহ্য পদার্থ থেকে যায়, CNG ব্যবহৃত হলে সেই তুলনায় অনেক কম পরিমাণ অদাহ্য পদার্থ থেকে যায়। এছাড়াও CNG, পেট্রোল বা ডিজেলের তুলনায় অধিকতর সস্তা এবং পেট্রোল বা ডিজেলের মত CNGকে চোরেরা পাইপ দিয়ে বের করে নিয়ে আসতে পারেনা এবং এরসাথে ভেজালও মেশানো যায় না। যানবাহনকে CNG চালিত যানবাহনে পরিবর্তিত করার প্রধান সমস্যাটি হল এই যে বিতরণকেন্দ্র/ পাম্পের মাধ্যমে CNG সরবরাহের জন্য পাইপলাইন স্থাপন এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ সুনিশ্চিত করা খুবই কঠিন। একইসাথে দিল্লিতে যানবাহন থেকে সৃষ্ট দূষণ হ্রাস করার জন্য বেশকিছু সমান্তরাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরোনো যানবাহনের চলাচল বন্ধ করা, সিসাবর্জিত পেট্রোল ব্যবহার করা, কম সালফারযুক্ত পেট্রোল এবং ডিজেল ব্যবহার করা, যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ব্যবহার করা, যানবাহনে জন্য নির্ধারিত দূষণমাত্রার সীমানির্ধারক নিয়মগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের শহরগুলোতে যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ হ্রাস করার জন্য ভারত সরকার একটি নতুন যানবাহন জ্বালানী-নীতির মাধ্যমে একটি রাস্তার মানচিত্র তৈরি করেন। পেট্রোল এবং ডিজেল জ্বালানীর মধ্যে সালফার ও অ্যারোম্যাটিক যৌগের মাত্রা নিঃসন্দেহে কমানোর উদ্দেশ্যে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইউরো-III নর্ম এই শর্ত আরোপ করে যে সালফারের মাত্রা অবশ্যই ডিজেলের মধ্যে 350 পার্টস পার মিলিয়ন (ppm) এবং পেট্রোলের মধ্যে 150ppm রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট জ্বালানীর মধ্যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের মাত্রা 42 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। রাস্তার মানচিত্র অনুযায়ী, লক্ষ্য হল এই যে, পেট্রোল ও ডিজেলে উপস্থিত সালফারের মাত্রা কমিয়ে 50ppm এবং 35 শতাংশ কমিয়ে আনা। জ্বালানীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যানবাহনের ইঞ্জিনগুলোরও সংস্কার করা প্রয়োজন।

ভর নির্গমণ মান (Mass Emission Standards) (ভারত স্টেজ II যা ইউরো II মান এর সমতুল্য) ভারতবর্ষের কোন নগরীতে এখন আর প্রযোজ্য নয়। নীচের সারণিতে ভারতবর্ষের সর্বশেষ ভর নির্গমণ মান-এর বিবরণ দেওয়া হল (সারণি 16.1)।

সারণি 16.1 ভারতবর্ষের ভর নির্গমণের মান

যানবাহনের ধরন	মান	বাস্তবায়ন হয়েছে এমন শহরসমূহ
4 চাকার যানবাহনসমূহ	ভারত স্টেজ III	সারাদেশে অক্টোবর 2010 থেকে
4 চাকার যানবাহনসমূহ	ভারত স্টেজ IV	13টি বড়নগরে (দিল্লি ও NCR, মুম্বাই, কোলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, সুরাট, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ এবং সোলাপুর) এপ্রিল, 2010 থেকে
3 চাকার যানবাহনসমূহ	ভারত স্টেজ III	সারাদেশে অক্টোবর 2010 থেকে
2 চাকার যানবাহনসমূহ	ভারত স্টেজ III	সারাদেশে অক্টোবর 2010 থেকে

এসকল প্রচেষ্টা করবার জন্য ধন্যবাদ, যারফলে দিল্লিতে বায়ুর গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি গণনা অনুসারে 1997 থেকে 2005 এর মধ্যে দিল্লিতে CO_2 এবং SO_2 এর মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমেছে।

16.2 জলদূষণ এবং এর নিয়ন্ত্রণ (Water pollution and its control)

মানুষ পৃথিবীব্যাপি সব জলাশয়গুলোতে সবধরনের বর্জ্যপদার্থকে নিক্ষেপ করে জলাশয়ের অপব্যবহার করছে। আমাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে জল সবকিছু ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই সত্য সম্পর্কে আমরা অবগত নই যে জল আমাদের এবং একইভাবে অন্যান্য সকল সজীববস্তুরই জীবনরেখা। তোমরা কি নদী ও নর্দমাগুলোর মাধ্যমে ধুঁয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে? মানুষের এইসব কার্যকলাপের জন্যই বিশ্বের

বেশকিছু অংশের পুকুর, হ্রদ, জলধারা, নদী, মোহনা এবং মহাসাগর ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়ছে। জলাশয়ের স্বচ্ছতাকে ধরে রাখার বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারত সরকার 1974 সালে আমাদের জলের উৎসগুলোকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে **জল (দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ) [Water (Prevention and Control of Pollution) Act] আইন** পাশ করেন।

16.2.1 গৃহস্থালী তরলবর্জ্য এবং কারখানা সৃষ্ট বর্জ্য (Domestic sewage and Industrial effluents)

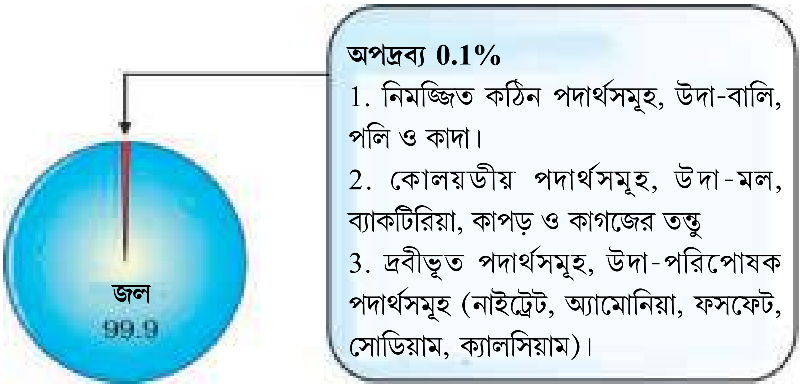

চিত্র 16.2 বর্জ্য জলের উপাদান

শহর এবং নগরীতে আমাদের বাড়িঘরে জল ব্যবহার করে কাজ করার পর আমরা সবই ধুয়ে নর্দমাতে ফেলি। তোমরা কি কখনো ভেবে আশ্চর্য হয়েছ যে, আমাদের বাড়িঘরে সৃষ্ট তরল বর্জ্য কোথায় যায়? গ্রামগুলোতে কি ঘটে? নিকটবর্তী নদীতে পরিবাহিত হওয়া এবং এরজলে মিশে যাওয়ার আগে এই তরল বর্জ্যের পরিশোধন হয় কি? 0.1 শতাংশ অপদ্রব্য (impurities) গার্হস্থ্য তরলকে ব্যবহারের অনুপোযোগী করে তোলে (চিত্র 16.2)। তোমরা তরল বর্জ্য পরিশোধনের প্ল্যান্ট সম্বন্ধে অধ্যায় 10-এ অধ্যয়ন করেছ। কঠিন পদার্থকে অপেক্ষাকৃত সহজে অপসারিত করা গেলেও,

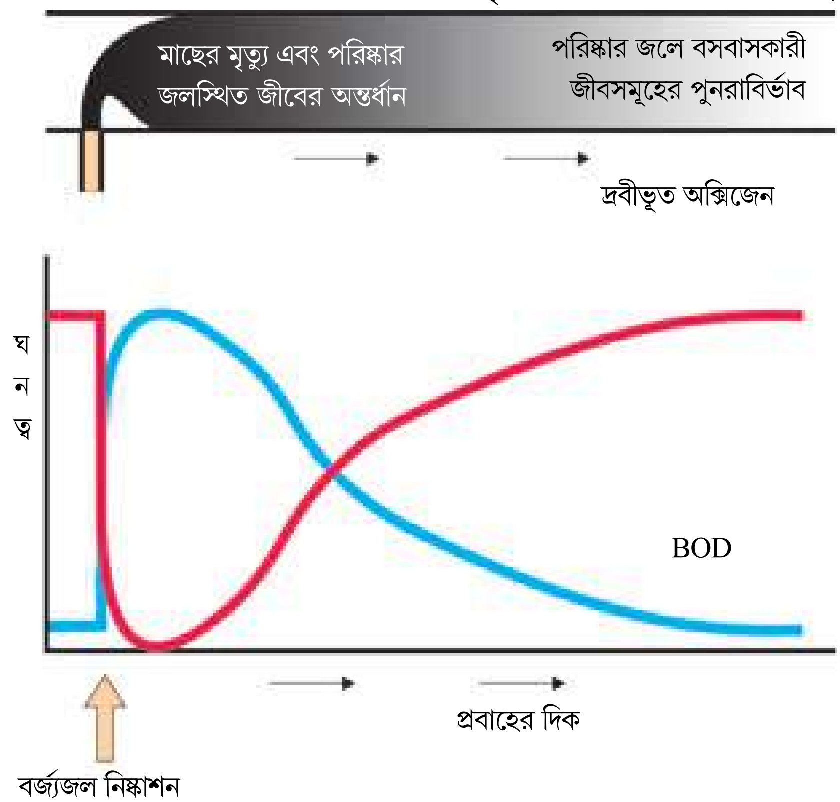

চিত্র 16.3 নদীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের উপর নির্গত বর্জ্যজলের প্রভাব।

নর্দমার জলে দ্রবীভূত লবণ যেমন নাইট্রেট, ফসফেট, অন্যান্য পরিপোষক পদার্থ, বিষাক্ত ধাতব আয়ন এবং জৈব পদার্থসমূহকে অপসারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। গার্হস্থ্য তরল বর্জ্য প্রাথমিকভাবে জৈবভঙ্গুর (Biodegradable) জৈবপদার্থ নিয়ে গঠিত, যারা সহজেই বিয়োজিত হয়ে যায়— এইসব জৈবপদার্থকে সাবস্ট্রেট (**Substrate**) হিসেবে ব্যবহার করে এবং তরল বর্জ্যের কিছু অংশকে ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবরা তাদের কাজে লাগিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে বলে তাদের ধন্যবাদ। **জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD)** নির্ণয়ের মাধ্যমে তরল বর্জ্য জলে জৈবভঙ্গুর জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। কিভাবে এটি করা যেতে পারে তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে কি ? জীবাণুজগতের অধ্যায়ে তোমরা BOD, জীবাণু এবং জৈব ভঙ্গুর পদার্থের পরিমাণের মধ্যে সংগঠিত সম্পর্কের ব্যাপারে অধ্যয়ন করেছ।

চিত্র 16.3 এ নদীর মধ্যে বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ফলে কিছু পরিবর্তন যা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তা দেখানো হয়েছে। জলাশয়ের মধ্যে জৈব পদার্থের জৈবভঙ্গুর ক্রিয়ায় (Biodegradation) যেসব জীবাণু নিয়োজিত থাকে তারা ঐ জলাশয় থেকে বিপুল পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে নেয় এবং এরফলে নিষ্কাশিত বর্জ্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উৎসস্থল থেকেও দূরবর্তী নিম্নস্থানে (down stream) অনেকটাই কমে যায়, যা মাছ এবং অন্যান্য জলজ জীবের মৃত্যুর কারণ হয়।

জলের মধ্যে অধিক পরিমাণ পরিপোষক পদার্থের উপস্থিতির কারণে প্ল্যাঙ্কটন (মুক্তভাবে ভাসমান) শৈবালের বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়, যাকে শৈবাল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি বা শৈবাল ব্লুম **(algal bloom)** বলে (চিত্র 16.4)। এরফলে জলাশয়ের বর্ণ বিশেষ প্রকৃতির হয়ে যায়। শৈবাল সাম্রাজ্য বৃদ্ধির ফলে জলের গুণমানের অবনতি হয় এবং এরফলে মাছের মৃত্যু ঘটে। কিছু ব্লুম সৃষ্টিকারী শৈবাল (bloom forming algae) মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্য মারাত্মক বিষাক্ত।

তোমরা হয়তো জলে ভাসমান উদ্ভিদে, ফিকে লাল বর্ণের (mauve colored) এক প্রকার ফুল দেখেছো। এই উদ্ভিদগুলোকে তার সুন্দর ফুলের জন্য ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অতি বৃদ্ধি জলপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের বৃদ্ধি পাবার ক্ষমতা, আমাদের দ্বারা তাদের অপসারণ করে দেওয়ার ক্ষমতা থেকেও বেশি। এগুলো হল— কচুরিপানা *(Eichhornia crassipes)*, যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টিকারী জলজ আগাছা, এটিকে বাংলার সন্ত্রাসও ('Terror of Bengal') বলা হয়। তারা ইউট্রোফিক জলাশয়ে ব্যাপকহারে বাড়ে এবং জলাশয়ের বাস্তুতান্ত্রিক গতিশীলতায় একপ্রকার অসমতা সৃষ্টি করে।

চিত্র 16.4 একটি শৈবাল ব্লুম-এর সচিত্র দৃশ্য

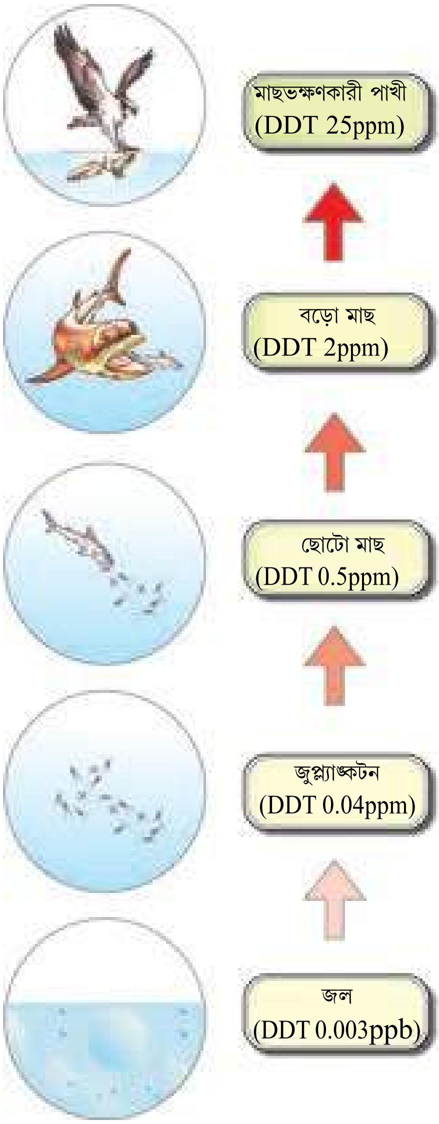

চিত্র 16.5 একটি জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে DDT এর জৈববিবর্ধন

ঘরবাড়ির পাশাপাশি হাসপাতাল থেকেও যেসব বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয় তাতে বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু উপস্থিত থাকতে পারে এবং এসব বর্জ্যজল যদি যথাযথ পরিশোধন না করে জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে এর থেকে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক রোগ যেমন, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র যেমন পেট্রোলিয়াম, কাগজ নির্মাণ শিল্প, ধাতু নিষ্কাশন ও প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকেন্দ্র প্রভৃতি থেকে নির্গত তরল বর্জ্য যেগুলো বাড়িঘর থেকে নির্গত বর্জ্যজল সদৃশ নয় তাতে সাধারণত বিষাক্ত পদার্থ, (বিশেষভাবে (Notably) ভারীধাতু (সংজ্ঞায় যে পদার্থের ঘনত্ব>5 গ্রাম/সেমি^{3} থাকে যেমন পারদ, ক্যাডমিয়াম, তামা, সিসা ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগসমূহ উপস্থিত থাকে।

কিছু বিষাক্ত পদার্থ যা প্রায়ই শিল্পজাত বর্জ্য তরলের মধ্যে উপস্থিত থাকে তা জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে **জৈববিবর্ধন (Biomagnification)** ঘটায়। বিষাক্ত পদার্থের ক্রমাগত পুষ্টিস্তর বা ট্রফিক পর্যায়ে বেড়ে যাওয়ার ঘটনাকে জৈববিবর্ধন বলে। জীবদেহের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থের বিপাকক্রিয়া বা রেচনক্রিয়া ঘটেনা বলে ইহা সঞ্চিত হয় এবং পরবর্তী উচ্চ ট্রফিক স্তরে চলে যায়। এই ঘটনাটি পারদ এবং DDT এর ক্ষেত্রে সুপরিচিত। চিত্র 16.5 এর মধ্যে একটি জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে DDT এর জৈববিবর্ধন দেখানো হয়েছে। এইভাবে ক্রমাগত পুষ্টিস্তরে DDT এর ঘনত্ব বেড়ে চলে। ধরা যাক জলের মধ্যে এর ঘনত্ব 0.003 ppb (ppb=parts per billion) থেকে শুরু হয়েছে, তবে মাছ ভক্ষণকারী পাখীর দেহে তা শেষে জৈববিবর্ধন পদ্ধতিতে বেড়ে গিয়ে 25ppm(ppm= parts per million)-এ পৌঁছায়। DDT এর উচ্চ ঘনত্ব পাখীর দেহে ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়ায় বাধাদান করে, যার ফলে এদের ডিম্বখোলস পাতলা হয়ে যায় এবং অপরিণত অবস্থাতেই ভেঙ্গে যায়, ফলস্বরূপ অবশেষে পাখীর পপুলেশন (bird population) কমে যায়।

জলে পরিপোষক পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলাশয়ের প্রাকৃতিকভাবে বার্ধক্যে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে **ইউট্রোফিকেশান (eutrophication)** বলে। একটি নবীন জলাশয়ের (young lake) জল ঠাণ্ডা, পরিষ্কার এবং অল্প পরিমাণে জীবনধারণের পক্ষে সহায়ক হয়। সময়ের সাথে সাথে নালার জল যখন এসব জলাশয়ে প্রবেশ করে তখন এদের মধ্যে বিভিন্ন পরিপোষক পদার্থ যেমন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস মিশে যায়, যা জলজ জীবের বৃদ্ধিকে প্রণোদিত করে। জলাশয়ের উর্বরাশক্তি বেড়ে যাওয়ায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠে (burgeons) এবং জলাশয়ের নীচস্তরে জৈবপদার্থ জমতে শুরু করে। শতশত বছর ধরে পলি এবং জৈবপদার্থের ধ্বংসস্তূপ জলাশয়ে জমে যাবার ফলে জলাশয় অগভীর ও উষ্ণ হয়ে পড়ে, একইসঙ্গো জলাশয়ের শীতল পরিবেশে বসবাসকারী জীবদের স্থান উষ্ণ জলজ জীব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। জলাভূমির উদ্ভিদেরা (marsh plants) তাদের মূলকে জলাশয়ের অগভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং প্রকৃত জলাশয়ের নিম্নভূমিকে পূরণ করতে থাকে। অবশেষে জলাশয়টি প্রচুর ভাসমান উদ্ভিদ (bog) দ্বারা ভর্তি হয়ে গিয়ে স্থলে পরিবর্তিত হয়। জলবায়ু, জলাশয়ের আকার এবং অন্যান্য শর্তসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি জলাশয়ের প্রাকৃতিক বার্ধক্যকাল (natural aging) হাজার বছরও হতে পারে। তবে কারখানা ও বাড়িতে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থের মত মনুষ্যসৃষ্ট দূষক পদার্থসমূহ জলাশয়ের বার্ধক্যপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে অনেকটা ত্বরান্বিত করতে পারে। এই ঘটনাকে **সংস্কৃতিগত বা দ্রুততর ইউট্রোফিকেশন (cultural or accelerated eutrophication)**

বলে। বিগত শতাব্দীতে, তরল বর্জ্য, কৃষিজ এবং শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থ দ্বারা বিশ্বের অনেক অংশে অবস্থিত জলাশয়ে মারাত্মকভাবে ইউট্রোফিকেশন ঘটেছে। এক্ষেত্রে মুখ্য দূষণকারী পদার্থ হল নাইট্রেট এবং ফসফেট যা উদ্ভিদের পরিপোষক হিসেবে কাজ করে। এরা শৈবালের বৃদ্ধিকে অতি মাত্রায় উদ্দীপিত করে, যার ফলে দৃষ্টিনন্দন নয় এমন গাছ (unsightly scum) ও দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং এগুলো অন্যান্য জলজ জীবদের জন্য বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেনকে হরণ করে নেয়। একই সময়ে, জলাশয়টিতে বয়ে আসা বিভিন্ন দূষক পদার্থ সমস্ত মৎসের জন্য বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে যাদের বিয়োজন ক্রিয়ার জন্য জলে দ্রবীভূত বাকি অক্সিজেনের পরিমাণও কমে যায়। এইভাবে একটি জলাশয় আক্ষরিকভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী এককসমূহ যেমন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত উষ্ণ বর্জ্যজল একটি অন্য এক প্রকার বিশেষ ধরনের দূষকপদার্থ। উচ্চ তাপমাত্রায় সংবেদনশীল জীবের সংখ্যা উষ্ণ বর্জ্যজলের প্রভাবে অপসারিত হয় কিংবা কমে যায় এবং অত্যধিক শীতপ্রধান অঞ্চলে উদ্ভিদ ও মৎসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু ঐ স্থানের নিজস্ব ফ্লোরা এবং ফণা এর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

16.2.2 সুসংহত বর্জ্যজলের পরিশোধনের একটি কেস অধ্যয়ন বা স্টাডি (A case study of integrated waste water treatment)

কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকরণকে একত্রে একটি সুসংহত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করে নর্দমাসহ বর্জ্যজলের পরিশোধন করা যায়। কালিফোর্নিয়ার উত্তর উপকূলে অবস্থিত আর্কাটা শহরে এই জাতীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহনের নিদর্শনকে একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে। হামবোল্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানীদের সহায়তায় শহরের লোকেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি সুসংহত বর্জ্যজল পরিশোধন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। বর্জ্যজলের পরিশোধন দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়—(ক) প্রচলিত উপায়ে অধঃক্ষেপণ, যেখানে পরিস্রাবন এবং ক্লোরিণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিশোধন করা হয়। এই ধাপের পরেও বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক দূষকপদার্থ যেমন ভারী ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় থেকে যায়। এই সমস্যা নিবারণের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল এবং (খ) জীববিজ্ঞানীরা ছয়টি সংযুক্ত জলাভূমিকে সারিবদ্ধভাবে 60 হেক্টরেরও বেশি অংশ নিয়ে জলাভূমির একটি সিরিজ গঠন করেন। এই এলাকায় উপযুক্ত উদ্ভিদ, শৈবাল, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছিল যারা দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থের প্রশমণ, শোষণ এবং আত্তীকরণ (assimilate) ঘটায়। এরফলে, জলাভূমির (marshes) উপর দিয়ে যখন জল প্রবাহিত হয় তখন তা প্রাকৃতিকভাবে বিশুদ্ধ হয়ে যায়।

জলাভূমিটি একটি অভয়ারণ্যেরও সৃষ্টি করেছে যেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রকার মৎস, প্রাণী এবং পাখিদের নিয়ে একটি বৃহৎ জীববৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। এই আশ্চর্যজনক প্রকল্পের দেখাশোনা ও সুরক্ষার দায়িত্ব ফ্রেন্ডস অফ দ্যা আর্কাটা মার্স (FOAM) নামে একটি স্থানীয় নাগরিক গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল।

এইসময় পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে বর্জ্য পদার্থ দূর করার জন্য জলের প্রয়োজন, অর্থাৎ বর্জ্যজল সৃষ্টি হয়। কিন্তু রেচন পদার্থের মত মানব বর্জ্যের বর্জনের জন্য যদি জল প্রয়োজন না হতো তবে কি হতো? তোমরা কি অনুমান করতে পারো যে একজন যদি শৌচালয়ে জল ব্যবহার না করে তবে কি পরিমাণ জল সংরক্ষণ হবে? যাইহোক, এটাই বাস্তব। বাস্তুতান্ত্রিক স্বাস্থ্য বিধান হল একটি সুসংহত ব্যবস্থাপনা (sustainable system) যেখানে শুষ্ক কম্পোস্ট শৌচালয় ব্যবহার করে মানুষের মলমূত্রের ব্যবস্থাপনা করা হয়। মানুষের বর্জ্য পদার্থের নিস্পত্তিতে এটি একটি ব্যবহারিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বল্প খরচে সম্পন্ন করা যায় এমন একটি কার্যকরী সমাধান। এখানে যে মুখ্য বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল যে, এই কম্পোস্টিং পদ্ধতির সাহায্যে, মানষের মলমূত্রকে পুনঃশ্চক্রায়নের মাধ্যমে সম্পদ (যথা- প্রাকৃতিক সার) এ পরিবর্তিত করা হবে, যা রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেবে। এরকম কার্যক্ষম 'EcoSan' জাতীয় শৌচালয় কেরালা এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন অংশে দেখা যায়।

16.3 কঠিন বর্জ্যপদার্থসমূহ (Solid Wastes)

আবর্জনা হিসেবে নিক্ষিপ্ত সবধরনের পদার্থকেই সম্মিলিতভাবে কঠিন বর্জ্যপদার্থ বলে। পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যসমূহ **(municipal solid wastes)** হল এরকম বর্জ্যপদার্থ যেগুলো ঘরবাড়ি, অফিস, দোকানপাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি থেকে পৌরসভা কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং এদের অপসারণ (dispose) ঘটানো হয়। পৌরকঠিন বর্জ্যসমূহে সাধারণত কাগজ, বর্জ্য খাদ্য সামগ্রী, প্লাস্টিক, কাঁচ, ধাতু, রাবার, চামড়া, বস্ত্র প্রভৃতি থাকে। এদের দহনের ফলে বর্জ্যবস্তুর আয়তন কমে যায়, যদিও সাধারণত এগুলোর শেষপর্যন্ত পুরোপুরি দহন হয় না এবং এই ধরনের মুক্ত আবর্জনার স্তূপ (dump) ইঁদুর ও মাছিদের প্রায়শই প্রজননক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। আবর্জনার স্তূপকে মুক্ত পরিবেশে জ্বালানোর পরিবর্তে স্যানিটারী ল্যাণ্ডফিল **(sanitary landfills)** প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্যানিটারী ল্যাণ্ডফিলের মধ্যে বর্জ্যপদার্থগুলোকে চাপ প্রয়োগে সংহত করে (compaction) গর্ত বা খাই (trench) এর মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন ঝুরঝুরে মাটি (dirt) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যদি তোমরা কোনো শহরে বা নগরে বসবাস কর তবে তোমরা কি জানো নিকটতম ল্যাণ্ডফিল স্থান কোথায় রয়েছে? প্রকৃতপক্ষে ল্যাণ্ডফিলও এই সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান নয়, কেননা আবর্জনা সৃষ্টির পরিমাণ, বিশেষত মহানগরীগুলোতে এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এই স্থানগুলোও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই ল্যাণ্ডফিলগুলো থেকে চুঁইয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থসমূহ, অন্যান্য বস্তু ইত্যাদি থেকেও বিপদ ঘটতে পারে, যেগুলো ভৌমজলের উৎসসমূহের দূষণ ঘটাচ্ছে।

মানুষ যদি পরিবেশের এইসব সমস্যাসমূহের প্রতি সংবেদনশীল হয় তবেই একমাত্র এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমাদের দ্বারা সৃষ্ট সব বর্জ্যপদার্থগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি— (ক) জৈবভঙ্গুর বর্জ্য (খ) পুনরাবর্তনযোগ্য বর্জ্য (গ) জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য। যেসব আবর্জনা সৃষ্টি হয় তাদের বাছাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুণর্ব্যবহার বা পুণরাবর্তনযোগ্য বর্জ্যগুলোকে অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে; আমাদের আবর্জনা সংগ্রহকারীরা (kabadiwallahs) এবং ছেঁড়া কাপড় সংগ্রাহকেরা (ragpickers) এইসব পুনরাবর্তনযোগ্য বস্তুকে আলাদা করে দিয়ে একটি বিরাট কাজ করে। জৈব ভঙ্গুর পদার্থগুলোকে জমিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে এগুলোকে প্রাকৃতিকভাবে বিয়োজনের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত অবস্থায় কেবলমাত্র জৈব অ-ভঙ্গুর পদার্থগুলোই থেকে যায়। আমাদের দ্বারা সৃষ্ট আবর্জনার পরিমাণ যাতে কম হয় সেইদিকে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা জৈব অভঙ্গুর পদার্থের ব্যবহার বাড়িয়ে চলেছি। কোনো রেডিমেড ভালো গুণসম্পন্ন খাদ্যবস্তুর প্যাকেট যেমন একটি বিস্কুটের প্যাকেট তুলে নাও এবং এর প্যাকেজিং দেখ— তুমি কি এর মধ্যে কয়টি সুরক্ষাপ্রদানকারী স্তর ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছ? লক্ষ্য করলে দেখবে যে এগুলোর মধ্যে অন্তত একটি প্লাস্টিকের স্তর রয়েছে। এমনকি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুধ এবং জলের মত বস্তুগুলোকেও পলিব্যাগে প্যাকেটজাত করতে শুরু করে দিয়েছি। শহরগুলোতে আমরা সুন্দর পলিস্টাইরিন এবং প্লাস্টিক মোড়কে আবদ্ধ ফল এবং সব্জি কিনতে পারি- এরজন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে আমরা আর কিইবা করতে পারি? এইভাবে আমরা পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রাখছি। সারাদেশের রাজ্যসরকারগুলো প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং পরিবেশ বান্ধব মোড়কের ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কেনাকাটা করতে যাওয়ার সময় পলিথিন নির্মিত থলিকে বর্জন করে কাপড়ের কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু নির্মিত থলি সাথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রয়াস নিতে পারি।

হাসপাতালে এমন ক্ষতিকারক বর্জ্যপদার্থের সৃষ্টি হয় যেগুলোতে জীবাণুনাশক পদার্থ (disinfectants) ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং সংক্রামক প্যাথোজেনসমূহও উপস্থিত থাকে। এই ধরনের বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা ও অপসারণও সতর্কতার সাথে করতে হবে। হাসপাতালে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থসমূহের অপসারণের ক্ষেত্রে দহনচুল্লীর (incinerator) ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেরামতযোগ্য নয় এমন (irreparable) কম্পিউটার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম **'বৈদ্যুতিন বর্জ্যপদার্থ (e-waste)'** নামে পরিচিত। e-বর্জ্যপদার্থকে ল্যান্ডফিলের মধ্যে মাটিচাপা দেওয়া হয় কিংবা ভস্মীভূত করা হয়। উন্নত বিশ্বে সৃষ্ট e-বর্জ্যপদার্থের অর্ধেকের বেশি উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রধানত চীন, ভারত এবং পাকিস্তানে রপ্তানি হয়, যেখানে পুনরাবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে তামা, লোহা, সিলিকন, নিকেল এবং সোনার মত ধাতুকে পুণরুদ্ধার করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে e-বর্জ্য পদার্থের পুনরাবর্তনের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শই এই কাজটি হাতে সম্পন্ন (manual participation) করা হয়। এরফলে শ্রমিকেরা e-বর্জ্য পদার্থের মধ্যে উপস্থিত বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসে। পুনরাবর্তনই হল e-বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার একমাত্র সমাধান, যা একপ্রকার পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি ।

16.3.1 প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থের প্রতিকার বিষয়ক কেস স্টাডি (case study of remedy for plastic waste)

ব্যাঙ্গালোরের একজন প্লাস্টিকের বস্তা প্রস্তুতকারক, প্লাস্টিক বর্জ্যপদার্থের ক্রমবর্ধমান সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের একটি আদর্শ সমাধান বের করেছেন। 57 বছর বয়স্ক আহমেদ খান 20 বছর ধরে প্লাস্টিকের বস্তা তৈরি করে চলেছেন। প্রায় 8 বছর পূর্বে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্লাস্টিক বর্জ্য হল একটি প্রকৃত সমস্যা। তখন তাঁর কোম্পানি পুনরাবর্তনের মাধ্যমে পলিব্লেণ্ড (Polyblend) নামক পরিবর্তিত প্লাস্টিকের একপ্রকার সূক্ষ্ম গুড়া সৃষ্টি করেন। এই মিশ্রণটিকে বিটুমিনের সাথে মিশ্রিত করে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। আহমেদ খান R. V. ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং ব্যাঙ্গালোর নগর নিগমের সহযোগিতায় প্রমাণ করেছিলেন যে, পলিব্লেণ্ড ও বিটুমিনের সংমিশ্রণ দিয়ে যখন রাস্তা তৈরি করা হয়, তখন বিটুমিনের জলবিকর্ষী ধর্ম বৃদ্ধি পায় এবং তাতে রাস্তার আয়ু তিনগুণ বেড়ে যায়। পলিব্লেণ্ড তৈরির ক্ষেত্রে যে-কোনো প্লাস্টিক ফিল্ম বর্জ্য পদার্থকে কাঁচামালরূপে ব্যবহার করা যায়। আবর্জনা কুড়ানো লোকেরা (rag pickers) যখন প্লাস্টিক বর্জ্যপদার্থের প্রতি কেজি 0.40 টাকা দরে বিক্রি করত, খান তখন প্রতি কেজিতে তাদের 6 টাকা করে দিত। খানের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে 2002 এর মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে ইতোমধ্যে 40কিমিরও বেশি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এই হারে পলিব্লেণ্ড তৈরি করতে হলে শীঘ্রই ব্যাঙ্গালোরে খানকে প্লাস্টিক বর্জ্যের ঘাটতির সম্মুখীন হতে হবে। পলিব্লেণ্ডের মত আবিষ্কারের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, এখন আমরা প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারব।

16.4 কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ এবং তাদের প্রভাব (Agro-chemicals and their effects)

সবুজ বিপ্লবের সূচনাকালে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অজৈব সার এবং পেস্টিসাইড পদার্থের ব্যবহার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড, ছত্রাকনাশক প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ঘটনাচক্রে এসমস্ত পদার্থ সেইসব জীব যাদের ধ্বংস করা আমাদের লক্ষ্য নয়, যারা মাটির বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও তাদের পক্ষে, বিষাক্ত । তোমরা কি ভাবতে পারো স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে এই পদার্থসমূহের জৈব বিবর্ধন ঘটতে পারে? আমরা জানি জলজ পরিবেশে রাসায়নিক সারের বর্ধিত মাত্রার ক্রমাগত সংযোজন জলজ বাস্তুতন্ত্র বনাম ইউট্রোফিকেশনের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই কৃষিকার্যে বর্তমান সমস্যাসমূহ অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

16.4.1 জৈব চাষাবাদ বিষয়ক একটি কেস স্টাডি (Case study of organic farming)

সুসংহত জৈব চাষাবাদ হল একটি চক্রাকার, শূন্য বর্জ্যপদার্থ (zero-waste) সৃষ্টিকারী পদ্ধতি যেখানে একটি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থসমূহ অন্য প্রক্রিয়াগুলোর জন্য পরিপোষকরূপে চক্রাকারে

আবর্তিত হয়। এটি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারে সাহায্য করে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হরিয়ানার শোণিপথ অঞ্চলের একজন কৃষক রমেশ চন্দ্র ডাগর ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষাবাদ করছেন। তিনি মৌমাছি চাষ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যবস্থাপনা, জল সংরক্ষণ, কম্পোস্ট তৈরি এবং কৃষিকাজকে প্রক্রিয়াসমূহের একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন যা একে অপরকে সহায়তা করে এবং এরফলে এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত লাভজনক এবং টেকসই উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার প্রয়োজন হয়না, কারণ গবাদিপশুর মলমূত্র (গোবর) সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফসলজাত বর্জ্য কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা একটি প্রাকৃতিক সাররূপে ব্যবহৃত হতে পারে বা খামারের শক্তির চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। সুসংহত জৈব চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করতে এবং এই সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ডাগর হরিয়ানা কৃষক কল্যাণ সংঘ (Hariyana Kisan Welfare Club) গঠন করেন যার বর্তমান সদস্যসংখ্যা 5000 জন কৃষক।

16.5 তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থসমূহ (Radioactive wastes)

শুরুর দিকে নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে একটি দূষণহীন পথ হিসেবে ধরা হতো। পরবর্তী সময়ে এটা উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে নিউক্লিয় শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুতর দুটি স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমটি হল আকস্মিকভাবে কোনো কারণে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নির্গমণ, যা থ্রি মাইল দ্বীপ (Three Mile Island) ও চেরনোবিল কাণ্ডে ঘটতে দেখা গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি হল তেজস্ক্রিয় বর্জ্যসমূহের নিরাপদ নিষ্পত্তি।

নিউক্লিয় বর্জ্যপদার্থ থেকে নির্গত বিকিরণ জীবদেহের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে, কারণ এটি খুবই উচ্চহারে পরিব্যক্তি (mutation) ঘটায়। উচ্চমাত্রায় নিউক্লিয় বিকিরণ প্রাণঘাতী হয় কিন্তু নিউক্লিয় বিকিরণের নিম্নমাত্রাও বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে, এই ব্যাধিগুলোর মধ্যে সচরাচর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ক্যান্সার। তাই, নিউক্লিয় বর্জ্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দূষক পদার্থ এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এই বর্জ্যের মোকাবিলা করতে হবে।

এটি সুপারিশ করা হয়েছে যে নিউক্লিয় বর্জ্যের যথাযথ প্রাক্‌ব্যবস্থাপনার পর ঐ বর্জ্যকে পুরু আস্তরণবিশিষ্ট কোন পাত্রে সঞ্চিত করার পর একে পাথুরে স্থানের ভেতরে ভূ-পৃষ্ঠের নীচে প্রায় 500 মিটার গভীরে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। তবে, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্পত্তির এই পদ্ধতি নিয়েও জনসাধারণের মধ্যে তীব্র আপত্তি রয়েছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্পত্তির এই পদ্ধতিটি বহু মানুষের কাছে কেন গ্রহণযোগ্য নয় বলে তোমরা মনে করো ?

16.6 গ্রীণহাউস প্রভাব এবং ভূ-উষ্ণায়ন (Green house effect and global warming)

'গ্রীণহাউস প্রভাব' পরিভাষাটি এমন একটি ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছিল যা একটি গ্রীণহাউসে ঘটে। তোমরা কি কখনো একটি গ্রীণ হাউস দেখেছ? এটি দেখতে একটি ছোট কাচের ঘরের মত হয় যা বিশেষত শীতকালে গাছপালা লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রীণহাউসে ব্যবহৃত কাচের প্যানেলের মধ্য দিয়ে আলোক এই ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে, কিন্তু এই ঘর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই গ্রীণহাউসটি উষ্ণ হয়ে উঠে, এটি একটি মোটরগাড়িকে কয়েকঘণ্টা রোদে রেখে দিলে তার ভেতরটা যেমন উষ্ণ হয়ে উঠে অনেকটা সেইরূপ।

গ্রীণহাউস প্রভাব হল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা ভূ-পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। তোমরা এটা জেনে আশ্চর্য হবে যে গ্রীণহাউস প্রভাব না থাকলে ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বর্তমান গড় 15^0C এর পরিবর্তে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে -18^0C হয়ে যেতো। গ্রীণহাউস প্রভাবকে বুঝতে

চিত্র 16.6 বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তরে সৌরশক্তি

গেলে এটি জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তরে যে সৌরশক্তি পৌঁছায় তার কি পরিণতি ঘটে (চিত্র 16.6)। মেঘপুঞ্জ এবং গ্যাসসমূহ পৃথিবীর দিকে আগত সৌরবিকিরণের প্রায় এক চতুর্থাংশের প্রতিফলন ঘটায় এবং এর কিছুটা অংশ শোষণ করে নেয়, কিন্তু আগত সৌরবিকিরণের প্রায় অর্ধেক ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং একে উষ্ণ করে তোলে, যদিও এর একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। পৃথিবীর উপরিস্তর তাপকে অবলোহিত বিকিরণরূপে (infrared radiation) পুনরায় অন্তরীক্ষে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু এর কিছু অংশ অন্তরীক্ষে ফিরে যেতে পারেনা, কারণ বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসসমূহ (যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি) এর একটি বড় অংশ শোষণ করে নেয়। এই গ্যাসগুলোর অনুসমূহ তাপশক্তির বিকিরণ ঘটায় এবং ওই তাপশক্তির একটি বড় অংশ পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং একে আবার উষ্ণ করে তোলে। এই চক্রটির বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। উপরে উল্লিখিত গ্যাসগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেনকে সচরাচর গ্রীণহাউস গ্যাস বলা হয় (চিত্র 16.7) কারণ এরা গ্রীণ হাউস প্রভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী।

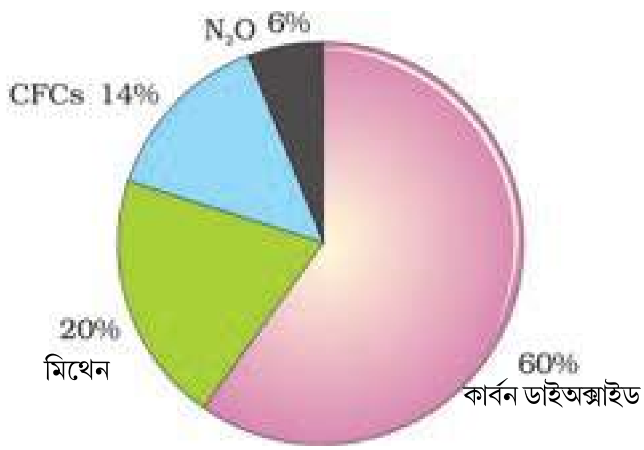

চিত্র 16.7 সামগ্রিক ভূ-উষ্ণায়নে বিভিন্ন গ্রীণহাউস গ্যাসগুলোর আপেক্ষিক অবদান

গ্রীণহাউস গ্যাসসমূহের স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা যথেস্ট বৃদ্ধি পায় এবং এরফলে ভূ-উষ্ণায়ন ঘটে। গত শতাব্দীতে, পৃথিবীর তাপমাত্রা 0.6^0C বৃদ্ধি পেয়েছে, এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির বেশিরভাগটিই ঘটেছে গত তিন দশক ধরে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির ফলে পরিবেশে ক্ষতিকারক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এরফলে জলবায়ুর বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে (যেমন- El Nino effect), এরফলে মেরুপ্রদেশের বরফচূড়া (ice caps) এবং হিমালয়ের তুষারচূড়ার মত অন্যান্য স্থানসমূহেও বরফের গলন বৃদ্ধি পায়। বহুবছর ধরে এরূপ চলতে থাকলে সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে যারফলে বহু তটীয়

এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। ভূ-উষ্ণায়ন সর্বক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন আনতে পারে, তা এমন একটি বিষয় যে বিষয়ে এখনো সক্রিয়ভাবে গবেষণা চলছে।

আমরা কিভাবে ভূ-উষ্ণায়নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? এটি নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের মধ্যে রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমানো, শক্তি ব্যবহারের দক্ষতার উন্নতিসাধন, বনধ্বংস কমানো, বৃক্ষরোপণ এবং মানুষের জনসংখ্যা-বৃদ্ধি হ্রাসকরণ। বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস করতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগও গ্রহণ করা যেতে পারে।

16.7 স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনস্তরের ক্ষয় (Ozone depletion in the stratosphere)

তোমরা পূর্বে একাদশ শ্রেণির রসায়ন শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নকালে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে (ট্রপোস্ফিয়ার) গঠিত খারাপ ওজোন ('bad' ozone) সম্পর্কে জেনেছিলে, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে। তবে ভালো ওজোনও ('good' ozone) রয়েছে এবং এই ওজোন বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর অংশে অর্থাৎ **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার**-এ পাওয়া যায় এবং এটি সূর্য থেকে আগত অতিবেগুণি রশ্মির বিকিরণ শোষণকারী একটি পুরু আস্তরণরূপে অবস্থান করে। অতিবেগুণি রশ্মিসমূহ সজীববস্তুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ সজীব বস্তুর দেহে অবস্থিত DNA ও প্রোটিন প্রধানত অতিবেগুণি (UV) রশ্মিকে শোষণ করে এবং এই রশ্মির উচ্চশক্তি ওই অণুসমূহস্থিত রাসায়নিক বন্ধনীগুলোকে ভেঙ্গে দেয়। বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত যে বায়ুস্তম্ভ রয়েছে তাতে ওজোনের স্থূলত্ব **ডবসন এককে** (DU) পরিমাপ করা হয়।

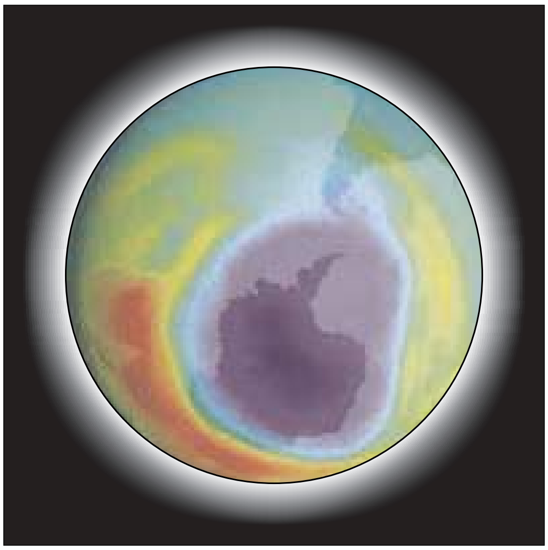

চিত্র 16.8 অ্যান্টার্কটিকার উপরে অবস্থিত ওজোন ছিদ্রকে বেগুণী বর্ণে দেখানো হল, যেখানে ওজোন স্তর হল সবচেয়ে পাতলা স্তর। ওজোন স্তরকে ডবসন এককে দেখানো হল (বেগুণী থেকে লাল বর্ণের স্কেলটিকে ভালো করে দেখো)। অ্যান্টার্কটিকায় প্রতিবছর আগস্টের শেষে এবং অক্টোবরের শুরুতে ওজোনস্তর সৃষ্টি হয়। সৌজন্যে: NASA

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে আণবিক অক্সিজেনের উপর UV রশ্মিসমূহের ক্রিয়ার ফলে, প্রতিনিয়ত ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে এবং আবার ভেঙ্গো গিয়ে আণবিক অক্সিজেনে (O_2) পরিণত হচ্ছে। স্ট্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনের উৎপাদন ও ভাঙ্গানের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকতে হবে। সম্প্রতি **ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs)** দ্বারা ওজোনের ভাঙ্গান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শীতলকরূপে (refrigerants) CFCs বহুল ব্যবহৃত হয়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে নির্গত CFCs উপরে উঠে গিয়ে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পৌঁছায় । স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে UV রশ্মিসমূহ CFCs এর উপর কাজ করে এবং এর ফলে CFCs থেকে Cl পরমাণুসমূহ মুক্ত হয়। Cl ওজোনকে ভেঙ্গো দেয় এবং এরফলে আণবিক অক্সিজেন মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় Cl পরমাণুসমূহ ব্যবহৃত হয় না কারণ এই পরমাণুগুলো কেলব অনুঘটকরূপে কাজ করে। তাই যে পরিমাণ CFC ই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যুক্ত হোক না কেন এরা স্থায়ী এবং প্রতিনিয়ত ওজোনস্তরকে প্রভাবিত করে। যদিও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরেরেই ওজোন স্তরে ব্যাপক ক্ষয় হচ্ছে কিন্তু অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলেই এই ক্ষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর ফলস্বরূপ একটি বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাতলা ওজোনস্তর সৃষ্টি হয়েছে, যাকে সাধারণভাবে **ওজোন ছিদ্র (Ozone hole)** বলা হয় (চিত্র 16.8)।

অতিবেগুণি-B (UV-B) থেকে কম তরঙ্গাদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অতিবেগুনি রশ্মিগুলোর বিকিরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় যা ওজোন স্তরটিকে অক্ষত রাখে। কিন্তু UV-B রশ্মি DNA-র ক্ষতিসাধন করে এবং পরিব্যক্তি ঘটায়। এটি ত্বকের বার্ধক্য, ত্বককোষের ধ্বংস এবং

ত্বকের বিভিন্ন প্রকার ক্যান্সার সৃষ্টি করে। মানুষের চোখের অচ্ছোদপটল (cornea) অংশটি অতিবেগুণি-B (UV-B) রশ্মিকে শোষণ করে এবং UV-B এর উচ্চমাত্রা অচ্ছোদপটলের প্রদাহ সৃষ্টি করে, যাকে **তুষার-অন্ধত্ব (snow blindness)**, ছানি (cataract) ইত্যাদি বলা হয়। UV-Bএর এরূপ প্রভাবের ফলে অচ্ছোদপটল স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ওজোন অবক্ষয়ের ক্ষতিকর প্রভাবকে উপলব্ধি করতে পেরে 1987 সালে কানাডার মন্ট্রিয়েল-এ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল নামে পরিচিত। ওজোন অবক্ষয়কারী পদার্থের (Ozone depleting substance) নির্গমণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 1989 খ্রিস্টাব্দে এই চুক্তি কার্যকরী হয়। পরবর্তীকালে CFCs সহ আরও অন্যান্য ওজোনস্তর অবক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের নির্গমণকে কমানোর উদ্দেশ্যে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পৃথক পৃথক সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা তৈরি করা হয়েছে।

16.8 সম্পদের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা সঠিক না হওয়ার ফলে সৃষ্ট অবক্ষয় (Degradation by improper resource utilisation and maintenance)

প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় যে কেবলমাত্র দূষণ পদার্থের প্রভাবেই ঘটে তা নয় বরং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না হলেও তা ঘটতে পারে।

ভূমিক্ষয় ও মরুকরণ : ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে কয়েকশো বৎসর সময় লেগে যায়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কৃষিকাজ, অবাধ গোচারণ, বনধ্বংস ও স্বল্প সেচপদ্ধতির মত মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এই উর্বর মৃত্তিকা স্তর খুব সহজেই অপসারিত হতে পারে, যার ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ শুষ্ক অঞ্চলে পরিণত হয়। যখন ভূ-পৃষ্ঠের অনুর্বর বিশাল অঞ্চলসমূহ (barren patches) সময়ের সাথে সাথে একসাথে মিলে যায় তখন মরুভূমির সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এটি স্বীকৃত যে আজকের দিনে মরুকরণ একটি প্রধান সমস্যা, যা বিশেষত ক্রমবর্ধমান নগরায়নের (urbanisation) ফলেই ঘটছে।

জলাবদ্ধতা এবং মৃত্তিকার লবণাক্ততা : যথাযথ নিকাশী ব্যবস্থা ছাড়া জলসেচের ফলে মৃত্তিকায় জলাবদ্ধতার (waterlogging) সৃষ্টি হয়। ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি জলাবদ্ধতার কারণে মৃত্তিকার উপরিস্তরে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তারপর এই লবণ জমির উপরিভাগে পাতলা স্তর হিসেবে জমা হয় কিংবা উদ্ভিদের মূল সংলগ্ন অঞ্চলে এসে জমা হতে থাকে। এই লবণের বর্ধিত পরিমাণ ফসলের বৃদ্ধির অন্তরায় এবং কৃষির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। জলাবদ্ধতা এবং মৃত্তিকার লবণাক্ততা হল সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে আসা কিছু সমস্যা।

16.9 অরণ্যবিনাশ (Deforestation)

অরণ্য বিনাশ হল অরণ্য আচ্ছাদিত অঞ্চলসমূহকে অরণ্যহীন অঞ্চলে পরিণত করা। একটি হিসেব অনুযায়ী দেখা গেছে ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রায় 40% অরণ্য হারিয়ে গেছে, যেখানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এর পরিমাণ মাত্র 1%। অরণ্য ধ্বংসের বর্তমান চিত্রটি, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, অত্যন্ত ভয়ানক। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষের 30% ভূমি অরণ্যাবৃত ছিল। শতাব্দীর শেষভাগে এই অরণ্যভূমি সংকুচিত হয়ে 19.4% এ এসে দাঁড়ায়, যেখানে ভারতের ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি (1988) এর সুপারিশ অনুযায়ী সমভূমির 33% এবং পার্বত্য অঞ্চলের 67% অরণ্য আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন।

অরণ্য বিনাশ কিভাবে ঘটে ? মানুষের বেশকিছু কার্যকলাপ এরজন্য দায়ী। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হল মানুষের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের যোগানের জন্য বনভূমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করা। আসবাবপত্র তৈরির জন্য, জ্বালানী কাঠ হিসাবে, গবাদি পশুর প্রতিপালন এবং আরও অন্যান্য বেশ কিছু প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদন করা হয়। উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে সাধারণভাবে **জুম চাষ** (Jhum cultivation) নামে পরিচিত কৃষি পদ্ধতি যাতে বন কেটে পুড়িয়ে ফেলা হয় (Slash and

burn agriculture), কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় এই পদ্ধতিটিও অরণ্য বিনাশের জন্য দায়ী। বন কাটা এবং পুড়িয়ে ফেলা— এই কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকেরা অরণ্যে উপস্থিত বৃক্ষসমূহকে কেটে ফেলে এবং জমিতে রয়ে যাওয়া উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলে। উৎপন্ন ছাই (ash) সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তখন এই জমি কৃষিকাজের জন্য অথবা গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। চাষাবাদের পরে এই অঞ্চলটিকে তার উর্বরতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক বছরের জন্য ফেলে রাখা হয়। কৃষকেরা তখন চাষের উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যায় এবং এই পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। আগেকার দিনে যখন জুমচাষের বহুল প্রচলন ছিল তখন পরবর্তী চাষের আগে যথেষ্ট সময়ের বিরতি দেওয়া হতো। তাই চাষাবাদজনিত প্রভাব থেকে জমির পুনরুদ্ধার সম্ভব হতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিকার্যের পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে এই পুনরুদ্ধার পর্যায়টি রাখা সম্ভব হয়ে উঠছে না, এর ফলস্বরূপ অরণ্য বিনাশ হচ্ছে। অরণ্য বিনাশের পরিণতিগুলো কি কি ? বন ধ্বংস করার ফলে যে মুখ্য প্রভাবগুলো দেখা যায় তার মধ্যে একটি হল বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ যে গাছ কার্বনের একটি বিরাট অংশকে নিজেদের জীবভরে (biomass) ধরে রাখতে পারে, অরণ্য বিনাশের সাথে সাথে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অরণ্য ধ্বংস করার ফলে বসতি ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, জলচক্র ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, অরণ্য বিনাশ ভূমিক্ষয়ের কারণ এবং যা চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে মরুকরণও ঘটায়।

পুন:বনসৃজন হল সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে অতীতে কোন একসময় অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এমন বনের পুন:সৃজন। অরণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এমন এলাকায় (deforested area) প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় বনসৃজন হতে পারে। তবে আমরা ওই এলাকায় পূর্বে অস্তিত্ব ছিল এমন জীববৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পুন:বনসৃজন প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করতে পারি।

16.9.1 অরণ্য সংরক্ষণে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কেস স্টাডি (Case study of people's participation in conservation of forests)

ভারতবর্ষে জনসাধারণের অংশগ্রহণের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। 1731 সালে রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুরের রাজা তার মন্ত্রীদের একজনকে একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণের জন্য কাঠের ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। রাজার মন্ত্রী এবং কর্মচারীরা তখন গাছ কাটবার উদ্দেশ্যে বিশনোই সম্প্রদায় অধ্যুষিত একটি গ্রামের নিকটবর্তী একটি বনভূমিতে যায়। প্রকৃতির সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের জন্য, বিশনোই সম্প্রদায় পরিচিত ছিল। বিশনোই সম্প্রদায় রাজার গাছ কাটার এই প্রচেস্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। অমৃতা দেবী নামক বিশনোই সম্প্রদায়ের একজন মহিলা একটি গাছকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং রাজার লোকদের বলেছিলেন যে গাছ কাটার পূর্বে তাঁকে কাটতে হবে এবং এইভাবে তিনি একটি দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গাছ রক্ষা করার বিষয়টি তাঁর কাছে তাঁর নিজের জীবনের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, রাজার লোক তাঁর আবেদনে (pleas) কর্ণপাত না করে, অমৃতাদেবীকে শুদ্ধ গাছটিকে কেটে ফেলেছিলেন। তারপর তার তিনকন্যা এবং শতাধিক বিশনোই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, তাঁর পথ অনুসরণ করে এবং গাছ রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দেন। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য মানুষের আত্মবলিদানের এই ধরনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আমরা আর কোথাও খুঁজে পাব না। গ্রামাঞ্চলের কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যারা বন্যজীবন সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাহস দেখিয়েছেন এবং আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি **অমৃতাদেবী বিশনোই ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাওয়ার্ড** ঘোষণা করেছেন।

তোমরা হয়তো হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের **চিপকো আন্দোলনের** কথা শুনে থাকবে। 1974 সালে স্থানীয় মহিলারা এই অঞ্চলের গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে রেখে ঠিকাদারদের কুঠারাঘাত থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে চিপকো আন্দোলন প্রসংশিত হয়েছিল।

অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারত সরকার 1980 এর দশকে যৌথ অরণ্য ব্যবস্থাপনার **[Joint Forest Management, (JFM)]** ধারণাটির প্রচলন করেন যাতে অরণ্য সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা যায়। অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার বিনিময়ে তারা বিভিন্ন বনজ সম্পদ (যেমন- ফল, আঠা, রাবার, ঔষধপত্র ইত্যাদি) লাভ করে, তাই অরণ্য যাতে টেকসই থাকে সেইভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ দূষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষকরণ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের মাত্রা স্থানীয়, আঞ্চলিক স্তর থেকে বিশ্বস্তরে ভিন্ন ভিন্ন। কলকারখানা এবং যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানী, যেমন কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের ফলেই প্রধানত বায়ুদূষণ ঘটে। এগুলো মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সবার পক্ষেই ক্ষতিকারক এবং এই কারণে এগুলোকে অবশ্যই অপসারিত করে বায়ুকে পরিষ্কার রাখতে হবে। গার্হস্থ্যবর্জ্য, বিভিন্ন জলাশয়ের দূষণের খুবই সাধারণ উৎস যা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয় কিন্তু জলাশয়সমূহের জলে জৈব অক্সিজেনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। গার্হস্থ তরল বর্জ্য, পরিপোষক, বিশেষত নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ হয় যা ইউট্রোফিকেশন ঘটায় এবং অ্যালগাল ব্লুম সৃষ্টি করে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির (nuisance) তৈরি করে। কারখানার বর্জ্যজল প্রায়শই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ বিশেষত ভারী ধাতু এবং জৈবযৌগ সমৃদ্ধ হয়। কারখানার বর্জ্যজল সজীববস্তুর ক্ষতিসাধন করে। পৌরকঠিন বর্জ্যসমূহও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং এইগুলোকে অবশ্যই ল্যান্ডফিলে ফেলে দেওয়া উচিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্যসমূহ এবং e-বর্জ্যসমূহের মত বিপজ্জনক বর্জ্যগুলোর অপসারণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। মৃত্তিকাদূষণ প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহ (যেমন-পেস্টিসাইড) এবং কৃষিক্ষেত্রে জমা কঠিন বর্জ্যসমূহের লিচিং এর কারণে ঘটে।

বিশ্বব্যাপী দেখা যায় এমন দুটি পরিবেশীয় সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান গ্রীণহাউস প্রভাব যা পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলছে এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনস্তরের অবক্ষয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও CFCs এর নির্গমণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং অরণ্যের ধ্বংস হল গ্রীণহাউস প্রভাব বেড়ে যাওয়ার মুখ্য কারণসমূহ। এটি বৃষ্টিপাতের ধরন, ভূ-উষ্ণায়নের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি সজীববস্তুর ক্ষতিসাধনও করতে পারে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন, যা অতিবেগুণি রশ্মির বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করে, তা CFCs এর নির্গমণের ফলে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই ত্বকের ক্যান্সার, পরিব্যক্তি এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

1. গার্হস্থ তরলবর্জ্যের প্রধান উপাদানগুলো কি কি ? নদীতে তরলবর্জ্য নির্গমণের প্রভাবগুলো আলোচনা করো।
2. বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন স্থান ভ্রমণকালে তোমাদের দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্যপদার্থসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। তোমরা কি খুব সহজেই এই বর্জ্যসমূহের সৃষ্টি হ্রাস করতে পারবে? কোন ধরনের বর্জ্য সৃষ্টি হ্রাস করা খুবই কঠিন বা অসম্ভব হবে?
3. ভূ-উষ্ণায়নের কারণ এবং প্রভাবগুলো আলোচনা করো। ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন?
5. স্তম্ভ 'ক' এবং স্তম্ভ 'খ'-তে দেওয়া বিষয়গুলো মেলাও :

স্তম্ভ 'ক'	**স্তম্ভ 'খ'**
ক) ক্যাটালাইটিক কনভার্টার	(অ) বস্তুকণা
খ) ইলেকট্রোস্টেটিক প্রেসিপিটেটর	(আ) কার্বন মনোঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ
গ) ইয়ার মাফ্‌স	(ই) উচ্চ শব্দমাত্রা
ঘ) ল্যাণ্ডফিলস	(ঈ) কঠিন বর্জ্যসমূহ

5. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিশ্লেষণধর্মী টীকা লিখ :
   ক) ইউট্রোফিকেশন
   খ) জৈববিবর্ধন
   গ) ভৌমজলের অবক্ষয় এবং এর পরিপূরণের পথসমূহ
6. অ্যান্টার্কটিকার উপরের বায়ুমণ্ডলে কেন ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে? ক্রমবর্ধমান অতিবেগুণি রশ্মির বিকিরণ কিভাবে আমাদের প্রভাবিত করছে?
7. অরণ্য সুরক্ষা এবং সংরক্ষণে মহিলা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভূমিকা আলোচনা কর।
8. একজন ব্যক্তি হিসেবে, পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য তুমি কি কি পন্থা অবলম্বন করবে?
9. নিম্নলিখিতগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :
   ক) তেজস্ক্রিয় বর্জ্যসমূহ
   খ) ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ ও e-বর্জ্যসমূহ
   গ) পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যসমূহ
10. দিল্লিতে যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ কমানোর জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? দিল্লিতে কি বায়ুর গুণমান উন্নত হয়েছে?
11. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর :
   ক) গ্রীণহাউস গ্যাসসমূহ
   খ) ক্যাটালাইটিক কনভার্টার
   গ) অতিবেগুণি B রশ্মি।